নির্বাচিত
রবিবারের গল্প

অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
(প্রকাশন বিভাগ)
৭৩, মহাত্মা গান্ধি রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

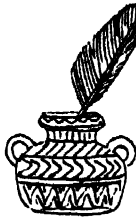
প্রকাশক :
অজিতকুমার জানা
প্রযত্নে অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স
৭৩ মহাত্মা গান্ধি রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারি ১৯৬৩

প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

বর্ণগ্রন্থন : পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন
কলকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক : স্টারলাইন
১৯ এইচ/এইচ/১২ গোয়াবাগান স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০০৬



ভরতের ঝুমঝুমি

পরশুরাম

হৃষীকেশ তীর্থে গঙ্গার ধারে যে ধর্মশালা আছে, তারই সামনের বড় ঘরে আমরা আশ্রয় নিয়েছি— আমি, আমার মামাতো ভাই পুলিন, আর তার দশ বছরের ছেলে পল্টু। তা ছাড়া টহলরাম চাকর আর চারটে সাদা ইঁদুরও আছে। ইঁদুর আনতে আমাদের খুব আপত্তি ছিল কিন্তু পল্টু বললে, 'বা রে, আমি সঙ্গে না নিলে এদের খাওয়াবে কে? বাড়ির ছটা বেড়ালই তো এদের খেয়ে ফেলবে।' যুক্তি অকাট্য, ইঁদুরের ভাড়াও লাগে না, সুতরাং সঙ্গে আনা হয়েছে। তারা রাত্রে একটা খাঁচার মতন বাক্সে বাস করে, দিনের বেলায় পল্টুর পকেটে বা মুঠোর মধ্যে থাকে, অথবা তার গায়ের ওপর চরে বেড়ায়।

সমস্ত সকাল টো টো করে বেরিয়েছি, এখন বেলা এগারোটা, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। চা তৈরির সরঞ্জাম আমরা সঙ্গে এনেছি, কিন্তু রান্নার কোনও জোগাড় নেই, তার হাঙ্গামা আমাদের পোষায় না। দোকান থেকে এক ঝুড়ি মোটা মোটা আটার লুচি, খানিকটা স্বচ্ছন্দবনজাত কচুঘেঁচুর ঘণ্ট, আর সেরখানেক নুড়ির মতন শক্ত প্যাঁড়া আনা হয়েছে। আমরা স্নান সেরে ঘরের দরজা বন্ধ করে খাটিয়ায় বসে কোলের ওপর শালপাতা বিছিয়েছি, টহলরাম পরিবেশনের উপক্রম করছে, এমন সময় বাইরে থেকে ভাঙা কর্কশ গলায় আওয়াজ এল — 'অয়মহং ভোঃ।'

কথাটা কোথায় যেন আগে শুনেছি। দরজা খুলে বাইরে এসে দেখলুম, একজন বৃদ্ধ সাধুবাবা। রংটা বোধ হয় এককালে ফরসা ছিল, এখন তামাটে হয়ে গেছে। লম্বা, রোগা, মাথার জটাটি ছোট কিন্তু অকৃত্রিম, গোঁফ আর গালের ওপর দিকের দাড়ি ছেঁড়া ছেঁড়া, যেন ছাগলে খেয়েছে। কিন্তু থুতনির দাড়ি বেশ ঘন আর লম্বা, নীচের দিকে ঝুঁটির মতন একটি গেরো বাঁধা। দেখলে মনে হয় এই গেরোটি কোনও কালে খোলা হয় না। পরনের গেরুয়া কাপড় আর কাঁধের কম্বল অত্যন্ত ময়লা। সর্বাঙ্গে ধুলো, গলায় তেলচিটে পইতে, হাতে একটা ঝোলা আর তোবড়া ঘটি। রুদ্রাক্ষের মালা, ভস্মের প্রলেপ, গাঁজার কলকে, চিমটে, কমণ্ডলু প্রভৃতি মামুলি সাধুসজ্জা কিছুই নেই।

প্রশ্ন করলাম, 'ক্যা মাংতা বাবাজি?' বাবাজি উত্তর দিলেন না, সোজা ঘরে ঢুকে আমার খাটিয়ায় বসে পড়লেন। টহলরাম বাঙালির সংসর্গে থেকে একটু নাস্তিক হয়ে পড়েছে,

অচেনা সাধুবাবাদের ওপর তেমন ভক্তি নেই। রুখে উঠে বললে, 'আর কৈসা বেহুদা আদমি তুম, উঠো খাটিয়াসে।'

সাধুবাবা ভ্রূকুটি করে রাষ্ট্রভাষায় যে গালাগালি দিলেন তা অশ্রাব্য অবাচ্য অলেখ্য। পুলিন অত্যন্ত রেগে গিয়ে গলাধাক্কা দিতে গেল। আমি তাকে জোর করে থামিয়ে বললুম, 'করো কি, বাবাজির সঙ্গে একটু আলাপ করেই দেখা যাক না।'

প্রমোদ চাটুজ্যে মশাই বিস্তর সাধুসঙ্গ করেছেন। সাধুচরিত্র তাঁর ভাল রকম জানা আছে, যোগী অবধূত বামাচারী তান্ত্রিক অঘোরপন্থী প্রভৃতি হরেক রকম সাধক সম্বন্ধে তিনি গবেষণা করেছেন। তাঁর লেখা থেকে এইটুকু বুঝেছি যে, গরুর যেমন শিং, শজারুর যেমন কাঁটা, খট্টাশের যেমন গন্ধ, তেমনি সিদ্ধপুরুষদের আত্মরক্ষার উপায় গালাগালি। তাঁদের কটুবাক্যের চোটে অনধিকার বাজে ভক্তরা ভেগে পড়ে, শুধু নাছোড়বান্দা খাঁটি মুক্তিকামীরা রয়ে যায়। এই আগন্তুক সাধুবাবাটির মুখখিস্তির বহর দেখে মনে হল নিশ্চয় এঁর মধ্যে বস্তু আছে। সবিনয়ে বললাম, 'ক্যা মাংতে হুকুম কিজিয়ে বাবা।'

বাবা বললেন, 'ভোজন মাংতা। আরে তোমরা তো দেখছি বাঙালি, বাংলাতেই বল না ছাই।'

বাবাজির মুখে আমাদের মাতৃভাষা শুনে খুশি হয়ে বললুম, 'এই পুরি তরকারি প্যাঁড়া আপনার চলবে কি?'

'খুব চলবে। কিন্তু ওইটুকুতে কী হবে। আমি আছি, তোমরা তিনজন আছ, তোমাদের ওই রাক্ষস চাকরটা আছে। আরও সের দুই আনাও।'

টহলরামকে আবার বাজারে পাঠালুম। পুলিনের পেশা ওকালতি, কিন্তু মক্কেল তেমন জোটে না, তাই বেচারা সুবিধে পেলেই যাকে তাকে সওয়াল করে শখ মিটিয়ে নেয়। বললে, 'আপনি বাঙালি ব্রাহ্মণ?'

'সে খোঁজে তোমার দরকার কি, আমার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবে নাকি? আমার ভাষা সংস্কৃত, তবে তোমরা তা বুঝবে না তাই বাংলা বলছি।'

'আপনি কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, গিরি, পুরিভারতী, অরণ্য না আর কিছু?'

'ওসব অর্বাচীন দলের মধ্যে আমি নেই। আমার আদি আশ্রম ব্রহ্মলোক, আমি একজন ব্রহ্মর্ষি।'

'নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?'

'বোবা যখন নও তখন না পারবে কেন। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারবে কি? তোমরা তো পাষণ্ড নাস্তিক। আমি হচ্ছি মহামুনি দুর্বাসা।'

কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থাকার পর প্রণিপাত করে আমি বললুম, 'ধন্য আমরা! চেহারা যেমনটি শুনেছি তেমনটি দেখছি বটে, কিন্তু লোকে যে আপনাকে বদরাগী বলে তা তো মনে হচ্ছে না। এই তো আমাদের সঙ্গে বেশ প্রসন্ন হয়ে কথা বলছেন।'

'বদরাগী কেন হব। তবে এককালে আমার তেজ খুব বেশি ছিল বটে। কিন্তু সে বজ্জাত মাগীটা আমার দফা সেরেছে।'

হাত জোড় করে বললুম, 'তপোধন, যদি গোপনীয় না হয় তবে কৃপা করে এই অধমদের

কৌতূহল নিবৃত্ত করুন। আপনি তো সত্য ত্রেতা দ্বাপরের লোক, এই ঘোর কলিযুগে আমাদের মতন পাপীদের কাছে এলেন কী করে?'

'পিতা অত্রি আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছেন, বৎস, তুমি হৃষীকেশ তীর্থে গঙ্গাতীরবর্তী ধর্মশালায় যাও, সেখানে তোমার সংকটমোচন হবে।'

'আপনার আবার সংকট কী প্রভু? আপনিই তো লোককে সংকটে ফেলেন।'

'সব বলব, আগে ভোজ সমাপ্ত হোক। তোমরাও খেয়ে নাও।'

পুলিন বললে, 'আপনি স্নান করবেন না?'

'সে তো কোনও কালে সেরেছি, ব্রাহ্মমুহূর্তেই গঙ্গায় একটি ডুব দিয়েছি।'

'কিন্তু জটায় আর দাড়িতে যে বড্ড ময়লা লেগে রয়েছে প্রভু, একটু সাবান ঘষলে হত না? গায়েও দেখছি ছারপোকা বিচরণ করছে। যদি অনুমতি দেন তো একটু ডিডিটি স্প্রে করে দিই। আমাদের সঙ্গেই আছে।'

'খবরদার, ওসব করতে যেয়ো না। গুটিকতক অসহায় প্রাণী যদি আমার গাত্রে বস্ত্রে আর জটায় আশ্রয় নিয়ে থাকে তো থাকুক না। তুমি তাদের তাড়াবার কে?'

টহলরাম খাবার নিয়ে এল। মহামুনি দুর্বাসার আদেশে আমরা তাঁর সঙ্গেই খাটিয়ায় বসে ভোজন করলুম। ভোজনান্তে আমি সিগারেটের টিনটি এগিয়ে দিয়ে বললুম, 'প্রভু, এ জিনিস চলবে কি? এর চেয়ে উঁচুদরের ধূমোৎপাদক বস্তু তো আমাদের নেই।'

একটি সিগারেট তুলে নিয়ে দুর্বাসা বললেন, 'এতেই হবে। গঞ্জিকা আমার সয় না, বাতিক বৃদ্ধি হয়। কই, তোমরা ধূমপান করবে না?'

লজ্জায় জিব কেটে বললুম, 'হেঁ হেঁ, আপনার সামনে কি তা পারি?'

'ভণ্ডামি করো না। আমার সামনে একরাশ লুচি গিলতে বাধল না, আর যত লজ্জা ধোঁয়ায়! নাও নাও, টানতে আরম্ভ করো।'

অগত্যা পুলিন আর আমিও সিগারেট ধরালুম। শোনবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছি দেখে দুর্বাসা তাঁর ইতিহাস আরম্ভ করলেন—

শকুন্তলার কথা জান তো? কালিদাস তার নাটকে লিখেছে। মেয়েটা আমার ডাকে সাড়া দেয়নি তাই হঠাৎ রেগে গিয়ে তাকে অভিশাপ দিয়েছিলুম — তুমি যার কথা ভাবছ সে তোমাকে দেখলে চিনতে পারবে না। শকুন্তলা এমনি বেহুঁশ যে আমার কোনও কথাই তার কানে গেল না। কিন্তু তার এক সখী শুনতে পেয়েছিল। সে আমার কাছে এসে পায়ে ধরে অনেক কাকুতি মিনতি করলে। তার নাম অনসূয়া। আমার মায়েরও ওই নাম, তাই প্রসন্ন হয়ে অভিশাপ খুব হালকা করে দিলুম। কিন্তু সখীটা অতি কুটিলা, শকুন্তলার মা মেনকার কাছে গিয়ে আমার নামে লাগাল।

এই ঘটনার পর প্রায় দশ মাস কেটে গেল। তখন আমি শিষ্যদের সঙ্গে গঙ্গোত্রীর নিকট বাস করছি। একদিন প্রাতঃকালে ভাগীরথীতীরে বসে আছি; এমন সময় একজন শিষ্য এসে জানালে, একটি অপূর্ব রূপবতী নারী আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। বিরক্ত হয়ে বললুম, আঃ জ্বালাতন করলে। নির্জনে একটু পরমার্থচিন্তা করব তাও ব্যাঘাত। কে এসেছে পাঠিয়ে দাও এখানে।

দেখেই চিনলাম মেনকা অপ্সরা। ভব্যতার জ্ঞান নেই, দাঁতন চিবুতে চিবুতে এসেছে, বোধ হয় ভেবেছে তাতে খুব চমৎকার দেখাচ্ছে। খেঁকিয়ে উঠে বললুম, 'কী জন্য আসা হয়েছে এখানে? জানো, আমি মহাতেজস্বী দুর্বাসা মুনি, বিশ্বামিত্রের মতন হ্যাংলা পাওনি যে লাস্য হাস্য ছলা কলা হাব ভাব টসক ঠমক দেখিয়ে আমাকে ভোলাবে।

মেনকা ভেংচি কেটে বললে, আ মরি মরি! জগতে তো আর কেউ নেই যে তোমাকে ভোলাতে আসব! তোমার ভালর জন্যই দেখা করতে এসেছি। তা যদি না চাও তো চললুম, কিন্তু এর পরে বিপদে পড়লে দোষ দিতে পাবে না। —এই বলে মেনকা পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে বোঁ করে ঘুরে গেল।

মাগীর আস্পর্ধা কম নয়, আমাকে তুমি বলছে। শাপ দিতে যাচ্ছিলুম —তুই এখুনি শুঁয়োপোকা হয়ে যা। কিন্তু ভাবলুম, উঁহু, ব্যাপারটা আগে জানা দরকার। বললুম, কিজন্য এসেছ বলোই না ছাই।

মেনকা বললে, 'মহাদেব যে তোমার উপর রেগে আগুন হয়েছেন, শকুন্তলাকে তুমি বিনা দোষে শাপ দিয়েছিলে শুনে। আর একটু হলেই তোমাকে ভস্ম করে ফেলতেন, নেহাত আমি পায়ে ধরে বোঝালুম তাই এবারকার মতন তুমি বেঁচে গেছ।'

আমি দেবতা-মানুষ কাকেও গ্রাহ্য করি না, কিন্তু মহাদেবকে ডরাই। জিজ্ঞাসা করলুম, 'কী বললে তুমি তাঁকে?'

বললুম, 'আহা নির্বোধ ব্রাহ্মণ, মাথার দোষও আছে, না বুঝে রাগের মাথায় শাপ দিয়ে ফেলেছে। তা শকুন্তলা তো বেশি দিন কষ্ট পাবে না, আপনি দুর্বাসা মুনিকে এবারটি ক্ষমা করুন। মহাদেব আমাকে স্নেহ করেন, তাঁর শাশুড়ির নাম আর আমার নাম একই কি না। বললেন, বেশ, ক্ষমা করব, কিন্তু তুমি তাকে দিয়ে একটা প্রায়শ্চিত্ত করাও।'

'কী প্রায়শ্চিত্ত করাবে শুনি?'

'তোমার ভয় নেই ঠাকুর, খুব সোজা প্রায়শ্চিত্ত। শকুন্তলা এখন হেমকূট পর্বতে প্রজাপতি কশ্যপের আশ্রমে আছে। আমি খবর পেয়েছি সম্প্রতি তার একটি খোকা হয়েছে। কশ্যপ বলেছেন, এই ছেলে ভরত নামে প্রসিদ্ধ হবে এবং পৃথিবী শাসন করবে। মনে করেছিলুম গিয়ে একবার দেখে আসব, কিন্তু তা আর হল না। ইন্দ্র সব অপ্সরাদের ডেকে পাঠিয়েছে। তাঁর ব্যাটা জয়ন্ত বিগড়ে যাচ্ছে —হবে না কেন, বাপের ধাত পেয়েছে, —তাই তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দিচ্ছেন। দু-মাস ধরে অষ্টপ্রহর নৃত্য গীত পানভোজন চলবে। আজই আমাকে যেতে হবে। দেবতাদের ষাট দিনে মানুষের ষাট বৎসর। আমি যখন ফিরে আসব তখন শকুন্তলার ছেলে বুড়ো হয়ে যাবে। তাই তোমাকেই তার কাছে পাঠাতে চাই।'

আমি ভাবলুম, এ তো কিছু শক্ত কাজ নয়। আমি যদি শকুন্তলার কাছে গিয়ে তাকে আর তার ছেলেকে আশীর্বাদ করে আসি তবে দেখতে শুনতে ভালই হবে। মেনকাকে বললুম, আমি যেতে রাজি আছি, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তটা কী, সেখানে গিয়ে কী করতে হবে?

একটি কাজের ভার নিয়ে তোমাকে যেতে হবে। এই ঝুমঝুমিটি খোকার হাতে দেবে আর আমার হয়ে তাকে একটু আদর করবে। কিন্তু তুমি বড় নোংরা, আগে ভাল করে হাত ধোবে তারপর খোকার থুতনিতে ঠেকিয়ে আলগোছে একটি চুমু খাবে।

আমি প্রশ্ন করলুম, 'সে আবার কী রকম?'

এই রকম আর কি-- এই বলে মেনকা তার হাত আমার দাড়িতে ঠেকিয়ে মুখের কাছে এনে একটা শব্দ করলে —চুঃ কি থুঃ বুজতে পারলুম না। তারপর বললে, 'এই নাও ঝুমঝুমি। খবরদার, হারিও না যেন, তা হলে মজা টের পাবে।'

ঝুমঝুমিটা নিয়ে আমি বললুম, 'হারাব কেন, খুব সাবধানে রাখব। আহা, তুমি তোমার নাতিটিকে দেখতে পাবে না, বড় দুঃখের কথা। দেখ মেনকা, তুমি তো চলে যাচ্ছ, যদি আমার কাছে কোনও বর চাইবার থাকে তো এই বেলা বল।'

'নাঃ, বর-টর আমার দরকার নেই।'

আমি বললুম, 'নেই কেন? যদি চাও তো আমার ঔরসে তোমার গর্ভে একটি পুত্র দিতে পারি। যদি তিন-চারটি বা শ-খানিক চাও তাও দিতে পারি।'

নাক সিঁটকে মেনকা উত্তর দিলে, 'হয়েছে আর কী? তুমি নিজেকে কী মনে কর, কার্তিক না কন্দর্প? তোমার সন্তান তো রূপে-গুণে একেবারে বোকাপাঁঠা হবে।'

অতি কষ্টে ক্রোধ সংবরণ করে আমি বললুম, 'আচ্ছা, আচ্ছা, বর না চাও তো আমার বড় বয়েই গেল। আমি অপাত্রে দান করি না। বেশ, এখন তুমি বিদেয় হও, একটা শুভদিন দেখে আমি শকুন্তলার কাছে যাব।'

পুলিন জিজ্ঞাসা করল, 'প্রভু, মেনকার বয়স কত?'

দুর্বাসা বললেন, 'তুমি তো আচ্ছা বোকা দেখছি। অপ্সরার আবার বয়স কী? জ্যোৎস্না বিদ্যুত রামধনু —এসবের বয়স আছে নাকি? তারপর শোন। মেনকা চলে গেল। তিন দিন পরে আমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলুম। অপ্সরাই বল আর দিব্যাঙ্গনাই বল, মেনকা আসলে হল স্বর্গবেশ্যা, লৌকিকতার কোনও জ্ঞানই তার নেই। কিন্তু আমার তো একটা কর্তব্যবোধ আছে। শুধু ঝমুঝুমি নিয়ে গেলে ভাল দেখাবে কেন, কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেই হবে। সেজন্য আশ্রমের নিকটস্থ বন থেকে একটি সুপুষ্ট ওল আর সের—খানেক বড় বড় তিন্তিড়ী সংগ্রহ করে ঝুলির ভেতর নিলুম।'

পুলিন বললে, 'এক মাসের খোকা বুনো ওল আর বাঘা তেঁতুল খাবে?'

আমি বললুম, 'তা আর, খাবে কেন। সেকালের ক্ষত্রিয় খোকারা পাথর হজম করত, বিলিতি গুঁড়ো দুধের তোয়াক্কা রাখত না।'

দুর্বাসা বললেন, 'তোমরা অত্যন্ত মূর্খ। ওল আর তেঁতুল ছেলে কেন খাবে, আশ্রমবাসী তপস্বী আর তপস্বিনীরা সবাই খাবেন। তারপর শোনো। যথাকালে হেমকূটে পৌঁছে মরীচিপুত্র ভগবান কশ্যপ ও তৎপত্নী ভগবতী অদিতিকে বন্দনা করলুম, তারপর শকুন্তলার কাছে গেলুম। আমি যে শাপ দিয়েছিলুম তা বোধ হয় সে জানত না, আমাকে দেখে খুশিই হল। ওল আর তেঁতুল উপহার দিলুম, মেনকার কথামতো ছেলেকে আদর করে আশীর্বাদ করলুম। বললুম, শকুন্তলা, তোমার পুত্র শ্রীমান সর্বদমন-ভরত আসমুদ্রহিমাচল সমস্ত দেশ জয় করে রাজচক্রবর্তী হবে। এর প্রজারা যে ভূখণ্ডে থাকবে তার নাম হবে ভারতবর্ষ —বর্ষং তদ্ ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততিঃ। তুমিও অচিরে পতির সহিত মিলিত হবে। তার পর ট্যাঁক থেকে ঝুমঝুমি বার করতে গিয়েই চক্ষুস্থির।'

আমি বললুম, 'বলেন কি, ঝুমঝুমি পেলেন না?'

'মোটেই না। আমার পরনের কাপড় উত্তরীয় কম্বল সব ঝাড়লুম, ঝুলি ঘটি মায় জটা সব তন্ন তন্ন করে খুঁজলুম, কোথাও ঝুমঝুমি নেই। শকুন্তলার মুখটি কাঁদোকাঁদো হল, আহা, তার মায়ের দেওয়া উপহারটি হারিয়ে গেল। মেনকা যতই নচ্ছার হক, নিজের মা তো বটে। আমি বললুম, দুঃখ করো না শকুন্তলা, আরও ভাল ঝুমঝুমি এনে দেব।'

দুজন বুড়ি তপস্বিনী শকুন্তলার কাছে ছিল। একজন বললে, 'পাগলের মতন যা তা বোলো না ঠাকুর। ছেলের দিদিমার দেওয়া যৌতুক আর তোমার ছাঁইপাশ কি সমান? তুমি ভারি অলবড্যে মুনি। নিশ্চয় নাইবার সময় তোমার ট্যাঁক থেকে জলে পড়ে গেছে আর মাছে কপ করে গিলেছে। যাও, এখন রাজ্যের রুই কাতলা ধরে ধরে পেট চিরে দেখো গে।'

অন্য বুড়িটা বললে, 'কী বলছ গা দিদি! শুধু রুই-কাতলা কেন, মিরগেল বোয়াল কালবোস শোল শাল চাই টাঁই এসব মাছের পেটেও তো থাকতে পারে।'

পুলিন বললে, 'কচ্ছপের পেটেও যেতে পারে।'

আমি বললুম, 'হাঙর কুমির শুশুক সিন্ধুঘোটক বা জলহস্তীর পেটে যেতেও বাধা নেই।'

দুর্বাসা আমাদের দিকে একবার কটমট করে চাইলেন, তারপর বলে যেতে লাগলেন—

আমি আর দাঁড়ালুম না, কথাটি না বলে পালিয়ে এলুম। যে পথে এসেছিলুম সেই পথের সর্বত্র খুঁজে দেখলুম, কোথাও ঝুমঝুমি নেই। আমি অত্যন্ত ভুলো লোক, কিন্তু ঝুমঝুমিটা তো ট্যাঁকেই গোঁজা ছিল। নিশ্চয়ই নাইবার সময় জলে পড়ে গেছে। যেখানে যেখানে স্নান করেছিলুম সর্বত্র জলে নেমে হাতড়ে দেখলুম, কিন্তু পাওয়া গেল না। তবে বোধ হয় রুই মাছেই গিলেছে, শকুন্তলার আংটির মতন। বোয়াল কালবোস চাঁই টাঁইও হতে পারে। জেলেদের ডেকে ডেকে বললুম, 'ওরে, মাছের পেটে ঝুমঝুমি পেয়েছিস? বার করে দে, আশীর্বাদ করব। ব্যাটারা বললে, মাছের পেটে ঝুমঝুমি থাকে না ঠাকুর, পটকা থাকে। — এই বলে দাঁত বার করে হাসতে লাগল। আমি অভিশাপ দিলুম, তোরা দেঁতো কুমির হয়ে যা। কিন্তু কোনও ফল হলনা।'

ওঃ, মেনকার কথা রাখতে গিয়ে কী সংকটেই পড়েছি। ঝুমঝুমি তুচ্ছ জিনিস, কিন্তু প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করা মহাপাপ। আমার আর শান্তি নেই, ব্রহ্মতেজ নেই, অভিশাপ দিলে ফলে না, আমি নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ হয়ে গেছি। শিষ্যরা আমাকে ত্যাগ করেছে, আমি এখন ছন্নছাড়া হয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আমি বললুম, 'মহামুনি, শান্ত হন, আপনি শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছেন। ভরত রাজা তো কবে স্বর্গলাভ করেছেন, তাঁর আর ঝুমঝুমির দরকার কী? আপনি নিশ্চিত হয়ে তপস্যা করুন, যোগসাধনা করুন, হরিনাম করুন। অথবা লোকশিক্ষার নিমিত্ত জীবনস্মৃতি লিখুন, জটাশ্মশ্রুধারী উগ্রতপা মুনি-ঋষিদের সঙ্গে গ্ল্যামারগার্ল অপ্সরাদের মোলাকাত বিবৃত করুন, পত্রিকাওয়ালারা তা নেবার জন্য কাড়াকাড়ি করবে। ঝুমঝুমির কথা এবার ভুলে যান।'

'হায় হায়, ভোলবার জো কী! ওই ঝুমঝুমিই হচ্ছে মেনকার অভিশাপ, শকুন্তলার প্রতিশোধ। আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে, যখন তখন ঝুমঝুমি শুনি।'

দুর্বাসা হঠাৎ চিৎকার করে হাত-পা ছুঁড়ে নাচতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিনের ছেলে

পল্টু তাঁর পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠল— 'মেরে ফেললে রে, সব কটাকে মেরে ফেললে!'

ব্যাপার গুরুতর। পল্টু নিবিষ্ট হয়ে ঝুমঝুমির ইতিহাস শুনছিল সেই অবকাশে ইঁদুরগুলো তার পকেট থেকে বেরিয়ে দুর্বাসাকে আক্রমণ করেছে। দুটো তাঁর কাঁধে উঠেছে, একটা অধোবাসে ঢুকে গেছে, আর একটা কোথায় আছে দেখা যাচ্ছে না। তাঁর কাঁধের ঝাঁকুনিতে তিনটে ইঁদুর নীচে পড়ে গেল। পল্টু কোনও রকমে সেগুলোকে দুর্বাসার পদাঘাত থেকে রক্ষা করলে।

দুর্বাসা বললেন, 'তুই অতি দুর্বিনীত বালক।'

পুলিন বললে, 'টেক কেয়ার তপোধন, আমার ছেলেকে যদি শাপ দেন তো ভাল হবে না বলছি।'

দুর্বাসা বললেন, 'ইঁদুর পোষা মহাপাপ, চণ্ডালেও পোষে না।'

পল্টু রেগে গিয়ে বললে, 'বা রে, আপনি যে নিজের গায়ে ছারপোকা পোষেন তা বুঝি খুব ভাল? দেখ না বাবা, ঋষিমশায়ের গা থেকে কত ছারপোকা আমাদের বিছানায় এসেছে। আর একটা ইঁদুর কোথায় গেল? খুঁজে পাচ্ছি না যে—'

দুর্বাসা আবার চিৎকার করে নাচতে লাগলেন। পল্টু বললে, 'ওই ওই, দাড়ির ভেতর একটা সেঁধিয়েছে!' অনুমতি না নিয়েই পল্টু দুর্বাসার দাড়িতে হস্তক্ষেপ করে তার ভেতর থেকে ইঁদুরটাকে টেনে বার করলে। তারপর বললে, 'ঝুমঝুম শব্দ হচ্ছে কেন?'

আমি লাফিয়ে উঠে বললুম, 'ঝুমঝুম শব্দ? বলিস কী রে! প্রভু, আপনার দাড়িটি একবার নাড়ুন তো।'

দুর্বাসা দাড়ি নাড়লেন। সেই নিবিড় শ্মশ্রুজাল ভেদ করে ক্ষীণ শব্দ নির্গত হল—ঝুম ঝুম ঝুম। যেন নৃত্যপরা মেনকার নূপুরনিক্বণ দূরদূরান্তর থেকে ভেসে আসছে।

পুলিন দাড়ির নীচের ঝুঁটিটা একবার টিপে দেখলে, তারপর গেরো খুলতে লাগল। দুর্বাসা বললেন, লাগে লাগে। কে তাঁর কথা শোনে। আমি তাঁর মাথাটি জোর করে ধরে রইলুম, পুলিন পড়পড় করে দাড়ি ছিঁড়ে ভেতর থেকে ঝুমঝুমি বার করলে। সোনার কি রুপোর কি টিনের—বোঝা গেল না, ময়লায় কালো হয়ে গেছে, কিন্তু বাজছে ঠিক।

পল্টু চুপি চুপি বললে, 'এক্স রে করলে কোনও কালে বেরিয়ে পড়ত, নয় বাবা?'

পল্টুর অভিজ্ঞতা আছে, বছর দুই আগে সে একটা পয়সা গিলেছিল।

দুর্বাসা একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'একেই বলে গেরোর ফের। ঝুমঝুমিটি যে যত্ন করে দাড়ির গেরো মধ্যে গুঁজে রেখেছিলুম তা মনেই ছিল না।'

তারপর পল্টুর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, 'বৎস আমি আশীর্বাদ করছি তুমি রাজা হবে।'

আমি বললুম, 'ও আশীর্বাদ আর ফলবার উপায় নেই প্রভু, রাজা টাজা লোপ পেয়েছে। বরং এই আশীর্বাদ করুন যেন ও মন্ত্রী হতে পারে, অন্তত পাঁচ বছরের জন্য।'

'বেশ, সেই আশীর্বাদ করছি। কিন্তু রাজা না থাকলে রাজকার্য চলবে কী করে?'

'আজকাল তা চলে। আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে কর্তা না থাকলেও ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়।'

দুর্বাসা বললেন, 'আমি এখন উঠি। যাঁর জিনিস তাঁকে অর্পণ করে সত্বর দায়মুক্ত হয়ে

ব্রহ্মলোকে যেতে চাই।'

'অর্পণ করবেন কাকে?'

'কেন, মহারাজ ভরতের বংশধর নেই?'

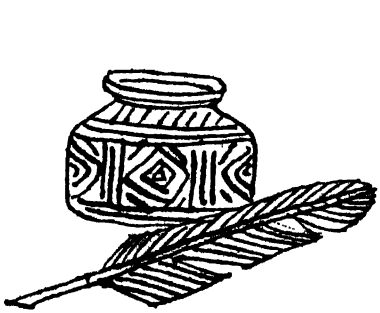
কেউ নেই, ভরতবংশ অর্থাৎ যুধিষ্ঠির-পরীক্ষিতের বংশ লোপ পেয়েছে, তাঁদের যারা উত্তরাধিকারী—নন্দ মৌর্য শুদ্ধ অন্ধ্র গুপ্ত প্রভৃতি, তার পর পাঠান মোগল ইংরেজ, এঁরাও ফৌত হয়েছেন। ভরতের রাজ্য এখন দুভাগ হয়েছে, বড়টি ভারতীয় গণরাজ্য, ছোটটি ইসলামীয় পাকিস্থান।

'একজন চক্রবর্তী রাজা আছেন তো?'

'এখন আর নেই, দুই রাষ্ট্রে দুই রাষ্ট্রপতি বহাল হয়েছেন, একজন দিল্লিতে আর একজন করাচিতে থাকেন। আইন অনুসারে এঁরাই ভরতের স্থলাভিষিক্ত, সুতরাং ঝুমঝুমিটি এঁদেরই হক পাওনা। কিন্তু দেবেন কাকে? একজনকে দিলে আর একজন ইউ-এন-ও-তে নালিশ করবেন, না হয় তলোয়ার ঘুরিয়ে লড়বেন, লড়কে লেঙ্গে ঝুমঝুম্মা।'

দুর্বাসা ক্ষণকাল ধ্যানমগ্ন হয়ে রইলেন। তারপর মট করে ঝুমঝুমিটি ভেঙে বললেন, একজনকে দেব এই খোলটা, যাতে পাথরকুচি আছে, নাড়লে কড়রমড়র করে। আর একজনকে দেব এই ডাঁটিটা, ফুঁ দিলে পিঁ পিঁ করে। দাও তো গোটা দশ টাকা রাহাখরচ।

টাকা নিয়ে দুর্বাসা তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।



যাদুকরী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শরতের নির্মল জলভরা বায়ুহিল্লোলিত দিঘিতে কলরব করিয়া যেন একদল বালিহাঁস আসিয়া পড়িল।

আশ্বিন মাস। আকাশ নীল, রৌদ্রে সোনালি আভা, ঘরে ঘরে পুজোর আয়োজন-উদ্যোগের সাড়া, দোকানে দোকানে পণ্যসম্ভার, পরিপূর্ণতায় চঞ্চলতায় গ্রামখানি নির্মল জলভরা বায়ু হিল্লোলিত দিঘির সঙ্গেই তুলনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহারই মধ্যে বালিহাঁসের মতোই কলরব করিয়া আসিয়া পড়িল দশ-বারোটি বাজীকরের মেয়ে ও জনাচারেক বাজীকর পুরুষ। বাজীকর অথবা যাদুকর।

বাজীকর একটি বিচিত্র জাতি। বাংলাদেশে অন্য কোথাও আছে বলিয়া সন্ধান পাওয়া যায় না। বীরভূমের সিথল গ্রামে এবং আশেপাশেই ইহাদের বসতি। বেদে নয় তবু যাযাবরত্বে বেদেদের সঙ্গে খানিকটা মিল আছে। ধর্মে হিন্দু, কিন্তু নির্দিষ্ট কোনও জাতি বা সম্প্রদায় জাতিকুলপঞ্জিকা ঘাঁটিয়াও নির্ণয় করা যায় না। পুরুষেরা ঢোলক লইয়া গান করে, যাদুবিদ্যার বাজী দেখায়। নিরীহ শান্ত আকৃতি, গলায় তুলসীর মালা, পরনে মোটা তাঁতের কাপড়, দুই কাঁধে দুইটা ঝোলা ও ঢোলক, মুখে এক অদ্ভুত টানের মিষ্ট ভাষা। ওই ভাষা হইতেই লোকে চিনিয়া লয় ইহারা বাজীকর। মেয়েরা কিন্তু পুরুষ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বিলাসিনীর জাতি। কেশে বেশে বিন্যাস তাহাদের অহরহ, রাত্রে শুইবার সময়ও একবার কেশবিন্যাস করিয়া লয়, প্রভাতে উঠিয়া প্রথমেই বসে চুল বাঁধিতে। পরনে শৌখিন পাড় শাড়ি, হাতে এক হাত করিয়া কাচের রেশমি অথবা গালার চুড়ি, গলায় গিলিটির হার, উপর হাতে তাগা অথবা বাজুবন্ধ, নাকে নাকছাবি, কানে আগে পরিত সারিবন্দী মাকড়ি, এখন পরে গিলটির ঝুমকা, দুল প্রভৃতি আধুনিক ফ্যাশানের কর্ণভূষা। কাঁকালে একটা গোবর-মাটিতে লেপন দেওয়া বিচিত্র গঠন ঝুড়ি, তাহার মধ্যে থাকে সাপের ঝাঁপি, বাজীর ঝোলা, ভিক্ষা সংগ্রহের পাত্র, সেগুলিতে ঢাকিয়া থাকে ভিক্ষায় সংগৃহীত পুরানো কাপড়। মেয়েদের প্রধান অবলম্বন গান

ও নাচ। নিজেদের বাঁধা গান, নিজেদের বিশিষ্ট সুর, নাচও তাই—বাজীকরের মেয়ে ছাড়া সে নাচ নাচিতে কেহ জানে না। লোকে বলে তামার বদলে রূপা দিলে নির্বিকারচিত্তে নগ্ন অবয়বে নাচে বাজীকরের মেয়ে। দর্শকে চোখ নামায়, কিন্তু বাজীকরের মেয়ের চোখে অকুণ্ঠিত দৃষ্টিতে পলক পড়ে না; দুনিয়ার লোক ছি ছি করে, কিন্তু বাজীকরের সমাজে ইহার নিন্দা নাই, বাজীকরীর বাজীকরের মনের ছন্দ পর্যন্ত মুহূর্তের জন্য অস্বচ্ছন্দ হইয়া উঠে না।

গ্রামে ঢুকিয়া তাহারা ছড়াইয়া পড়িল। দল বাঁধিয়া উহারা ভিক্ষা করে না; দল দূরের কথা—স্বামী-স্ত্রীতে কখনও গৃহস্থের দুয়ারে দাঁড়ায় না।

'ভিক্ষা দাও গো মা রানি, চাঁদবদনী, স্বামীসোহাগী, রাজার মা!'

মুখুজ্জে গিন্নি তরকারির বঁটিতে বসিয়া আনাজ কুটিতেছিল, চোখের কোণে দুই ফোঁটা জল টলমল করিতেছিল। সম্মুখে বসিয়াছিল কন্যা রমা, বিষণ্ণ নতমুখে সে নখ দিয়া মাটি খুঁটিতেছিল অকারণে। গিন্নি বিরক্তিভরে বলিল—'ওরে, ভিক্ষে দিয়ে বিদেয় করতো, পুজো এল আর এই হল বাজীকরের আমদানি।'

'নাচন দ্যাখেন মা, গান শোনেন; কই আমাদের রমা ঠাকরুন কই?'

'না। নাচ দেখার মতো মনের সুখ নাই আমার। ওরে—'

'বালাই ! ষাট! শত্রুর মনের সুখ যাক। আপনকার দুঃখ কিসের—'

'বকিসনে বলছি। এমন হারামজাদা জাত তো কখনও দেখি নাই। ওরে রমা, ঝি কোথায় গেছে, তুই-ই দে তো ভিক্ষে।'

রমা ভিক্ষা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বাজীকরের মেয়েটি রমার চেয়ে বয়সে বড় হইলেও দেখিতে প্রায় সমবয়সী মনে হয়। তাহার মুখ স্মিতহাস্যে ভরিয়া উঠিল, পরমুহূর্তেই সবিস্ময়ে সে বলিয়া উঠিল— 'ভোজটা ফাঁকি পড়লাম দিদিঠাকরুন।'

রমা বিরক্তিভাবেই বলিল, 'নে নে ভিক্ষে নে।'

'কোন মাসে বিয়া হল ঠাকরুন? কোথা হল বিয়া?'

গৃহিণী উঠিয়া আসিলেন, রূঢ়ভাবে বলিলেন, 'ভিক্ষে নিবি তো নে, না নিবি তো বিদেয় হ'। '

'ওরে বাপরে। তাই পারি। আজ শুধু ভিখ নিয়া যেতে পারি? দিদি ঠাকরুনের বিয়ার ভোজ খেতে পেলম নাই, বিদায় পেলম নাই- আজ শুধু ভিখ নিয়া যেতে পারি! আজ নাচ দেখাব—গান শুনাব, শিরোপা নিব।'

কাঁখালের ঝুড়িটা নামাইয়া কাপড়ের আঁচল কোমরে জড়াইয়া বলিল, 'কাপড় নিব, গয়না নিব, রমাদিদির কাছে নিব কাচের চুড়ির দাম, তবে ছাড়ব।' বলিয়াই সে আরম্ভ করিল—

হায় গো দিদি, কাচের চুড়ির ঝম্‌ঝমানি
উর-র-র জাগ জাগ জাগিন ঘিনা—
জার ঘিনিনা—
চুড়ির ওপর রোদের ছটা
হায় মরি কি রঙের ঘটা
সোনারুপো বাতিল হল কাঁদছে বসে স্যাকরানি

বেলাত হতে জাহাজ বোঝাই
হল চুড়ির আমদানি।
উর-র-র জাগ জাগ জাঘিন ঘিনা—
জার ঘিনিনা—

সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের চুড়ি সে তালে তালে বাজাইতেছিল—ঝম্ ঝম্! ঝম্ ঝম্! একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া পাক খাইয়া বাজীকরীর সর্বাঙ্গ নাচিতেছিল সাপিনীর মতো। গিন্নি ও রমা দুজনের বিষণ্ণ মুখেই এতক্ষণে হাসি দেখা দিল—অতি মৃদু ক্ষীণ রেখায়। বাড়ির এবং পাশের বাড়ির মেয়েরাও আসিয়া জুটিয়া গেল। বাজীকরী নাচিয়াই চলিয়াছে — চোখের তারা দুইটি নেশার আমেজে যেন ঢুলঢুল করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র সুরের গান।

পাড়ায় যতো এয়ো স্তিরি—শাঁখা ফেলে
পরছে চুড়ি—
লালপরী সবুজপরী—মাঝখানে হলুদ
পারা—
ওগো চুড়ির বাহার দেখে যা তোরা—।
এবার যদি না দাও চুড়ি, ত্যাজ্য করব
এ ঘর বাড়ি
নয়কো দোব গলায় দড়ি তবু
চুড়ি পরব গো,
হাতের শাঁখা ঘাটে ভেঙে ফেলব চোখের
নোনা পানি।
উর-র-র জাগ—;

গান শেষ করিয়া বাজীকরী থামিল।

চুড়ির জন্য গলায় দড়ি দিবার সংকল্প শুনিয়া মেয়েরা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতেছিল, একজন বলিল, 'মরণ!'

বাজীকরী খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, 'চুড়ি লইলে মরণ ভাল গো ঠাকরুন! রমাদিদি চুড়ির পয়সা লিয়ে এস—কাপড় গয়না নিয়ে নিব তোমার বরের কাছে। বর কখন আসবে বল! চিঠি লিখ তুমি। আমার নাম করে লিখ।'

রমা বা গিন্নি কোনও কথা বলিল না, একজন প্রতিবেশিনী তরুণী বলিল, 'তুই যা না হারামজাদি তার কাছে।'

'র‍্যাল ভাড়া দাও, ঠিকানা দাও, চিঠি লিখে দাও। আজই যাব। বরং লিয়ে আসব—নাকে দড়ি দিয়া বেঁধে রমাদিদির দরবারে।'

'মরণ। ও-পাড়ায় যেতে আবার "র‍্যাল ভাড়া" লাগে নাকি।'

গালে হাত দিয়া মেয়েটা সবিস্ময়ে বলিল, 'গাঁয়ে গাঁয়ে বিয়া না কি?'

'ঢং করছে। কিছু জানিস না নাকি?'

'কী কর‍্যা জানব দিদি; আমরা ফিরেছি তো দেশে তিন দিন।'

বাজীকরের জাত ভিক্ষা করিয়া দেশে-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ায়। যাযাবর সম্প্রদায়ের মতো গৃহহীন নয় ভূমিহীন নয়—ঘর আছে, প্রাচীনকাল হইতে নিষ্কর জমিও ইহারা ভোগ করে, তবু ভিক্ষা করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়। পূজার পূর্বে দেশ আসে, পূজার পর বাহির হয়, ফেরে ফসল উঠিবার সময়, ফসল তুলিয়া জমিগুলি ভাগচাষে বিলি করিয়া আবার বাহির হয় নীল সংক্রান্তি অর্থাৎ চৈত্র-সংক্রান্তির গাজন উৎসবের পর। গাজন ইহাদের বিশেষ উৎসব।

মেয়েটি বলিল, 'ও-পাড়ার বাঁড়ুজ্জেবাড়ির দেবুকে জানিস?'

চোখ দুইটি বড় বড় করিয়া বাজীকরী বলিল, 'খোকাবাবু? কলকাতার কলেজে পড়ে, টকটকে রঙ, শিবঠাকুরের মতো ঢুলঢুলে চোখে "লল্‌ছা" পারা বাবুটি?'

'হ্যাঁ।'

'অ-মাগ! আমি কুথা যাব গ!' মেয়েটা যেন হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। 'বুঝলা ঠাকরুন, বাবুটিকে দেখতাম আর ভাবতাম ইয়ার গলায় কে মালা দিবে? আর রমা দিদিকে দেখ্যা ভাবতাম ই লক্ষ্মী ঠাকরুনটি কার গলায় মালা দিবে?'

গভীর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মুখুজ্জে গিন্নি বলিলেন, 'থাম বাপু তুই, আদিখেত্যা করিসনে। কপালে আমার আগুন লেগেছিল—তাই ওই ঘরে বরে আমি বিয়ে দিতে গিয়েছিলাম।'

'কেনে মা?' মেয়েটা চকিত হইয়া উঠিল। চারিদিকে সকলের মুখের দিকে সে একবার চাহিয়া দেখিল, সকলেরই মুখ গম্ভীর হইযা উঠিয়াছে। রমা দাঁড়াইয়া দূরে, নতমুখে; না দেখিয়াও চতুরা বাজীকরী বুঝিয়া লইল—রমার চোখে জল ছলছল করিতেছে।

ক্ষতসন্ধানী মক্ষিকার মতো মেয়েটা ব্যগ্রতায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

মুখুজ্জেরা অবস্থাপন্ন লোক। গ্রামখানি বেশ বড়, গ্রামের চেয়ে ছোট শহর বলিলেই ঠিক হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের কল্যাণে দিন দিন বড় এবং শহরের শ্রীতেই সমৃদ্ধ হইয়া চলিয়াছে, অবস্থাপন্ন ব্যবসাদারও কয়েকজন আছে, তবু মুখুজ্জেরা অবস্থাপন্ন বলিয়া খ্যাতি আছে। রমা পিতার একমাত্র সন্তান। শ্রীমতী মেয়ে বাপ-মায়ের আদরের দুলালী। মেয়েকে চোখের আড়াল করিতে পারবেন না বলিয়াই গ্রামে বিবাহ দিয়াছেন। ঘরজামাইকেও মুখুজ্জে কর্তা ঘৃণা করেন। ও-পাড়ার বাঁড়ুজ্জেরা এককালে সম্ভ্রান্ত সঙ্গতিপন্ন ঘর ছিল—এখন শুধু সম্ভ্রম আছে, সঙ্গতি নাই; এই বাঁড়ুজ্জের দেবনাথ ছেলেটি বড় ভাল। সুরূপ সুন্দর ছেলে, বি এ পাশ করিয়া এম এ পড়িতেছে। এই ছেলেটির সঙ্গে মুখুজ্জেরা রমার বিবাহ দিয়াছেন। খেতের কলা-মূলা হইতে রান্না-করা তরকারি পর্যন্ত যাহা নিজেদের ভাল লাগিবে —তাহাই মেয়ে জামাইকে পাঠাইয়া দিবেন, মেয়ে একবেলা থাকিবে শ্বশুরবাড়িতে, এক বেলা থাকিবে বাপের বাড়িতে—এই ছিল তাঁহাদের কল্পনা।

বিবাহের পরে কিন্তু বিরোধ বাধিয়াছে এইখানেই। বনিয়াদি বাঁড়ুজ্জেরা কলা-মূলা রান্না-করা তরকারি উপঢৌকনে অপমান বোধ করিয়াছেন। বধূর একবেলা এখানে—একবেলা ওখানে থাকাও তাঁহারা বরদাস্ত করিতে পারেন নাই। বাদ-প্রতিবাদ চলিতেছিল, অকস্মাৎ একদিন রমাই সেটাকে বিবাদে পরিণত করিয়া তুলিল। রোজ অপরাহ্নে মুখুজ্জে বাড়ির ঝি আসিয়া রমাকে লইয়া যাইত— দুধ এবং জল খাইবার জন্য। সেদিন কিসের ছুটিতে দেবনাথ

আসিয়াছিল বাড়ি। রমার শাশুড়ি আপত্তি তুলিয়া বলিয়াছিলেন, 'দেবু বাড়ি এসেছে যে আজ আর বউমা যাবে না।'

পরক্ষণেই দীর্ঘদিনের সঞ্চিত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তিনি বলিলেন, 'আর রোজ রোজ কচি খুকির মতো দুধ খেতেই যাওয়াই বা কেন? গরিব বলে কি দুধ খাওয়াতে পারিনে বেটার বউকে! বলিস তুই, একটা পাড়া অন্তর রোজ আমার বেটার বউ আমি পাঠাব না।

ঝিটা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল— 'আজকের মতো পাঠিয়া দেন মা, মা আজ খাবার-দাবার করেছেন—'

'না-না-না।' রূঢ়স্বরে রমার শাশুড়ি জবাব দিয়াছিলেন।

ঝি ফিরিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর দেখা গিয়াছিল—বউ বাড়িতে নাই। গ্রামের মেয়ে মা-বাপের আদরের দুলালী ততক্ষণে জনবিরল গলি পথে পথে মায়ের কাছে গিয়া হাজির হইয়াছিল।

আরও কিছুক্ষণ পর মুখুজ্জে বাড়ি হইতে এক প্রবীণা আত্মীয়া আসিয়াছিলেন দেবনাথের জন্য নিমন্ত্রণ লইয়া—'কই হে দেবুর মা! দেবুর আজ নেমন্তন্ন ও বাড়িতে। শ্বশুর পাঁঠা কেটেছে। শাশুড়ি খাবার করেছে।'

নিমন্ত্রণ স্বীকার বা অস্বীকার কিছুই না করিয়া দেবুর মা জানাইয়াছিলেন কেবল ভদ্রতাসম্মত সম্ভাষণ— 'এসো বসো।'

'বসব না ভাই। নেমন্তন্ন করতে এসেছিলাম। বউও তোমার ও-বাড়িতে। খেয়ে দেয়ে বউ-বেটা তোমার ওবাড়িতেই আজ থাকবে; কাল সকালে আসবে।'

বাঁড়ুজ্জে গিন্নির মুখ আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতের মতো থমথমে হইয়া উঠিয়াছিল—কথার জবাব তিনি দেন নাই।

'তা হলে চললাম ভাই। সন্ধ্যাতেই পাঠিয়ে দিও দেবুকে—'

'দেবুকেই কথাটা বলে যাও।'

'সে কী?'

'হ্যাঁ। ব্যাটার শ্বশুরবাড়ির কথাতেও আমি নাই, বউয়ের কথাতেও আমি নাই।'

দেবনাথ রাত্রে যায় নাই। সেও বধূর আচরণে ক্ষুব্ধ না হইয়া পারে নাই। শ্বশুর-শাশুড়ির এই প্রশ্রয়পূর্ণ ব্যবহারও তাহার ভাল লাগে নাই। তাহার উপর ক্ষুব্ধ মাকে উপেক্ষা করিয়া এই নিমন্ত্রণ রক্ষার কোনও উপায়ই ছিল না।

ঝগড়ার সূত্রপাত এইখানেই।

দেবনাথের মা বলিলেন, 'বধূর পিতা-মাতাকে কন্যাকে লইয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া এ বাড়িতে দিয়া যাইতে হইবে।'

রমার মা বলিলেন, 'দেবনাথ নিজে আসিয়া রমার অভিমান ভাঙাইয়া তাহাকে লইয়া যাইবে— তবে তিনি কন্যাকে পাঠাইবেন। উপেক্ষিতা রমা সেদিন নাকি কাঁদিয়াছিল। ধীরে ধীরে সেই বিবাদ কঠিন পরিণতির দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। দেবনাথ স্ত্রীকে চিঠিপত্র পর্যন্ত লেখে না। দেবনাথের মা আস্ফালন করেন— ছেলের তিনি বিবাহ দেবেন—ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক—এই অকাল কয়মাসের অপেক্ষা।'

রমার মা ইহাতে ভয় পান না; তিনি কন্যার জন্য দালানকোঠার প্ল্যান করেন। ইদানীং তিনি খোরপোষ আদায়ের আর্জি পর্যন্ত মুসাবিদা করিতে শুরু করিয়াছেন।

ভরসা কেবল দুই পক্ষের পিতা।

মুখুজ্জে কর্তা ব্যবসা-বাণিজ্যমহাজনী লইয়া ব্যস্ত। বাঁড়ুজ্জে কর্তা আজীবন মাস্টারি করিয়াছেন—রিটায়ার করিয়াও তিনি আজও পড়াশুনা লইয়া ব্যস্ত। ইতিহাসের মাস্টার, ভাঙা মূর্তি, পুরানো পুঁথি সংগ্রহ করিয়া গ্রাম গ্রামান্তর ঘুরিয়া বেড়ান। দুইপক্ষের গিন্নি তারস্বরে চিৎকার করিয়াও অপদার্থ মানুষ দুইটিকে সচেতন করিতে পারেন না বলিয়া মধ্যে মধ্যে কপালে করাঘাত করেন।

বাজীকরী খিল খিল করিয়া সারা হইল।

মুখুজ্জে গিন্নির প্রতিবেশিনীর বাড়িতে বসিয়া কথা হইতেছিল। প্রতিবেশিনী বিরক্ত হইয়া বলিল, 'মর, এতে আবার হাসি কিসের?'

'হাসি নাই ছাগলের লড়াই দেখছ ঠাকরুন?' বলিয়া আবার খিল খিল করিয়া হাসিল।

'হাসি তামাসা পরের কথা রাখ; এখন আমি যা বললাম তার কী বল!'

তাহার দিকে চাহিয়া বাজীকরী বলিল, 'তুমার হাতে যোগবশের ওষুধ খাটবে নাই ঠাকরুন।'

মেয়েটি বশীকরণের ঔষুধ চায়। সবিস্ময়ে সে বলিল, 'খাটবে না? কেন?'

'রাগ কর নাই। তুমি বড় ময়লা ঠাকরুন। আমার ওষুধ লিতে হলে তুমাকে পরিষ্কার হতে হবে কিন্তুক।'

'আমি তো রোজ চান করি—'

'স্নান করা লয় ঠাকরুন; পরিষ্কারের অনেক কারণ আছে। তোমাকে পরিষ্কার কাপড় পরতে হবে, কেশবিন্যাস করতে হবে। ঢলকো করে চুল বাঁধবা, কপালে সিঁদুর টিপ পরবা। গায়ে গন্ধ লিবা। আলতা পরবা। খোঁপাতে ফুল পরবা, সেই ফুল কর্তার হাতে দিবা। দেখ পারতো এলাচ আনো আমি মন্তর দিয়া পড়ে দিই।'

স্থির দৃষ্টিতে বাজীকরীর দিকে চাহিয়া থাকিয়া মেয়েটি বলিল, 'পারব।'

'তবে আনো, এলাচ আনো, ছোট এলাচ দারচিনি, বড় এলাচ; মন্তর পড়ে দিব, তাই দিয়া মোটা খিলি করে পান সাজবা, নিজে খাবা খেয়ে কর্তাকে দিবা। কিন্তুক যা বললাম—তা না করলে খাটবে নাই ওষুদ। তখন যেন আমাকে গাল দিয়ো না। আর পাঁচটি পয়সা লাগবে, পাঁচ পাই চাল লাগবে, পাঁচটি সুপারি সিঁদুর—আর পুরনো কাপড় একখানি। লিয়ে এসো।

বাজীকরী চলিয়াছে বাজারের পথে।

একটা দোকানের সম্মুখে লোকের ভিড় জমিয়াছে, বাজীকর-পুরুষ বাজী দেখাইতেছে।

লাগ—লাগ—লাগ—লাগ, ভেলকি লাগ! লাগ বললে লাগবি, ছাড় বললে ছাড়বি। ভাটরাজার দোহাই দিয়ে ডুববি বেটা টুপটুপিয়ে—। বাহারে বেটা—বাহারে!—

একটা বাটির জলে একটা কাঠের হাঁস ক্রমাগত ডুবিতেছিল আর উঠিতেছিল।

'হাঁ—হাঁ বেটা, আর ডুবিস না, সর্দি লাগবে, জ্বর হবে।'

হাঁসটা ডোবা বন্ধ করিল।

'এইবার কাঠের হাঁস—শুন্ আমার কথা, খিধ্যায় জ্বলছে পেট, ঘুর‍্যা পড়ছে মাথা। প্যাঁক প্যাঁকিয়ে ডাক ছেড়্যা, দে দেখি একটা ডিম পেড়্যা; আগুন জ্বেল্যা পুড়ায়ে খাই!'

একটা ঝুড়ির ভিতর কাঠের হাঁসটাকে চাপা দিয়া বাজীকর বোল আওড়াইয়া একটা হাড় ঝুড়িটাতে ঠেকাইয়া দিল। 'ভাটরাজার দোহাই দিয়ে, ওঠ বেটা প্যাঁকপেঁকিয়ে—! দোহাই ভাটরাজার দোহাই!' সঙ্গে সঙ্গে ঝুড়িটা উঠতেই দেখা গেল, কাঠের হাঁস জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে ঠোঁট দিয়া সে পালক খুঁটিতেছে, পাশে একটা ডিম।

দর্শকের দল আনন্দে বিস্ময়ে হই হই করিয়া উঠিল; ছোট ছেলের দলে হাততালি আর থামে না! বাজীকরী মৃদু হাসিতে হাসিতে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিল।

'এই বাজকরুনি! এই!' —থানার বারান্দায় বসিয়াছিল কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী। তিনজন চেয়ারে বসিয়াছিল। জনকয়েক বসিয়াছিল বারান্দায়। একজন ডাকিল— 'এই বাজকরুনি! এই!'

বাজীকরী আসিয়া কাঁখালের ঝুড়িটা নামাইয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল—'পেনাম দারোগাবাবু!'

'তোর নাচ দেখা দেখি! এই বাবু তোদের নাচ দেখেন নাই দেখবেন।'

বাজীকরী দেখিল, তাহার চেনা বড়দারোগা ও ছোটদারোগার পাশে নূতন একটি বাবু। চতুরা বাজীকরীর ভুল হইল না, সে মুহূর্তে চিনিল, এও এক দারোগাবাবু। গোঁফের এমন জাঁকালো ভঙ্গি, কপালে এমন গোল দাগ, গায়ে এমন হাতকাটা খাকির জামা দারোগা ছাড়া কাহারও হয় না।

বড়দারোগাকে প্রণাম করিয়া সে বলিল, 'আপুনি ইখান থেক্যা চল্যা যাবেন বাবু?'

'হঠাৎ আমাকে বিদেয় করবার জন্যে তোর এত গরজ কেন?'

'আজ্ঞে, লতুন দারোগাবাবু এলেন—তাথেই বলছি!'

'উনি এখানে কাজে এসেছেন'

'কাজে?'

'হ্যাঁ, তোকে ধরে নিয়ে যাবেন। পরোয়ানা আছে তোর নামে।'

'আমার নামে?' মেয়েটি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

'হাসছিস যে! তুই হারামজাদি পাকা চোর।'

হাসিতে হাসিতে বাজীকরী বলিল, 'আজ্ঞা হাঁ। কিন্তু ধর‍্যা কী করবেন হুজুর, মন চুরির বামাল যে শনাক্ত হয় না।'

নূতন দারোগাবাবুটি চোখ কপালে তুলিয়া বলিল, 'ওরে বাপরে।'

বাজীকরী দুই হাত তুড়ি দিয়া আরম্ভ করিল—

উর-র জাগ জাগ জাঘিন ঘিনা জারঘিনি না—
সরু কাপড় নকশিপেড়ে—মাকড়ি চুড়ি গয়না—
গোট পাটা সাপ কাঁটায় পুঁজিপাটা রয়না—

বিদায় হইয়া বাজীকরী চলিয়া যাইতেছিল। কিন্তু বারান্দার উপবিষ্ট কনস্টেবল দলের জনদুয়েক উঠিয়া গিয়া থানার বড় বটগাছটার আড়াল হইতে তাহাকে ডাকিল।

হাসিয়া বাজীকরী বলিল, 'বল, কী বলছ!'
'আমাদের আলাদা করে নাচ দেখাতে হবে।'
'দেখাব।'
'ল্যাংটা হয়ে নাচতে হবে! এরা এসেছে ভরতপুর থেকে, দেখবে।'
মুখের দিকে চাহিয়া বাজীকরী বলিল, 'একটা টাকা লিব কিন্তুক।'
'আমি দেব।'
'তুমি ভরতপুরের সিপাই?'
'হ্যাঁ।'
চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া বাজীকরী বলিল, 'কিসের লেগে তুমরা?'
'কাজ আছে, পুলিশের কাজ।'
ফিক্ করিয়া হাসিয়া মেয়েটি এবার বলিল, 'কার মাথা খেতে এসেছ আর কি।'
কনস্টেবলটিও হাসিল।
বাজীকরী তাহার গা-ঘেঁষিয়া চলিতে চলিতে মৃদুস্বরে বলিল, 'মানুষটা কে বঁধু?'
কনস্টেবলটা তাহার মুখের দিকে চাহিল, —মদিরদৃষ্টিতে বাজীকরী তাহারই দিকে চাহিয়াছিল, ঠোঁটের রেখায় মাখানো লাস্যভরা হাসি।

মেয়েটা সত্যই নাচে সমস্ত আবরণ পরিত্যাগ করিয়া। এতটুকু সংকোচ নাই, কুণ্ঠা নাই, যৌবন লীলায়িত অনাবৃত তনুদেহ, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। সকলের কলুষ দৃষ্টি তাহার দিকে নিবদ্ধ থাকিলেও তাহার দৃষ্টি কাহারও দিকে নিবদ্ধ ছিল না। কণ্ঠে মৃদুস্বরে সঙ্গীত—

হায়রে মরি গলায় দড়ি
তুমি হরি লাজ দিবা,
হায়রে মরি গলায় দড়ি
তুমি হরি লাজ দিবা,
তুমার লাজেই আমি মরি
লইলে আমার লাজ কিবা!
কুল ত্যজিলাম মন সঁপিলাম
কলঙ্কেরই কাজল নিলাম—
হায়রে মরি বস্ত্র নিয়া
তুমি আমায় লাজ দিবা!
উর-র জাগ জাগ জাগিন ঘিনা—

আগন্তুক কনস্টেবলটি একটা টাকাই দিল। খানিকটা পথও তাহাকে আগাইয়া দিল। মেয়েটি বলিল, 'এইবার এস লাগর, আর লয়।'
হাসিয়া সিপাহী বলিল, 'আচ্ছা!'
'তুমি কিন্তুক লোক ভাল লয়!'
'কেন?'
'বল্ না কথাটা!' মেয়েটি ফিক করিয়া হাসিল।

আশ্বিনের প্রথম নির্মেঘ-নির্মল আকাশে মধ্যাহ্ন ভাস্কর ভাস্করতম দীপ্তিতে জ্বলিতেছে। বৈশাখের সূর্য প্রখরতর বটে কিন্তু এমন উজ্জ্বল নয়। বিগত বর্ষার বর্ষণসিক্ত মাটি হইতে সূর্যের উত্তাপে যেন বাষ্পোত্তাপ উঠেতেছে। ঘামে ভিজিয়া মানুষ সারা হইয়া গেল।

বাজীকরের দল এখনও ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গৃহস্থের বাড়িতে তাহারা আহারের ব্যবস্থা রাখিয়াছে। এইবার সেইখানে গিয়া পাতা পাড়িয়া বসিবে। বাঁড়ুজ্জে বাড়িতে সেই বাজীকরী আসিয়া চাপিয়া বসিল।

'পেসাদ হল মা ঠাকরুন। বাবুদের সেবা হল? পড়ল পাতার এঁটোকাঁটা?'

বাঁড়ুজ্জে গিন্নি বলিলেন, 'বস, বস, চেঁচাস নে।'

ছেলে দেবনাথ মুখে পান দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল, সে বাহির দরজার ওপাশ হইতে মেয়েটাকে ডাকিল— 'শোন!'

কাছে আসিয়া ঠুক করিয়া প্রণাম করিয়া মেয়েটা ফিক করিয়া হাসিল, বলিল, 'আপনার ভিতরটা পাথরে গড়া।'

ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া দেবনাথ বলিল, 'কী বলেছিস মাকে?'

চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া মেয়েটা বলিল, 'মিছা বলেছি তো বেটাবেটির মাথা খাব বাবু!'

'তুই দেখেছিস—'

'নিজের চোখে গো! বাপ কাঁদছে, মা কাঁদছে, মেয়ের সেই ধনুকভাঙা পণ!'

কথাবার্তায় বাধা পড়িল। ভিতর হইতে গিন্নি ডাকিলেন—'হ্যালা বাজকরুণী গেলি কোথায়?'

দেবনাথ তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল— 'দেখ মা ডাকছেন।'

গিন্নি বলিলেন, 'ওই শোন ওর কাছে।'

বাঁড়ুজ্জে কর্তা মেয়েটার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'বাজীকর তোরা?'

'আজ্ঞা হ্যাঁ বাবু; আপনাদের চরণের ধুলা।'

'হুঁ! সাপ আছে? বাজী দেখাতে পারিস? গান গাইতে পারিস? মন্তরতন্তর ওষুধপত্র জানিস?'

'আজ্ঞা হ্যাঁ হুজুর।'

'ভাটরাজাকে জানিস? ভাটরাজা?'

বারবার প্রণাম করিয়া মেয়েটা বলিল, 'ওরে বাপরে! দেবতা আমাদের। ভগবান আমাদের। এখনও জমি খাই। দোহাই দিয়ে বাজী দেখাই!'

মৃদু হাসিয়া কর্তা বলিলেন, 'ভাটরাজা নয়। তাঁর নাম হল ভবদেব ভট্ট। আর তোদের গ্রামের নাম কী জানিস? সীথল গাঁ নয়—সিদ্ধল, সিদ্ধল!'

গিন্নি রাগিয়া একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছিলেন, বলিলেন, 'বলি হ্যাঁগা! ওই সব জিজ্ঞেস করতে তোমায় ডাকলাম বুঝি? যত বাজে—'

'বাজে নয়। রাঢ়দেশে সিদ্ধলে ভবদেব ভট্ট মহাপ্রতাপশালী রাজা ছিলেন—তিনি—'

'এই দেখ, এইবার আমি মাথা খুঁড়ে মরব।'

কর্তা একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন।

মেয়েটারও বিস্ময়ের সীমা ছিল না; সিথল গ্রামের নাম 'সিদ্ধল', ভাটরাজার নাম ভবদেব ভট্ট। সে বলিল, 'কর্তাবাবু —আপনি এত কী কর‍্যা জানলা গো?'

গিন্নি বলিলেন, 'বউমায়ের কথা জিজ্ঞেস কর ওকে। ও নিজে দেখেছে।'

'জিজ্ঞেস করে কী করব। আজই ব্যবস্থা করছি আমি। কর্তা চলিয়া গেলেন পড়ার ঘরে, সিদ্ধলে ভবদেব ভট্টের ইতিহাসটা আজও তাঁহার অসমাপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে। আজ এই বাজীকরীকে দেখিয়া মনে পড়িয়া গিয়াছে।'

অপরাহ্নের শেষভাগ।

বাজীকরের দল গ্রাম ছাড়িয়া আপন গ্রাম সিথল গ্রামের দিকে চলিয়াছে। গ্রামের প্রান্তে আসিয়া সেই বাজীকরটা থমকিয়া দাঁড়াইল।

'তুরা চল গো। সবরাজপুরের হোথা দাঁড়াস খানিক। আমি এলাম বল্যে।'

দলের কেহ কোনও প্রশ্ন করিল না , বলিল, 'আচ্ছা।'

'হ্যাঁ, ও নটবর, তুর বাজীর ঝোলা আর ঢোলকটা দিবি?'

নটবর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, 'তু বড় বাড়াবাড়ি করছিস কিন্তুক।'

মেয়েটা উত্তরে কেবল হাসিল। নটবর মুখে ও-কথা বলিয়াও ঝুলি ও ঢোলক দিতে আপত্তি করিল না। কাঁখালের ঝুড়িতে কাপড় চাপা দিয়া বেশ করিয়া ঢাকিয়া লইয়া মেয়েটা দ্রুতপদে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল। আসিয়া উঠিল ডোমপাড়ায়।

ডোমপল্লী—এ অঞ্চলের বিখ্যাত চোর-ডাকাতের পল্লী। পল্লীর প্রত্যেক মানুষটির রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে অসংখ্য কোটি চৌর্যপ্রবণতার বীজাণু যেন কিলবিল করে।

'গান শোনবা গো ! গান! নাচন দেখ! নাচন!' মেয়েটা শশী ডোমের বাড়ি আসিয়া ঢুকিল। কাহারও সম্মতির অপেক্ষা করিল না, গান আরম্ভ করিয়া দিল। গান গাহিতে গাহিতে চকিত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে চারিদিক চাহিয়া দেখিল। সহসা নজরে পড়িল কোঠার জানলায় একখানি মুখ। বাইশ-চব্বিশ বৎসরের জোয়ানের মুখ। মুখখানা তাহার ভাল লাগিল। গান শেষ করিয়া সে শশীকে ডাকিল— 'শোন।'

'কী?'

'উপরের মানুষটি কে?'

শশী ক্রোধে ভীষণ হইয়া উঠিল।

হাসিয়া মেয়েটি বলিল, 'রাগ করছ কেনে। ভাল বলছি। তুমার জামাই, হামি জানি।'

শশী স্তম্ভিতের মতো মেয়েটির দিকে চাহিয়া রহিল।

মেয়েটি বলিল, 'ভরতপুর থেকে দারোগা এসেছে, সিপাই এসেছে। কাল সকালে তুমার ঘর খানাতল্লাস হবে, উয়ার নামে পরোয়ানা আছে।'

শশী এবার শুকাইয়া গেল।

'তুমার দুয়ারে সারা দিন নোক মোতায়েন আছে। সাঁঝের পরে সব ঘেরাও করবে।'

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শশী বলিল, 'জানি।'

'এক কাজ করো। এই ঢোলক দাও, এই ঝুলি দাও উয়ার কাঁধে। মাথায় মুখে গামছাটা বেঁধ্যা দাও ফেটা করে। আমার সাথে সাপ আছে। আমি ধরি মুখটা—উ ধরুক লেজটা।

তুমরা চেঁচাও সাপ সাপ বল্যা। আমি উগাকে নিয়ে চল্যা যাই। পুলিশের নোক বুঝতে পারবে, —আমরা বাজীকর।'

মেয়েটা হাসিতে আরম্ভ করিল, সে যেন আকণ্ঠ মদ খাইয়া নেশায় বিভোর হইয়া পড়িয়াছে।

বাজীকরী চলিয়াছে, সঙ্গে তার নকল বাজীকর। দ্রুতপদে অতিক্রম করিয়া গ্রাম পার হইয়া চলিতেছে। দক্ষিণপাড়া ভদ্রলোকের পল্লী, পল্লীপথে একখানা পালকি আসিতেছে। সঙ্গে দুইজন লোকের মাথায় বাক্স ও কুটুম্ববাড়ির তত্ত্বতল্লাশের জিনিসপত্র।

পাল্কীটা আসিয়া থামিল বাঁড়ুজ্জে বাড়িতে। পালকি হইতে নামিল বাঁড়ুজ্জে বাড়ির বধূ। মুখুজ্জে বাড়ির মেয়ে রমা। বাঁড়ুজ্জে গিন্নি আজই দেবনাথকে পালকি সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন—তাঁহার বধূ আজই সন্ধ্যার পূর্বে মাহেন্দ্রযোগে পাঠাইয়া দিতে হইবে। মুখুজ্জে কর্তার অমত কোনও কালেই ছিল না। মুখুজ্জে গিন্নিও আর অমত করেন নাই। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল— দেবনাথ নিজে আসিয়া কন্যার অভিমান ভাঙাইয়া লইয়া যাইবে, তবে তিনি পাঠাইবেন। দেবনাথ নিজে লইতে আসিয়াছে, কন্যার অভিমান নাই, সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সম্মত হইয়া পাঠাইয়া দিলেন। জামাইয়ের হাত ধরিয়া চোখের জলও ফেলিয়াছেন। কাল তিনি বেয়ানের কাছেও আসিবেন। বাপরে তিনি জামাইয়ের মা, তাঁহার উপরে তিনি গাহিতে পারেন? মেয়ে পাঠাইয়া তিনি কর্তার কাছে চলিলেন— মেয়ে-জামাইয়ের পূজার ফর্দ লইয়া।

মুখুজ্জে গিন্নি কর্তার ঘরে ঢুকিয়া লজ্জায় গালে হাত দিলেন। তাঁহার প্রতিবেশীর ঘরের খোলা জানালা দিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার লজ্জার অবধি রহিল না। প্রতিবেশিনী মেয়েটি তো খুকি নয়, সে আজ রঙিন শাড়ি পরিয়াছে, ব্লাউস পরিয়াছে, কেশবিন্যাসের কী পারিপাট্য, খোঁপায় ফুল। স্বামীর সহিত যাহার দিনরাত ঝগড়া হইত— সে হাসিয়া স্বামীর হাতে পান দিতেছে। স্বামীও হাসিতেছে।

রমা পালকি হইতে নামিয়া শাশুড়িকে প্রণাম করিয়া নীরবে অপরাধিনীর মতো দাঁড়াইল।

শাশুড়ী সেটুকু অনুভব করিয়া সস্নেহে বধূর মাথায় সিঁদুর দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, 'ছি মা, কী সর্বনাশ হত বল দেখি!'

রমার চোখ হইতে টপ টপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল। গিন্নি বলিলেন, 'যাও আপনার ঘর দেখে শুনে নাও গে। আমি বুড়োমানুষ পারব কেন—তবু যা পেরেছি গুছিয়ে রেখেছি।'

গিন্নি কর্তার ঘরের দিকে গেলেন। কর্তা ঘাড় গুঁজিয়া লিখিতেছেন।

'দেখ কথাটা সত্যি।'

'হুঁ।'

'আফিং যদি না খেতে চাইবে, তবে বউমা কাঁদিল কেন? বাজীকরুণী ভাগ্যে দেখেছিল। ছুঁড়িটা এক দিন এলে একখানা কাপড় দেব।'

কর্তা মুখ তুলিয়া বিজ্ঞের মতো খানিকটা হাসিয়া বললেন, 'ওদের খবর মিথ্যে হয় না গিন্নি! ওরা কারা জানো?'

আবার খানিকটা হাসিয়া বলিলেন, 'ওরা নিজেরাও অবশ্য জানে না; বাংলাদেশেই বা

কজনে জানে! শোনো—'

'রাঢ়ের সিদ্ধলরাজ ভবদেব ভট্ট—গুপ্তচরের এক অতি নিপুণ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নটি ও রূপোজীবিনীদের সন্তানসন্ততি লইয়া গঠিত হইয়াছিল এই সম্প্রদায়। নারী ও পুরুষ উভয় শ্রেণীই গুপ্তচরের কাজ করিত। ইহাদিগকে ভোজবিদ্যা, সর্পবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র, অবধৌতিক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত, নারীরা নৃত্যগীতে নিপুণ ছিল। এই সম্প্রদায় যাযাবরের মতো ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশে দেশান্তরে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আনিত। তৎকালীন অন্যান্য রাজারাও এই দৃষ্টান্তে—'

গিন্নি চলিয়া যাইতেছিলেন। কর্তা বলিলেন, 'শেষটা শোন—;'

গিন্নি পিচ কাটিয়া বলিলেন, 'ও সব শোনবার আমার এখন সময় নেই। যত সব উদ্ভট কথা!'

গ্রামের প্রান্তে নকল বাজীকরকে বিদায় দিয়া বাজীকরী বলিল, 'চললাম লাগর। এইবার চল্যা যাও সোজা!'

দ্রুতপদে বাজীকরী সবরাজপুরের দিকে চলিল।

এত বড় ডোম জোয়ানটি বার বার কথা বলিতে চাহিয়াও পারিল না। বহুকষ্টে অবশেষে তাহার কথা ফুটল— সে ডাকিল— 'শোন!'

কেহ উত্তর দিল না। রাত্রির অন্ধকারে অভ্যস্ত চোখে ডোম ছেলেটির দৃষ্টি হানিয়া তাকাইল—কিন্তু দেখিতে পাইল না। বাজীকরী যেন মিলাইয়া গিয়াছে।



বোবা

বনফুল

মা-মরা মেয়ে মিনু। বাবা জন্মের আগেই মারা গেছে। সে মানুষ হচ্ছে এক দূর সম্পর্কীয় পিসিমার বাড়িতে। বয়স মাত্র দশ, কিন্তু এই বয়সেই সব রকম কাজ করতে পারে সে। সব রকম কাজই করতে হয়। লোকে অবশ্য বলে যোগেন বসাক মহৎ লোক বলেই অনাথা বোবা মেয়েটাকে আশ্রয় দিয়েছেন। মহৎ হয়ে সুবিধাই হয়েছে যোগেন বসাকের। পেটভাতায় এমন সর্বগুণান্বিতা চব্বিশ ঘণ্টার চাকরানি পাওয়া শক্ত হত তাঁর পক্ষে। বোবা হওয়াতে আবও সুবিধে হয়েছে, নীরবে কাজ করে। মিনু শুধু বোবা নয়, ঈষৎ কালাও। অনেক চেঁচিয়ে বললে তবে শুনতে পায়, সব কথা শোনার দরকারও হয় না তার। ঠোঁট-নাড়া আর মুখের ভাব দেখেই সব বুঝতে পারে। এছাড়া তার আর একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে যার সাহায্যে সে এমন সব জিনিস বুঝতে পারে, এমন সব জিনিস মনে মনে সৃষ্টি করে, সাধারণ বুদ্ধিতে যার মানে হয় না। মিনুর জগৎ চোখের জগৎ, দৃষ্টির ভিতর দিয়েই সৃষ্টিকে গ্রহণ করেছে সে, শুধু গ্রহণ করেনি, নূতন রং আরোপ করেছে তাতে।

খুব ভোরে ওঠে সে। ভোর চারটের সময়। উঠেই দেখতে পায় পুব আকাশে দপ দপ করে জ্বলছে শুকতারা। পরিচিত বন্ধুকে দেখলে মুখে যেমন মৃদুহাসি ফুটে ওঠে, তেমনি হাসি ফুটে ওঠে মিনুর মুখেও। মিনু মনে মনে বলে—সই ঠিক সময়ে উঠেছ দেখছি। বৈজ্ঞানিকের চোখে শুকতারা বিরাট বিশাল বাষ্পমণ্ডিত একাস্ত গ্রহ, কবির চোখে নিশাবসানের আলোক দূত, কিন্তু মিনুর চোখে সে সই। মিনুর বিশ্বাস সে-ও তার মতো কয়লা ভাঙতে উঠেছে ভোরবেলায়, আকাশবাসী তার কোনও পিসেমশায়ের গৃহস্থালিতে উনুন ধরাবার জন্যে। আকাশের পিসেমশাইও হয়তো ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করে তার নিজের পিসেমশাইয়ের মতো। শুকতারার আশেপাশে কালো মেঘের টুকরো যখন দেখতে পায়, তখন ভাবে ওই যে কয়লা। কী বিচ্ছিরি করে ছড়িয়ে রেখেছে আজ। মাঝে মাঝে এমন নুংরুট্টি হয় ও। বলে আর মুচকি মুচকি হাসে। তারপর নিজে যায় সে কয়লা ভাঙতে। কয়লাগুলো ওর শত্রু, শত্রুর উপর হাতুড়ি চালিয়ে ভারি তৃপ্তি হয় ওর। হাতুড়িটার নাম রেখেছে গদাই, আর যে পাথরটার উপর রেখে কয়লা ভাঙে তার নাম দিয়েছে শানু। শানের সঙ্গে মিল আছে বলে বোধহয়।

কয়লাগাদার কাছে গিয়ে রোজ সে ওদের মনে মনে ডাকে—ও গদাই ও শানু, ওঠ এবার, রাত যে পুইয়ে গেছে। সই এসে কয়লা ভাঙছে। তোমরাও ওঠো। কয়লা ভাঙতে ভাঙতে সে অস্পষ্ট হিস্ হিস্ শব্দ করে একটা। মনের ঝাল মিটিয়ে শত্রুর মাথা ভাঙছে যেন। কয়লা ভেঙে তারপর যায় সে ঘুঁটের কাছে। ঘুঁটে তার কাছে ঘুঁটে নয়, তরকারি। উনুনের নাম রাক্ষসী। উনুন রাক্ষসী কেরোসিন তেল-দেওয়া ঘুঁটের তরকারি দিয়ে শত্রুদের মানে, কয়লাদের খাবে। আঁচটা যখন গনগন করে ওঠে তখন ভারি আনন্দ হয় মিনুর। জ্বলন্ত কয়লাগুলোকে তার মনে হয় রক্তাক্ত মাংস, আর আগুনের লাল আভাকে মনে হয় রাক্ষসীর তৃপ্তি। বিস্ফোরিত নয়নে সে চেয়ে থাকে! তারপর ছুটে চলে যায় উঠোনে, আকাশের দিকে চেয়ে দেখে সেখানে উষার লাল আভা ফুটেছে কি না, উষার লাল আভা যেদিন ভাল করে ফোটে সেদিন সে ভাবে সইয়ের উনুনে চমৎকার আঁচ এসেছে। যেদিন আকাশ মেঘে ঢাকা থাকে সেদিন ভাবে, ছাই পরিষ্কার করেনি, তাই আঁচ ওঠেনি আজ। এই ভাবে নিজের একটা অভিনব জগৎ সৃষ্টি করেছে সে মনে মনে। সে জগতের সঙ্গে বাইরের জগতের মিল নেই। সে জগতে তার শত্রু মিত্র সব আছে। আগেই বলেছি কয়লা তার শত্রু। তার আর একদল শত্রু আছে, বোলতা ভীমরুলরা। একবার কামড়েছিল তাকে। সে-যন্ত্রণা সে ভোলেনি। প্রতিশোধ নিতেও ছাড়ে না। দুপুরে যখন পিসিমা ঘুমোয় তখন সে ঘুরে বেড়ায় কোমরে কাপড় জড়িয়ে আর গামছায় একটা প্রকাণ্ড গেরো বেঁধে। বোলতা বা ভীমরুল দেখতে পেলেই সোঁ করে গামছাটা ঘুরিয়ে মারে। অব্যর্থ লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায় মাটিতে। অনেক সময় মরে যায়, অনেক সময় মরে না। না মরলে ঝাঁটা-পেটা করে মারে তাকে। আর হিস হিস শব্দ করে। বোলতা বা ভীমরুল মেরে সে খেতে দেয় পিঁপড়েদের। পিঁপড়েরা তার বন্ধু। মরা বোলতাটাকে নিয়ে যাবার জন্যে শত শত পিঁপড়ে ভিড় করে আসে। তারা কেমন করে খবর পায় কে জনে। বোলতাটাকে টানতে টানতে নিয়ে যায় যখন তারা তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ে মিনু। কুঁই কুঁই কুঁই কুঁই শব্দ বেরোয় তার মুখ থেকে। এটা তার উচ্ছ্বসিত আনন্দের অভিব্যক্তি।.... পিঁপড়েরা ছাড়া আরও অনেক বন্ধু আছে তার। রান্নাঘরের বাসনগুলি সব তার বন্ধু। তাদের নাম রেখেছে সে আলাদা আলাদা। ঘটিটার নাম পুঁটি। ঘটিটা একদিন হাত থেকে পড়ে গিয়ে তুবড়ে গেল। মিনুর সে কী কান্না। তোবড়ানো জায়গাটায় রোজ হাত বুলিয়ে দেয়। গেলাস চারটের নাম হারু, বারু, তারু আর কারু। চারটে গেলাসই একরকম। কিন্তু মিনুর চোখে তাদের পার্থক্য ধরা পড়ে। গেলাসগুলোকে যখন মাজে বা ধোয় তখন মনে হয় সে যেন ছোট ছেলেদের স্নান করাচ্ছে। মিটকেসটা ওর শত্রু। ওটার নাম দিয়েছে গপগপা। গপগপা করে সব জিনিস পেটে পুরে নেয়। মাঝে মাঝে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে মিটকেসের চকচকে তালাটার দিকে, আর মনে মনে বলে—আ মর, মুখপোড়া, সব জিনিস পেটে পুরে বসে আছে। মিনুর আর একটি দৈনন্দিন কর্তব্য আছে। যখন অবসর পায় টুক্ করে চলে যায় ছাতে। ছাত থেকে একটা বড় কাঁঠাল গাছ দেখা যায়। কাঁঠাল গাছের মাথার দিকে থেকে একটা সরু শুকনো ডাল বেরিয়ে আছে। সেই ডালটার দিকে সাগ্রহে চেয়ে থাকে মিনু! মনে হয় তার সমস্ত অন্তর যেন তার দৃষ্টিপথে বেরিয়ে গিয়ে আশ্রয় করেছে ওই ডালটাকে। এর কারণ আছে। তার জন্মের পূর্বেই তার বাবার মৃত্যু হয়েছিল। বাবাকে

সে দেখেনি। অনেকদিন আগে তার মাসিমা তার কানের কাছে চিৎকার করে একটা বিস্ময়ের খবর বলেছিল তাকে। তার বাবা নাকি বিদেশে গেছে, অনেকদূর বিদেশ, মিনু বড় হলে তার কাছে ফিরে আসবে হয়তো তার কোলেই আসবে। মিনু বুঝতে পারেনি ব্যাপারটা ভাল করে। একটা জিনিস কেবল তার মনে গাঁথা হয়ে ছিল—বাবা ফিরে আসবে। কবে আসবে? মিনু কত বড় হলে আসবে? কথাটা মাঝে মাঝে ভাবতে সে। এমন সময় একদিন একটা ঘটনা ঘটল। সে সেদিনও ছাতে দাঁড়িয়েছিল। দেখতে পেল পাশের বাড়ির টুনুর বাবা এল বিদেশ থেকে অনেক জিনিসপত্র নিয়ে, আর ঠিক সেই সময়ে তার নজরে পড়ল ওই সরু ডালটায় একটা হলদে পাখিও এসে বসল। সেইদিন থেকে তার বদ্ধ ধারণা হয়ে গেছে ওই সরু ডালটায় একটা হলদে পাখি এসে আবার বসবে। সেইদিনই তার বাবা আসবে বিদেশ থেকে। তাই ফাঁক পেলেই সে ছাতে উঠে কাঁঠাল গাছের ওই সরু ডালটার দিকে চেয়ে থাকে। হলদে পাখি কিন্তু আর এসে বসে না। তবু রোজ একবার ছাতে ওঠে মিনু । এটা তার দৈনন্দিন কর্তব্যের মধ্যে একটা। ছাতে উঠে আর একটা জিনিস চোখে পড়ল তার। রাস্তার কালো কুকুরটার পায়ের থাবার উপরে ঘা হয়েছিল একটা, মিনু দেখত কুকুরটা রোজ সেটাকে চাটে। নিবিষ্ট মনে চেটে যায় খালি। তারপর মিনু সবিস্ময়ে একদিন লক্ষ করল ঘা-টা সেরে গেছে। কেবল চেটে চেটে ঘা-টাকে সারিয়ে ফেলেছে কুকুরটা। অবাক হয়ে গেল মিনু। তার মনে হল ঘা-টা বোধহয় আমসত্ত্বের মতো। তাই চাটতে পেরেছে। তাক লেগে গেল ওর ডাক্তারি দেখে। আর একটা জিনিসও বসে গেল ওর মনে—ঘা নিশ্চয়ই আমসত্ত্ব, তা না হলে চাটতে পারে কেউ?..... দিন কয়েক পরে পিসিমার বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল ছেঁচে গেল শিল পড়ে। পিসেমশাই কী একটা ওষুধ দিলেন। বোধহয় হোমিওপ্যাথিক। বললেন সাতদিন পরে আর এক দাগ দেবেন। এই সাতদিনে ঘা কিন্তু খুব বেড়ে গেল। যন্ত্রণায় পিসিমার চোখে জল পড়তে লাগল। পাড়ার হারু ডাক্তার সকালে এসে ঘুমের ওষুধ দিয়ে গেলেন। ঘুমের ওষুধ খেয়ে পিসিমা ঘুমোচ্ছেন, পায়ের পটিটা আলগা হয়ে সরে গেছে, ঘা-টা দেখা যাচ্ছে। মিনুর মনে হল আমসত্ত্ব, আমসত্ত্বের মতোই তো কালচে দেখতে। তার ইচ্ছে হল চেটে দিই একটু, হয়তো সেরে যাবে, কুকুরটা তো চেটেই সারিয়েছে ঘাটা। মিনু জিভ বার করে চেটে দিলে ঘা-টা। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেল পিসিমার। আঁৎকে চিৎকার করে উঠলেন তিনি— 'কী করলি পোড়ারমুখি।' পাখাটা ছুঁড়ে মারলেন তিনি মিনুকে। মিনু পালিয়ে গেল। লুকিয়ে রইল সমস্ত দিন। সেইদিনই রাত্রে কম্প দিয়ে জ্বর এল তার। কাউকে কিছু বললে না। মনে হল জ্বর হওয়াটাও বুঝি অপরাধ একটা। .... ভোরে ঘুম ভেঙে গেল, রোজ যেমন কয়লা ভাঙতে যায় সেদিনও তেমনি গেল, সেদিনও চোখে পড়ল শুকতারাটা দপদপ করে জ্বলছে। মনে মনে বলল—সই এসেছিস। আমার শরীরটা ভাল নেই ভাই। তুই ভাল আছিস তো? উনুনে আঁচ দিয়ে কিন্তু সে আর জল ভরতে পারলে না সেদিন, শরীরটা বড্ড বেশি খারাপ হতে লাগল। আস্তে আস্তে গিয়ে শুয়ে পড়ল নিজের বিছানায়। কেমন যেন ঘোর ঘোর মনে হতে লাগল.... চাটবার পর থেকে পিসিমার ঘা-টাও বেড়ে গিয়েছিল খুব। মিনু টের পায়নি, কারণ পিসিমার কাছে আর সে ঘেঁষেনি। এ-ও জানত না যে পিসেমশায় পাশের গাঁয়ে তাঁর শালাকে খবর পাঠিয়েছিলেন পিসিমাকে দেখে যাবার জন্য। পাশের গাঁয়ে

পিসিমার যে ভাই আছে একথাও মিনু জানত না। নিজের ছোট্ট ঘরটিতে মিনু জ্বরের ঘোরে শুয়ে রইল খানিকক্ষণ। জ্বরের ঘোরেই হঠাৎ তার মনে হল একটা দরকারি কাজ করা হয়নি কিন্তু। আস্তে আস্তে উঠল সে বিছানা থেকে, তারপর খিড়কির দরজা দিয়ে দাঁড়াল ছাতের সিঁড়ির কাছে। সিঁড়ির কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে উঠে গেল ছাতে। কেউ দেখতে পেল না। পিসিমা পিসেমশাই তখনও ঘুমোচ্ছেন। ছাতে উঠেই চোখে পড়ল লালে লাল হয়ে গেছে পূর্বাকাশ। বাঃ চমৎকার আঁচ উঠেছে তো সইয়ের। একটু হাসল সে। তারপর চাইল সেই সরু ডালটার দিকে। সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল তার। একটা হলুদ পাখি এসে বসেছে। তাহলে তো বাবা নিশ্চয় এসেছে। আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না ছাতে, যদিও পা টলছিল তবু সে প্রায় ছুটে বেরিয়ে এল বাইরে। এসেই দেখতে পল বাইরের বারান্দায় একটি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে আছেন। ছুটে গিয়ে তাঁর পা দুটো জড়িয়ে ধরল, তার মুখ থেকে কুঁই কুঁই কুঁই শব্দ বেরুতে লাগল। ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন ভদ্রলোক। সঙ্গে সঙ্গে পিসেমশাই বেরিয়ে এলেন কপাট খুলে।

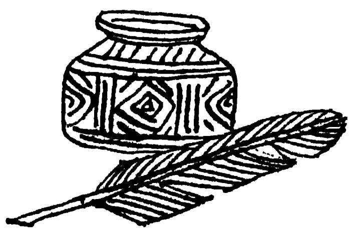
'কে এই মেয়েটা আমার পায়ে মুখ ঘষছে এমন করে।'

'তোমার পায়েও মুখ ঘষছে। তোমার দিদির পায়ে কাল কামড়ে দিয়েছে ও! পাগল হয়ে গেছে বোধহয়।'

চুলের ঝুঁটি ধরে হিড় হিড় করে সরিয়ে দিলেন তিনি মিনুকে।

সাতদিন পরে হাসপাতালে মৃত্যু হল মিনুর। তার সমস্ত মুখ ঘায়ে ভরে গিয়েছিল। সেপ্‌টিসিমিয়া হয়েছিল। ডাক্তাররা বললেন, সমস্তক্ষণ সে প্রায় অজ্ঞানই হয়ে ছিল। মৃত্যুর খানিকক্ষণ আগে জ্ঞান হল কয়েক মিনিটের জন্য। চোখ খুলে দেখল সামনে একটা খোলা জানলা দিয়ে আকাশের খানিকটা দেখা যাচ্ছে। দপদপ করে জ্বলছে শুকতারাটা। মুখে মৃদু হাসি ফুটল মিনুর। মনে মনে বলল, 'সই এবার তোর কাছে যাচ্ছি।'

কে জানে শুকতারার দেশের লোকেরা বোবা মিনুর মনের কথা বুঝতে পেরেছে কি না।



অপরাজিতা

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মেয়েটি প্রায়ই আসে আমার বাড়িতে।

সবাই বলে সে খুব সুন্দরী।

কিন্তু সুন্দরী কাকে বলে, আমি ঠিক বুঝি না।

গায়ের রং ফর্সা হলেই তাকে সুন্দরী বলে না।

এমন মেয়েও আমি দেখেছি যার গায়ের রং ফর্সা। কিন্তু একবার তাকালে তাকিয়ে দেখা শেষ হয়ে যায় — দ্বিতীয়বার আর তাকাতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু সেই মেয়েকেই নেই বোধহয় সুন্দরী বলে — যাকে বারংবার দেখেও দেখার সাধ মেটে না।

এটা গেল বাইরের রূপ।

সেরকম রূপের অভাব ছিল না মেয়েটির। কিন্তু মেয়েদের আরেকটি রূপ আছে। সেটি তার অন্তরের রূপ। সে রূপ চোখে দেখা যায় না। কথা বললেই ধরা পড়ে। অথচ কথা সে সহজে বলতে চায় না। চোখে চোখ পড়লেই টানা-টানা কাজলকালো চোখদুটি সে নামিয়ে নেয়।

মনে হয় যেন কী এক গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে সে দুটি চোখে।

বললাম, 'চুপ করে রয়েছ কেন, কথা বলো....।'

চোখ দুটি আবার সে তুললে। এবার তার চোখ ভরা জল। মনে হল বলতে তার কষ্ট হচ্ছে। তবু বলল, 'আপনার জানা কোনও ভাল জ্যোতিষী আছে।'

ভেবে বললাম, 'আছে একজন। তাকে খবর দিতে পারি।'

চুপ করে রইল সে। জিজ্ঞাসা করলাম — 'কোথায় থাকো তুমি?'

'শ্যামবাজারে।'

'সঙ্গে আর কে আছেন?'

মুখ নামিয়ে বলল, 'সঙ্গে আর কে থাকতে পারে বলুন তো?'

আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই তোমার স্বামী।'

'ঠিকই বলেছেন।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কতদিন বিয়ে হয়েছে?'

মেয়েটি বলল, 'চার বছর হল।'

'স্বামী কী করেন?'

'কলেজে অধ্যাপনা করেন।'

জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ বোধ করছিলাম, তবু জিজ্ঞাসা করলাম, 'সন্তানাদি হয়নি?'

মাথা নিচু করে মেয়েটি জবাব দিল, 'না, এখনও হয়নি।'

একটু ভেবে বললাম, 'সেই জন্যই কি জ্যোতিষীর সন্ধান করছিলে?'

সলজ্জ ভঙ্গিতে মেয়েটি উত্তর দিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোনও ওষুধ খেয়েছিলে?'

'কত বড় বড় ডাক্তারের কাছে গেলাম, কত ওষুধই তো খেলাম কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আগে কোনও জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়েছ?'

'না, তবে ছেলেপুলে হয়নি বলে আমার কাছ থেকে অনেক লোক টাকা ঠকিয়ে নিয়েছে।'

'কিরকমভাবে ঠকাল আমাকে বলবে?'

মেয়েটি হাসল। বলল, 'সে এক ভারী মজার ঘটনা। শুনবেন আপনি!'

'বলো, শুনতেই তো চাইছি।'

মেয়েটি বলল, 'আগে যারা এসেছিল, তাদের কথা আর বলব না। এবার যিনি এলেন তিনি আমার পরিচিত। রীতিমতো শিক্ষিত। মস্ত বড় ছাপাখানার মালিক। সবকিছু শুনে তিনি বললেন, কাল আমি একজনকে নিয়ে আসব। দেখি তিনি কিছু করতে পারেন কি না? তান্ত্রিক সাধু, কিন্তু দেখলে চেনা যায় না। বয়স খুব কম।'

পরের দিন তিনি একাই এলেন। বললেন, 'তাঁকে আনতে পারলাম না। অনেক লোকের ভিড়। তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায় না। আপনাকে তাঁর আশ্রমে যেতে হবে। আমি নিয়ে যাব। কাল ঠিক দশটার সময়ে তৈরি হয়ে থাকবেন।'

দশটার সময় বিজনবাবু এলেন গাড়ি নিয়ে। তাঁর সঙ্গে গেলাম। কলকাতা থেকে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে ছোট্ট একটি গ্রাম। সেই গ্রামের ভেতরে আঁকা বাঁকা পথে যেতে যেতে গাড়িটা যেখানে গিয়ে থামল, দেখলাম গাছপালায় ঢাকা ছোট্ট একটা নাটমন্দির। সেখানে গিয়ে বিস্তর অচেনা লোক চাপাচাপি করে বসে আছে।

মাটির তৈরি খুব বড় একটি মনসার মূর্তি। সেই মূর্তির সামনে পিছন ফিরে বিড় বিড় করে আপন মনে কী যেন বলছে পুরোহিতের মতো একটা লোক। গলায় একটি ফুলের মালা। প্রিয়দর্শন যুবক বললেই ভালো হয়।

এক-একজনের নাম ধরে ডাকছেন আর সেই ভিড়ের মাঝখান থেকে সে এগিয়ে যাচ্ছে তাঁর কাছে। কী যে তাদের কথা হচ্ছে কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

শেষে আমার নাম ধরে ডাকতেই আমি চমকে উঠলাম। আমার নাম তিনি জানলেন কী করে?

তা তিনি যেমন করেই জানুন, এগিয়ে গেলাম। তার কাছে গিয়ে বসতেই তিনি বললেন, 'কী চাই তোর?'

লজ্জায় আমার মুখ দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছিল না। তখন তিনি নিজেই বললেন, 'বুঝেছি, ছেলে চাই।'

এই বলে তিনি চোখ বুজলেন। চোখ বুজে আবার সেই বিড় বিড় করে কথা। মিনিট খানেক পরে চোখ খুলে তাকিয়েই বললেন, 'ছেলে পাবি। কিন্তু তার জন্য আমায় গজমতি ভাস্কররাজ এনে দিতে হবে।'

বললাম, 'আমি তো কখনও ওর নামও শুনিনি। গজমতি ভাস্কররাজ কোথায় পাব বাবা?'

তিনি বললেন, 'সোনার দোকানে খুঁজবি।'

কলকাতা শহরে সোনার দোকান আর বাকি রাখলাম না খুঁজতে। কিন্তু এই অদ্ভুত নাম শুনে সবাই হাসতে লাগল।

শনিবার আর মঙ্গলবার তাঁর 'ভর' হয়। সপ্তাহের মধ্যে এই দুইদিন তাঁর দেখা পাওয়া যায়।

শনিবার গিয়ে দেখি তেমনই লোকজনের ভিড়। তিনিও তেমনই বসে আছেন। গিয়ে বললাম, গজমতি ভাস্কররাজ কোথাও পেলাম না বাবা।'

তিনি বললেন, 'পাঁচশো এক টাকা দাম। দিতে যদি পারিস তো টাকা আনবি আমি দেব।'

হাতে টাকা ছিল না, কিন্তু তখন আমার এমন বিশ্বাস হয়ে গেছে যে গলার সোনার হারটা বিক্রি করে পাঁচশো এক টাকা নিয়ে গিয়ে তাঁর হাতে দিলাম। তার বদলে একটা সোনার ছোট মাদুলি তিনি আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'রবিবার সকালে স্নান করে বাঁ হাতে না হয় গলায় এটা ধারণ করবি। তাহলেই এক মাসের মধ্যে মনস্কামনা পূর্ণ হবে।'

মেয়েটি হেসে তার হাতের মাদুলিটি আমাকে দেখালে। বলল, 'সাত মাস হয়ে গেল। কিছুই হয়নি। টাকাটা আমার গেল।'

তারপর প্রায় বছর দেড়েক তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

আমি চলে গিয়েছিলাম হিমাচল প্রদেশে।

ফিরে যখন এলাম, একদিন বাইরের ঘরে বসে আছি, দেখি না একটা মেয়ে আরেকজন পুরুষ এসে দাঁড়াল। মেয়েটি হাসছে। তার কোলে সুন্দর একটি ফুটফুটে ছেলে। বললাম, 'বসুন।'

'আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না? বসুন বললেন যে!'

তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। নাঃ, কিছুতেই চিনতে পারছি না।

মেয়েটি বলল, 'আমি অপরাজিতা।' বলেই সে হেঁট হয়ে আমাকে প্রণাম করল। ছেলেটিকেও প্রণাম করালে।

তার স্বামীও প্রণাম করার জন্য হাত বাড়িয়েছিল, আমি নিষেধ করলাম।

অপরাজিতা বলল, 'এখন চিনতে পেরেছেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ। আমি তোমাকে ওষুধ দিয়েছিলাম না?

'সেই কথাই বলতে এসেছি। ছেলেকেও প্রণাম করাবার জন্য নিয়ে এলাম।'

বলেই সে একটি কাগজ বের করে বলল, 'আরেকটি অনুরোধ আছে। এই কাগজে ওষুধের নামটি লিখে দিন। আমার এক ননদ কান্নাকাটি করে চিঠি লিখেছে। তাকে সেই কাগজটি পাঠিয়ে দেব। ছেলে না হওয়ার জন্যই তার সংসারে যে অশান্তি হচ্ছে তা যদি আপনি জানতেন —'

লিখে দিলাম, হোমিওপ্যাথির এই অসাধারণ ওষুধটির নাম।

ঋতু শেষে কলিফস এবং সিপিয়া ২০০ পালটাপালটি ভাবে তিন দিন অন্তর তিন মাস খেয়ে দেখবে।

খবর পেয়েছিলাম ওষুধ খেয়ে তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছিল।



সভাপর্ব

মনোজ বসু

সভার ব্যাপারে দিন দিন নানান পদ সৃষ্টি হচ্ছে। সভাপতি তো বটেই, পরের পদ প্রধান অতিথি আর একটা হল উদ্বোধক। তা ছাড়া অনুষ্ঠান ভেদে আরও নানা পদযোজনা হয়। নামী লোক কেউ পদ বিনা সভায় আসে না। খাতিরে পড়ে হয়তো কথা দিলেন, সময় কালে পাত্তা মেলে না। ভেবে ভেবে সেজন্য পদ বের করতে হয়।

তিন পদের মধ্যে উদ্বোধক পদটাই বেশি পছন্দ আমার। উদ্বোধকের বক্তৃতা সকলের আগে। উৎসাহভরে মানুষ ভিড় করেছে, দেহ ও মনের প্রচুর তাগদ। এমনই অবস্থায় যথেচ্ছ বক্তৃতার মুষলাঘাত করা চলে। করেই ছুটি। তারপরে ইচ্ছে হল তো সভাস্থলেই বসে বসে শ্রোতৃমণ্ডলীর দুর্গতিতে বিমল রসাস্বাদন করুন। বেরিয়ে এসে প্রাকৃতিক শোভা দেখে বেড়াতে পারেন। কিংবা কাজের অজুহাত দেখিয়ে সরাসরি বাড়ি গিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিতে পারেন। শেষ পন্থায় কিছু মুশকিল আছে। আসবার সময় গাড়ি খরচা করে পরম যত্নে তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন, যাবার মুখে হয়তো বা শুধুমাত্র গাড়ি ডেকে দেবার লোকই মিলবে না। যেন ফৌজদারি মামলার সাক্ষী। সাক্ষী যতক্ষণ না কাঠগড়ায় উঠছে, খাতিরযত্নের অবধি নেই। যা বলেছে তাতেই 'হ্যাঁ'। চড়া রোদ্দুরে, কর্তামশায়, ছাতার অভাবে বড় কষ্ট হচ্ছে। কর্তামশায় এখন কল্পতরু: তার জন্যে কি — দেব কিনে ফ্যান্সি ছাতা। কোর্টে পৌঁছতে দেরি হয়ে যাবে, নয়তো এখনই কিনে দিতাম। ফেরার সময় মনে কোরো। ফেরার পথে কর্তামশায়কে দিয়েছে সে মনে করিয়ে। তখন ভিন্ন সুর: ওই তো, কত সব দোকান রয়েছে, টাকা ফেলে পছন্দ মতন নাওগে কিনে ছাতা। আমাদেরও, কোনও কোনও ক্ষেত্রে, ওই রকম ছাতা কেনার অবস্থা। বক্তৃতা সমাধা হবার সঙ্গে সঙ্গে পট-পরিবর্তন—শত প্রশ্নের তখন ভালোমতো একটা জবাব মেলে না।

উদ্বোধক হয়ে একবার কী বিপদে পড়েছিলাম বলি। তারিখ আঠাশে-উনত্রিশে বৈশাখ। জায়গা কলকাতার কাছাকাছি। অনুষ্ঠান সম্পর্কে কী সব বলে দিয়েছিলেন, ভুলে গেছি; ছাপানো চিঠিও এসে থাকবে, হারিয়ে গেছে। সভাক্ষেত্রে উঠে দাঁড়ালাম উদ্বোধন করতে। বৈশাখের শেষ; অতএব রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী না হয়ে যায় না। তদনুযায়ী রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে

পড়েছি। বক্তৃতা ঝরঝর করে এগুচ্ছে, উদ্যোক্তারা দেখি মুখ চাওয়াচাওয়ি করছেন। শেষকালে একজন উঠে এসে কানে কানে বললেন, রবীন্দ্রজয়ন্তী নয়, নববর্ষ-আবাহন। রসভঙ্গে আগুন হয়ে উঠেছি আমি : 'বৈশাখের শেষে কোনদেশি নববর্ষ মশায়? সে হবে না, রবীন্দ্রজয়ন্তী চালাব।' সকাতরে ভদ্রলোক পুনশ্চ বলেন, 'ক্ষমাঘেন্না করে দিন সার, সমিতির দলাদলি মেটাতে এত দেরি হয়ে গেল। কী করা যায় তখন!' 'ঈশানের পুঞ্জ মেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে বাধাবন্ধ হারা'— 'বর্ষশেষ' কবিতার খানিকটা আবৃত্তি করে রবীন্দ্রজয়ন্তীর পাশ কাটিয়ে নববর্ষ-বন্দনায় মোড় নিতে হল।

কে সভাপতি, কোন জন প্রধান-অতিথি, আগে থাকতে এসব কথাবার্তা হয়ে আছে। কার্ডে নাম ছাপা। তা সত্ত্বেও একজনে উঠে নাম প্রস্তাব করবেন, অন্যে সমর্থন করবেন। রীতকর্মটুকু সমাধা না হওয়া পর্যন্ত নীচের আসনে বসে আছি আমরা। পদ পাকা হয়ে গেলে মাতব্বররা সঙ্গে করে নিয়ে যথাযোগ্য স্থানে বসিয়ে দিচ্ছেন। ছাতনাতলায় বর নিয়ে বসানোর মতন। ফুটফুটে চেহারার এক বাচ্চা ধরে আনা হল মাল্যদানের জন্য। এক একটা গলায় মালা পরছে, আর চটপট হাততালি। নিয়ম হল, মালা তৎক্ষণাৎ খুলে ফেলতে হবে, মালার সঙ্গে গলদেশের আর কোনও যোগাযোগ নেই। ইতিমধ্যে এক মাতব্বর প্রোগ্রাম নিয়ে সভাপতির সামনে দিয়েছেন। যাক বাবা, বক্তা দেখা যাচ্ছে সর্বসাকুল্যে পাঁচজন। কায়ক্লেশে দুটো ঘণ্টা কাবার করতে পারলেই সভাপতির পালা এসে যাবে। বক্তারা একের পর এক উঠেছেন—সভাপতি ততক্ষণ ভেবে নিচ্ছেন, তাঁর অভিভাষণ কোন কায়দায় শুরু করবেন। এবং উপসংহারই বা কোন কথার উপর হবে যাতে প্রচণ্ডতম হাততালি আদায় করা যায়। কিন্তু কী সর্বনাশ—একটি বক্তার হয়ে গেল তো মাতব্বরমশায় প্রোগ্রামের নীচে দুটো-তিনটে নাম বসিয়ে দিয়ে গেলেন। দীনবন্ধুদাদার দধিভাণ্ড আর কি! ভাণ্ড যতই উপুড় করুন, দধি আর শেষ হয় না। কার পরে কে বলবেন, সেটাও সেই মাতব্বরমশাই বলে দিচ্ছেন। সভাপতির কাজ শুধু করুণ মুখে শেষ সময়ের প্রতীক্ষা করা, সকলের যাবতীয় কথা যখন শেষ হয়ে যাবে। ইতিমধ্যে উঠে গিয়ে একটান সিগারেট টেনে আসবেন, সে উপায় নেই। কোমরে কিক ধরলেও একবার নড়ে বসতে দেবে না। প্রাচীন গানে মৃত্যুসময়ের ভয়ঙ্কর অবস্থার বর্ণনা আছে, তারই একটা কলি সেই সময়ে ঘুরে ফিরে মনে আসে—'অন্যে বাক্য কবে তুমি রবে নিরুত্তর।' রামমোহন রায়ের রচনা। তিনিও নিশ্চয় অনেক সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। নয়তো কলমের ডগায় এমন মোক্ষম বাক্য সম্ভব না।

আরও যে কত রকমের বিপদ সভাপতিত্ব করেত গিয়ে! শুনবেন? এক গণ্ডগ্রামে নিয়ে গেছে, ছোঁড়াদের কী এক সাংস্কৃতিক সভা। ভোরের আগে ট্রেন নেই, রাতটুকু কাটিয়ে আসতে হবে। এক ছোকরা নিয়ে এসেছে। বলে, স্টেশনের উপর দোতলা হরিসভার বাড়ি, ফুরফুরে হাওয়া, তোফা থাকবেন। অতএব মাঝারি গোছের বেডিং ও স্যুটকেশ সঙ্গে নিতে হল।

স্টেশনে নেমে কুলি পাইনে। ছোকরা বলে, 'গাঁয়ের ডেলি-প্যাসেঞ্জার, শক্তসমর্থ মানুষ সবাই, কুলির তোয়াক্কা রাখিনে আমরা। স্টেশন ছেড়ে যত কুলি খাদের কাজে নেমে গেছে।'

বেডিংটা সে নিয়ে নিল—প্রথমে বগলে, পরে কাঁধে, সর্বশেষ মাথায়। স্যুটকেশ আমি

নিয়েছি। ওটাও মাথায় তুললে সুবিধা হত। কিন্তু সভাপতির মানুষের ইজ্জত বিবেচনা করে প্রাণপণে হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলেছি। চলেছি তো চলেইছি।

'কী ভায়া, বললে যে স্টেশনের উপর—'

ছোঁড়া খিঁচিয়ে উঠল, 'স্টেশনের উপর মানে কি প্লাটফর্মের উপর?'

সন্ধ্যা হয় হয়। এক সময় অবশেষে হরিসভার বারান্দায় ধপাস করে সে বেডিং নিয়ে ফেলল। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। বাড়ি দোতলাই বটে, কিন্তু সামনের দরজায় ভারী তালা ঝুলছে।

'বসুন আপনি— বেডিং-এর উপরেই চেপে বসুন না। দেখে আসি, ঘর খোলার কী করা যায়।'

গেল তো গেল। ঘোর হয়ে গেছে। ঠায় বসে আছি এক জায়গায় ধুলো পায়ে। জনমানব দেখিনে যে জিজ্ঞাসা করে নেব হাত-পা ধোবার পুকুরঘাট কোন দিকে। নিজে খোঁজ করব— কিন্তু জায়গাটা যেন কেমন কেমন, জিনিসপত্র ফেলে বেরুতে ভরসা হয় না। সেই ফাঁকে হয়তো বা লোপাট হয়ে যাবে।

আওয়াজ পাচ্ছি, কলকাতার গাড়ি এল একটা। রাস্তার উপরে এতক্ষণে মানুষের চলাচল। ডেলি-প্যাসেঞ্জাররা বাড়ি ফিরছেন। ডাকাডাকিতে একজন এসে কম্পাউন্ডে ঢুকলেন।

'কে আপনি মশায়? এখানে কী জন্যে বসে?'

'সভায় নিয়ে এসেছে। তাদের কারও পাত্তা পাচ্ছিনে।'

'ছেলেছোকরার কাণ্ড। বোধহয় ভুল হয়ে গেছে।'

'আপনি যদি একটু মনে করিয়ে দিয়ে আসেন দয়া করে।'

'দূর মশায়। খেটেখুটে এলাম, কোথায় কাকে খুঁজে বেড়াই! কে নিয়ে এসেছে, নামটাও তো সঠিক বলতে পারছেন না।'

পরক্ষণে সান্ত্বনা দেন: 'থাকুন না বসে। জলে পড়েননি। গাড়িভাড়া দিয়ে যখন নিয়ে এসেছে, ঠিক একসময় মনে পড়ে যাবে।'

তিনি সরে পড়লেন। তারপর আরও সব আসছেন। কয়েকজন করুণাপরায়ণ চুক-চুক করে বলেন, 'ছোঁড়াগুলোর কাণ্ডই এইরকম। আপনাকেও বলি মশায়। ওরা নাচিয়ে দিল, অমনি নেচে উঠলেন। গিয়ে তো গাঁয়ের নিন্দে করবেন—গ্রামবাসী আমাদেরই যত জ্বালা।'

আমি ঘাড় নেড়ে বলি, 'কিচ্ছু না, শতমুখে প্রশংসা করব, সাড়ে-আটটার ট্রেনে যাতে কলকাতা ফিরতে পারি সেই উপায় করে দিন। একটা লোক দেখে দিন মালগুলো যে স্টেশনে দিয়ে আসবে।'

ভদ্রলোক শিউরে ওঠেন: 'রক্ষে করুন। মারা যাই আর কি আপনার কথা শুনে। আপনি তো গাড়ি চেপে সড়াৎ করে বেরিয়ে পড়লেন। জানাজানি হতে বাকি থাকবে না—সভাপতিকে সরিয়ে যজ্ঞি নষ্ট করেছি। সকালসন্ধ্যা স্টেশনের পথে যেতে হয়, পথের চায়ের দোকানে ওদের আড্ডা। ইট মেরে মাথা ফাটিয়ে দিলে আপনি কি তখন ঠেকাতে আসবেন। তার চেয়ে চা এনে দিচ্ছি—চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে বসুন।'

সত্যি, করুণার অন্ত নেই। কেটলি ও মাটির ভাঁড় নিয়ে এলেন সেই কোনও চায়ের

দোকান থেকে। অতিরিক্ত একখানা লেড়োবিস্কুট। ঈশ্বর এদের শতায়ু করুন। তারপরেও নিজেদের মধ্যে বলাবলি হচ্ছে: 'শোবেন কোথা সভাপতি মশায়—বারান্দার উপরে? খাবেন কী?'

এক ময়রা আছে বুঝি, তাকে লুচি ভাজবার ফরমাস দিলে সভাপতিকে উপবাসে নিশিযাপন করতে হয় না। লুচি আর আলু-কুমড়োর তরকারি। কিন্তু যা করতে হয়, এখনই। দোকান বন্ধ করে ময়রা বাড়ি চলে গেলে আর হবে না।

ফিস্‌ফিস্‌-গুজগুজ চলছে। লুচির মূল্যটা কে দেয়, সেই কথা। চাঁদা তোলার কথা উঠছে, তা-ও বুঝতে পারি। ক্রুদ্ধ একজন ওঁদের মধ্যে বলে উঠলেন, 'মাতব্বরি করে ছোঁড়ারা নিয়ে এল, আমরা কেন গচ্চা দিয়ে মরব?'

আমি একটা টাকা বের করে দিলাম: 'ময়রাকে দিন গিয়ে। লুচিভাজা হলেই নিয়ে আসবে, গরম গরম খেয়ে নেব।'

সভার উদ্যোক্তারা অনতিপরেই এসে উপস্থিত, যে ছোকরা আমাকে বসিয়ে দিয়ে চাবি খোলার ব্যবস্থায় গিয়েছিল, সে-ও এসেছে।

'মিটিং-এ আসুন।'

'রাত আটটার সময় মিটিং আবার কী?'

ছোকরা বলে, 'ভারি লজ্জার ব্যাপার। হরিসভার চাবি যাঁর কাছে, তিনি কলকাতায় গিয়ে বসে আছেন। তাঁর খোঁজে দেরি হয়ে গেল। তার উপর দুটো দল আমাদের। সাবজেক্ট কমিটিতে মারামারি ব্যাপার। অনেক কষ্টে এতক্ষণে মিটমাট হয়ে গেল।'

'না ভাই, শরীর ভেঙে পড়ছে। যা হোক কিছু মুখে দিয়ে আমি শুয়ে পড়ব।'

ওপক্ষের স্বর ক্রমশ উষ্ণ হয়ে উঠছে: 'শুয়ে পড়বেন কি—সভাপতি বিনে মিটিং হয় কখনও?'

'বারান্দার উপর সেই শিবস্থাপনা করে চলে গেলেন। সভাপতির কী গতি হল, এতক্ষণের মধ্যে খোঁজ নিয়েছেন একবার?'

ছোকরা অধীরভাবে বলে, 'বললাম তো অন্যায় হয়েছে। এক কথা কতবার বলতে হবে? খাতিরযত্ন করে অতদূর থেকে নিয়ে এলাম, আপনি বলছেন শুয়ে পড়বেন। চার গাঁয়ের মানুষ জড়ো হয়েছে, তাদের সামনে চুন-কালি দেবেন আমাদের মুখে। বেশ, দেখুন না সেই চেষ্টা করে।'

মেজাজ বুঝে সুড়সুড় করে চললাম। দুটি ছেলে—ভলান্টিয়ার হবে তারা—স্যুটকেশ ও বেডিং ছোঁ মেরে তুলে চলল।

যায় কোথা ওরা?

তুলে পেড়ে রাখছে। ঘর খোলা গেল না, এইখানে ফাঁকায় শোবেন। ফুরফুরে হাওয়া। মিটিং হয়ে গেলে ওরাই এসে যত্ন করে বিছানা পেতে দিয়ে যাবে।

লুচির অর্ডার দিয়ে সেই ভদ্রলোক ইতিমধ্যে ফিরে এসেছেন। বললেন, 'ঠাণ্ডা লুচি কিন্তু চামড়ার মতন টেনে ছিঁড়তে হবে। তার চেয়ে খেয়েদেয়ে কায়েমি হয়ে মিটিং-এ বসুন গে।'

সেই লোভে নিমেষকাল বোধহয় থমকে দাঁড়িয়েছি। অমনি হুংকার উঠল: 'বাগড়া দেন

কী জন্যে? লুচি খেতে তো আসেননি, কী দরের মানুষ—লুচি কলকাতায় ঢের ঢের খেয়ে থাকেন। কী বলেন স্যার?'

ঘাড় নেড়ে তৎক্ষণাৎ সকাতরে সায় দিই।

'কত লোক, আসা করে এসেছে। নমো-নমো করে সেরে ওঁর মতলব মতন ফলারে এসে বসবেন, সেটা কিন্তু হবে না স্যার।'

চিঁ চিঁ করে বলি, 'তা কেন হবে?'

প্রীত হয়ে ছোকরা বলে, 'দেশের এই দুর্দশা—বক্তৃতা জ্বালাময়ী হয় যেন। দেখবেন কী হাততালি!'

আরও আছে। পরের দিন সকালবেলা। ওদের বলেছিলাম, 'যা হবার হল। পয়লা ট্রেন ধরিয়ে দিতে হবে কিন্তু।'

'আলবাৎ। তার আগেই ব্রেকফাস্ট। চায়ের দোকানটা বলতে গেলে আমাদেরই। তারা ব্যবস্থা করেছে। যত কিছু খুঁত ওই এক খাওয়াতে পুষিয়ে দেবে। দেখবেন কী পেল্লায় ব্যাপার।'

রোদ উঠে যায়, চোখ মুছতে মুছতে ভলান্টিয়ার একটি এল।

'চলুন। যা ধকলটা গেল, ঘুম ভাঙতে দেরি হয়েছে। ছুটে চলুন, স্টেশনে গাড়ি এসে পড়ল বোধহয়।'

আজকে উলটো। সে নিয়েছে স্যুটকেশ, আমি বিছানা। বিছানা মাথায় চাপিয়ে নিলাম। দেখুকগে লোকে, বয়ে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে কোনও রকমে কামরায় ওঠা গেল। গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে বলে, 'টিকিট করা হয়নি কিন্তু স্যার।'

'তবে?'

'ভয় কিসের? টিকিটবাবু টিকিট চাইলে হাতে একটা আধুলি গুঁজে বেরিয়ে যাবেন। এই তো রেওয়াজ। হরদম করছি আমরা।'

কিন্তু কাপুরুষ আমি, বহুপরীক্ষিত পন্থা নিতে সাহসে কুলায় না। পরের স্টেশনে গার্ডকে বলে ন্যায্য ভাড়া মিটিয়ে দিলুম। এতক্ষণে সোয়াস্তির নিশ্বাস পড়ে—এ যাত্রার ফাঁড়াটা বোধহয় কাটল।

এসব অনেক দিনের কথা। এ লাইনে নবীন আগন্তুক তখন। আবার ঝানু সভাপতিও আছেন—সামাল দিতে উদ্যোক্তারা নাকের জলে চোখের জলে হন। এক সভাপতির তুষ্টির জন্য টালিগঞ্জ থেকে দু-গাড়ি বাঁশ কিনে পাঠাতে হয়েছিল। সে গল্প, পারেন তো, কবিশেখর কালিদাস রায় মশায়ের কাছ শুনে নেবেন।

আর্দালি নেই

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'আপনি এখন কোথায়? আলিপুরে?' রাস্তায় চকিতে দেখা, চকিতে প্রশ্ন করল সুরঞ্জন।

নীলাম্বর হয়তো শুনতে পায়নি। চিনতেই পারেনি হয়তো।

সুরঞ্জন কাছে ঘেঁষে এল। মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কি, আলিপুরেই আছেন তো?'

'হ্যাঁ—', পাশ কাটিয়ে ভিড়ের মধ্যে সরে পড়ল নীলাম্বর।

এই যে, ভালো তো? এমনিধারা একটু হঠাৎ দেখায় পথিক প্রশ্ন। চাকুরের ক্ষেত্রে — কোথায় আছেন, কোন পোস্টে, অথবা কোন ডিপার্টমেন্টে? সেক্রেটারিয়েট হলে, রাইটার্সে, না, আত্মহত্যাটার?

সরে যেতেই নীলাম্বরের মনে হল, সুরঞ্জন না? এক সঙ্গে ছিলাম না যশোরে?

তবে ওর হাউ ডু ইউ ডু-র উত্তরে হাউ ডু ইউ ডু তো বলা হল না।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে সুরঞ্জনকে ধরল নীলাম্বর। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তো এখানেই? কোন ডিপার্টমেন্টে?'

'প্যাঙ্গস অফ চাইল্ড বার্থে।' হাসল সুরঞ্জন।

'তার মানে।'

'লেবারে।'

বলে যাচ্ছিল, কী মনে করে আবার ফিরল নীলাম্বর। সুরঞ্জনের হাত চেপে ধরল। বললে, 'আমাকে দেখে মনে হয় আমি এখনও আলিপুরে আছি?'

'যা, আপনিই তো বললেন—'

'হ্যাঁ, বললুম বই কী। বলতে ভাল লাগে। না বলতে পারলে নিঃস্ব নিঃস্ব মনে হয়। সেই যে হিটলার বলেছিল—'

' কী বলেছিল?'

'বলেছিল যদি মিলিটারি পোশাক পরা না থাকে উলঙ্গ দেখায়।'

'তার মানে, আপনি'— শোক অনুমান করলে যেমন হয়, সুরঞ্জনের চোখের দৃষ্টি ধূসর হয়ে গেল।

'হ্যাঁ ভাই, রিটায়ার করেছি।'

বেলুন ছিলাম, চুপসে গিয়েছি—এমনি শোনাল।

'আপনার দাদা কোথায়?' কী বলবে বুঝতে না পেরে মামুলি সাংসারিক প্রসঙ্গে প্রবেশ করল সুরঞ্জন।

'দাদা বর্ধমানে।'

'বর্ধমানে মানে?' চমকাল সুরঞ্জন।

'মানে তিনি এখনও সার্ভিসে।'

'সে কি? তিনি রিটায়ার করেননি এখনও?' চোখ কপালে তুলল সুরঞ্জন।

'না, তাঁর বয়স আমার চেয়ে কম।'

সুরঞ্জন হো-হো করে হেসে উঠল। হাসি থামিয়ে বলল, 'কী করে ম্যানেজ করল?'

'এপিঠ-ওপিঠ করে।'

'মানে কোর্টে এফিডেভিট করে?' আদালতি পরিভাষা, চট করে ধরে নিল সুরঞ্জন।

'তাছাড়া আর কি। মিথ্যে এফিডেভিট করেছে বলে যাঁরা ডিপোনেন্টকে জেলে পাঠান তাঁদেরই মধ্যে একজনের এ কীর্তি।'

ইন্টারভিউতে প্রার্থীকে যেমন দেখে তেমনি করে সুরঞ্জন সূক্ষ্মচোখে দেখতে লাগল নীলাম্বরকে। উৎসাহের সুরে বললে, 'আপনার তো সবই আছে দেখছি, কিছুই যায়নি।'

'সবই আছে মানে?' আহতের মতো রুখে উঠল নীলাম্বর।

'হ্যাঁ, দেখছি, চোখ ঠিক আছে, দাঁত ঠিক আছে, চুল, ওকে ঠিক পাক ধরা বলে না, আর' নীলাম্বরের ডানহাতের কবজিটা শক্ত করে ধরল, সুরঞ্জন। 'সুন্দর সুস্থ শরীর আছে এখনও। প্রশ্ন হচ্ছে, কী হয়ে নয়, কী নিয়ে কত নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারলেন চাকরি থেকে। ভালো স্বাস্থ্য যখন আছে, তখন আর কী চাই। আপনি তো রাজা।'

'আমি রাজা!' প্রায় মুখ ভেঙচে উঠল নীলাম্বর, 'আমার কিছুই যায়নি?'

'মানে ব্যাবুত্তেন্দ্রিয় হননি তো!'

'তাই বলতে চাও আমার কিছুই যায়নি?'

'আহা, মাইনে—সে তো যাবে, তার কথা কে ভাবছে? আউট হতে হবে এই নিয়মেই তো খেলা। প্রসব হবে না শুধু বাড়বে এ আইন প্রকৃতিতে নেই।'

'তুমি কী বুঝবে,' বুকভাঙা শ্বাস ছাড়ল নীলাম্বর, 'আমার আসল জিনিসই নেই।'

দাদার স্ত্রী মারা গিয়েছে নাকি? না কি কোনো উপযুক্ত পুত্র? মুখ নীরক্ত করল সুরঞ্জন। ঝাপসা গলায় অনুচ্চে বললে, 'কী নেই?'

দুটি ছোট্ট কথায় প্রচণ্ড হাহাকার করে উঠল নীলাম্বর, 'আর্দালি নেই।'

মুখ গম্ভীর করে সুরঞ্জন নিজের গালে হাত বুলুতে-বুলুতে বললে, 'তা বটে।'

'ভাবো কার্তিক আছে, ময়ূর নেই।'

'না, না, ময়ূর নয়, ষাঁড়। ভাবুন শিব আছে ষাঁড় নেই।' হেসে উঠল সুরঞ্জন। 'এ তো

ভালোই হয়েছে। ভাঁড় আনতে ষাঁড় পালিয়েছে।'

'তুমি বলো কী!' কাতরতার ছায়া আরও গভীরভাবে নীলাম্বরের মুখে পড়ল। বললে, 'আর্দালি ছাড়া বাঁচব কী করে! আর্দালি ছাড়া পেনসনি জীবনের মানে কী! আর্দালিই তো চিরকাল হাটে-মাঠে ঘাটে-বাটে বাজারে বন্দরে পথ দেখিয়েছে, চিনিয়েছে, ছোট-ছোট করে ভিড় সরিয়েছে, চিনিয়েছে কে আসছে পিছনে। সভায় গিয়েছি কেউ চেনে না, আর্দালিকে দিয়ে বুঝিয়েছি, আর সবাই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কেউ কেউ অতিভক্তিতে আর্দালিকেও সেলাম করেছে। বুঝেছে সর্বদেবমনস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি। শেষদিকে গাড়ি কিনলাম কেন? আমার নিজের জন্য নয়, আর্দালির জন্য।'

'আর্দালির জন্যে?' হাঁ করে রইল সুরঞ্জন।

'হ্যাঁ, ড্রাইভারের পাশে বসবে বলে। মানে, বসাব বলে। অমনি বসিয়ে বোঝাবো বলে, ভেতরে যাচ্ছেন কে আরোহী, কোন সে কৃষ্ণবিষ্ণু নইলে শঙ্খচক্র ছাড়া বোঝে কে ভি-আই-পি-কে? সেইবার যে বাড়িতে রবীন্দ্র জয়ন্তী করলাম, গেটে দু-দুটো উর্দিপরা আর্দালি রাখবার সাহসে। আর্দালি দেখে বুঝবে লোকের ভিতরে আছেন কে বিদগ্ধ। এমনি কনস্টেবল দাঁড় করাও লোকে চটবে, সাজাগোজা আর্দালি দাঁড় করাও গদগদ হবে। মঠে মন্দিরে যেতে হলেও আর্দালিকে নিয়ে গেছি। কত খাতির কত আসুন বসুন। এখনও যাই, আর্দালি নেই, তাই আর কেউ পোঁছে না, এ-কে, এল গেল কেউ বলে না ঘুণাক্ষরে। বুকের আস্ত একখানা হাড় চলে গেলেও বোধহয় সইত। আর্দালিই তো আমাদের সাইনবোর্ড, লেফাফার ঠিকানা, টিকির জবাফুল।

'ও জঞ্জাল গেছে, ভালোই হয়েছে। ঝাড়া হাত-পা হয়েছেন।' গুমোটের নয়, হালকা হাওয়ার গলায় বললে সুরঞ্জন, 'আর্দালি আর কী। আপনার কনস্ট্যান্ট ওয়াচার, আপনার বিরুদ্ধে বেনামি চিঠি, আপনার বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলায় উইটনেস নম্বর ওয়ান। ওই লাগানো-ভাঙানো বিভীষণের কবল থেকে ছাড়া পেয়েছেন বলে তো আয়ু বেড়ে গিয়েছে আপনার।'

'বেড়ে গিয়েছে! কী যে বলো!' যুক্তিতে এতটুকুও উদ্দীপ্ত হল না নীলাম্বর। ক্লান্ত ঘোলাটে মুখে বললে, 'লাইফ-ইনসিওরের পলিসি একটা ম্যাচিওর করেছে, কাগজপত্র পাঠাতে হবে রেজেস্ট্রি করে। প্যাক-ট্যাক করে সব ঠিক করলুম, কিন্তু হায়, পোস্ট করবে কে? ভুলে কলিং বেলের বদলে টেবলের উপর থাবা মারলুম। বাজল না, কেউ দাঁড়াল না এসে প্রত্যুত্তরে। সুরঞ্জন,' নীলাম্বর ঘন হয়ে প্রায় কানের কাছে মুখ আনল, 'কত ঘণ্টা তুমি শুনেছ, মন্দিরের ঘণ্টা, গির্জের ঘণ্টা, ছুটির ঘণ্টা, গোরুর গলায় ঘণ্টা, কোনও খেলা শুরু হবার আগেকার ঘণ্টা, নীলেমের ঘণ্টা—কিন্তু সত্যি করে বলো তো কলিংবেলের ঘণ্টার মতো ঘন্টা আছে?—যখন সে ঘণ্টার উত্তরে দাঁড়াবে এসে আর্দালি।'

'আজকাল আর অত দাঁড়ায় না।' বললে সুরঞ্জন। 'কলিংবেল টিপছেন তো টিপছেন, ঠুকছেন তো ঠুকছেন, ও প্রান্তে চাঞ্চল্য নেই। ঘণ্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠলেও নয়। টুলে কোথাও বা দিব্যি চেয়ারে বসে, বাবু ঘুমোচ্ছেন। আর যদি দুজন থাকে তো ঠেলাঠেলি করছেন পরস্পরে, তুই যা না তুই যা। শেষে মাঝে নিজেকে উঠতে হয় আর্দালি

ডাকতে, যেমন কখনও কখনও মামলায় ডাক হলে মক্কেলকে খুঁজে আনতে ছুটতে হয় উকিলকে।' গলা ছেড়ে হেসে উঠল সুরঞ্জন।

অত হাসিতেও নীলাম্বরের দুঃখের মেঘ উড়ে গেল না। বললে, 'চাকর তো সর্বক্ষণই বাজারে আর ছেলেরা পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে এসে এখন গ্রেস মার্কের জন্য ঘুরছে। তাই নিজেই গেলাম পোস্টাপিসে। চার-চারবার লাইন দিতে হল।'

'সে কি? চার-চারবার?'

'প্রথম লাইন কত স্ট্যাম্প লাগবে তার হিসেবের জন্যে। দ্বিতীয় লাইন টিকিট কেনবার জন্যে। টিকিট তো কিনলাম, এখন সে টিকিট লাগাই কী দিয়ে? হ্যাঁ, ওই দেখুন, জলের লাইন, জল লাগিয়ে টিকিট সাঁটার লাইন। তৃতীয় লাইন ছেড়ে আবার কাউন্টারে লাইন, সেই প্রথম লাইন, যেটা তখন চতুর্থ, চতুর্থ লাইন ধরলাম। সেই লাইন তখন মাইলখানেক লম্বা হয়েছে। সকালে দশটায় গিয়েছিলাম, বাড়ি ফিরলাম দেড়টায়। বিজ্ঞানের ফলে ওষুধে-ভিটামিনে যে আয়ু বেড়েছিল তার বেশি ক্ষয় হয়ে গেল এই লাইন দিয়ে দাঁড়ানোয়।'

'কিন্তু চাকরিতে থাকলে আপনি ভেবেছেন আপনার আর্দালি ওই চিঠি পোস্ট করত পোস্টাপিসে গিয়ে, লাইনে দাঁড়িয়ে?' গাছের তলা থেকে সুরঞ্জন নীলাম্বরকে ফাঁকায় টেনে আনল।

'করত না? কেন করত না?'

'বলত এ আপনার পার্সোন্যাল কাজ। এ আমার করার কথা নয়।'

'বা, আমি ইনটারপ্রিটেশান দিতাম। আমি সরকারি কর্মচারি বলেই আমার এই ইনসিওরেন্স, সরকারি কর্মচারী না হলে প্রিমিয়ম দিতুম কেমন করে? সুতরাং এই ইনসিওরেন্স-সংক্রান্ত কাজ নিশ্চিত সরকারি কাজ—' বাঁ হাতের চেটোতে ডান হাতে কিল মারল নীলাম্বর।

মৃদু-মৃদু হাসল সুরঞ্জন। বললে, 'ওদের ইনটারপ্রিটেশান আরও সূক্ষ্ম। বলত, আমরা যে অফিসের কর্মচারী এই টাকা সেই অফিসের বিষয় নয়, অতএব বেল মারবেন না, ডাকবেন না আমাদের। মশাই, অফিসে যাব আর্দালি ট্যাক্সি এনে দেবে, কিন্তু হাওড়া স্টেশনে যাব, আনবে না। বলবে এ আপনার পার্সোন্যাল ম্যাটার। সেদিন কী হল শুনুন। আর্দালিকে বললুম, এক পট চা এনে দেবে? বা, এনে দেব বই কী। আপনি অফিসার, আপনার চা আনব না? দিব্যি নিয়ে এল ট্রে সাজিয়ে। কাজ করছিলুম, বললুম, এক কাপ তৈরি করে দাও। বিশ্বাস করবেন? দিল না তৈরি করে। বললে, এ সরকারি নয়, এ আপনার পার্সোন্যাল। শিবের বাহন কি শুধু ষণ্ডমশাই? পাষণ্ড। আপনি গাছ দেখেছেন, তার ছায়া দেখেছেন। বৃক্ষশাখায় পক্ষী দেখেননি? যে পাখি বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ আপনাকে পথে বসিয়ে উড়ে পালায়! এ ভালোই হয়েছে, তাদের আনন্দ গিয়েছে। নইলে কোন কাজটা সরকারি কোন কাজটা ব্যক্তিগত প্রতিপদে এর চুলচেরা হিসেব করতে গিয়ে আরেক দুশ্চিন্তা, আরেক থ্রম্বসিস।'

'না, না, তা কেন, সবই কি ওই একই রকম?' নীলাম্বর হঠাৎ যেন অতীতে চলে যেতে চাইল, আর যে দিন যায় তাই সোনার দিন। বললে, 'প্রথম যখন সেই সার্কুলারটা এল, পাসে সিনেমা দেখতে পাবে না, মফস্বলে গিয়ে প্রেসিডেন্টের বাড়িতে উঠতে পাবে না, আর্দালিকে

লাগাতে পারবে না বাড়ির কাজে নিজের কাজে, তখন সটান গেলুম সাহেবের কাছে।'

'তখন কে সাহেব?'

'লালমুখো টমসন।'

'কী নিয়ে গেলেন?'

'মফস্বলে বা কে যায়, আর সিনেমা ওই সব অধম চিত্রই বা কে দেখে। গেলুম আর্দালির বিষয় নিয়ে। বললুম, সাহেব তুমি যদি এক টিন সিগারেট আনতে বল, আনবে, সেটা বাজার করা হবে না। কিন্তু আমি যদি বলি শালপাতায় করে ভিজে তামাক নিয়ে এস আমার গুড়গুড়ির জন্যে, আনবে না, বলবে, বাজার করা বারণ হয়েছে সার্কুলারে। আমার জন্যে কাটা মাছ কিনে আনাটা বাজার, তোমার জন্যে টিন্‌ড ফিস কিনে আনাটা বাজার নয়। সাহেব ভালো ছিল, হেসে উঠল, দিল খুলে। বললে, এক কাজ করো। বই বওয়াও।' কথাটা মনে হতে নীলাম্বরও হাসল।

'সে আবার কী?'

সাহেব বললে, 'উকিলদের বলো খুব করে নজির সাইট করতে। বি-এল-আর থেকে এ-আই-আর — যত রাজ্যের চর্বিতচর্বণ। উকিলদের আর তা বলতে হবে না, বললুম সাহেবকে, নজর আর নজির—এ দুই নিয়েই তো আছে উকিল। আর আইন? আইন গিয়েছে পাইন বনে, হাওয়া খেতে। সাহেব আরেক কিস্তি হাসল, বললে, সেই সব নজিরের পাহাড়, বইয়ের গিরি-গোবর্ধন, বওয়াও ওদেরকে দিয়ে। ওরা বুঝুক, কোন বাজার হালকা।'

'আমরা তো ওভারস্টে করি, ফাইল আপ টু ডেট করে রাখি।' চালাক-চালাক চোখ করে বললে সুরঞ্জন, 'সুপিরিয়র ভাবে কী এফিসিয়েন্ট, আর আমি জানি অন্তরের যন্ত্রণা। আদা জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে আর আর্দালি জব্দ "বসাইয়া রাখিলে।"

'আমি তখন চৌকিতে। আমার আর্দালি মহীমোহন আমার বাড়িতে রাঁধে, খায়, থাকে। আমি বললাম মহীমোহন, সার্কুলার এসেছে, তোমার আর আমার এখানে রান্না করা চলবে না, সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছ খাওয়া, থাকাও চলবে না।' নীলাম্বর অতীতের কথা বলতে গিয়ে একটু বুঝি বা আর্দ্র হল অলক্ষ্যে।

'কী বলল মহীমোহন?' সুরঞ্জন ধরিয়ে দিল।

'মাটিতে পড়ে আমার দু পা জড়িয়ে ধরল। বললে বাবু, আমি যদি এখন আলাদা ঘর ভাড়া করি, নিজের খাওয়া খরচ নিজে চালাতে যাই, সদরে, ইস্কুলে আমার ছেলেটা পড়ছে, সে আর মানুষ হবে না। আমার সমস্ত স্বপ্ন ধুলো হয়ে যাবে। সদরে-মফস্বলে দুটো সংসার চালাই আমার কি সেই মুরোদ আছে?'

'তারপর? আপনি সার্কুলার অমান্য করলেন?' প্রশ্নে একটু বুঝি বা বিদ্রূপ মেশাল সুরঞ্জন।

'আমি ধমকে উঠলাম। বললাম সরকারি হুকুম তামিল করতেই হবে আমাকে। আর আমার এখানে থাকা চলবে না তোমার। তুমি থাকো, আর কেউ বেনামিতে নালিশ করে দিক। তখন আমি কৈফিয়ত দিয়ে মরি। আমার প্রমোশন নিয়ে টানাটানি পড়ুক। হবে না—তুমি অন্যত্র আস্তানা নাও।'

'মহীমোহন তবুও পা ছাড়ে না—তাই না?' কথার সুর বুঝে আন্দাজে এগোল সুরঞ্জন।

'তার চেয়েও বেশি। ছেলের দোহাই দেয়। বলে, ছেলেটাকে মানুষ করব বড় করব। এই আমার একমাত্র সাধ বাবু—'

'তারপর কী করলেন?'

'বললুম, বেশ তুমি থাকো আমার বাড়ি, যেমন খাচ্ছিলে খাও দুবেলা, কিন্তু তুমি রাঁধতে পারবে না। তোমাকে দিয়ে বাড়িতে কাজ না করালেই তো হল। তোমাকে যদি আমি এমনি খেতে থাকতে দিই তা হলে তো সরকার আপত্তি করতে পারবে না। এমন তো কোনও সার্কুলার নেই যে খেতে-থাকতে দিলে কাজ—রান্না করিয়ে নিতে হবে। তবে আর ভয় কী কথা কী। তুমি থাকো, খাও, কিন্তু খবরদার, রান্না করতে পারবে না। রান্না কী, কুটো কেটে পারবে না দুখান করতে। বাবুর মতো থাকবে।'

'থাকল?'

'থাকল। কিন্তু তার সে যে কী যন্ত্রণা, তোমাকে কী বলব সুরঞ্জন। খাচ্ছে থাকছে অথচ তৃণ কাজ করতে পারছে না সার্কুলারের শাসনে— সে দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে লাগল। সন্দেহ হতে লাগল, খায় না বোধহয় পেট ভরে। বোধহয় পুরো রাত ঘুমোয় না। তারপর যখন বদলি হয়ে গেলাম, তখন—' থামল নীলাম্বর।

'তখন খুব কাঁদল?' হাসল সুরঞ্জন।

'শুধু ওইটুকু বললে কিছুই বলা হল না। মৃত্যু নয়, আঘাত নয়, বাড়ি-ঘর বা চাকরি চলে যাওয়া নয়, একটা জ্যান্ত মানুষের জন্যে আরেকটা জ্যান্ত মানুষ অনাত্মীয় মানুষ যে কাঁদতে পারে এ কখনও ভাবতে পারতুম না।'

'ও বুঝি আপনার জন্যে কাঁদছে? ও কাঁদছে ভাতের জন্যে।'

'ভাতের জন্যই তো কাঁদবে। ভাত তো অমনি আসে না, কোনও মানুষের হাত দিয়েই তো আসে।' নীলাম্বর সামলাল নিজেকে, 'কোন কথা থেকে কোন কথায় চলে এলাম। হাকিমের জন্য কে কাঁদে, আর্দালির জন্যেই হাকিমের কান্না। রাম যে হা-লক্ষ্মণ হা-লক্ষ্মণ করেছিল, তার মানে, কেঁদেছিল হা-আর্দালি হা আর্দালি বলে।'

'সরকারের উচিত রিটায়ার্ড অফিসারের সঙ্গে রিটায়ার্ড অর্ডালি ট্যাক করে দেওয়া।' হাসতে হাসতে বললে সুরঞ্জন। 'এটাই সার্ভিসের কন্ডিশন করে দেওয়া।'

কদিন পরে সকালবেলা ছোটছেলে উপরে এসে বললে নীলাম্বরকে, 'নীচে তোমাকে কে ডাকছে।'

'কে?'

'আর্দালি। আর্দালির মতো পোশাক।' কংসের কাছে কে শোনাল কৃষ্ণনাম। এ কী অকরুণ! তাড়াতাড়ি চটি উলটো-উলটি করে পরে ফের সামলে-শুধরে দ্রুত পায়ে নীচে নামল নীলাম্বর।

এই তো সেই দিব্যকান্তি রক্তবাস স্ফীতবদ্ধপরিকর মোহনমূর্তি। তাপতৃষাহর অমৃতের সরোবর। এই তো সেই প্রার্থিত-প্রতীক্ষিত।

এ কী, থলেতে করে কিছু শীতের তরকারি নিয়ে এসেছে—কপি বেগুন কড়াইশুঁটি টোম্যাটো। শীর্ণ হলেও কতগুলি কলা।

'মধ্যমগ্রামে একটু বাড়ি করেছি। সঙ্গে একটু তরকারির খেত। ছেলেটা মানুষ হয়েছে। কলেকটারিতে ঢুকেছে কেরানি হয়ে। শ্রীচরণে কিছু দিতে না পেরে শান্তি পাচ্ছিলাম না।' লোকটা নীলাম্বরের পায়ের কাছে নুয়ে পড়ল।

'এ কী, কে তুমি? এসব কেন দিচ্ছ?' আগুন দেখলে যেমন করে তেমন পিছু হটল নীলাম্বর।

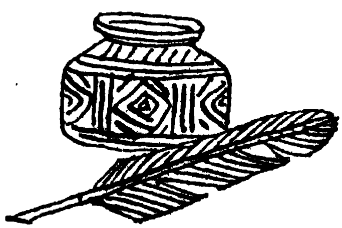
'আমাকে চিনতে পাচ্ছেন না? আমি মহীমোহন।'

'ও! মহীমোহন? তা-তুমি আছ এখন চাকরিতে? বা, বেশ, বয়সে ম্যানেজ করতে পেরেছ? কিন্তু আমার কাছে আর এসেছ কেন? আমি তো আর চাকরিতে নেই। আমি রিটায়ার করেছি।'

'তা জানি। জানি বলেই তো এসেছি, পেরেছি আসতে। নইলে চাকরিতে থাকলে এসব কি পারতুম দিতে? সাহস পেতুম? আমি আপনার সেই আর্দালি।' স্নিগ্ধ মুখে তাকাল মহীমোহন।

'কিন্তু জানো, আমার আর আর্দালি নেই।' নীলাম্বর বললে।

'না থাক। কিন্তু মানুষ তো আছে।'



গাঁজা

সৈয়দ মুজতবা আলি

কিংবা গুলও বলতে পারেন। সদাশয় ভারত সরকার যখন আমাকে কিছুতেই 'পদ্মশ্রী' 'পদ্মভূষণ' জাতীয় কোনও উপাধিই দিলেন না, শেষ পর্যন্ত শিশির ভাদুড়ী পেয়েও সেটি বেয়ারিং চিঠির মতো ফেরত দিলেন তখন হাজরা রোডের রক্‌ফেলাররা (অর্থাৎ যাঁরা রকে অন্তত এক লক্ষ গুল মেরে লক্ষপতি রক্‌ফেলার হয়েছেন) সাড়ম্বরে আমাকে 'গুলম্‌গীর' উপাধি দিলেন।

হালের কথা। বর্ষার হৃদ্মকেশ পরে শরৎ নেমেছেন কলকাতার শহরে। বাড়ির আঙিনায় হাঁটুজল রাস্তায় কোমর। সেই জল ভেঙে ভিজে জগঝম্প হয়ে তাবৎ 'ফেলাররাই' উপস্থিত, এসেই বসলেন টেলিফোনটি মাঝখানে রেখে। তারপর সবাই আপন আপন আপিস-আদালতকারখানা শুঁড়িখানাতে খবর পাঠালেন, 'কী ভয়ঙ্কর জল দাঁড়িয়েছে রাস্তায়! বাড়ি থেকে বেরনো সম্পূর্ণ অসম্ভব। নৌকো ভাড়ার চেষ্টা করছি। আপিসে আজ না আসতে পারলে কয়েকটা ভিজিটার ফিরে যাবে। সর্বনাশ হবে। কী করি বলুন তো?'

মশাদার এরকম সকরুণ সোনার গন্ধঢালা আপিস-প্রীতি এর পূর্বে আমি কখনও দেখিনি। রকে আসতে তাকে বুব ভেজাতে হয়েছে, এখন তার চোখ ভেজা অথচ তার বাড়ি থেকে যেদিকে আপিস সেদিকে যেতে হাঁটু পর্যন্ত ভেজাতে হয় না।

আমাদের রকটি সংমিশ্রিত; অর্থাৎ, দু-চারটি চিংড়ি সদস্যও আছেন। আবার ফণিকাকার বয়স ষাট পেরিয়েছে, গুড়গুড়ির বয়স পাঁচ পেরোয়নি। এর মাঝে-মধ্যে থাকলে আমাদের একটু সামলে-সুমলে কথা কইতে হয়।

মশাদার প্যাঁচটা দেখে টেটেন মারলে ডবল প্যাঁচ। অজন সেনকে বলল, 'অজনদা, আমার আপিসকে ঝপ্ করে একটা ফোন করে দিন তো, আমি আপিসে বেরিয়ে গিয়েছি, পৌঁছেছি কিনা!'

অঞ্জনদা আরও তৈরি মাল। নম্বর পেয়ে খবরটা দিয়ে কী একটা শুনে আঁতকে উঠে বলল, 'কী বললেন? পৌঁছয়নি? বলেন কি মশাই? বড় দুশ্চিন্তায় ফেললেন তো!'

নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

অজনদার নিজের কোনও ভাবনা নেই। তার আপিসে মাত্র একটি কল। সেটা সে প্রায়ই আপিস ছাড়ার পূর্বে বে-কল করে আসে।

এবারে আমরা শান্ত মনে সমাহিত চিত্তে কর্তব্য-কর্মে মন দিলাম।

অজন বুঝিয়ে বলে, 'আলম অর্থাৎ দুনিয়া জয় করে পেলেন বাদশা আওরঙ্গজেব ওই আলমগির নাম। সেই ওজনে আপনি গুলম্‌গির।'

আমি বললুম, 'হাসালি রে হাসালি! এ আর নতুন কী শোনালি? প্রথমে আমি পীরস্তানে ছিলুম গুল-ই-বকাওলি, তারপর লন্ডনে নেমে হলুম ডিউক অব গুলস্টার, তারপর ফ্রান্সে হলুম দ্য গুল, তারপর পাকিস্তানে হলুম গুল মহম্মদ, এখানে এসে হলুম গুলজারিলাল নন্দ। তা ভালো ভালো। গুলম্‌গির! বেশ বেশ।'

বড়দা উপর থেকে রকে নামেন ক্বচিৎ-কস্মিন। বললেন, 'ল্যাটে -ল্যাটে বুঝলেন।' বড়দার মুখ হামেহাল পানের পিকে ভর্তি। তারই মহামূল্যবান এক কোঁটা পাছে বরবাদ হয়, সেই ভয়ে তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলে স্বর্গের দিকে ঠোঁট দুটি সমান্তরাল করে সেই দুটিকে মুখের ভিতরের দিকে বেঁকিয়ে দিয়ে ত' 'দ' -কে 'ট', 'ড' , করে কথা বলেন, 'অল্পই।'

তাঁর এসব কল-কায়দা করা সত্ত্বেও আমরা তখন পাখা, খবরের কাগজ, হাতের কাছে যা পাই তাই দিয়ে মুখ ঢাকি। আমি স্বয়ং ছাতা ব্যবহার করি।

অজনদা বলল, 'এবারে আপনি আপনার উপাধি -প্রাপ্তির সম্মানার্থে একটি সরসে গুল ছাড়ুন তো, চাচা!'

মশা বলল, 'কিংবা গাঁজা।'

আমি বললুম, 'যদি ছাড়ি গাঁজার গুল?'

ঘেন্টু বলল, 'চাচাকে নিয়ে তোরা পারবি নে রে, ছেড়ে দে।' ঘেন্টুর পাড়াদত্ত নাম ঘেন্টু। আমি নাম দিয়েছি ঘেন্টু। যবে থেকে আমার চর্মরোগ হয়েছে। ঘেন্টু চর্মরোগের জাগ্রতা দেবী। বিশ্বেস না হলে চলন্তিকা খুলে দেখুন।

আমি বললুম, 'তবে শোন। কিন্তু তার পূর্বে টেটেনকে সাবধান করে দিচ্ছি , সে যেন আমার গাঁজার গুল নিয়ে কোনও সোসিয়া-পোলেটিকো-ইকনমিক-স্টাটিসটিক্‌স সঞ্চয় না করে। সে আজকাল ওই নিয়ে মেতেছে।'

টেটেন নানাবটি কেস পড়ছিল। বলল, 'আপনি কিসসুটি জানেন না, চাচা। আপনার জানা নেই, এ সংসারে মিথ্যাবাদী আছে এবং তার চেয়ে বড় মিথ্যাবাদীও আছে এবং সর্বশেষ স্টাটিস্‌টিশিয়ানদের কথা ভুলবেন না। ওদের মাল নিয়েই তো সরকার গুল মারে। নিত্যি নিত্যি কাগজে দেখতে পান না? আমি আপনার দোরে যাব কেন?'

'তবে শোন,' নিশ্চিন্ত হয়ে বলি।

'পার্টিশনের বছরখানেক পরের কথা। আমার মেজদা ওতর বাংলার কোথায় যেন কি একটা ডাঙর নোকরি করেন। তাঁর সঙ্গে দেখা। আমরা এখন দুই ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন দেশের অধিবাসী। কিন্তু আমাদের ভিতর কোনও ঝগড়া-কাজিয়া নেই। এই অ্যাদ্দিন বাদে নেহেরুজী

আর আইয়ুব খান সাহেব সেটা বুঝতে পেরে আমাদের শুভ বুদ্ধি এক্কেয়ার করেছেন। তা সে যাক গে।

হিন্দুস্থানের বিস্তর দরদ-ভরা তত্ত্বতাবাশ করে মেজদা শুধলে, 'তোদের দেশে গাঁজার কী পরিস্থিতি?'

আমি একগাল হেসে বললাম, 'স্বরাজ পেয়ে বাড়তির দিকে।'

মেজদা আশ্চর্য হয়ে শুধালে, 'সে কি রে! কোথায় পাচ্ছিস? আমি তো চালান দিতে পারছি নে!'

আমিও অবাক। শেষটায় বোঝা গেল, দাদা ছিলিম মেরে শিবনেত্র হওয়ার সত্যিকার গাঁজার কথা বলছে। আমি কী করে জানব? আমি পাষণ্ড বটি, —দাদা ধর্মভীরু, সদাচারী লোক।

বলল, 'শোন।'

পার্টিশনের ফলে মেলা অচিন্তিত প্রশ্ন নানা ঝামেলা মাথা চাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে উঠল এবং তারই সর্বপ্রধান হয়ে উঠে দাঁড়াল গঞ্জিকা সমস্যা।

গাঁজার এত গুণ আমি জানতুম না। শুনতে পেলুম স্বয়ং জাহাঙ্গির বাদশা নাকি গাঁজা খেয়ে উভয়ার্থে অচৈতন্য হয়েছিলেন। সেটা নাকি তুজক-ই-জাহাঙ্গিরিতে আছে। গাঁজা ছাড়েন শেষটায় তিনি মনের দুঃখে। এর দাম অতি সস্তা বলে সেটা পোষায় না রাজাবাদশাদের রাজসিক জাত্যভিমানে। সে কথা যাক।

আমার এলাকায় পৃথিবীর বৃহত্তম গাঁজার চাষ এবং গুদোম। ভারতে গাঁজার চাষ প্রায় নেই। আমি এসব তত্ত্ব জানতুম না— সমস্ত জীবন কাটিয়েছি আসামে, বরঞ্চ চায়ের খবর কিছুটা রাখি। এসব গুহ্য রহস্যের খবর দিয়ে গাঁজা ফার্মের ম্যানেজার আমাকে একদিন দুঃসংবাদ দিলে, সে বছরের গাঁজা গুদোমে পচে বরবাদ হব-হব করছে। ইণ্ডিয়াতে চালান দেবার উপায় নেই —অথচ সেখানেই তার প্রধান চাহিদা।'

আমি শুধলাম 'কেন ? তুমি নিজে খাও না বলে অন্য লোকেও খাবে না? এ তো বড় জুলুম।'

দাদা বলল, 'কী জ্বালা! আমি শ্রীঘরবাস পছন্দ করি নে; তাই বলে আমি জেল তুলে দিয়েছি নাকি? সাধে কি বলি তুই একটি চাইলড্ প্রডিজি — ওয়ান্ডার চাইল্ড — চল্লিশ বছরে তোর যা জ্ঞানগম্যি-হল, আল্লার কুদরতে পাঁচ বছর বয়েসেই সেটা তুই অর্জন করে নিয়েছিলি।'

আমি চটে গিয়ে বললুম, 'আর তুমি বিয়াল্লিশে।' দাদা আমার চেয়ে দু-বছরের বড়।

দাদা বলল, 'তোর রসবোধ নেই। ঠাণ্ডা হ।'

রক্‌ফেলাদের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'এসব মাইনর বর্ডার ইনসিডেন্ট আমাদের ভিতরে কালে-কস্মিনে হয়, কিন্তু মিটমাট হয়ে যায় 'আকাশবাণী', 'ঢক্ক-ডিংডমে' পৌঁছবার পূর্বেই।'

অজনদা শুধোলে, 'ঢক্কা-ডিংডমটা কী চাচা?'

'ডিংডম্ মানে জগঝম্প, বিরাট ঢাক, যার থেকে ইংরিজি 'টমটম', 'টম্টমিং' শব্দ

এসেছে। অর্থাৎ ঢাকার বেতার কেন্দ্র। তারপর শোন :

দাদা বলল, 'ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। ভারতের ষাট হাজার সন্ন্যাসী নাকি রাষ্ট্রপতির কাছে সই, হাতের টিপ দিয়ে আবেদন জানিয়েছেন, গাঁজার অভাবে তাঁদের নানাবিধ কষ্ট হচ্ছে, আত্মচিন্তার ব্যাঘাত হচ্ছে —'

আমি গোস্‌সা করে বললুম, 'দেখো দাদা, পিতা গত হওয়ার পর অগ্রজ পিতৃতুল্য। কিন্তু তুমি যদি আমাদের সন্ন্যাসীদের নিয়ে মশকরা করো—'

বাধা দিয়ে দাদা বেদনাতুর কণ্ঠে বলল, 'দেখ ভাই, তুই কখনও দেখছিস যে আমি কাউকে নিয়ে —'

এবারে আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'থাক থাক। তুমি বলো।' দাদার ওই গলাটা আমি বড়ই ডরাই। ওটা দাদা ব্যবহার করে পঞ্চাশ বছরে একবার। দাদার বয়স তখন বিয়াল্লিশ।

দাদা তো আমাকে মাফ করবার জন্য তৈরি। চশমার পরকলা দুটো পুঁছে নিয়ে বলল, 'পূর্বেই বলেছি, পার্টিশনের ফলে বিস্তর অভাবিতপূর্ব সমস্যা দেখা দিল —এটা তারই একটা। পার্টিশনের পূর্বে সান্তাহারের গাঁজা যেত হরিদ্বারে হৃষিকেশে, বাঙালের বিয়ার আসত ঢাকায় লাফিয়ে লাফিয়ে। এখন মধ্যিখানে এসে দাঁড়াল এক দুশমন। জিনিভাতে কবে কে আইন করেছিল বিশ্বজনের কল্যাণার্থে — কল্যাণ না কচু — তার সারমর্ম এই আপন দেশে তুমি সার্বভৌম রাজা, যা খুশি করতে পারো, যত খুশি ততো আফিং ফলিয়ে বিক্রি পার, গাঁজা চালাতে পার— কিন্তু ভুলো না, আপন দেশের চৌহদ্দির ভিতর। এক্সপোর্ট করতে গেলেই চিত্তির। তখন জিনিভার অনুমতি চাই। যেমন মনে কর, ফিনল্যাণ্ড জিনিভার মারফতে তোদের কাছে চাইলে দু-মণ আফিং —ওষুধ বানাবার জন্য। জিনিভা সন্দেহে গোয়েন্দা লাগাবে জানবার জন্য, সত্যি ওষুধ বানাবার জন্য ফিনল্যাণ্ডের অতখানি প্রয়োজন কি না, কিংবা ওরই খানিকটে আক্রা দরে বাজারে বিক্রি করে, দেশের লোককে আফিংখোর বানিয়ে দু-পয়সা কামিয়ে নিতে চায়। কারণ কোনও কোনও দেশ নাকি বিদেশের ওষুধ বানানোওয়ালাদের সঙ্গে ষড় করে ওষুধের অছিলায় বেশি বেশি হসিস, ককেইন রপ্তানি করে সে-সব দেশের বহু লোকের সর্বনাশ করেছে। আইনগুলো আমি পড়ে দেখি নি, তাই ঠিক ঠিক বলতে পারব না— নির্যাসটি জানিয়েছিল গাঁজা ফার্মের ম্যানেজার। এখন নাকি জিনিভার পারমিশন চাই, সেটা পেতে কতদিন লাগবে তার ঠিকঠিকানা নেই, কতখানি পাঠানো যাবে তার স্থিরতা নেই।

ইতিমধ্যে উপস্থিত হল আরেক সংকট।

গেল বছরের গাঁজাতে গুদোম ভর্তি। এদিকে হাল বছরের গাঁজা খেতে তৈরি। তুলে গুদামজাত করতে হবে। নতুন গুদোম এক ঝটকায় তৈরি করা যায় না —শেষটায় হয়তো জিনিভা কোনও পারমিটই দেবে না, কিংবা এত অল্প দেবে যে বেবাক ব্যবসাই গুটোতে হবে। নয়া গুদোমের কথাই ওঠে না।

তখন নানা চিন্তা, বহু ভাবনা, ততোধিক কর্তৃপক্ষকে আলোচনা করে স্থির করা হল, ' গেল বছরের গাঁজা পোড়াও—'

আড্ডার কেউই গঞ্জিকা-রসিক নয়। তবু সবাই — টেটেন ছাড়া — এক কণ্ঠে হায় হায় করে উঠল। খাই আর না-ই খাই, একটা ভাল মাল বরবাদ হতে দেখলে কার না দুঃখ হয়! রায়টের সময় পার্ক সার্কাসের মদের দোকানে বোতল ভাঙা হচ্ছে দেখে এক টেম্পারেন্স পাদ্রিকে পর্যন্ত আমি শোক করতে দেখেছি।

স্টাটিস্টিসিয়ান টেটেন বলল, 'আপনারা এতে এমন কি নতুন শোক পাচ্ছেন? মার্কিনরা যে দু-দিন অন্ত অন্তর অঢেল গম লিট্‌রিলি অ্যাণ্ড মেট্‌ফরিক্লি দরিয়ায় ভাসিয়ে দেয় সে বুঝি জানেন না?' টেটেনই আমাদের মধ্যে ইংরিজিতে এম.এ.। ওর উচ্চারণ আমাদের বুঝতে কষ্ট হয়।

সবাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলার পর আমি গল্পের খেই ধরে এবং সিগারেট ধরিয়ে বললুম, 'তারপর দাদা বলল, 'গুদোমেতে নতুন মাল পোরা হবে।' ম্যানেজারকে বলল, আমি অমুক দিনে যাব, সেদিন পুরনো মাল পোড়ানো হবে। কারণটা তাকে আমি আর বললাম না। সেই যে — তুই জানিস নাকি? বড়দা তোকে বলেছেন, তিনি যখন জাপানি বোমার সময় ট্রেজারি অফিসার ছিলেন তখন হুকুম এল জাপানি বোমা পড়লে, ব্যাপক বিপদের সম্ভবনা দেখা দিলে ট্রেজারির তাবৎ কারেন্সি নোট পুড়িয়ে ফেলবে! ভাইজাগা না কোথাকার এক সুবুদ্ধিমান একটি মাত্র বোমা পড়ামাত্রই সরকারকে খবর দিলে সে সব নোট পুড়িয়ে ফেলেছে। তারপর দু-বছর বাদে তাজ্জবকি বাত, বাজারে সেসব নোটের দর্শন পাওয়া যেতে লাগল। পোড়ায়নি। সরিয়ে ফেলেছিল। আমার তাই ভয়, গাঁজার বেলাও ওই যদি হয়।

আগেভাগে দিনক্ষণ দেখে, অর্থাৎ টুর প্রোগ্রাম যথা-যথাস্থানে পাঠিয়ে দিয়ে বেরলুম গাঁজা পোড়াতে।'

আমি আঁতকে উঠে বললুম, 'কী বললে?'

দাদা ঈষৎ চিন্তা করে বলল, 'হ্যাঁ তা তো বটেই। 'গাঁজা পোড়ানো' কথাটার অর্থ 'গাঁজা খাওয়াও হয়। তাই শুনেছি, ছোকরা নাতির হাতে সিগারেট দেখে যখন ঠাকুরদা গম্ভীর কণ্ঠে তাকে বলল, 'জানিস, সিগারেট মানুষের সব চেয়ে বড় শত্রু।' সে তখন শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল, 'তাই তো ওকে পোড়াতে যাচ্ছি।'

মোকামে পৌঁছে দেখি বিরাট ভিড়। বিশখানা গাঁয়ের বাছাই বাছাই লোক জমায়েত হয়েছেন সেখানে গাঁজা পোড়ানো দেখবেন বলে। আমি তো অবাক। বাঁশ-পাতা পোড়ানো আর গাঁজা-পাতা পোড়ানোতে এমন কি তফাৎ যে দুনিয়ার লোক হদ্দমুদ্দ হয়ে জমায়েত হবে? তা সে যাক্ গে।

হুদো হুদো গাঁজা ওজন করে হিসেব মিলিয়ে ডাঁই ডাঁই করে মাঠের মধ্যিখানে রাখা হল। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে ম্যানেজারই মুখাগ্নি করলে। সে-ই তার জনক— একে দিয়ে তার বহু পয়সা কামাবার কথা ছিল।

সেদিন বাতাসটা ছিল একটু এলেমেলো। গাঁজার ধুঁয়ো ক্ষণে এদিকে যায়, ক্ষণে ওদিকে যায়। আর তখন দেখি অবাক কাণ্ড! পাতা পোড়াবার সময় যে দিকে ধুয়ো যায় মানুষ সে দিক হতে সরে যায়। আজ দেখি উলটি বাত। জোয়ান-বুড়ো মেয়েমদ্দ — হ্যাঁ, কয়েকটি মেয়েছেলেও ছিল— ছোটে সেদিকে।

আর সে কী দম নেওয়ার বহর! সাঁই সাঁই শব্দ করে সবাই নাভিকুণ্ডলী পর্যন্ত ভরে নিচ্ছে সেই নন্দনকাননের পারিজাত-পাপড়ি পোড়ানোর খুশবাই — অন্তত তাদের কাছে তাই। আমার নাকে একবার একটুখানি ঢোকাতে আমি তো কেশে অস্থির। আর ওরা ফেলেছে কী পরিতৃপ্তির নিশ্বাস— 'আঃ, আঃ!' কেউ খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, কোমরে দুহাত রেখে, আকাশের দিকে জোড়া মুখ তুলে নাসারন্ধ্র স্ফীত করে নিচ্ছে এক একখানি দীর্ঘ দম, আর ছাড়ছে দীর্ঘতর 'আঃ-!' শব্দ। কেউ বা মাটিতে বসে ক্যাবলাকান্তের মতো মুখ হাঁ করে আস্য মার্গ দিয়ে যৌগিকধূম্র গ্রহণ প্রশস্ততর মনে করছে।

হঠাৎ হাওয়া ওলটাল। তখন পড়িমড়ি হয়ে সবাই ছুটল সেদিকে। আমি, ম্যানেজার, সেরেস্তাদের ততোধিক পড়িমড়ি হয়ে ছুটলুম অন্য দিকে। দু একটি চাপরাশি দেখি মনস্থির করতে পারছে না। তাদের আমি দোষ দিই নে।

ভেবে দেখ, পৃথিবীতে এ ঘটনা ইতিপূর্বে আর কখনও হয়েছে? গাঁজা তো আর কোথাও ফলানো হয় না। তারই মণ মণ পুড়িয়ে একচ্ছত্র গঞ্জিকাযজ্ঞ। চতুর্দিকে গরিব দুঃখী বিস্তর। এক ছিলিমের দম বাজারে কিনতে গেলে এদের দম বেরিয়ে যায়। আর এখানে লক্ষ লক্ষ তাওয়া পোড়ানো হচ্ছে আকাশ বাতাস টইটুম্বর করে। হয়তো ধরণীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই শেষ যজ্ঞ।

আমি তো সায়েন্সের ছাত্র ছিলুম। তোদের কোনও এক ঔপন্যাসিক নাকি সদর রাস্তায় মদের পিপে ফেটে যাওয়ার বর্ণনা দিয়েছে। আমি তার ট্রেলার বাইস্কোপে দেখেছি। কিছু না। ধুলোখেলা। সেখানে সবাই করেছে মালের জন্য হুটোপুটি একই দিকে। এখানে বিরাট জিরগা-জলসার জনসমাজ দিকনির্ণয় যন্ত্রের অষ্টকোণ চষে ফেলছে—ধুঁয়ো যখন যেদিকে যায় সেদিকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে উলটোদিকে ছুটছি আমরা কয়েকজন। রবীন্দ্রনাথ নাকি "জাগ্রত ভগবনাকে" ডেকেছিলেন তাঁকে "জনসমাজ মাঝে" ডেকে নেবার জন্যে। আমি পরিত্রাহী চিৎকার ছাড়ছি, অবশ্য মনে মনে—আল্লাতালা যেন এই আমামুন্নাস, এই 'জনসমাজ' থেকে আমাকে তফাৎ রাখেন।'

আমি ততক্ষণে হাসতে হাসতে প্রায় কেঁদে ফেলেছি। দাদা আমার গম্ভীর রাশভারী প্রকৃতির লোক, চোখ-মুখে কোনও রকম ভাব প্রকাশ করে না, অবশ্য দরদী লোক বলে মাঝে মাঝে ঠোঁটের কোণে মৃদু হাস্য দেখা যায়—যাই হোক, যা-ই থাক, আমার মতো ফাজিল-পঞ্চানন নয়। কোট পাতলুন তুর্কি টুপি পরা সেই লোক খনে এদিক-ওদিকে ধাওয়া করছে, টুপির ফুন্না বা ট্যাসেল চৈতন্যের মতো খাড়া হয়ে এদিক ওদিক কম্প্রমান — এ দৃশ্যের কল্পনামাত্রই বাস্তবের বাড়া।

দাদা বলল, 'তুই তো হাসছিস। আমার তখন যা অবস্থা। শেষটায় দেখি, মাথাটা তাজ্জিম তাজ্জিম করতে আরম্ভ করেছে। এত হুটোপুটি সত্ত্বেও ঘিলুতে খানিকটা ধুঁয়ো ঢুকে গিয়েছে নিশ্চয়ই। তারপর মনে হল বেশ কেমন যেন ফুর্তি ফুর্তি লাগছে, কী রকম যেন চিত্তাকাশে উড়ুক্কু উড়ুক্কু ভাব। তারপর দেখি, মানেজারটা আমার দিকে কী রকম বেয়াদবের মতো ফিক ফিক করে হাসছে। ওর তা হলে হয়েছে। কিংবা আমার। অথবা উভয়ের।

আর এস্থলে থাকা নয়।

টলটলায়মান, পড়পড়ায়মান হয়ে জিপে উঠলুম। সেও এক বিপদ। দেখি দুখানা জিপ। দুটোই ধুঁয়োটে কিন্তু হুবুহু একই রকম। কোনটায় উঠি? শেষটায় দেখি আমার পাশে আমারই মতো কে একজন দাঁড়িয়ে। হুবহু আমারই মতো, তার টুপির ফুন্নাটি পর্যন্ত। দুজনাতেই দুই জিপে উঠলুম।'

আমি বললুম, 'দুটো জিপ না কচু!'

দাদা বলল, 'বুঝেছি বুঝেছি, তোকে আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। শান্ত হয়ে শোন। তারপর গাড়ি যায় কখনও ডাইনে ঢাকা, আর কখনও বাঁয়ে মতিহারী। তবে কি ড্রাইভারটা? সে তো সর্বক্ষণ আমরাই পিছনে ছিল। তারপর দেখি সেই অন্য জিপটাও ঢাকা মতিহারী করছে একদম পাশে পাশে থেকে। ওমা! তারপর দেখি চারটে জিপ। সেও না হয় বুঝলাম। কিন্তু তারপর, মোশায়, সে কী কাণ্ড! চারখানাই উড়তে আরম্ভ করল।'

আমি শুধালাম, 'উড়তে!'

'হ্যাঁ, উড়তে। জিপটাই তো ছিল ঠায় দাঁড়িয়ে। ধুঁয়ো খেয়েছিল আমাদের চেয়েও বেশি।'

হাওয়ায় উড়তে উড়তে ঘুমিয়ে পড়লুম। এবং শেষ পর্যন্ত বাংলোয় পৌঁছলুম। ভাগ্যিস বেশি ধুঁয়ো মগজে যায়নি। আপন পায়েই ঘরে ঢুকলুম।

সামনেই দেখি তোর ভাবী। আমার দিকে একদৃষ্টে তাকালেন। বাপ্‌স্! তারপর অতি শান্ত কণ্ঠে — কিন্তু কী কাঠিন্য দার্ঢ্য সে কণ্ঠে — শুধালেন, 'আপনি কোথায় গিয়েছিলেন?'

'আমি কিছু বলি নি।' দাদা থামলেন।

আমি আড্ডাকে বললুম, 'আমার ভাবী সাহেবা অতিশয় পুণ্যশীলা রমণী, পাঁচ বেকৎ নামাজ পড়েন, রোজা রাখেন, তসবি টপকান। শমসুল্‌-উলমোর মেয়ে।'

রক শুধালে, 'ওটার মানে কী চাচা?'

আমি বললুম, 'পণ্ডিত-ভাস্কর। তোদের মহামহোপাধ্যায় অপজিট্ নাম্বার।'

রক শুধালে, 'তারপর?'

আমি বললুম, 'তদনন্তর কী হল জানি না! বউদি দাদার হাল থেকে কতখানি আমেজ করতে পেরেছিলেন তাও বলতে পারি নে, কারণ ঠিক সেই সময় ভাবী সায়েবা তাঁর স্পিশিলাটি চারপরতি পরোটা ও দেখতে বজ্রের মতো কঠোর খেতে কুসুমের মতো মোলায়েম শবডেগ নিয়ে ঢুকলেন। আমরা খেতে পেলুম বটে কিন্তু কাহিনিটি মারা গেল।

মশাদা বলল, 'বিলকুল গুল।'

আমি পরম পরিতৃপ্তি সহকারে বললুম, 'সাকুল্যে। তাই না বলেছিলুম, গাঁজার গুল। অর্থাৎ গুলের রাজা গুলম্‌গির। তোরা আমাকে আজ ওই টাইটিলটি দিলি না?'

সেজদিদিমার স্মৃতিপুরাণ

লীলা মজুমদার

বাড়ির সকলের মহা ভাবনা! এই নাকি প্রথম সেজদিদিমা আছাড় খেলেন! জন্মাবার পরেই বড় বড় করে চোখ তুলে চেয়ে চেয়ে নাকি আঁতুড়ঘরের কোথাও কোনও খুঁত আছে কিনা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলেন। দু-মাসে দিদিমার কোল থেকে নিজেই নেমে পড়ে খুব তাড়াতাড়ি হামা দিয়ে এক মস্ত আরশুলা ধরেই মুখে পুরে দিয়েছিলেন! সঙ্গে সঙ্গে ধর-ধর করে জনা পাঁচেক আধবুড়ি ওঁকে ধরে ফেলে মুখে আঙুল পুরে আরশুলার মরদেহের বাকি অংশগুলো বের করে দিয়েছিলেন। যেটুকু গিলে ফেলেছিলেন তারই ফলে নাকি তাঁর ওইরকম অসাধারণ বুদ্ধি আর অসহিষ্ণু স্বভাব হয়েছিল, এইরকম অনেকেরই ধারণা। অবশ্য ওই হট্টগোলে দেয়ালে খুব জোরে মাথা ঠুকে গিয়ে খুদে একটা আলু মতো হয়ে গিয়েছিল। তাতেও হতে পারে।

সেকালে এ বাড়িতে মেয়েদের বেশি লেখাপড়া শেখার রেওয়াজ ছিল না। তবে এখন লোকে যাই বলুক, স্কুলে না গেলেও এ বংশের সব মেয়েদের বাংলা লিখতে পড়তে অংক কষতে বাড়িতেই শেখানো হত। সেজদিদিমা এক কাটি বাড়া! মাস্টারমশাই যখন ভাইদের অ্যাট ক্যাট করে ইংরেজি শেখানো ধরলেন, মেনিবেড়াল কোলে নিয়ে দরজার চৌকাঠের ওপর বসে বসে সেজদিদিমা তাঁর মুখখানা দেখে দেখেই মুখে মুখে সব শিখে ফেললেন। তাই শুনে খুশি হয়ে মাস্টারমশাই তাঁকে ভাইদের সঙ্গে বসিয়ে যত্ন করে ইংরেজি ,অংক ইতিহাস, ভূগোল সব শিখিয়ে দিয়েছিলেন। প্রাইভেটে এনট্রান্স পাস করেছিলেন।

মাসটারমশাই নিজের ছেলের সঙ্গে এই সাধারণ মেয়ের বিয়ে দিয়ে, কালে কালে তাঁকে প্রাইভেটে ইতিহাসে এম.এ. পাশ করিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি হয়ে দাঁড়ালেন বাড়ির সব ছেলেমেয়েদের কট্টর প্রধানা শিক্ষিকা।

যা একবার চোখ দেখেন, বা কানে শোনেন তা জম্মে ভোলেন না। সে এক ভয়াবহ ব্যাপার। পড়াশুনোর ব্যাপারে কারও আপত্তির কারণ ছিল না, বরং সুবিধাই ছিল। মানচিত্র বা অভিধান খুলতে হত না। তিনিই মানচিত্র তিনিই অভিধান। মুশকিল হল সাংসারিক জীবনের। সামান্যতম ব্যাপারটুকু একবার চোখে দেখলে বা কানে শুনলেই হয়ে গেল। চিরকালের মতো রেকর্ড হয়ে থাকত। অপরাধীর পার পাবার জো ছিল না।

বিশ্বাস কর আর নাই কর, নেতাদের বড় বড় ব্যক্তিমে একটিবার শুনলেই হল। কমা, সেমিকোলন, ভুলভালসুদ্ধ চিরকালের মতো সেজদিদিমার স্মৃতিপটে গাঁথা হয়ে থাকত। এসব নিজেদের চোখে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। তবে ওঁদের ওই দত্তচৌধুরির বংশে

ঘটনাগুলোর প্রবাদবচনের মতো হয়ে আছে। তাঁর জ্বালায় আত্মীয়স্বজনদের গত পঞ্চাশ বছরের ভুলভালগুলো তাঁদের বংশধরদের অগোচর থাকত না। মাঝে মাঝে তাঁরা আপত্তি করতেন, বলতেন, 'আমরা নিজেদের বংশধরদের অবজ্ঞার পাত্র হই, এই কি তোমার ইচ্ছে?'

কাষ্ঠ হেসে সেজদিদিমা বলতেন, 'করবার সময় মনে ছিল না, সব কিছুর ফল ভোগ করতে হয়? ভুল বললে শুধরে দিস! মনে রাখিস ইংরাজিতে একটা প্রবচন আছে —দুটি জিনিস ফিরিয়ে আনা যায় না। ছোঁড়া তির আর বলা কথা।'

এইভাবে বছরের পর বছর ধরে, তিন পুরুষের সদস্যদের তিনি হাতের মুঠোর মধ্যে পুরে রেখেছিলেন। তাঁর কর্তাটি পর্যন্ত তাঁর কথায় উঠতেন বসতেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রাণের বন্ধুর কাছে মাঝে মাঝে আক্ষেপ করতেন। 'আমার দোর্দণ্ড প্রতাপে কলেজের প্রিন্সিপাল থেকে বেয়ারা পর্যন্ত ধরাধরি কম্পমান আর নিজের গিন্নির কথায় কিনা ওঠ-বোস করি। ছিঃ!'

বন্ধু বললেন, 'সব কথা কি আর ওঁর কানে যাওয়া সম্ভব — ওই দেখ কাণ্ড!'

ওই শেষের কথাটুকু বলার কারণ হল যে ওঁর পায়ের কাছে ওঁর পেয়ারের হলদে-কালো মেনি বিড়ালটা শুয়েছিল, সে হঠাৎ উঠে পড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সেজদাদু বললেন, 'ওই দেখ! নিশ্চয় এইসব কথা লাগাতে গেছে!'

বন্ধু বললেন, 'আমি বরং উঠি।'

সে যাই হোক। স্বীকার করতেই হবে সেজদিদিমণির অসাধারণ স্মৃতিশক্তির ও কর্তব্যনিষ্ঠার ফলে অবস্থার দিন দিন উন্নতি হতে থাকল এবং তিনি নিজেও ছদ্মনামে একটা বিখ্যাত দৈনিক কাগজের যুগ্ম-সম্পাদিকা হয়ে গত পঞ্চাশ বছরে ঘটা সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের ভিতরের কথা ছেপে দিতে লাগলেন। অবশ্য সব নাম পালটে। দেখতে দেখতে বাড়ির অবস্থা পালটে গেল। ছিল একটা সুখের গেরস্থ বাড়ি। এখন হয়ে উঠল একটা স্বচ্ছল সংসার। তবে সুখ তার মধ্যিখান থেকে কোন সুযোগে সুড়সুড় করে পলিয়ে গেল!

এতই নিঃশব্দে পালিয়েছিল যে গোড়ায় কেউ কিছু টের পায়নি। তারপর একেবারে স্তম্ভিত! এমন সর্বনাশ কেউ কল্পনাও করতে পারেনি! ব্যাপারটা খুলেই বলি। বিশ্বাস কর আর নাই কর, রাতে বাড়িতে কোনও অবিমৃষ্যকারিতায়-ভরা দুঃসাহসিক চোর এসেছিল। হয়ত বা বিদেশি কেউ, যার কাছে সেজদিদিমার খ্যাতি অজ্ঞাত ছিল।

সে যাই হল, হয়তো বাড়ির সবাইকে ধুলোপড়া করে দিয়ে, কিংবা কোনও নিদ্‌মন্তর পড়ে বা শিকড়টিকড় পুড়িয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে থাকবে। তারপর সেই সুযোগে সেজদিদিমার পুরনো কাগজপত্রের ক্যাশবাক্সটি সরিয়ে, অবিকল সেই রকম আরেকটি ক্যাশবাক্স রেখে, সট্‌কান দিয়েছিল। শেষরাতে ঘুম ভেঙে সেজদিদিমা তার পায়ের গোড়ালি আর দেয়ালে ছায়া ছাড়া কিছু দেখতে পাননি।

সেই যথেষ্ট! ভয়-ডর বলে তাঁর কিছু ছিল না। উনি যেসব বিষয় লিখতেন, তার কটি নোট-পত্র ছাড়া মূল্যবান কিছু ছিলও না ওই ক্যাশবাক্সে। তাঁর আসল দলিলের ভাণ্ডার তো তাঁর মস্তিষ্কে। ক্যাশবাক্স যে নেবে সে কাঁচকলা পাবে। কিন্তু তার আস্পার্ধা দেখে তাঁর সর্বাঙ্গ রি রি করে জ্বলে উঠল। তিনি দাদুর লাঠি গাছি তুলে রে-রে-রে করে তার পাছু নিলেন।

সামনের তিন ধাপ সিঁড়ির কথা মনেই ছিল না। ধপাস্ করে পড়লেন। মেঝেতে মাথা ঠুকে তিনদিন অজ্ঞান অচৈতন্য। চোর হাওয়া।

সেই তিনদিন সকলের উদ্‌বেগ আতঙ্কের শেষ ছিল না। তবু অনেক কাল বাদে বাড়িতে যে একরকম শান্তি বিরাজ করছিল, সেটাও মানতেই হবে। কিন্তু সে শান্তি বড় দুঃখের।

এক-দুই-তিন করে সাতদিন ওইভাবে কাটল। বাড়ি যেন বোবা। সেজদিদিমা একাই বাড়ি মাথায় করে রাখতেন, আর সকলে হয় চুপ করে থাকতেন, নয়তো ফিসফিস করে কথা বলতেন। হয়তো তার কারণ হল তার বেশি কিছু করবার সুযোগই পেতেন না। তাছাড়া তাঁর কোনও ব্যবস্থাপনায় আপত্তি করার কোনও সঙ্গত কারণ পাওয়া যেত না। প্রত্যেকটার ফল লাভজনক হত। সবাই তার যথেষ্ট ভাগ পেতেন। না চাইতেই পেতেন। কিছু বলার সাহস কারও হত না।

তবে একটা প্রাকৃতিক নিয়ম আছে যে আধারে যতখানি ধরে, তার বেশি ঠুসে দেবার চেষ্টা করলে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। তাই সেজদাদু তাঁর প্রাণের বন্ধু, পূর্বোক্ত বদ্যিনাথ সামন্তর বাড়ি রোজ বিকেলে একবার (স্বাস্থ্যের কারণে হাঁটতে যাবার অছিলায়) গিয়ে মনের কথা প্রাণের কথা উজাড় করে দিয়ে আসতেন। শুনে বদ্যিনাথ মহা রেগে যেতেন। বলতেন, 'তুমি কি একটা মুগুর ভাঁজা, সাঁতারকাটা পুরুষমানুষ নাকি একটি কিঞ্চিলিকা?'

শুনে আশ্চর্য হয়ে সেজদাদু বললেন, 'কিঞ্চিলিকা আবার কী? পরম পণ্ডিতের বিদ্যের দৌড় দেখে কাষ্ঠ হেসে বদ্যিনাথ সামন্ত বললেন, 'কিঞ্চিলিকা হল কেঁচো।'

খানিক ভেবে সেজদাদু বললেন, 'হ্যাঁ আমি কিঞ্চিলিকা। তা ছাড়া উপায় নেই।' রেগেমেগে সামন্ত বললেন, 'আছে উপায়। সেটাকেই অবলম্বন করতে হবে। অত কথা কারও মনে থাকতে পারে না, মানে সেটা ফিজিকেলি ইমপসিব্‌ল। কোথাও নিশ্চয় নোট করা থাকে। ওঁর ডাইরি নেই?'

'না তা নেই। তবে একটা মান্ধাতার আমলের ক্যাশবাক্স আছে। খোপ খোপ করা। খরচের রেজকি পয়সাকড়ি, রসিদ ইত্যাদি রাখেন। ওপরের ট্রেটা তুলে তলায় অবিশ্যি গোপন কাগজপত্র থাকতেও পারে। তবে আমায় গিন্নি এত কথা বলেন যে গোপন কিছু থাকা সম্ভব মনে হয় না।'

সামন্ত বললেন, 'ওই বাক্সটি হাতাতে হবে। তবেই ঠাকরুন পোষ মানবেন। খুব মূল্যবান বাক্স নাকি?'

'আরে না, না। তখন কি আর ম্যূলবান কিছু কিনবার সামর্থ্য ছিল আমাদের ? বিদ্যা নিয়েই ধুয়ে খেতাম। এখানকার সচ্ছলতার সবটুকুই আমার গিন্নির কৃতিত্ব!'

সামন্ত চটে গেলেন, 'ওই দুর্বলতাটাই তোমার কেঁচোমির কারণ। যে যাক্‌গে। তাহলে ও রকম আরেকটা ক্যাশবাক্স দুষ্প্রাপ্য নয়?' 'আরে না, না বড়জারের যে কোনও দোকানে পাওয়া যায়। সেকেন্ডহ্যান্ডের জলের দর। তাছাড়া আমাদেরই টং-এর গুদোমঘরে ওর জোড়াটা আছে চাবিসুদ্ধ।' ব্যাস্ আর বলতে হবে না। আমাকে কিছু জিজ্ঞাসাও কোরো না। তুমি যা। অমনি নিজেই গিন্নির কানে তুলে দেবে। আজ মতলবটা পাকাই, কাল কার্যে পরিণত করা যাবে। তুমি নাক গলিও না।'

এ বিষয়ে আর কিছু উচ্চবাচ্যও করেননি সেজদাদু। আর দুদিন পরেই তো ওই কাণ্ড। ভয়ে সেজদাদুর ঃ ত পা হিম! তার ওপর সামন্তর টিকির দেখা নেই! তাঁর বাড়িতে দুঃসংবাদটি দিতে গিয়ে বড় নাতি মনু ফিরে এল। তিনি নাকি নিখোঁজ। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। চারদিকে চররা তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে। সেজদাদু একেবারে ভেঙে পড়েছিলেন। গিন্নির ওই অবস্থা। বন্ধু নিখোঁজ। তাঁকে সাহায্য করতে গিয়েই বন্ধু কী সর্বনাশ হল কে জানে। ওই হট্টগোল শুনে সে রাতে ওই পলায়মান ছায়া ছোটদাদুও দেখেছিলেন আর সে যে কার ছায়া, সেটুকু বুঝতে তাঁর একদণ্ড দেরি হয়নি। সমস্ত সর্বনাশের জন্য তিনি নিজেকে ছাড়া কাউকে দায়ী করতে পারছিলেন না।

এদিকে সেজদিদিমা তেমনি কাঠ হয়ে পড়ে আছেন। পাশে অবিনাশ ডাক্তারবাবু আর বড়কাকি ওষুধ ব্র্যাণ্ডি ইত্যাদি নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত। আত্মীয়-বন্ধুদের সারাদিন আসা যাওয়া।

এরই মধ্যে সপ্তম দিনে হঠাৎ চোখ খুলে অপ্রসন্ন কণ্ঠে সেজদিদিমা বললেন, 'কোথাকার না কোথাকার কেনা কে মতলবি লোক রটাল বন্দুকের গুলিতে গোরু শুয়োরের চর্বি দেয়। দাঁত দিয়ে খোলস ছাড়াবার সময় হিন্দু-মুসলমান দুজনেরই জাত যায়! ব্যস্! আর বলা নেই কওয়া নেই অমনি সেপাইরা সব মার কাট্-কাট করে খেপে উঠল! শুরু হয়ে গেল সিপাহি বিদ্রোহ! কোয়ার্টারের জানলা দিয়ে তাই দেখে বেকুব বনে গেলাম।'

শ্রোতার সব নিশ্বাস বন্ধ করে বলল, 'তারপর? তারপর?'

সেজদিদিমা বললেন, 'তারপর আর কী? হিসেব রাখা কেরানিবাবুরা রাতারাতি সপরিবারে বারাকপুর থেকে সটাং কলকাতা! বলে বাঁচলে পরে অন্য কথা। সেই ইস্তক আমরা কলকাত্তাই বনে গেছি।' এই বলে ফিক করে হেসে সেজদিদিমা আবার চোখ বুজলেন। বাড়ির সকলে তাজ্জব বনে গেল।

সেই হল শুরু। একটু একটু করে সেজদিদিমার পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে আর তার হুবহু বর্ণনা দেন। সাল, তারিখ অকুস্থল সহ। মহারানি ভিক্টোরিয়ার প্রতি ভারি ভক্তি দেখা গেল। তিনিই তো সব ভাল ভাল আইনকানুন বেঁধে দিয়ে খুনেদের ছাড়া আর সবাইকে বেকসুর খালাস দিয়ে সব গোলমাল মিটিয়ে দিলেন। আজ পর্যন্ত তঁর ওই ভাষণের ভিত্তিতে আইনকানুন চলছে। তার ওপর সামন্যই রদবদল হয়েছে। স্বয়ং যুবরাজ ভারতে এলেন, দিল্লিতে দরবার হল। সে এক দেখবার জিনিস। চোখের সামনে ভাসে।' — এই বলেই আবার চোখ বন্ধ। -

ডাক্তার বললেন, 'কোনও চিন্তার কারণ নেই। শরীরে শক্তি ক্রমে ফিরে আসছে। এইরকম একটা বড় আঘাতের পর রুগিরা অনেক সময় কিছুদিন ভুল বকে। তারপর অবার প্রকৃতিস্থ হয়।'

আত্মীয়-বন্ধুরা শুনে ভারি বিরক্ত। ভুল বকা আবার কি? এ তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সেজদিদিমার পূর্বজন্মের কথাও এতদিনে মনে পড়ছে। তা পড়বে? কী প্রখর স্মৃতিশক্তি, সেটা ভুললে তো চলবে না।

এই আশ্চর্য ব্যাপার চারদিকে রটে যায়। চেনা-অচেনা লোক শুনতে আসে। বলাবাহুল্য ডাক্তারবাবু দরজায় খিল দিতে বলছেন। আরো বলেছেন, তেমন বুঝলে ডালকুত্তা এনে সদর

দরজায় বেঁধে রাখবেন।

বাড়ির ছেলেমেয়েদের কিন্তু একটা মস্ত উপকার হল উনবিংশ শতাব্দীর, শেষ অর্ধেকের ভারতের ইতিহাস একেবারে নখাগ্রে এসে গেল।

গিন্নির শারীরিক উন্নতি দেখে সেজদাদু যেমনি খুশি, তাঁর মানসিক বিভ্রান্তির কারণে তেমনি। হ্যাঁ, মানসিক বিভ্রান্তি ছাড়া আবার কী ?

এই সময় দৈবাৎ বিধাতার ইচ্ছায় সমস্ত বিপদ কেটে গেল। ততদিনে দুই সপ্তাহ কেটে গেছে। সেজদিদিমা বালিসে ঠেস দিয়ে উঠে বসেছেন। নার্সকে নিষ্কর্মা বলে ভাগিয়েছেন। ডাক্তারকে বড় বড় কথা বলার জন্য তাড়া দিয়েছেন। ডাক্তারের মা তাঁর সই বলে ডাক্তারও কিছু মনে করেননি, বরং তেড়ে তর্ক করেছেন।

হেনকাল রোগা ফ্যাকাশে বদ্যিনাথ সামন্ত সেজদিদিমার পেয়ারের পুতি বলাইকে ধরে এনে হাজির করলেন। বললেন, বলাই এবার সকলের সামনে বল কি নিয়ে তোরা এত আমোদ করছিলি।'

এই বলে অবিকল সেজদিদিমার বাক্সের মত একখানি ক্যাশ-বাক্স, সেজদাদুর হাতে দিয়ে, হন্ হন্ চলে গেলেন। সেজদাদু বাক্স খুলে দেখেন ওপরের ট্রেতে একটা সোনার মাদুলি আর তলার খোপে একটা পুরনো ডাইরি। তার উপরে সবুজ কালি দিয়ে কাঁচা হরফে এবং ভুল বানানে লেখা শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দাসীর দিনপঞ্জিকা ইতি। খাতাটা সত্যিই একটা ডাইরি বলে মনে হয়। সম্ভবত বহুকালে আগে সেজদিদিমা ঘর গুছোতে গিয়ে ওটিকে খুঁজে পান এবং মুগ্ধ হয়ে পড়েন। পরে পরিবারের মানুষ বাড়লে বাক্সটা যেমন ছিল সেই অবস্থাতেই টং-এ স্থান পেয়েছিল। এবং বাড়ির নাতি-পুতিরাও ওই টংটিতে নিরিবিলি আস্তানা পেয়ে, নিজেদের ঘাঁটি বানিয়েছিল। তারই সম্ভবত হাবিজাবির সঙ্গে ওই ক্যাশবাক্স ঘেঁটে পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করে পড়ে খুব আমোদ পেয়েছিল। তারপর সেজদিদিমার মুখেও গড়গড়িয়ে ওইসব কথা শুনে, বোধহয় হকচকিয়ে গিয়ে আর কিছু বলেনি।

সামন্তদাদু চুপিসাড়ে টং-এ উঠে ওই ক্যাশবাক্সের হদিশ পান। কিন্তু সরানো আর হয়ে ওঠেনি, স্বয়ং সেজদিদিমার বীরবিক্রমের কারণে। তাঁর পা মচকে, সর্বাঙ্গ ছড়ে গিয়ে, এক বন্ধুর বাড়িতে লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল। সেজদিদিমা আর তাঁর বংশধরেরা অন্য জাতের প্রাণী। ওরা সব পারে।

এর একটা ভাল ফল হল। সেজদিদিমার মাথার ঘোর কেটে গেল। তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন। পাণ্ডুলিপিটার কথা তিনি কখনও ভাবেননি। তখন বয়সও কম ছিল, অভিজ্ঞতাও ছিল না। এখন যেন হাতে চাঁদ পেলেন। লেখার হাত ক্রমে ক্লান্ত হয়ে আসছিল। এবার ধারাবাহিকভাবে, হুবহু যেমন আছে , প্রতি শনিবার তেমনি ছেপে দেবেন। শ্রোতারা লুফে নেবে।

আহ্লাদে গদগদ হয়ে ডেকে বললেন, ' কোথা গেলি বাবা বলাই, এই মাদুলিটা তোকে দিলাম। মায়ের কাছে রেখে দে।' আহা বংশধর বলে কথা। ডাক্তারকে বললেন, 'খেঁদুবাবা আজ বড় সুখের দিন। তুমি দুপুরে খেয়ে যাবে।'

ভাড়াটে বাড়ি

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

উপরে নীচে মোট বারোখানি ঘর কিন্তু তেরো ঘর ভাড়াটে থাকে বাড়িটিতে। বাড়ির ভিতর দিকে পশ্চিমের যে বারান্দা তাহারই একটা খাটাল চটের পর্দা দিয়া ঢাকিয়া শীতাতপ হইতে আড়াল করা হইয়াছে এবং সেই অতি সংকীর্ণ-পরিসর স্থানের মধ্যেই আরও সরু তক্তপোশ পাতিয়া কালীপদ নিজের বাসস্থান ঠিক করিয়া লইয়াছে; দক্ষিণ দিকে দেওয়ালে পেরেক, দড়ির সাহায্যে আলনা টাঙাইয়া তাহাতে সে রাখে কাপড়-জামা এবং তাহার বাকি 'এস্টেটপত্র' অর্থাৎ একটা ভাঙা তোরঙ্গ আর জোড়া দুই অতিশয় জীর্ণ জুতা, থাকে তক্তপোশের নীচেই।

এ বুদ্ধি নাকি কালীপদর নিজেরই, সে ঘর খুঁজিতে আসিলে বাড়িওয়ালা প্রতাপবাবু তাহাকে বলিয়াছিলেন, 'ঘর না তৈরি করলে আর দিতে পারব না, সব বোঝাই।'

সে জবাব দিয়াছিল, 'ঠিক এই রকমই খুঁজছি আমি। চলুন দেখি, আমি ঘর বার করতে পারি কি না—'

হতভম্ব প্রতাপবাবু প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'তার মানে?'

সে কহিয়াছিল. 'মানেতে দরকার কী, চলেই আসুন না!'

এবং তাঁহার হাত ধরিয়া প্রায় টানিতে টানিতে ভিতরে লইয়া গিয়া তাহার প্রস্তাবটা বুঝাইয়া দিয়ছিল। প্রতাপবাবু আরও বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন, 'কিন্তু এর প্রয়োজন কী? কলকাতাতে কি আর ঘর নেই?'

কালীপদ উত্তর করিয়াছিল, 'ঢের, অভাব কী? অভাব যেটা হচ্ছে সেটা আমার টাকার— একটা ঘর নিলে তো আর ছ-সাত টাকার কম পাব না, মেসে সিট নিলেও চার টাকা অন্তত দিতে হবে। অথচ আমার দুটি টাকার বেশি সঙ্গতি নেই। আপনারও ধরুন এটা স্রেফ উপরি তো? যা পেলেন তাই লাভ।'

বলা বাহুল্য আর একটু বিবেচনার পর প্রতাপবাবু রাজি হইয়াছিলেন। সেই হইতে কালীপদ তাহার এই অদ্বিতীয় ঘরকন্না পাতিয়া এইখানে আছে। তাহার এই আবিষ্কারের জন্য তাহার গর্বেরও সীমা ছিল না. প্রায়ই লোককে ডাকিয়া কাইত, 'বাবা, প্রতাপ দত্তের

চেয়েও আমার বিষয়বুদ্ধি! দিলুম ওর দুটো টাকা আয় বাড়িয়ে।'

কালীপদর বয়স বছর কুড়ি-বাইশ হইবে। কিন্তু এই বয়সে কেহ যে এমন অলস হইতে পারে, তা এ বাড়ির কাহারও জানা ছিল না। এ বিষয়ে সে ছিল অদ্বিতীয়; কী একটা ছাপাখানায় সে চৌদ্দো টাকা মাহিনায় চাকরি করিত, সকাল দশটা হইতে অপরাহ্ন ছয়টা পর্যন্ত সেখানে কাজ করিবার কথা। সে প্রত্যহ ঠিক সাড়ে নয়টা পর্যন্ত সকালে ঘুমাইত। বাকি সময়টার মধ্যে তাহাকে স্নান প্রভৃতি সারিয়া খুচরা দরের হোটেল হইতে ভাত খাইয়া দশটার মধ্যে হাজিরা দিতে হইত। তাড়াতাড়িতে কোনও দিনই ভাল করিয়া খাওয়া হইত না, তবু সে একটি দিনও সাড়ে নয়টার আগে শয্যাত্যাগ করিত না। কেহ অনুযোগ করিলে বলিত, 'উঠে কী করব? ভোর হতে না হতে কল পাইখানা নিয়ে যা কড়াকড়ি আর ঝগড়াঝাঁটি, তর চেয়ে সকলের সারা হলে নিই, এই আমার ভাল।'

কিন্তু সন্ধ্যাবেলাও অফিস হইতে বাহির হইয়া কোনওমতে একটা উড়ের দোকান হইতে দুই পয়সার রুটি কিনিয়া আহারটা সেইখানেই সারিয়া লইত, তাহার পর বাসায় ফিরিয়াই সটান শয্যাগ্রহণ। অর্থাৎ অফিসের আট ঘণ্টা আর এদিকে ওদিকে আরও ঘণ্টাখানেক, এই মোট ন-ঘণ্টা ছাড়া সে একটি মুহূর্তও বৃথা অপব্যয় করিত না; চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পনেরো ঘণ্টাই তাহার কাটিত বিছানায়। অন্য কোনও রকম বাড়তি আয়ের চেষ্টা তো করিতই না, প্রেসেই কোনও দিন 'ওভার টাইম' খাটিতে বলিলে সে সোজাসুজি অস্বীকার করিত। বলিত, 'দেখুন পয়সাটাই বড় কথা নয়, শরীরটার দিকেও দেখতে হবে তো? এই যা খাটুনি, কোন দিন পড়ব আর মরব।'

বাসার কেহ অনুযোগ করিলে বলিত, কী হবে আমার বেশি পয়সায়? চারটে টাকা গুদোম ভাড়া দিতে হয়, আর বাকি দশ টাকাতেই আমার বেশ চলে যায়। মায়ের পেটে দশ মাস ছিলুম, ওটার ভাড়া দেওয়া দরকার, বুঝলেন না ? আর কাউকে দেখবার আমার দরকার কী? দেশে যা আছে তার ওপর আর চারটে টাকা হলেই মায়ের বেশ চলে যাবে, চাই কি যদি একটু টেনে চালাতে পারি তো হাতে দু-পয়সা জমবেও—'

এমন কী উপরের মহিমবাবু তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহার ছেলেটিকে সামান্য অ-আ শিখাইতে, তাহার জন্য মাসিক এক টাকা হারে, পারিশ্রমিক দিতেও প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু কালীপদ তাহাতেও রাজি হয় নাই। মহিমবাবু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন. 'কিন্তু সন্ধেবেলা তো তুমি শুয়ে শুয়ে গল্প করো, ও যদি তোমার কাছে এসে পড়ে যায় তো তোমার ক্ষতি কী? অথচ একটা টাকা আয়ও তো বাড়ত।'

উচ্চাঙ্গের হাসি হাসিয়া কালীপদ জবাব দিয়াছিল, 'একটা টাকা আয় বাড়লে তো আমার দুঃখ ঘুচবে না মহিমবাবু। ওটা কিছু নয়— কিন্তু এই সারাদিনের হাড়াভাঙা খাটুনির পর, আবার এসে বকতে শুরু করলে কি আর শরীরে কিছু থাকবে মনে করেন? না, মহিমবাবু, ওটা মাপ করতে হল।'

অথচ এই একটি বিষয়ে আলস্য তাহার কোনওদিনই দেখা যায় নাই। বকিতে পারিত সে অসাধারণ; যতক্ষণ সে বাসায় থাকিত এবং জাগিয়া থাকিত, ততক্ষণ আর কাহারও শান্তি থাকিত না। অবিরাম গতিতে সে কাহারও না কাহারও সহিত বকিয়া চলিত। বক্তৃতার

বিষয়বস্তুরও কোনও দিন তাহার অভাব হইত না। সে-বাসায় কাহারও খবরের কাগজ লইবার বদ অভ্যাস ছিল না, সুতরাং কালীপদ যতটা সংবাদ প্রেসের অন্যান্য কর্মচারীদের নিকট হইতে সংগ্রহ করিত, তাহার সহিত চতুর্গুণ ভেজাল মিশাইয়া সে অম্লানবদনে ইহাদেব কাছে চালাইত। এ বিষয়ে তাহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও ছিল খুব বেশি, নমুনাস্বরূপ তেতলার বামুন পিসির কথাই ধরা যাক—

বামুন পিসি বিধবা মানুষ, বিধবা কন্যা লইয়া থাকেন, সামান্য কিছু টাকা তেজারতিতে খাটাইয়া তাঁহার দিন চলে; সহসা একদিন নিজের বিছানা হইতে চিৎকার করিয়া কালীপদ তাঁহাকে সংবাদ দিল, 'আর খবর শুনেছ মাসি, কোম্পানি কী নতুন আইন করেছে?'

বামুন পিসি প্রথমটায় অতটা গ্রাহ্য করেন নাই, একটু তাচ্ছিল্য সহকারেই প্রশ্ন করিলেন, 'কি রে কালীপদ?'

কালীপদ জবাব দিল, 'সোনার দাম হু হু করে বেড়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের বড় ক্ষতি হচ্ছিল বলে কোম্পানি আইন করে দিচ্ছে, সোনা আর কেউ পনেরো টাকা ভরির বেশি বেচতে পারবে না!'

বামুন পিসির মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল, তাঁহার মূলধন সুদ্ধ চলিয়া যায়; তিনি ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, 'ওমা সে কী সর্বনেশে কথা রে, আমি যে তা হলে দাঁড়িয়ে মারা যাব।'

কালীপদ সমবেদনা জানাইয়া কহিল, 'কিন্তু কী করা যায় মাসি, এধারে যে অনেক লোকের সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

নীচের ঘর তখন সুরেশবাবু অফিস হইতে আসিয়া কাপড় ছাড়িতেছিলেন, তিনি হাঁকিয়া কহিলেন, 'এ খবর কবেকার কাগজে দিয়েছে কালীপদ।'

কালীপদ জবাব দিল, 'কেন আজকের।'

সুরেশবাবু কহিলেন, 'কিন্তু আমি তো অফিসে আজকের কাগজ আদ্যোপান্ত পড়লুম, তাতে কই এ খবর পেলুম না।'

কালীপদ কহিল, 'কী কাগজ পড়ছেন আপনি?'

সুরেশবাবু কহিলেন, 'আমি দুখানা বাংলা কাগজ পড়েছি —'

কালীপদ অম্লানবদনে জবাব দিল, 'এসব খবর তো বাংলা কাগজে থাকে না, ইংরেজি সব কাগজেই বেরিয়েছে—'

সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়িটার হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। বামুন পিসি তো মড়াকান্না জুড়িয়া দিলেন। তিনি ভরি-করা কুড়ি পঁচিশ টাকা ধার দিয়াই বসিয়া আছেন, সুদসুদ্ধ আরও বাড়িয়াছে। অবশেষে সুরেশবাবু বাহিরে গিয়া চার পয়সা দিয়া একটা ইংরিজি কাগজ কিনিয়া আনিলেন এবং সকলে মিলিয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া সংবাদটা খুঁজিতে লাগিলেন।

তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও যখন এ খবর মিলিল না, তখন কালীপদ বেশ সহজ কণ্ঠেই কহিল, 'তাই তো। বাবু বললেন, কি না, আমি তো আর কাগজ পড়ি না , সময় কোথা বলুন। তাহলে বাবুই বোধ হয় ভুল শুনেছেন কিংবা ঠাট্টাই করেছেন।'

কিন্তু তবু তাহার পর তিন রাত্রি বামুন পিসির ভাল করিয়া ঘুম হইল না।

আর একদিন হয়তো মহিমবাবু সারাদিনের পর বিশ্রাম করিতে বসিয়াছেন, তাহাকে

ডাকিয়া কহিল, 'এবারে ভাইসরয় কাপের খবর জেনেছেন কিছু?'

মহিমবাবু রেস সম্বন্ধে দুর্বলতা সর্বজনবিদিত, তিনি ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিলেন, 'কী খবর ভাই কালীপদ?'

কালীপদ জবাব দিল, 'এবারে এত বেশি লোক ফাইনালিস্টের ওপর বাজি ধরেছে যে, ওরা ঠিক করেছে যে, এবার কিছুতেই ওকে জিততে দেওয়া হবে না—'

মহিমবাবুর মুখ শুকাইয়া গেল, তিনিও মনে মনে ওই ঘোড়াটা আঁচিয়া ছিলেন। তিনি রুদ্ধনিশ্বাসে প্রশ্ন করিলেন, 'তুমি কার কাছে এ খবর শুনলে?'

কালীপদ হাসিয়া কহিল, 'বিলক্ষণ! আমাদের ম্যানেজারবাবুর কাকার সহিস হল লাটসাহেবের রাঁধুনির আপনার মেসোমশাই! তার মুখ থেকেই বাবু শুনেছেন, আমি আবার বাবুর মুখে শুনলুম, নইলে আমি আর ওসব ঘোড়া-ফোড়ার খবর কোত্থেকে পাব বলুন?'

এ যুক্তি অকাট্য বলিয়াই মহিমবাবুর বোধ হইল। ফলে তাঁহার চোখের সামনে দিয়া তাঁহার অনেকগুলি টাকা ডুবাইয়া ওই ঘোড়াটাই ফার্স্ট হইল। তিনি ফিরিয়া আসিতে কালীপদ সংবাদ শুনিয়া কহিল, 'কী করবেন বলুন, ওরা তো তিন ভরি আফিং খাইয়েছিল শালা ঘোড়া যে আফিংসুদ্ধ হজম করবে তা কে জানে!'

এইভাবেই তাহার দিন চলে। কোনও দিন আসিয়া বলে, 'সেই যে হনুলুলুতে একটা ঘোড়ার পেটে তিনটে মানুষের ছানা হয়েছিল, তারই একটা আজ মরে গেল।'

কোনওদিন বা শুষ্কমুখে সংবাদ দেয়, দেরাদুন এক্সপ্রেস পড়ে যেতে সেদিন যা লোক মরেছিল, তার নাকি সব এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কাল নাকি একটা মড়া মাটি খুঁড়ে বার করেছে—এইসা ধাক্কার চোট যে, একেবারে মাটির পুঁতে গিয়েছিল!

ইদানীং তাহার কথা সবটা প্রায় বিশ্বাস করিত না। ভাল করিয়া সেদিকে কেহ কান দিত না। কিন্তু দৈবাৎ তাহার একটি ভাল শ্রোত্রী মিলিয়া গেল। মহিমবাবুর অফিস আলিপুরে উঠিয়া যাওয়ায় তিনি ওই অঞ্চলে বাসা দেখিয়া চলিয়া গেলেন, আর তাঁহারই ঘরে ভাড়া আসিলেন চন্দ্রনাথবাবু। ভদ্রলোক একটা মনোহারীর দোকানে কাজ করেন, টাকা ত্রিশেক মাহিনা, অথচ ছেলেপুলে সর্বসুদ্ধ সাত-আটটি হইবে। এই চন্দ্রনাথবাবুরই বড় মেয়ে টেঁপি বাড়ির মধ্যে কালীপদর সবচেয়ে বড় ভক্ত হইয়া উঠিল।

টেঁপির বয়স বছর চোদ্দ কিংবা পনেরো হইবে কিন্তু দেখিলে মনে হয় আরও ছোট, এমনই তাহার দৈহিক গঠন। শ্রীছাঁদ কোথাও কিছু নাই, বেঢপ চেহারা তাহার উপর বাপের নাই পয়সা, এমতাবস্থায় তাহাকে পার করা যে কী দুঃসাধ্য ব্যাপার— সেই কথাটা কল্পনা করিয়াই বোধকরি টেঁপির মায়ের মাথা খারাপ হইয়া যাইত। তিনি কন্যাকে দেখিলেই কারণে অকারণে তিরস্কার করিতেন। তাঁহারই বাক্যযন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য সে ফাঁক পাইলেই ছোট ভাইটাকে কোলে করিয়া কালীপদর বিছানার সামনে বারান্দায় আসিয়া বসিত এবং বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে কালীপদর মুখের দিকে চাহিয়া অখণ্ড মনোযোগের সহিত তাহার চমকপ্রদ সংবাদাদি শুনিত।

বলা বাহুল্য এমন শ্রোত্রী পাইয়া কালীপদর উদ্ভাবনী শক্তির দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল, তখন সংবাদ খোঁজ-খবর করিয়া সংগ্রহ করেও বেশি এবং ভেজাল চালায় তাহার আট

গুণ। ঝোঁকের মাথায় এমন কথাও বলিয়া বসে, 'উড়োজাহাজ হয়ে কী সুবিধেই হয়েছে বল দেখি টেঁপি, আমাদের রাজা রোজ কামস্কাটকায় মাছ ধরে বাড়ি ফেরবার পথে বসরা থেকে গোলাপ কিনে নিয়ে যায়। আগে কি আর এত সুখ চলত?'

টেঁপি সব কথাই নির্বিচারে বিশ্বাস করিত। এমন কী কোনওদিন কথা প্রসঙ্গে এইরূপ কোনও সংবাদ তাহার বাবার কাছে দিতে গেলে তিনি যখন উপহাস করিতেন তখন সে তাঁহাকেই মূর্খ ভাবিয়া মনে মনে দুঃখিত হইত। চন্দ্রনাথবাবু দোকান হইতে গোপান ছেলেমেয়েদের জন্য মধ্যে মধ্যে বিস্কুট লজেঞ্জুস প্রভৃতি লইয়া আসিতেন, টেঁপি আবার তাহারই মধ্যে হইতে দুই-একখানা কালীপদর জন্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়া হয়তো কহিত, 'বাবাটা কিছু খবর রাখে না, জান কালীদা, বোম্বেতে ভূমিকম্প হয়ে সেই যে সমুদ্দুরের মাছ ছিটকে লাটসাহেবের খাবার টেবিলে গিয়ে পড়েছিল — সেই কথাটা বলতে গেলুম বাবাকে, বাবা হেসে উড়িয়ে দিলে!'

কালীপদ অনুকম্পাভরে কহিত, 'খবরের কাগজ তো পড়তে পায় না বেচারা, খবর রাখবে কী করে বল?'

টেঁপি কহিত, 'বলি এরপর বিয়ে-থা করতে হবে না!, ঘর সংসার পাততে হবে না? এমনি করেই বুড়ো বয়স পর্যন্ত ভেসে ভেসে বেড়াবে?'

বিস্মিত হইয়া কালীপদ জবাব দিত, 'বিয়ে-থা? আমি বিয়ে করব?.... তুই কি খেপেছিস টেঁপি?'

টেঁপিও বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিত, 'সে কি, বিয়ে করবে না তো চলবে কী করে। অসুখ বিসুখ হলেই বা দেখবে কে, ভাত জলই বা দেবে কে? হোটেলে খেয়ে কদিন শরীর থাকবে? সংসারী হতে হবে না?'

কালীপদ হাতজোড় করিয়া বলিত, 'মাপ করো রাজা, আমার আর সংসার পেতে দরকার নেই। এই বেশ আছি!.... সে বড় ঝঞ্ঝাট!'

টেঁপি রাগ করিয়া চলিয়া যাইত।

কিন্তু সহসা একদিন দেখা গেল যে, কালীপদর এই অপরিসীম ঔদাসীন্য কিছু কমিয়েছে। টেঁপি নিজের ঘর হইতে ছুঁচ -সুতা লইয়া আসিয়া বারান্দার পা ছড়াইয়া বসিয়া কালীপদরই একটা ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিতেছিল, হঠাৎ মুখ তুলিয়া কহিল, 'আমার যে বিয়ে হচ্ছে কালীদা!'

কালীপদ সহসা যেন একটা ধাক্কা খাইল। চমকিয়া উঠিয়া প্রশ্ন করিল, 'সে কী? কার সঙ্গে? কবে?'

টেঁপি দাঁতে করিয়া সুতা ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কহিল, 'কবে এখনও কিছু ঠিক হয়নি।... ওই যে নীচে বাইরের ঘরে বুনো মোষের মতো দেখতে দুটো ভাই থাকে তাদেরই বড়টার সঙ্গে। ওর নাকি আমাকে বড় পছন্দ; মুখে আগুন!'

লোকটিকে কালীপদর মনে পড়িল। রাস্তার উপরের ঘর ভাড়া করিয়া দুটি ভাই থাকে, কোনও এক বড় দপ্তরিখানায় দুজনে কাজ করে, যেমন কালো, তেমনি মোটা, তেমনি

বেঁটে — দুটি ভাই-ই একরকম দেখতে।

কালীপদ যেন একটু অসহিষ্ণুভাবেই কহিল, কিন্তু তার যে প্রায় চল্লিশের ওপর বয়স হল।

টেঁপি গম্ভীরভাবে কহিল, 'তা কী করবে, বাবা পয়সা-কড়ি তো দিতে পারবে না, ওর চেয়ে ভাল পাত্তর কোথা পাবে? দয়া করে যে নিতে চাচ্ছে ওই ঢের!'

কালীপদ আরও খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, 'কিন্তু থাকে তো ওই একটা ঘরে, বিয়ে করবে কোথা?'

টেঁপি কহিল, 'সবাই কি আর তোমার মতো চিরকাল একরকম কাটায়, ওরা আলাদা বাসা নিচ্ছে। ওই ছুতোরপাড়ার গলিতে একটা মাটির বাড়ি ভাড়া করেছে, এই মাসেই উঠে যাবে।'

কালীপদ আর কথা কহিল না। ইহার দিন দুই পর সত্য সত্যই সেই দুটি ভাই অন্যত্র উঠিয়া গেল। কালীপদ নিঃশব্দে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু কী করিয়া যে কী করা যায় কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না। অবশেষে তিন-চারদিন পরে একটা মতলব তাহার মাথায় খেলিয়া গেল, সে মনিবের নিকট হইতে দুটি টাকা ধার করিয়া একটা লটারির টিকিট কিনিয়া ফেলিল।

টেঁপি সন্ধ্যার সময় হ্যারিকেন জ্বালিয়া তাহার বিছানার সামনে নখ কাটিতে বসিল, সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল, কালীপদ কেমন একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাহার দিকেই চাহিয়া আছে, সে একটু বিস্মিত হইয়া কহিল, 'এমন করে চেয়ে আছ যে?'

কালীপদ জবাব দিল, 'ভাবছি।'

তাহার গলাটা নামিয়া সহসা কহিল, 'টেঁপি আমি যদি তোকে বিয়ে করি?'

ফ্যাঁস করিয়া নরুনটা মাংসের মধ্যে বসিয়া গেল। জোর করিয়া কাটা স্থানটা চাপিয়া ধরিয়া বিবর্ণ মুখে টেঁপি কহিল, 'ও আবার কী ঠাট্টা?'

কালীপদ কহিল, 'ঠাট্টা নয় সত্যি। ভাবছি কদিন। ওই বুনো মোষটার সঙ্গে বিয়ে হলে বড় কষ্ট পাবি তুই—'

টেঁপি ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে কহিল, 'রাখবে কোথায় আমাকে বিয়ে করে? এইখানে?'

কালীপদ মাথা নাড়িয়ে বিজ্ঞভাবে বলিল, 'সে ব্যবস্থাও করেছি। আজ একটা লটারির টিকিট কিনেছি দুটাকা দিয়ে। দেখবি? ফার্স্ট না হয় নাই পেলুম, অন্য প্রাইজও তো আছে? তাহাতেই কলকাতায় একটা ছোটখাটো বাড়ি কিনে এমনি করে সব ভাড়াটে বসিয়ে দেব, বুঝলি না। দিব্যি বসে খেয়ে চলে যাবেখন।... ইস তোর পাটা অমন করে কেটে গেল কী করে রে? রক্তে ভেসে যাচ্ছে যে!'

ইহার পর সাত-আটটা দিন টেঁপির কোথা দিয়ে কাটিয়া গেল তাহা সে নিজেই বুঝিতে পারিল না। কালীপদ রোজ তাহাকে বক্তৃতা দিয়া বুঝাইয়া দেয় যে, লটারির টাকা তাহার না পাইবার কোনও কারণ নাই, টেঁপিও ক্রমে তাহা বিশ্বাস করিয়াছে।

কিন্তু আটদিনের দিন কালীপদ বাসায় ফিরিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া ছুটিয়া গিয়া দেখিল, তাহার সারা মুখে কে যেন কালি মাড়িয়া দিয়াছে। সে আর কোনও প্রশ্ন করিল না, শুধু বাঁশের রেলিংটা ধরিয়া বহুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর আস্তে আস্তে কহিল, 'এখনও পনেরো-কুড়ি দিন সময় আছে, একটা ভাল কাজ-টাজ খুঁজে দেখ না!'

শুষ্ক কণ্ঠে কালীপদ কহিল, 'কে আর আমাকে বেশি মাইনের কাজ দেবে? পনেরো না হয় আঠারো এই তো!'

টেঁপি জবাব দিল, 'বেশি টাকাতে দরকারই বা কী। এইতো আমার বাবা তেত্রিশ টাকা মাইনেতে সংসার চালাচ্ছে—'

সে আর দাঁড়াইল না। দ্রুতপদে চলিয়া গিয়া একেবারে বিছানায় শুইয়া পড়িল। মাকে কহিল, 'মাথা ধরেছে মা বড্ড, আজ আর আমি খাব না—'

এই প্রথম তাহার কালীপদর দক্ষতা সম্বন্ধে মনে সংশয় দেখা দিয়াছে এবং সে আঘাত বড় কঠিন।

কালীপদ ফিরিল নটার অনেক পরে। টেঁপি আসিয়া অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর যেন কতকটা অপরাধীর মতোই চলিয়া আসিল, যদিও তাহার অপরাধটা যে কোথায়, তাহা সে বুঝিতে পারিল না।

মা প্রশ্ন করিলেন, 'হ্যাঁরে আজকাল কালীপদকে যে বড় চুপচাপ দেখছি!'

টেঁপির মুখ অকারণ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে মাটির দিকে মুখ করিয়া কহিল, 'এইবার একটু কাজে কর্মে মন দিয়েছে, বোধ হয় সংসারী হবার ইচ্ছে।'

মা মুখে একটা শব্দ করিয়া কহিলেন, 'হ্যাঁ, ও হবে সংসারী, পোড়া কপাল! বিশ্বকুঁড়ে আর মুখসর্বস্ব! শেষ অবধি দেখিস ওকে ভিক্ষে করে খেতে হবে।'

টেঁপি একটু উষ্ণ কণ্ঠেই কহিল, 'মায়ের যেমন কথা, ভিক্ষে করবে কী দুঃখে ? কাজ করছে না ও? এই তো কাল ওভারটাইম খেটে এল—'

মা আর কথা কহিলেন না। কিন্তু টেঁপির তখন মস্তিষ্ক উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে; সে মনে মনে কল্পনা করিতে লাগিল কালীপদ সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত খটিতেছে অর্থের জন্য এবং হাঁ, এবং তাহাকে সুখে রাখিবার জন্য; টেঁপি তাহাদের ছোট্ট গৃহস্থালিতে তাহারই জন্য রাঁধিয়া বাড়িয়া বসিয়া আছে, কালীপদ অফিস হইতে ফিরিবার পথে কত কী কিনিয়া আনিয়াছে। টেঁপি অনুযোগে করিতেছে, কী দরকার এত খাটবার, এত বেশি টাকায় আমাদের কী হবে, এই তো দুটি প্রাণী আমরা, কুড়িটা টাকা মাসে হলেই হবে।

কিন্তু কালীপদ ঘাড় নাড়িয়া কহিতেছে, না না তুমি বোঝ না, তোমার সাধআহ্লাদ কিছুই মেটাতে পারছি না, কী আর-দিতে পারছি তোমায় বলো?.... তা ছাড়া আজই দুটি প্রাণী আছি, চিরকাল কি থাকবে— ছেলেপুলে হবে না! হাতে দু পয়সা হওয়া দরকার।

লজ্জায় রাঙা হইয়া টেঁপি হয়তো পাখাখানা ঠকাস করিয়া ফেলিয়া রাখিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে—

সহসা তাহার জাগ্রত স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল কালীপদর পায়ের শব্দে। সে সেদিনও কাহারও সহিত বাক্য না করিয়া একেবারে সটান নিজের শয্যায় গিয়া শুইয়া পড়িল। টেঁপি পাশের ঘরের ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল তখন মোটে আটটা; কী একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে তাহার বুকটা যেন টিপ করিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে কাছে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, এরই মধ্যে ওভারটাইম শেষ হয়ে গেল?'

কালীপদ দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া শুইয়াছিল, খানিকক্ষণ তেমনিই শুইয়া থাকিয়া বিরস কণ্ঠে জবাব দিল, 'ও আমি পারব না। বড্ড খাটনি, অত করে খাটলে মরে যাব-'

টেঁপি শক্ত করিয়া রেলিংটা চাপিয়া ধরিয়া যেন নিজেকে সামলাইয়া লইল। কী যেন বলিতেও গেল, কিন্তু ঠোঁট দুটিই থর-থর করিয়া কাঁপিল, কণ্ঠে ভেদিয়া কোনও শব্দ বাহির হইল না। মিনিটখানেক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া আবার নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল।

তাহার বাবা-মা তখন লণ্ঠনের কাছে উপুড় হইয়া পড়িয়া একছড়া সোনার হার আলোকে মেলিয়া ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, টেঁপিকে দেখিয়া মা মুখ তুলিয়া কহিলেন, 'জামাই গায়ে-হলুদ দেবে বলে এরই মধ্যে হার গড়িয়েছে। দেখ দেখি পছন্দ হয় কিনা, তোকে দেখাবার জন্যই পাঠিয়েছে।—আমার তো বাপু তো বেশ পছন্দ!'

টেঁপি যন্ত্রচালিতের মতো হারটা তুলিয়া লইয়া শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সেদিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর সেটা ধীরে ধীরে আবার মায়ের হাতেই ফিরাইয়া দিয়া কহিল, 'বেশ হয়েছে মা!'



পরাভব

আশাপূর্ণা দেবী

এত অপদস্থ হয়নি সুরজয়া। অথচ সমস্তটা নিঃশব্দে পরিপাক করতে হবে, কারণ এ-নাটকের নায়িকা তার নিজেরই মেয়ে। আবার এই নিয়ে মেয়েকে সকলের সামনে ভর্ৎসনা তিরস্কার করে আরও অপদস্থ হবার মতো খেলো বুদ্ধি সুরজয়ার নয়।

দারিদ্রের কুণ্ঠা চিরদিনই ছিল, কিন্তু সে একেবারে মনের মধ্যে। বাইরে সুরজয়ার আচারে আচরণে প্রকৃতিতে, এমন কি তার আকৃতিতেও এমন একটি গভীর মর্যাদাবোধ ছিল যে, তাকে সমীহ না করে উপায় ছিল না কারও। কাঠিন্যও নয়, গাম্ভীর্যও নয়, শুধু নিতান্ত সংজ্ঞতার একটা মজবুত বর্ম যেন আচ্ছাদিত করে রাখে সুরজয়াকে, সেই বর্মে ঠেক খেয়ে পিছলে পড়ে বিধাতার সমস্ত প্রতিকূলতা, মানুষের সমস্ত কৌতুক কৌতূহল।

ভাইরা বড়লোক বলে যে সুরজয়া ভাইদের বাড়ি আসা-যাওয়া করে না তা নয়, রোগে শোকে উৎসবে ব্যসনে সর্বদাই তার এ-বাড়িতে উপস্থিতি আছে। শুধু ছেলেমেয়ে দুটোকে আনতেই নাকি তার ব্যাজার লাগে। ওদের কথা তুললেই হেসে গা হালকা করে বলে, 'রক্ষে করো বাবা, দুদণ্ডের জন্যে ঘানিগাছ থেকে কেটে বেরিয়ে আসি, আবার সাধ করে গলার দড়িটা গলায় জড়িয়ে আসব?'

ভাজেরা অবশ্য আড়ালে মুচকি হেসে বলাবলি করে, 'আহা, আসল কথা কি আর বুঝি না? ঠাকুরজামাই কী হাল করেই ছেলেমেয়েদের রাখেন জানতে আর বাকি নেই আমাদের।' কিন্তু সে আড়ালেই, মুখোমুখি মুচকি হাসবার সাহস এর আগে কারও কোনওদিন হয়নি।

তাই আজ সেজ ভাজের ফাটা ডালিমের মতো টুকটুকে লাল গোলগাল, মুখের টোলখাওয়া টেপা-হাসির দিকে তাকিয়ে সুরজয়া যেন চোখের সামনে শুধু খানিকটা দাঁত-খিঁচানো অন্ধকার দেখতে পেল।

সেজ ভাজের পিছনে তার মেয়ে অলকা, তার মুখেও মার মতো হাসির ব্যঞ্জনা। সুরজয়ার সহসা একবার মনে হল, এতটুকু মেয়ে এমন কুৎসিত হাসি হাসতে শিখল কোথা থেকে?

কিন্তু অলকাই তো শুধুই হাসছিল না, হাসি-মুখে সে সজোরে জাপটে ধরে আটকে রেখেছিল সুরজয়ার মেয়ে মনোলীনাকে, যার ডাকনাম মনু। তেরো বছর বয়েস, ক্লাস নাইনের ছাত্রী, কিন্তু সমবয়সী মামাতো বোন অলকার কাছে সে হাতির কাছে মশা মাত্র। অলকা অবশ্য লেখাপড়ায় তেমন নয়, প্রত্যেক ক্লাসে দু-বছর করে বাস করে করে অনেক কষ্টে এবার ফাইভে উঠেছে। কাজেই মেদে মাংসে রঙে গড়নে এবং অলঙ্কারে অহঙ্কারে সব বিষয়ে সে মনুর চাইতে ভার-ভারিক্কি হলেও মনে মনে একটি জায়গায় পরাজিত ছিল। এবং

কোনও না কোনও সময়ে মনুকে অপদস্থ করবার বাসনা তার বোধ করি জন্মগত। তার মার ব্যাপারও প্রায় তাই। সুরজয়াকে একবার পেড়ে ফেলবার সাধ সেজ বউয়ের চিরকালের ।

সুরজয়া যে রঙে সেজ বউয়ের কাছে দাঁড়াতে না পারলেও শুধু মুখের কাট আর মোমবাতির মতো হাতের গড়নের সম্বলে তার চাইতে বেশি সুন্দর আখ্যা পায়, আর সেই মোমবাতির হাতে অন্য কোনও অলঙ্কার জোটে না বলেই শুধু প্লেন দুগাছা বালা পড়ে থাকে, এ-কথা সকলেরই জানা সত্ত্বেও সকলেরই যে মনে হয় এটা সুরজয়ার মার্জিত রুচির চিহ্ন— এসবই সেজ বউয়ের অসহ্য।

যাক, দীর্ঘ দিনের সাধ আজ মিটেছে। আজ সুরজয়াকে পেড়ে ফেলতে পেরেছে যেন সেজ বউ। কারণ বলেইছি, আজকের নাটকের নায়িকা সুরজয়ারই নিজের মেয়ে।

মামার বাড়িতে আসা। মনুদের ভাগ্যে দৈবাতের ঘটনা। আর কদাচ যদিও বা আসে দুই-এক ঘণ্টার জন্যে, দু-পাঁচ দিন থাকার সৌভাগ্য কখনও হয়নি। এবার হয়েছে। নিতান্ত অসুবিধেয় পড়েই হয়েছে।

সুরজয়ার স্বামী মৃন্ময়কে বিশেষ কী একটা কাজে মাসখানেকের জন্য বাইরে যেতে হয়েছে, আর লাগবি তো লাগ ঠিক এই সময়েই সুরজয়ার বড়দার মেয়ের বিয়ে লাগল। সোজাসুজি বিয়ে তো নয়, বিরাট কাণ্ডকারখানা । 'ঘটা' কাকে বলে দেখিয়ে দিতে চান বড়দা বড়বউদি। কাজেই সুরজয়ার অনুপস্থিতি অসম্ভব। আর, আরও অসম্ভব তেরো বছরের মেয়েটাকে একা বাড়িতে রেখে আসা।

এমনিতেই তো বড়দা অনেক অনুরোধ করেছিলেন সুরজয়াকে, মৃন্ময়ের অনুপস্থিতির কালটা যাতে সুরজয়া পিত্রালয়েই কাটায়। সুরজয়া হেসে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল সে-কথা, 'ও দাদা, আর বেশি লোভ দেখিয়ো না; আমার তো মনে হচ্ছে দিব্যি কিছুদিন গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বাপের বাড়ির আয়েস খেয়ে নিই; কিন্তু ছেলেমেয়ে দুটো কি আর তা হলে বয়ে যাবে না? বইখাতার নাম ভুলে থাকবে। তারপর ওদের পরীক্ষার সময় আমারই মৃত্যু। পরীক্ষা তো ওদের দিতে হবে না, দিতে হবে আমাকেই।'

ভাই নিবৃত্ত হয়েছিলেন।

কিন্তু ভাইঝির বিয়ের নেমন্তন্ন আটকাবে সুরজয়া কোন হাসির বর্মে?

ছেলেমেয়েদের কাছেও সুরজয়ার এমন একটা সহজাত সম্ভ্রমবোধ ছিল যে, মামার বাড়ি গিয়ে এই কোরো না, মামার বাড়ি গিয়ে তাই কোরো—স্পষ্ট ভাষায় তেমন কোনও নির্দেশ দিতে বেধেছে। তবু আশা করেছিল তার চিরদিনের শিক্ষা বিফল হবে না।

কিন্তু এ কী করে বসল সুরজয়ার মেয়ে! বড় হবার মোহে এত ছোট হয়ে গেল? চালই যদি ফলাতে গেলি তো এমন ভুল চাল কেন? আজন্মের শিক্ষায় সুরজয়ার চালটা আয়ত্ত করতে পারলি না নির্বোধ মেয়ে।

বিয়েতে চারিদিকে কুটুম্ব এসে জড়ো হয়েছে, সেজগিন্নির বাপের বাড়িও বাদ যায়নি। এসেছে অলকার মামাতো আর মাসতুতো বোনের ঝাঁক। আর নিজেদের দলের মধ্যে তাদের বহুবিধ শাড়ি-গহনার আলোচনার মাঝখানে যখন কে একজন নিতান্ত অমায়িক প্রশ্ন করেছে মনুকে — 'তোরা বিয়েবাড়িতে এ-রকম করে এসেছিস কেন রে? তোর মার গায়ে গয়না

নেই, বাজে বাজে সাদা শাড়ি, তোদের শুধু সাদা জামা কেন ভাই?' তখন নাকি দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে বলে বসেছে মনু, 'কী করব রে, বাবা যে ভুলে মার চাবিটা লখ্‌নৌ নিয়ে চলে গেছেন। আলমারিই খোলা গেল না।'

হলেই বা সরলা কিশোরীর দল, তবু চোখে চোখে ইশারা খেলে যায়, এবং অলকাই এগিয়ে এসে বলে—'ওমা, সত্যি? আলমারিতে তোর আরও ভাল জামা আছে?'

মনুর বোধ করি তখন মরিয়া অবস্থা তাই সে হঠাৎ বেপরোয়া গড়গড় করে বলে বলে যায়— 'থাকবে না কেন, পুজোর সময় জন্মদিনের সময় কত তো সুন্দর সুন্দর জামা হয়। লাল ভেলভেটের একটা স্কার্ট আছে আমার, জরির কাজ-করা সবুজ সার্টিনের ফ্রক একটা, তা ছাড়া নাইলনের জর্জেটের সিল্কের কতগুলো।'

হয়তো বা মিথ্যাভাষিণী মনুর কথা একেবারে মিথ্যেও নয়। হয়তো বা তার মনের আলমারির তাকে তাকে, থাকে থাকে সাজানো আছে সেই সব সার্টিন ভেলভেট জরি রেশম। কিন্তু পৃথিবীতে দয়া জিনিসটা বড় কম। তাই অলকা গায়ে হাত দিয়ে বলেছে— 'ওমা, তাই নাকি? তা কই ভাই, কক্ষনও পরে আসিস না কেন রে? তা হলে পিসিমারও আরও অনেক শাড়ি গয়না আছে।'

'আছেই তো'—কাণ্ডজ্ঞানশূন্য মনু বলে চলেছে, 'অনেক আছে। মা পরেন না।'

সেজগিন্নি এই কাহিনিটি বিবৃত করে গালে টোল খাইয়ে মুচকে হেসে বলেন, 'তা ভাই, অন্য সময় ফ্যাশান করে না পর না পর, বিয়েবাড়িতে গয়না গায়ে দিলে, কি একখানা দামি শাড়ি পরলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। আর মেয়েটাকেই বা কেন অত পোশাক-আশাক থাকতে এবেলা ওবেলা শুধু একটা করে আদ্দির ফ্রক পরিয়ে রেখেছ বিয়ে-বাড়িতে? আমাদের বাড়ির চাবির থোলোর তো গোনাগুনতি নেই, সব কটা নিয়ে চলো গাড়ি করে আমার সঙ্গে। একটা-না-একটা চাবি লাগবেই তোমার আলমারিতে। পাঁচজনের সামনে ভিখিরি হয়ে বেড়াবে বাছা? মরে যাই! না না, তুমি চলো ঠাকুরঝি, এই দেখ, এতগুলো চাবি থেকে আর হবে না?

গোটা দশ-বারো চাবির থলে আঁচলের কোণে গলিয়ে নিয়ে এসেছেন সেজবউ। আর অলকা প্রায় অর্ধমৃত মনুকে চেপে ধরে সোৎসাহে বলছে, 'চল্ না, আমিও তোর সঙ্গে যাব। গাড়ি বার করতে বলেছি।'

সমস্ত পরিস্থিতিটার ওপর একবার চোখ বুলায় সুরজয়া। দেখে ঘরের বাইরে একঝাঁক সকৌতুক কিশোরীর মুখ।

সেজবউদি যখন বলছিলেন, 'যাই ভাগ্যিস গল্পচ্ছলে বলল মেয়েটা! নইলে আমরা তো বলাবলি করছিলাম—ঠাকুরঝি অন্য সময় ফ্যাশন করে প্লেন ড্রেস করুক, বিয়ে-বাড়িতে এত ফ্যাশন করার কোনও মানে হয় না। কী জানি, কিছু নেই নাকি! না ভাই, আর দু কথা নয়, তুমি কষ্ট করে একবার চলো—নিয়ে আসবে গুছিয়ে গাছিয়ে।'—তখন যেন পায়ের তলার মাটি সরছিল না সুরজয়ার। নিরলম্ব একটা শূন্যে ভাসছিল সে।

ক্রমশ ধাতস্থ হল।

সাদা-হয়ে যাওয়া মুখে কোনও রকমে একটা ফিকে হাসি হেসে বলল সুরজয়া, 'তুমি

খ্যাপা না পাগল সেজবউদি? দুটো শাড়ি-জামার জন্যে চললাম আমি এখন, এই নিউ আলিপুর থেকে পাকপাড়ায়!'

সেজবউ বোধ হয় এ উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, বোধ করি ভেবেছিলেন এই সাদাটে মুখ থেকে অসংলগ্নভাবে গোঁজামিল দেওয়া দুটো কথা বেরোবে, হয়তো সুরজয়া বলবে, 'মনু ঠাট্টা করেছে। অথবা এই নির্জলা মিথ্যা কথা বলার অপরাধে মেয়েটাকে তীক্ষ্ম তিরস্কারে পাঁচজনের সামনে ধুলোর অধম করবে।'

'কিন্তু এ কী!'

এ যে আরও নির্জলা স্পষ্ট পরিষ্কার মিথ্যা!

এবার বরং বিরক্তিতে মুখ কুঁচকে যায় সেজবউয়ের। ঠোঁট উলটে বলেন, 'কী জানি ভাই, কী তোমাদের আলিস্যি! আমরা তো পাঁচজনের সামনে সৌষ্ঠব রাখতে এপাড়া ওপাড়া কেন, পৃথিবীর ওপার এপার দৌড়তে পারি।'

এতক্ষণে মুখের রং ফিরে এসেছে সুরজয়ার, স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, হাসির বর্মটা। তার সেই বর্মের ভিতর থেকে বলে, 'সে তো চিরকালই জানি সেজবউদি, তুমি যা পার, তার এক তিলও আমি পারি না।'

হঠাৎ এক ডজন চাবির থলে সুদ্ধ আঁচলটা ঝনাত্ করে পিঠে ফেলে সেজবউদি উঠে চলে গেলেন বিনাবাক্যে।

ঠিক বুঝতে পারলেন না অপদস্থ হল কে! বুঝতে যে পারলেন না সেটা নেহাত অপরের মনের চেহারা দেখতে পাওয়া যায় না বলেই।

কিন্তু নিজের মনের চেহারা তো দেখতে পাওয়া যায়! সেই মনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সুরজয়ার মনে হল মৃত্যুযন্ত্রণা কি এর চাইতেও কষ্টকর?

হয়তো মনুও কোনও অন্ধকার কোণে বসে এই একই কথা ভাবছিল। আর প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছিল, কখন উদ্যত বজ্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাকে।

কিন্তু না, সে ভয় নেই মনুর।

তাকে ডেকে তিরস্কার করতে পারবে না সুরজয়া। তিরস্কার করবার সাহস তার আর নেই। কিশোরী কন্যার আড়ষ্ট বিদীর্ণ ছাইরঙা মুখের রেখায় রেখায় সুরজয়া তার নিজের মনের চেহারাটাই দেখতে পেয়েছে।

সুকুমার নিরস্ত্র মন মনুর, পৃথিবীর যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ এর আগে কখনও দেখেনি, হঠাৎ দেখতে পেয়ে দিশেহারা হয়ে হাতের কাছে যা হাতিয়ার কুড়িয়ে পেয়েছে, তাই নিয়ে সশস্ত্র হতে চেষ্টা করেছে। ওকে তিরস্কার করবে সুরজয়া কোন্ মুখে?

বোধ করি এই প্রথম মনে হল সুরজয়ার, দারিদ্র্য শুধু লজ্জারই নয়, দুঃখেরই নয়, ভয়ঙ্কর একটা অপরাধও। সে-অপরাধ জগতের কারও কাছে নয়, অপরাধ আপন সন্তানের কাছে। সেই অপরাধের অপরাধে পথভ্রান্ত সন্তানকে শাসন করবার অধিকার হারাতে হয়। এখানে বুদ্ধির জোরে পার পাওয়া যায় না। আজ শুধু সংসারের কাছে অপদস্থ হয়নি সুরজয়া, অপদস্থ হয়েছে নিজেরও কাছে।

রিতা

সুবোধ ঘোষ

জল নেবার জন্য রিতা ছোট পাহাড়ি নদীটার বালির ওপর এসে দাঁড়াল।

মাঝ নদীতে বালির ওপর দিয়ে সরু একটা জলস্রোত, ঘড়া ডোবে না। অনেকক্ষণ হাত দিয়ে খুঁড়ে খুঁড়ে একটা গর্ত করল রিতা। তারপর সেখানে ঘড়া ডুবিয়ে দিয়ে নিজে একটু দূরে নীচের স্রোতের ধারে বসে হাত পা ধুয়ে নিল। মুখটা ভাল করে মেজে নিয়ে আঁচল দিয়ে মুছে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল, দূর মহুয়ার ভিড় অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। একফালি চাঁদ উঠেছে মাথার ওপর। ভর সন্ধ্যা ঘনিয়ে উঠেছে।

.কলসিটা কাঁখে তুলতে আর ইচ্ছে করল না। কানাটায় হাত দিয়ে হেঁচড়ে কিছু দূর নিয়ে গিয়ে একটা কালো পাথরের চটানে এসে দাঁড়াল। আজ তার আর কিছু ভাল লাগছে না।

অনেকদিন থেকেই তার ভাল লাগছিল না। সাঁওতাল চাষার মেয়ে রীতা। পাহাড়ের ঢালুতে ছোট একটা ডিহি। এ ডিহিতে যে সাঁওতালদের বসতি তারা তাদের জংলিপনা হারিয়েছে অনেকদিন। কিন্তু চাষ-আবাদেও হাত পাকেনি। আইন-কানুনকে ভয় খায় বেশি। জংলিদের মতো বেপরোয়া মহুয়ার মদ চোলাই করতে পারে না। ট্যাক্স দেয় বেশি, কাপড়-চোপড়ের প্রয়োজন বেড়েছে, অথচ আয় নেই! বারো মাসে একটা ফসল তাদের খিধে মেটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

তাই মাঝে মাঝে কুলি রিক্রুটারের ক্যাম্প বসে। টাণ্ডেলার ডিহি বস্তি ঘুরে ঘুরে জোয়ান খাটিয়ে লোক জোগাড় করে আনে। কিছু আগাম পায়, খাকি কোট আর পাগড়ি পায় বিনা পয়সায়। তিন বছরের কন্ট্রাক্টে ফিজি দ্বীপে চালান হয়।

রিতা শুধু শুনেছে তার বিয়ে হয়েছে। চাষি সাঁওতালেরা প্রায় হিন্দু হয়ে গেছে। অল্প বয়সেই ছেলেমেয়ের বিয়ে দেয়। লগন মাঝির মেয়ে রিতার বিয়ে হয় মাত্র সাত বছর বয়সে।

তারপর থেকেই রিতা আজ দশ বছর ধরে শুনে আসছে মুনার কথা। বিয়ের কয়েক মাস পরে সেও তিন বছরের কন্ট্রাক্টে ফিজি চলে গেছে। রিতার শ্বশুরবাড়ির ভিটের ওপর

এখন একটা ধুতুরার জঙ্গল। সে বাপ-মায়ের কাছেই থেকেছে আর বড় হয়েছে। দিনের পর দিন শুনে আসছে, —মুনা এবার ঘরে ফিরবে। চিঠি এসেছে।

সত্যিই মুনার চিঠি আসে। সে খুব ভাল আছে। কাজের অনেক উন্নতি হয়েছে, পয়সা জমেছে কিছু। সে লেখাপড়াও কিছু কিছু নাকি শিখেছে। সাহেবরা তাকে ভালবাসে। সাহেবরা কত বকশিশ দেয়, দামি দামি পোশাক বাঁশি টুপি....

চিঠিতে প্রবাসী পতির এইসব কুশল সংবাদ দিনের পর দিন শুনে আসছে রিতা। লগন মাঝি সমস্ত ডিহি ঘুরে সগর্বে এইসব বার্তা আরও বেশি করে রটিয়ে বেড়ায়। রিতার সৌভাগ্যের কথা সকলে আলোচনা করে।

কৌতূহলের পালা শেষ হয়ে গেছে অনেকদিন । ওসব সংবাদে রিতার আর মন ভরে না। এতদিনে তার আসা উচিত ছিল।

পাথরের চটানে দাঁড়িয়ে রিতার মনে এই চিন্তাই মন্থর কুয়াশার মতো ভর করেছিল। আর কতদিন এইভাবে, এই মনে মনে দেখবার একটানা অভিনয় চলবে?

রিতা আবার চলতে শুরু করল। উঁচু নিচু মেঠো জমি পার হয়ে ডিহির কাছাকাছি পৌঁছেছে। কাঠগোলাপের বনে হালকা ঝড়ের দোলা লেগেছে। কাকের ঝাঁক কলরব করে দেওদারের মাথায় এসে আড্ডা নিচ্ছে। রিতা রাগ করে একটা হোঁচট খেল।

আর একটু দূর এগোতেই দেখা গেল, পথের মাঝে দাঁড়িয়ে নুটু। একথা রিতার জানাই ছিল। শুধু আজ নয়—আজ তিন বছর ধরে নুটু তার পেছনে ঘুর ঘুর করছে। নুটু বাঁশি বাজিয়ে রিতার নামে গান গায়। উত্তরে রিতা ওকে গালাগালি দেয়। নটু খরগোস শিকার করে এনে লগন মাঝির বাড়িতে দিয়ে যায়। ঘরসুদ্ধ লোক মাংস খায়, রিতা ছোঁয় না। নুটু যতবার ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে, রিতা তাকে বিমুখ করেছে।

নুটুর উপদ্রবে রিতার রাগ পড়ত গিয়ে ফিজি প্রবাসী মুনার ওপর। নুটুর এই দুঃসাহস কী করে সম্ভব হয়? হয় ও জানে মুনা আর আসবে না, নয় মনে করে রিতা বুঝি মুনাকে ভালবাসে না।

মুনাকে ভালবাসে রিতা। কিন্তু মুনাকে তার প্রথম যৌবনের চোখে সে আজও দেখতে পায়নি। মুনা তার কাছে কল্পনা মাত্র। কিন্তু সে কল্পনার মধ্যে রামধনুর মতো কত না বিচিত্র মোহ মিশিয়ে আছে। সমস্ত ডিহি যার নামে স্তুতিমধুর, সেই মুনা তার স্বামী। মুনা জোয়ান মরদ, মুনা রোজগাব করে, পয়সা জমিয়েছে। যখন দেশে ফিরবে মুনা, সমস্ত ডিহির দাম যেন বেড়ে যাবে। ভাগ্যিস অনেকদিন আগেই তার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, নইলে ঝড়ু মাঝির মেয়েই হয়তো মুনার ঘরণী হয়ে যেত! রিতার চেয়ে সে অনেক সুন্দর।

নুটুকে ডিহির লোকে দেখতে পারে না, গরিব বলে নয়, বেজায় কুঁড়ে আর বখা। রিতার ওপর ওর অনুরাগের কথা ডিহির অনেকে টের পেয়েছে। ওকে কড়া কথায় অনেকে শাসিয়েও দিয়েছে—'সামলে চল। নিজে ভাল হতে শেখ তবে রিতার মতো ভাল মেয়ে তোকে বিয়ে করতে চাইবে। তা ছাড়া পরের বউ, অত মাখামাখি ভাল দেখায় না। মুনা মাঝিও শিগগির আসছে। শেষকালে কি ডিহির মধ্যে একটা পাশাপাশি কাণ্ড ঘটাবি!'

দূর ফিজির বাগানেও চাঁদ ওঠে। মুনা দেশের কথা ভাবে নিশ্চয়। কিন্তু বেশি করে ভাবে রিতার কথা। চিঠিতে খবর পেয়েছে—রিতা ডাগর হয়েছে, তার ওপর নাকি রাগ অভিমান করে আর মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলে।

সমস্ত বছরে তিনটে বা চারটে চিঠি পায়। তার মধ্যে শেষ চিঠিগুলিই মুনাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে। রিতা নাকি খুব সুন্দর দেখতে হয়েছে। তবে বাপ-মার সঙ্গে প্রায়ই কোঁদল করে —মুনা কেন দেশে ফিরছে না।

রিতাকে মনে পড়ে। কিন্তু আট বছর আগে বিয়ের দিনে দেখা রিতার সে-মুখটি আর মনে পড়ে না। হলুদ ছোপানো কাপড় পরে কাকার কোলে চড়ে বিয়ের আসরে এল রিতা। তারপর পূজাপাঠ হয়েছে, মাদল বেজেছে, ঝুমুর হয়েছে, আর অন্য কিছু মনে পড়ে না।

রিতাকে এইভাবে শুধু চিঠির মধ্যেই পেয়ে এসেছে মুনা —আর ছুটির পর বাগান থেকে ঘরে ফিরতে একা পথে কল্পনায় অনেক কিছু পেয়েছে।

মুনা তার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা পরিকল্পনা করে রেখেছে। তাই সে শুধু মুখ বুজে কঠোর পরিশ্রম করে। কিছু পয়সা জমানো চাই। সেই সঙ্গে লেখাপড়া শিখে নিতে হবে। তারপর দেশে ফিরে নিজের সঙ্গিনীকে আবার কাছে টেনে নেবে।

কিন্তু ডিহিতে থাকা আর চলবে না। শহরে একটা ছোট ভাড়া ঘরে সে নতুন সংসার পাতবে। বিনা মাইনেতে অ্যাপ্রেন্টিস খেটে বয়লার মিস্ত্রির কাজটা সে ভাল করে শিখেছে। আর জীবনে বাগানের কুলিগিরি নয়।

একটা সিঙ্গেল রিডের হারমোনিয়াম কিনেছে মুনা। মাদ্রাজি গান, হিন্দি গান গাইতে শিখেছে। সাহেবদের দেওয়া ট্রাউজার পরে নাইট ক্যাপ মাথায় দিয়ে মাঝে মাঝে পোর্টেতে সিনেমা দেখে আসে।

মুনার কুলিদের টান্ডেল অনেক সময় ঠাট্টা করে বলেছে, 'কুলি হয়ে এসব কাপ্তেনি ভাল নয় রে ছোঁড়া। দেশে ফিরলে বউ আর চিনতেও পারবে না। ঘরেও নেবে না।'

মুনি জানতো দেশে ফিরে আর থাকছে কে? রিতাকেও তারই মতন কায়দা-দুরস্ত করে নেবে। তাকে কুলির বউ করে রাখবে না সে। পাহাড়িয়া চাষি জীবনে ফিরে যাবার মতো মতিগতি তার আর নেই। কিন্তু এবার বোধহয় ফেরা উচিত। বেচারি রিতা।

মুনার মনে তার কল্পনার রিতা সমস্ত রূপ নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

-

ডিহির পঞ্চায়েতের বৈঠকে নুটুর সাজার নির্দেশে হয়েছে। দশ টাকা জরিমানা। যেমন করেই হোক, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে পাথর ভেঙে ওকে দশ টাকা রোজগার করতে হবে আর জরিমানা দিতে হবে । নইলে এ ডিহিতে ওর স্থান নেই।

নুটু বলল, 'আমি রিতার কাছে মাপ চেয়ে নিচ্ছি। ও ক্ষমা করে নিক। জরিমানা যেন না করা হয়। গাঁয়ের বাইরে তাড়িয়ে দিলে আমি মরে যাব।'

কিন্তু অপরাধ বড় কঠিন। সহজে মুক্তি দেওয়া যায় না। নোংরা চেহারা, কাজে কুঁড়ে, নুটুর জংলি স্বভাব আজও গেল না। উপোসেও ওর পাথুরে শরীর যেন কাবু হয় না। দিন গেলে দুটো কাঠবিড়ালি মেরে পুড়িয়ে খেয়ে নিলেই ওর চলে গেল। চুলের ঝুঁটিতে সর্বদা

বাঁশি গুঁজে রাখে। সকলে যখন মাঠে খাটতে বের হয় নুটু তখন একটা আলের ওপর শুয়ে বাঁশি বাজায়।

এসব অপরাধ ক্ষমার্হ। কিন্তু পরের বিয়ে করা বউয়ের পেছনে একটা উপদ্রবের মতো লেগে থাকা, কোনও পঞ্চায়েত ক্ষমা করতে পারে না।

রিতা সেদিন স্রোতে স্নান করতে গিয়েছিল। বনের নিরালায় নিশ্চিন্ত মনে সে স্নান করছে, একটা কুলের ঝোপ থেকে এক ঝাঁক তিতির উড়ে পালিয়ে গেল, যেন ভয় পেয়ে। রিতার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি তখুনি ধরে ফেলল অপরাধীকে। ঝোপের ভেতরে নুটুর ঝাঁকড়া চুলের মাথা দেখা যাচ্ছে।

ঘরে ফিরে এসেই রিতা লগন মাঝিকে সে-কথা জানিয়ে দিয়েছে।

এই অপরাধেই নুটুর শাস্তি। নুটু হাত জোড় করে পঞ্চায়েতের কাছে নিবেদন করল—'আমি রিতাকে বহিন বলে মাপ চেয়ে নিচ্ছি। ও ক্ষমা করে দিক।'

রিতা বলল, 'না'।

নুটু ডিহি ছেড়ে চলে গেছে। রিতা তার ঔদ্ধত্যকে মাপ করতে পারেনি, এর জন্য রিতার মনেও কোনও আপসোস নেই। নুটুর এই অপরাধ, এই আবদার অনেকটা বামন হয়ে চাঁদ ধরার শখের মতো। তার স্বামী মুনার কথাও তো নুটু সবই শুনেছে। তবে কেন সে প্রতিযোগিতায় নামে, কোন সাহসে?

চিঠিও এসে গেল, মুনা আসছে। আগামী সপ্তাহে ওদের জাহাজ ছাড়বে।

রিতার বুক দুরদুর করে উঠল। এ কী অদ্ভুত চাঞ্চল্য। মুনা আসছে। ফিজি দ্বীপের চাঁদ নীল আশমানে ভেসে এসে এই মহুয়ার মাথায় এসে দাঁড়াবে।

জঙ্গল থেকে কোঁচড় ভড়ে বিঠা ফুল কুড়িয়ে এনে ঘরে রাখল রিতা। মোটা মুক্তার মালা একটা ধুয়ে রাখল।

খিদিরপুর থেকে চিঠি এসে গেছে। জাহাজ পৌঁছে গেছে। মুনা তিনদিন পরে পৌঁছচ্ছে দেশে।

ডিহির সব মাঝিরা রাত থাকতে স্টেশনে এসে বসে রইল। ভোরে কলকাতায় ট্রেন থামে। লগন মাঝি একটা পালকি খুঁজেছিল, কিন্তু ভাড়া বেশি বলে আর জোগাড় হল না।

ট্রেন থেকে একদল কুলি নামল। নানা গাঁ ও ডিহি থেকে কুলিদের মা বউ ও ছেলেমেয়েরা এসেছে। বুড়িরা তাদের ছেলেদের কাঁধে মুখ রেখে একচোট কেঁদে নিল। যাদের ছেলেরা আসেনি তারাও কাঁদল। শোরগোল শেষ হবার পর নানা দিকের পথে মাঠ জঙ্গলে যে যার ধরে চলল।

আর নামল মুনা। কালো ফুল প্যান্ট পরা, গায়ে কোট আর কম্ফোর্টার জড়ানো। পায়ে জুতো আর মোজা। বিবর্ণ একটা পুরনো ফেল্টের টুপি মাথায়, মোটা বর্মা চুরুট হাতে।

মাঝিরা হাঁ করে বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল। মুনা লগন মাঝির কাছে এগিয়ে এসে হাঁটুতে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই সকলের জড়তা যেন একটু ভাঙল। বুড়ো মাঝিদের দু-একজন মুখ ফুটে সাহস করে কুশল প্রশ্ন করল।

তারপর ডিহির পথ। মুনা আগে আগে চলেছে। মাঝিরা সকলে পেছনে পেছনে দল

বেঁধে চলেছে। সাড়াশব্দ বড় কিছু নেই। মুনা এক একবার থেমে তাদের সঙ্গ নিলেও তারা যেন থেকে থেকে পিছিয়ে পড়ছে।

কথা ছিল মুনা ডিহিতে ঢোকামাত্র ছেলেরা মাদল বাজাবে। তারপর তো সমস্ত দিনের উৎসব লাগবে। লগন মাঝি একটা পাঁঠা কিনে রেখেছে।

রিতা তার মায়ের নির্দেশে মতো সাজ করেছে। ভয়ে বুক কেঁপেছে, লজ্জা করেছে তবুও। নিজেকে জোর করে শান্ত করে আনে রিতা। বেশি লজ্জা করে প্রথম দেখার সব আনন্দটুকু যেন নষ্ট না হয়। সে হয়তো রাগ করবে।

বটতলার নীচে লোকজনের গলার শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। কিন্তু ছেলেদের মাদল বাজল না। রিতা কৌতুহলী হয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল।

লগন মাঝি আর তার সঙ্গে আরও দু-তিনজন মাঝি ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে অদ্ভুত ইংরেজি পোশাকে একজন লোক। রিতা অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল। এরা মুনার খবর নিয়ে আসছে।

মুনা হয়তো তুলসী মাঝির গোলায় বিশ্রাম করছে।

লগন মাঝিরা রিতার সামনে এসে দাঁড়াল। রিতা বোকার মতো তবু দাঁড়িয়ে আছে দেখে একজন মাঝি চোখ টিপে ইশারায় জানাল— ঘরের ভেতর যা।

রিতা তবু দাঁড়িয়েছিল। ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারেনি। লগন মাঝি আবার মুখের ইশারায় জানিয়েছিল—মুনা।

এক দৌড়ে ঘরের ভেতর ঢুকে রিতা থরথর কাঁপতে লাগল। ওর মা এসে ধরে দু'বার ঝাঁকুনি দিল—'ও কি হচ্ছে?'

সমস্ত ডিহিটা স্তব্ধ হয়ে গেছে। মুনা ফিরেছে, ডিহির ছেলে মুনা। কিন্তু আমোদ তো জমল না। ছোট ছেলেরা দেয়ালে মাদল ঝুলিয়ে রাখল। পাহাড়ের ওপর থেকে গির্জার একটা দেশি সাহেব আজ তাদের ডিহিতে ঢুকেছে, ভয় দেখাবার জন্য।

আট-হাতি খেরো কাপড়ে রিঠে মাজা শরীর জড়ানো, শালবনের জংলি চাষির মেয়ে রিতা। চোখে জল দেখা দেবার আগেই মাকে বলল, 'ছেড়ে দাও, আমি ঠিক আছি।'

তবু চোখের জলের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য আর একটি কল্পনার ছবি চকচক করে উঠল— ডিহি ছাড়িয়ে বহু দূরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কের পাশে রোদের মধ্যে বসে জংলি নুটু একা পাথর ভাঙছে। ওর পাশে ঝুড়ি হাতে সে যদি গিয়ে একবার দাঁড়াত, খারাপ কিছু বোধহয় হত না।

পাপ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

তিনতলায় বরযাত্রীদের আহারের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলাম। বিয়ের লগ্ন রাত তিনটে বত্রিশে, কাজেই খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাটা আগে করে ফেলাই সমীচীন। সিঁড়ির মুখের ভাইপোর গলার আওয়াজ, 'কাকাবাবু, একটু শুনুন এদিকে।'

সিঁড়ির কাছ বরবার এগিয়ে এলাম। কী ব্যাপার! পান সিগারেটের সব বন্দোবস্ত করে তবে আমি এসেছি। একটি ঝাঁকড়া চুল প্যাঁকাটি-লাঞ্ছিত শরীরের বরযাত্রী কোলের ওপর হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে গজল শুরু করতে করতে জোরপায়ে তিনতলায় এসে উঠছে। আবার কী ব্যাপার!

ব্যাপার ঘোরালো। ভাইপোর মুখে বিবরণ শুনে রেলিং ধরে টাল সামলালাম। বর উঠে যাচ্ছে আসন ছেড়ে। এমন ঘরে সে বিয়ে করবে না। সর্বনাশ! আসন ত্যাগ করার হেতু শুনে ঘাম জমে উঠল কপালে, চোখের সামনে অসংখ্য হলদে ফুলের স্তবক।

কানের নাকি ভালবাসা ছিল বিয়ের আগে। পাড়ায় কোনও এক ছোকরার সঙ্গে চিঠিপত্র লেখালেখিও চলত। এমন কালসাপ ঘরে ঢোকাতে পাত্র নারাজ।

'এসব বাজে কথা কে বললে তাকে মনু?' হাঁপাতে হাঁপাতে কথাগুলো বললাম। দুটোপা-ই ঠকঠকিয়ে কাঁপছে। তালু শুকিয়ে কাঠ।

'বলবার লোক যে কে তাতো ভালই জানেন কাকাবাবু।' মনুর গলায় ঝাঁজের মিশেল। পাত্রপক্ষের সঙ্গে কড়া কড়া কথার বিনিময় হয়েছে নিশ্চয়। সবকিছু নিঃশেষ হজম করেনি। কিছুটা হুল ফেরতও দিয়েছে।

'নরেশ?' আমতা আমতা করলাম।

'তা ছাড়া আবার কে? সন্ধ্যা থেকে দেখছি বরের কাছে ঘোরাঘুরি করছেন। এখন অবশ্য আর দেখতে পাচ্ছি না। ছোবল মেরেই সটকেছেন।'

নরেশ, মানে আমার জ্ঞাতিভাই। আমার গ্রামে ফিরে আসতে তাদেরই ক্ষতি হয়েছে সবচেয়ে বেশি। মাঠের ধান, পুকুরের মাছ, বাগানের ফলপাকুড়ের ভাগীদার জুটতে রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। মনের রাগ মনে চেপেছিল এতদিন, কিন্তু পুকুরপাড়ের সীমানা নিয়ে

বাষ্প বহ্নির রূপ নিল। দেওয়ানি আর ফৌজদারি—দুখাতে প্রবাহিত হল বিদ্বেষের লাভাস্রোত। তবুও মেয়ের বিয়েতে সবকিছু ভুলে আমি নিজে নিমন্ত্রণ করে এসেছি গলবস্ত্র হয়ে। বাঁকা বাঁকা কথা, টিটকারি কিছু গায়ে মাখিনি। এই আমার প্রথম কাজ, এমন একটা ব্যাপারে জ্ঞাতিভাই দূরে সরে থাকবে, ভাবতে ভাল লাগেনি। কিন্তু একবারও ভাবিনি খাল কেটে কুমির এনেছি নিজের এলাকায়। এখন ভয় পেলে চলবে কেন?

মনুর সঙ্গে যখন নীচে পৌঁছলাম তখন জটলা শুরু হয়েছে। বর একেবারে উঠোনের মাঝখানে। তাকে ঘিরে সাঙ্গোপাঙ্গের দল। অন্তঃপুরের পাশ দিয়ে আসতে ফোঁপানির শব্দ কানে এল। কথাটা সেখানে পৌঁছেছে। আমি যেতেই পাত্রের মামা এসে দাঁড়ালেন। জারাজীর্ণ চেহারা, হাতে গলায় মাদুলির ভারে ন্যুব্জদেহ। এতক্ষণ ঘরের কোণে পালাজ্বরে কোঁ কোঁ করছিলেন, বড়লোক ভাগনের চ্যাঁচামেচিতে খাড়া হয়ে উঠেছেন। কথার তুবড়ি, বন বন করে পাক খাচ্ছে দু-চোখের তারা।

'ছি ছি, আপনার এই কাজ মুখুজ্যেমশাই?'

সবটা মামাকে আর বলতে হল না, ভিড় ঠেলে ভাগনেই এল, শুধু চোখ নয়, ঘুষিও পাকিয়ে।

'কি মশাই, দিব্যি মেকি দু-আনি চালিয়ে দিচ্ছিলেন তো? ভাগ্যিস খবরটা কানে এল, নইলে হয়েছিল আর কী!'

কনের বাপেদের জন্যে ভগবান আছেন কিনা জানি না, থাকলেও অসহায় আর্তনাদে বোধহয় তাঁর ঘুম ভাঙে না। বহুকষ্টে নিজেকে সামলালাম দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে। খুব আস্তে বললাম, 'কী ব্যাপারটা দয়া করে ভেঙে বলবেন আমাকে?'

'আ হা হা, ভাজা মাছ উলটে খেতে জানেন না! ন্যাকা সাজারও সীমা আছে।' ভিড়ের মধ্যে থেকে কে যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের টুকরো ছুঁড়ে দিল। তার তপ্ত স্পর্শ শুধু ত্বকেই নয়, জ্বালা ধরাল মর্মস্থলে।

পাত্র হাত দিয়ে গোলমাল থামিয়ে দিল, গম্ভীর গলায় বলল, 'ভদ্রলোককে শুনতেই দাও না ব্যাপারটা। কী উত্তর দেন শুনি।'

সংক্ষেপেই বলল। আমার মেয়ে বহুদিন ধরে ডুবে ডুবে জল গিলছিলেন। শিবের বাবা কেন, নিজের বাবাও বোধহয় জানতে পারেননি, পারলেও বেগতিক দেখে স্রেফ চেপে যাচ্ছেন ব্যাপারটা।-

দম নিলাম। খুব সংযত গলায় বললাম, 'কথাটা শুনছেন বোধহয় পাড়ায় নরেশ মুখুজ্যের কাছে?'

'অত নাম ধাম গোত্র কুলুজি জানি না মশাই। আমার স্পষ্ট কথা, মেয়ে কালো হোক, কানা হোক, খোঁড়া হোক, সব সহ্য করব, কিন্তু চরিত্রে এক ফোঁটা দোষ থাকলে, অন্তত চিন্তাপুরের বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে বউ হয়ে ঢুকতে পারবে না।'

'খুবই ঠিক কথা, হক কথা,' আমি আবার দম নিলাম, ডানহাতে পইতে জড়িয়ে বললাম, 'আমি ব্রাহ্মণ, ত্রিসন্ধ্যা জপ না করে জলস্পর্শ করি না। যদি আমি পইতে ছুঁয়ে বলি ব্যাপারটা সর্বৈব মিথ্যা, কুলোকের রটনা, জ্ঞাতিশত্রুর কারসাজি, তা হলে কি বিশ্বাস

হবে? তাছাড়া চলুন আপনারা আমার সঙ্গে নরেশ মখুজ্যের বাড়ি, ডাকুন তাকে আমার সামনে। নিজের ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলুক কথাটা সত্যি। আমি একটি কথাও বলব না। শুনে শুনে সাত জুতো আপনারা মারুন আমাকে, যে শাস্তি ইচ্ছা দিন, মাথা পেতে নেব।'

পাড়ার বুড়ো লোক কয়েকজন আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, আমার কথা শেষ হতেই বললেন, 'যা শুনেছ একবারে মিথ্যে কথা বাবাজি। নরেশটা চিরকাল এমনি ধরনের। কেবল পরের সর্বনাশ করার চেষ্টা। জমি নিয়ে মামলা বেধেছে ডাক্তারের সঙ্গে, তাই বিয়ে পণ্ড করার জন্য এ-সব রটাচ্ছে। আমাদেরও বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণে আসতে বারণ করেছিল। ডাক্তারের নাকি জাত নেই! সায়েব-সুবোর সঙ্গে যা তা খেয়েছে শহরে।'

পাত্রপক্ষের চিৎকার কিছুটা কমল বটে, কিন্তু গুঞ্জরণ থামল না। পাত্র নিজেই প্রস্তাব করল, বেশ সেই ভদ্রলোকের বাড়িতে চলুন। মুখোমুখি বোঝাপড়া হয়ে যাক। সবকিছু নিজের কানে না শুনে, পাপ আমি ঘরে ঠাঁই দিতে পারব না।

'এই তো মরদের কথা।'— কে একজন জোর গলায় সায় দিল।

অগত্যা দল বেঁধে যাওয়া হল নরেশের বাড়ি। দূর এমন কিছু নয়। বাগানটা পার হয়েই জরাজীর্ণ বাড়ি। ব্যাপারটা নরেশ বোধহয় আঁচ করছিল। আমরা বাড়ির কাছে বরাবর যেতেই হ্যারিকেনের স্তিমিত দীপ্তিটুকুও নিভে গেল। কাছে কাছে গিয়ে নাম ধরে ডাকতেই দু-একটা দরজা বন্ধ হবার শব্দ। মিনিট দশেক ধরে চেঁচামেচি করেও কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

এবারে পাত্রের মামা কথা পাড়লেন, 'ঠিক আছে মশাই, চলুন ফিরে যাওয়া যাক। যত সব বদমাস লোকের কান্ড। দিলে মেজাজটা খারাপ করে।'

পাত্র তবু নাছোড়বান্দা। বৃদ্ধ ঘোষাল মশাইয়ের দিকে ফিরে বলল, 'আপনি প্রাচীন লোক, আপনি দিব্যি করে বলুন, মেয়ে নিষ্পাপ?'

ঘোষাল মশাই পাত্রের একটা হাত জড়িয়ে ধরলেন। আস্তে বললেন, 'ডাক্তারবাবুর মেয়েকে আমরা অনেকদিন থেকে জানি। রূপ গুণ চাল চলন সবই মায়ের আমার নিন্দার বাইরে। আর তা ছাড়া, এ অজ পাড়াগাঁয়ের ওসব নভেলি ব্যাপারের কোনও চল নেই বাবাজি। তুমি নির্ভয়ে মেয়েকে ঘরে নিয়ে যেতে পার।'

পাত্র এবার ফিরল নিজের মামার দিকে, 'কী বলো মামা, তুমি গুরুজন উপস্থিত রয়েছ, তুমি যা বলবে তাই হবে।'

মামার অবস্থা কাহিল হয়েই এসেছিল। দুটো চোখ লাল, কাঁপুনিও বেশ জোর জ্বরটা খুবই তেড়ে এসেছে। এই অবস্থায় বর উঠিয়ে নৌকায় ফিরে যেতে হলেই মুশকিল। দেশ অবধি গিয়ে হয়ত আর পৌঁছতেই হবে না। তার চেয়ে একটা মিটমাট হয়ে যাওয়াই ভাল।

কাজেই তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'এঁরা বলছেন যখন, তখন ঠিকই আছে। শুভ কাজটা শেষ করেই নাও।'

পাত্র তারপরেও হাতমুখ নেড়ে চারিত্রিক নিষ্ঠার মহত্ত্ব সম্বন্ধে দু-এক কথা বলল, 'অবশ্য বন্ধুদের দিকে ফিরে।'

কোণের দিকে দাঁড়িয়েছিলাম চুপচাপ। আমার অবস্থা একেবারে নিন্দার নয়। সরকারি ডাক্তার হিসাবে যশ আর অর্থ দুই-ই আহরণ করেছিলাম। মেয়ের বিয়েতে খরচপত্র নেহাত কম করছি না। একবার মনে হল, স্পষ্ট গলায় বলি, দরকার নেই এমন ঘরে মেয়ে দিয়ে। আমার মেয়ে সাতজন্ম না হয় কুমারীই থাকবে, তবু এমন মানুষের গলায় মালা দেবে না। কিন্তু মনকে বোঝালাম। পাত্রের আর দোষ কী! ঘরের শত্রু বিভীষণই যত নষ্টের মূল। তাছাড়া, এমন পাত্র হাতছাড়া করলে, পরে পস্তাতে হবে। একটু পড়তির মুখে, তা হোক, নামী জমিদার বংশ। এখনও নেই নেই করেও আয় মন্দ নয়। এ ছাড়াও ছেলেটি শহরে নতুন কারবার ফেঁদেছে। চামড়ার ব্যবসা। একবার দাঁড়িয়ে গেলে আর দেখতে হবে না। গয়নায় মেয়ের চামড়া দেখা যাবে না। দেখতে শুনতেও ছেলেটি ভাল, লেখা পড়া তেমন জানে না বলে বাড়িতে একটু ক্ষীণ আপত্তির সুর উঠেছিল, কিন্তু টেঁকেনি।

ভালয় ভালয় বিয়েটা শেষ হয়ে গেল। বরকনে নৌকোয় উঠতে স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লাম।

বছর দুই কেটে গেছে। দু-একবার মেয়েকে আনতে লোক পাঠানো হয়েছিল, মেয়েকে পাঠায়নি। নানা ওজর-আপত্তি তুলে এড়িয়ে গেছে। গৃহিণীর শরীরের অবস্থা খারাপ। বাত ছিলই, তাতে বিশেষ কাত করতে পারেনি, কিন্তু হার্টের অসুখে শয্যাশায়ী মাস ছয়েক। ইদানীং বাড়াবাড়ি চলেছে। সকাল বিকাল ইনজেকশন দিচ্ছি। দামি দামি দু-একটা টনিক, কিন্তু উন্নতির লক্ষণ চুলোয় যাক, দিন দিন অবনতিই হচ্ছে। মেয়েকে দেখার খুব ইচ্ছা। সারা দিনরাত মেয়ের নাম করছেন। আমার এ শরীরে মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যাবার দখল সইবে না। নৌকো, পালকি, নয়তো গোরুর গাড়ি। সব মিলিয়ে পাক্কা মাইল কুড়ি। এ বয়সে সাহস হল না। মোলায়েম একটা চিঠি লিখে বড় ছেলেকেই পাঠালাম। অভিভাবক বলতে সেই পালাজ্বরাক্রান্ত মামা, তাই চিঠিটা সোজাসুজি জামাইকেই লিখলাম।

দিন তিনেক। ভোরের দিকে গোরুর গাড়ি দাঁড়াল। দাওয়ায় বসে দাঁতন করছিলাম, এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম।

ঘোমটা মাথায় মেয়ে এসে দাঁড়াল। বেশ যেন রোগা, গায়ের রংও তামাটে। মাঝে মাঝে চিঠি অবশ্য লিখেছে। তাতে অসুখ-বিসুখের কোনও খবর পাইনি, তবে বিষাদের একটা প্রচ্ছন্ন সুর ছিল। কিসের যেন একটা অভাব, অর্থ, আভিজাত্য সব পেয়েও পরিপূর্ণ শান্তি যেন পায়নি। দু-একবার ছেলেরা গিয়েছিল বোনের বাড়ি। তারা ফিরতে গৃহিণী প্রশ্ন করেছিলেন, 'মিনতি ভাল আছে তো? জামাই? আদরযত্ন করলে তোদের?'

ছেলেদের কথায় এমন কিছু মনে হয়নি যাতে ধারণা হতে পারে মিনতি কষ্টে আছে। দেহের কিংবা মনের। সেইজন্যই গৃহিণী বললেন, 'নাই এল মিনতি। সুখে থাক, শান্তিতে থাক। আর আমার কিছু দরকার নেই।'

মিনতি এগিয়ে এসে প্রণাম করল। ঘোমটা না সরিয়ে। —'থাক্ মা থাক,' চিবুক ধরে আদর করতে যেতেই ঘোমটা একটু সরে গেল। খুব অল্প, কিন্তু তাতেই কাজ হল। ডাক্তারি চোখকে ফাঁকি দিতে পারল না।

হাত দিয়ে ঘোমটা সরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এ সব কবে থেকে হয়েছে মিনতি।’

মিনতি প্রথমে কোনও উত্তর দিল না। ঘোমটাও সরাল না। দুটো চোখ জলে ভরে এল। কেঁপে কেঁপে উঠল দুটো ঠোঁট। আবার জিজ্ঞাসা করতে আস্তে আস্তে বলল, ‘প্রায় বছরখানেক।’

চোখের সামনে থাকে অনেকগুলো দিন সরে গেল। ভেসে উঠল আর এক আলোকোজ্জ্বল রাত্রি। কুৎসা আর অপবাদে পঙ্কিল রাত্রির আকাশ। চিন্তাপুরের বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে পাপ না ঢোকে তার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস।

আর একবার ভাল করে দেখলাম মিনতির মুখের দিকে। না, আর সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। আমার এত বছরের অভিজ্ঞ চোখ ভুল করেনি। যৌন কদাচারের নির্মম প্রতিলিপি। বাঁড়ুজ্যে বাড়িতে নতুন করে পাপ আর প্রবেশ করেনি, পুরনো পাপই অপরূপ লীলায় আত্মপ্রকাশ করেছে।



মালাকর

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

লিখতে বসে আজ আমার যাদব মালাকরের কথা মনে পড়ছে। এতকাল বাদে ছেলেবেলার সেই যাদবকে মনে পড়বার অবশ্য একটু কারণ আছে।

পঞ্জিকায় পর পর কয়েকটি বিয়ের তারিখ রয়েছে। টেবিলে এসে জমেছে লাল আর হলদে রং-এর প্রজাপতিলাঞ্ছিত খানকয়েক নিমন্ত্রণের চিঠি। তার সব কটিতে যদিও লেখা আছে 'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়' কিন্তু শুধু আশীর্বচনে কি নিজের সামাজিক মনই তুষ্ট হয়, না গৃহকর্ত্রীর মর্যাদা বাঁচে!

পঁচিশ নম্বর বাড়িতে নহবত বসেছে। সেখান থেকে মাঝে মাঝে সানাইয়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

কিন্তু এমন বিয়ের মরশুম আর লৌকিকতার সমস্যা তো ফির বছরই আসে, সমাধানও হয়। কোনওবারই মালাকরের মুখ মনে পড়ে না। এবারও হয়তো পড়ত না যদি এক ভদ্রলোকের হাতে সাধারণ একটি শোলার মুকুট দেখতে না পেতাম।

আমার ঘরের সামনে পথ। পাড়ার পথিকেরা চলে। অন্য পাড়ার মানুষজনের আনাগোনা হয়। না-দেখা দিনই বেশি আসে, না-দেখা মুখই আমার চোখের সমুখ দিয়ে বেশি সরে যায়।

কিন্তু লিখতে বসে আজ হঠাৎ এক ভদ্রলোককে আমি দেখে ফেললাম। তাঁর পরনে খাটো ধুতি, গায়ে ঘামে ভেজা পুরনো পাঞ্জাবি, মুখে দু দিনের না-কামানো দাড়ি, কিন্তু হাতে একটি বড় সুন্দর সাদা ধবধবে মুকুট। ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলেন।

কিন্তু সেই মুকুটটি আমার চোখের সামনে অনেকক্ষণ ধরে দুলতে লাগল।

ভদ্রলোকের নিজের টোপর পরবার বয়স আর নেই। হয়তো জামাইয়ের জন্যে নিচ্ছেন, কি ভাগনি-জামাইয়ের জন্যে। এমনও হতে পারে মনিব-কন্যার বিয়ের জন্যেই এত ব্যস্ততা।

কিন্তু মুকুটটি বড় সুন্দর। আজকাল এই কলকাতা শহরে বিয়ের টোপর বড় চমৎকার হয়। শোলা তো নয়, যেন হাতির দাঁতের কাজ।

আমাদের গাঁয়ের যাদব মালাকর এমন সুন্দর মুকুট গড়তে জানত না। লম্বা ধরনের প্রায় একই আকারের মুকুট সে বছরের পর বছর গড়ত। তবু আমাদের গাঁয়ের লোক তার সেই

হাতের মুকুট মাথায় পরে তিন পুরুষ ধরে বিয়ে করে এসেছে, কেউ কোনও আপত্তি করেনি।

যাদব মালাকর শুধু অবশ্য বিয়ের মুকুটই গড়ত না, অন্নপ্রাশনের শিশুদের জন্যেও মুকুট তৈরি করত। বিয়ের আগে মুকুট পরতে হলে শিশুকে অবশ্য একটু অবস্থাপন্ন ঘরে জন্মাতে হত। মৃত্যুর পরেও মালাকরের ফুলসজ্জার কাজ ফুরত না। তার শোলার ফুল কাঠের বৃষটিকে পরাতে হত, তার সাদা ফুলে সাজত শ্রাদ্ধবাসর। ফুলের আরও দরকার ছিল। যত রকমের যত পুজো হত, বিশেষ করে লক্ষ্মীপুজো, কার্তিকপুজো, সরস্বতী পুজো। যাদব মালাকরের ফুল ছাড়া চলত না।

একবার লক্ষ্মীপুজোয় সে সময়মতো ফুল দিয়ে যায়নি, তার ফলে হুলুস্থুল কাণ্ড বেঁধে গেল। আমার ঠাকুরমার উদ্‌বেগই সবচেয়ে বেশি। তিনি বার বার বলতে লাগলেন, 'যেদোর কাণ্ড দেখ, এখনও ফুল দিয়ে গেল না। কী করে তোমাদের পুজো হবে আমি কিছু জানি না বাপু।' বাবাকে বললেন, 'তুই একবার নিজেই যা না যেদোর বাড়ি।'

বাবা তাঁর বন্ধুদের নিয়ে পাশায় বসেছিলেন, খেলায় বাধা পেয়ে চটে উঠলেন, 'বিরক্ত কোরো না পিসিমা। কে যাবে এখন তোমার যেদোর কাছে? সেও হয়েছে কে পয়লা নম্বরের ফাঁকিবাজ। চাকরান খাবার বেলায় ঠিক আছে। ফুল দেবার বেলায় দেখা নেই।'

আমি ঠাকুরমার কাছে গিয়ে বললাম, 'দিদিভাই, আমরা তো অনেক ফুল নিয়ে এসেছি। সেই শেষরাত্রে নৌকা করে গিয়ে এক সাজি নলটুনি ফুল নিয়ে এলাম। অত ফুল কেউ আনতে পারেনি। তোমার আর ফুলে কী দরকার!'

ঠাকুরমা দাঁতে হেসে বললেন, 'দাদা, বড় হও, তবে বুঝবে। মালাকরের ফুল ছাড়া কোনও পুজো হয় না।'

আচ্ছা এক ঠাকুরমা হয়েছেন! তাঁর মুখে কেবল না না না—এটা কোরো না আর ওটা কোরো না। এটা ছাড়া ওটা হয় না, ওটা ছাড়া এটা হয় না। এতদিন কেবল শুনেছি নলটুনি ফুল ছাড়া লক্ষ্মীপুজো হয় না, পলাশ ফুল ছাড়া সরস্বতী পুজো হয় না, আজ শুনি মালাকরের ফুল ছাড়া কোনও পুজোই হবার জো নেই।

মালাকরের এই সম্মান দেখে আমার ভারি অভিমান হল। মনে হল বললাম, 'আর জন্মে যেন যাদব মালাকর হই।'

সন্ধ্যা হতে না হতেই অবশ্য যাদব এসে হাজির হল। বেঁটে চেহারা, চ্যাপটা মুখ, চ্যাপটা নাক। গলায় তিনপ্যাঁচ তুলসীর মালা। মাথার চুলে পাক ধরেছে। সে উঠানে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বাবা আর ঠাকুরমা তার দিকে তেড়ে এলেন। ঠাকুরমা বললেন, 'এত দেরি করলি কেন? পুজোই যে পণ্ড করতে বসেছিলি যাদব।'

বাবা পরামর্শ দিলেন, 'মরশুমের সময় একজন লোক-টোক কাউকে রাখলেই পারো মালাকর। সেদিকে খুব হুঁশ আছে। একটি পয়সা খরচ করবে না। এত যে জমাচ্ছ, তোমার সম্পত্তি খাবে কে শুনি? ছেলে নেই, পুলে নেই, বউ এক-একটা ঘরে আসে আর মরে।'

মালাকর হেসে বলল, 'মরে না কর্তা, বলুন বেঁচে যায়।'

তার হাসি দেখে বাবার মনে বোধহয় একটু দুঃখ হল, হুঁকোর মাথা থেকে কলকেটা তুলে তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নাও, দেখ কিছু আছে কি না।'

তামাক খাবার আগে যাদব দুগাছি ফুল আমার হাতেই দিল। মনে মনে ভাবলাম, এই ফুলের জন্যে এত! ইঞ্চি পাঁচ-ছয় লম্বা শোলার দুটি পাতলা কোঁচকানো চিলতে। ভিতরে একগাছি করে সুতো। এই ফুলের মতো গৌরব। যার গন্ধ নেই, শোভা নেই, পাপড়ি নেই, পরাগ নেই, সে ফুল ছাড়া ঠাকুরমার কেন পুজো হয় না। অবাক কাণ্ড!

যাদবের ভাগ্যকে আমি আরেকবার ঈর্ষা করলাম। লক্ষ্মীপুজোই হোক আর কার্তিকপুজোই হোক, প্রত্যেক পুজোর পরদিন কি পরদিনের পরদিন যাদব এসে হাজির হত। তার হাতে বিরাট এক বেতের ধামা। মুড়কি, মুড়ির মোয়া আর নারকেলের নাড়ুতে সে ধামা একেবারে বোঝাই। যত বাড়িতে ফুল দিয়েছে সে, তত বাড়িতে তার প্রসাদ জুটেছে। যাদবের কী ভাগ্য! আমি একটা মোয়া চেয়ে পাই না, মা ধমকান, 'পেটরোগা ছেলে, অত খাই-খাই কেন রে তোর! খালি দুষ্টু খিদে।'

কিন্তু যাদবের খিদেকে কেউ নিন্দা করে না। সে ধামা-ভরতি করে রাজ্যের চিঁড়ের মোয়া আর নারকেলের নাড়ু, তিলের নাড়ু নিয়ে যায়।

আমার মা আর ঠাকুরমাও তাকে যথেষ্ট দেন। লোকে নাড়ুগোপাল নাড়ুগোপাল বলে। ওর নামই হওয়া উচিত নাড়ুগোপাল।

আমি একবার ঠাকুরমার চোখ এড়িয়ে যাদবের পিছনে পিছনে গিয়েছিলাম। খালের ঘাটে ডিঙি নৌকো। আম গাছের সঙ্গে বাঁধা। ও তার ধামা নিয়ে নৌকোয় ওঠবার আগে আমি পিছন থেকে ডাকলাম, 'ও যাদব. শুনছ!'

সে হেসে বলল, 'কী কর্তাবাবু, কী হুকুম?'

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, তোমার ধামায় কতগুলি নাড়ু আছে বলো তো? একশোটা?'

যাদব হেসে বলল, 'তারও বেশি। কেন, তুমি একটা নেবে?'

'না না না।'

পাছে যাদব আমার হাতে কিছু জোর করে গুঁজে দেয়, তাই আমি তাড়াতাড়ি ছুটে পালিয়ে এসেছিলাম।

একবার আমার ভাইপোর অন্নপ্রাশনের মুকুট আনতে গিয়েছিলাম যাদব মালাকরের বাড়ি। গাঁয়ের একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে ছোট ছোট দুখানি ঘর। বারান্দায় বসে উঠানের রোদে কাঁচা শোলা শুকোচ্ছে। বাড়ির-নীচেই নদী। ক্ষীণ স্রোতে সবুজ কচুরির উপরে বেগুনি রঙের ফুল ভেসে চলেছে। যাদবের ঘরে ছোট বড় কয়েকটি মুকুট। ছেলেবেলায় যেমন দেখেছি আজও তাই। নক্‌শার কোনও বদল হয়নি।

জলচৌকিতে বসে আমি সেগুলি দেখতে দেখতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম , 'আচ্ছা যাদবদা!'

যাদব বলল, 'বল দাদাবাবু।'

বললাম, 'তুমি এই মুকুট আর ওই ফুল ছাড়া সারাজীবন আর কিছু গড়লে না?'

সে বলল, 'কই আর গড়লাম।' তারপর একটু চিন্তা করে বলল, 'হ্যাঁ একবার গড়েছিলাম।'

'কোনবার?'

যাদব বলল, 'সেবার তোমার এক জ্যাঠতুতো ভাইয়ের বিয়ে। সে ভাই তোমার চেয়ে

বয়সে অনেক বড়। তাকে তুলে নেওয়ার জন্যে কনের মামা এলেন মালা মুকুট আর বিরাট এক রুইমাছ নিয়ে। তুমি আবদার ধরলে তোমারও মুকুট চাই, তুমিও বিয়ে করতে যাবে। তোমার বয়স তখন তিন কি চারের বেশি হবে না। আমি ছিলাম সামনে। বললাম, 'আচ্ছা, আমি তোমাকে নতুন টোপর বানিয়ে দেব। কেঁদ না তুমি। খানিক বাদে এক সাহেবের টুপি তৈরি করে নিয়ে গেলাম তোমার জন্যে। তুমি সেই টুপি পেয়ে টোপরের দুঃখ ভুলে গেলে। দাদার বউ নিয়েও আর কাড়াকাড়ি করতে গেলে না।'

যাদব হাসতে লাগল। ছেলেবেলার সেই লজ্জাকর কাহিনি আমার মনে ছিল না। তবু ওর স্মৃতিকে চাপা দেওয়ার জন্যে বললাম, 'আচ্ছা, তুমি নাকি তিন-তিনটে বিয়ে করেছ?'

যাদব বলল, 'তা করেছি, কিন্তু একটাও কপালে টিকল না।' নিশ্বাস চেপে সে হাতের কাজে মন দিল।

আমি অপ্রস্তুত হলাম। দুঃখের প্রসঙ্গটা না তুললেই পারতাম।

একটু বাদে ও ফের নিজেই মুখ তুলল, 'চার বারের বারও করতে গিয়েছিলাম। হাওলাত বরাত করে শতাধিক টাকা জোগাড়ও করে ফেলেছিলাম।'

'করলে না কেন?'

যাদব বলল, 'সব ঠিকঠাক। কিন্তু শেষ রাত্রে স্বপ্নে এসে আমার মা-ঠাকরুন দেখা দিলেন। বললেন, 'খবরদার, অমন কাজও করিসনে। বয়সে সে তোর নাতনির সমান। ঘুম ভাঙবার পর আমি সেই বাসি বিছানায় শুয়েই মন ঠিক করে ফেললাম। আর না।'

যাদব হো-হো করে হেসে উঠল।

তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'আমার সেই চতুর্থ পক্ষের হবু শ্বশুর মুকুটের বায়নাটা আমাকেই দিয়েছিলেন। সেই মুকুট অপর একজনের কাছে বিক্রি করে ভাঙার হাট থেকে ইয়া বড় এক পেল্লাই ইলিশমাছ কিনে নিয়ে এলাম। মুষলধারায় বৃষ্টি। বুঝলে, মাছ ভাজা আর খিচুড়ি লাগালাম। নিজে খেলাম, পাঁচজনকে ডেকে খাওয়ালাম। আনন্দটা বিয়ের চেয়ে কম কীসে।'

যাদব মালাকরের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল বছর দশেক আগে। পার্টিশনের পরে সেই প্রথম দেশে গিয়েছি। প্রথম এবং এখন পর্যন্ত সেই শেষ। আত্মীয়-স্বজন বেশির ভাগই গাঁ ছেড়ে চলে এসেছে। পাড়াপড়শি যে কয়েক ঘর অবশিষ্ট আছে, তাদের খোঁজ খবর নিতে নিতে মালাকরের বাড়িতে একবার এলাম।

বাড়ি তো নয়, জঙ্গল। আশেপাশের বন বাদাড় ওদের উঠানের উপর যেন উঠে এসেছে। ধারে-কাছে মানুষজন নেই। যাদব আমাকে দেখে প্রথমে চিনতে পারল না। আমারও চেনা শক্ত—মাথার চুল, ঠোঁটের গোঁফ, বুকের লোম সব সাদা। দাঁত না থাকায় গাল দুটি ভেঙে গিয়েছে। স্বাস্থ্যও আস্ত নেই।

আত্মপরিচয় দেওয়ার পর ও চিনতে পারল। খুশি হয়ে বলল, 'এসো এসো।'

ছোট জলচৌকিখানা বারান্দায় পেতে দিয়ে বলল, 'বসো।'

আমি বললাম, 'কেমন আছ? ভালো তো সব?'

যাদব বলল, 'হ্যাঁ, সবই ভালো। তারপর, তোমরা তো দেশের মায়া ছেড়েই চলে গেছ। ফের কী মনে করে?'

বললাম, 'এলাম একবার দেখতে।'

যাদব অভিমানের সুরে বলল, 'দেখবার আর কী আছে? ছাড়া ভিটে শিয়াল কুকুর আর জঙ্গল দেখে যাও।'

আস্তে আস্তে আলাপ শুরু হল। ওর শরীর ভালো না। তাই বাড়িঘরের এই অবস্থা। সেই শক্তি সামর্থ্য আর নেই। তা ছাড়া কার জন্যেই বা খাটবে? দূর সম্পর্কের এক ভাগ্নেকে এনে নিজের কাছে রেখেছিল। সে লেখাপড়া শিখে শহরে চলে গিয়েছে। বিয়েথা করে দিব্যি আনন্দে আছে সেখানে। খোঁজ-খবরও নেয় না।

যাদব বলল, 'দুনিয়াটা এমনি।'

মনে পড়ল, আমাদের ছেলেবেলায় রসিক গল্প-বলিয়ে মানুষ হিসেবে ওর খুব নাম ছিল। তার ফুল ছাড়া যেমন গাঁয়ের বিয়ে হত না, শ্রাদ্ধ হত না, অন্নপ্রাশন, পূজা-পার্বণ চলত না, তেমনি তার গল্প ছাড়া আসর জমত না। সে ইচ্ছা করলে বিয়ে-বাড়ির লোককে কাঁদাতে পারত, তেমনি হাসাতে হাসাতে শ্রাদ্ধকর্তার পেটে খিল ধরাতেও পারত। তার হাতে ছিল ফুল, মুখে ফুলঝুরি। তাকে দেখেছি নাগেদের তাস-পাশা-দাবার আড্ডায়, যাত্রা আর কবিগানের আসরে, উৎসব অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে—কোথাও সে গরহাজির থাকত না। নদীতে জাল ফেলে, পলো বেয়ে সে মাছ ধরতে জানত, কুড়ুল দিয়ে শক্ত শক্ত গাব গাছ কেটে নামাত, আবার বাড়ি ভরে সযত্নে দেবদারুর চারা লাগাতেও তাকে দেখেছি।

সেই সামাজিক বহুকর্মা মানুষটিকে আজ এমন বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ দেখে বড় খারাপ লাগল।

যাদব বলল, 'আর দাদা, সবাই যে যার পাড়ি দিল, এখন আর মানুষ পাই না যে মুখ খুলি। সেই দিনকাল আর নেই।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বললাম, 'তারপর তোমার কাজকর্ম কেমন চলছে?'

যাদব বলল, 'তোমরা কর্তারা কেউ বাড়িঘরে রইলে না, কাজকর্ম করাবে কে?'

যাদবের আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে, বাড়িঘরের চেহারা দেখে তা বুঝতে বাকি রইল না। ঘরখানা জীর্ণ হয়েছে, সামনের দিকে ঝুঁকেও পড়েছে খানিকটা। আগে এই বারান্দায় বসে নদী দেখা যেত। এখন আর তা দেখা যায় না। সামনের জংলা ভিটেটা তাকে আড়াল করেছে। দেখা না গেলেও শোনা যায়। খান দুই নৌকো চলে গেল। বইঠা আর জলের ছলাত ছলাত শব্দ শুনতে লাগলাম।

'দাদু!'

হঠাৎ সেই জলের শব্দ ছাপিয়ে ঘরের পিছন থেকে এক শিশুর গলা ভেসে এল।

যাদব তাড়াতাড়ি বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে যেন কথা বলতে লাগল।

'না না না, আমার কোনও কষ্ট হবে না। কী আর উৎপাত করবে! তুমি নিশ্চিন্তে তোমার কাজে চলে যাও। ঘুমিয়ে পড়লে আমি আমার বিছানায় শুইয়ে দেব। ভাবনা নেই তোমার।'

একটু বাদে চার-পাঁচ বছরের একটি ছোট মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাদব ফিরে এল। আমি কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই বলল, 'নন্দ দাসের বোন পদ্ম, তার মেয়ে। এই কচি বাচ্চাটাকে

নিয়ে বিধবা হয়েছে। দেখবার শোনবার কেউ নেই, কিন্তু দুর্নাম দেওয়ার বেলায় লোকের অভাব হয় না।'

এই অভিযোগের আমি কোনও জবাব দিলাম না।

যাদব বলল, 'মা কাজে যাচ্ছে। কার্তিকপুজো আসছে, কুণ্ডুবাড়িতে চিঁড়ে কুটতে হবে, নাড়ু বাঁধতে হবে। গিন্নির দেহ ভালো নয়, ওকে দিয়েই কাজকর্ম করায়। মেয়েটা দুরন্ত বলে আমার কাছে মাঝে মাঝে রেখে যায়।'

'দাদু!'

মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে যাদব বলল, 'কী দিদি?'

'আমার মুকুট কই?'

যাদব হেসে বলল, 'তোমার মুকুট? ঘরেই আছে দেখ গিয়ে। আমার ঘরে কোনও জিনিস যেন ভেঙে-চুরে নাশ করে দিও না। তোমার তো হাতেও লক্ষ্মী পায়েও লক্ষ্মী।'

মেয়েটি ঘরের মধ্যে চলে গেলে যাদব গলা নামিয়ে আমাকে গোপনে বলল, 'ভারি দুরন্ত। একদণ্ডও স্থির হয়ে থাকে না।'

একটু বাদেই তার প্রমাণ পেলাম। মেয়েটি মাঝারি আকারের একটি বেতের ডালা হাতে করে নিয়ে এসেছে, 'দাদু তোমার ফুল।'

যাদব ব্যস্ত হয়ে বলল, 'তুমি সব পণ্ড করবে। তুই আমার মুকুট ছেড়ে ফুলের ডালা নিতে গেলি কেন? দে, দে, আমার হাতে দে। ছিঃ দিদি, নষ্ট করতে নেই পুজোর ফুল।'

শিশুর হাত থেকে ফুলের ডালাখানা কেড়ে রাখল যাদব। ঘরে নিয়ে গেল না, আমার সামনে মাটিতে রাখল। মেয়েটির তুলতুলে ঠোঁট দুটি ফুলে উঠেছে দেখে সে বলল, 'চল, তোমাকে সেই মুকুটটা দিচ্ছি।'

তারপর ঘরের ভিতর থেকে একটা বহু দিনের পুরনো ভাঙা মুকুট নিয়ে এসে মেয়েটিকে বলল, 'নাও। দেখ তো কী সুন্দর মুকুট! তোমার যখন বিয়ে হবে, তোমার বর ঠিক এমনি একটা মুকুট মাথায় দেবে।'

মেয়েটি বলল, 'ধ্যেৎ।'

যাদব নিজের মনেই হেসে বলল, 'তোমার বরের মাথার মুকুট গড়বার জন্যে আমি আর থাকব না, তোমাকে আলাদা লোক খুঁজে নিতে হবে দিদি।'

আমি ডালার ফুলগুলোর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'পুজোটুজো খুব হয় নাকি এখনও?'

সে বলল, 'হয় কিছু কিছু।'

অনেককাল পরে যাদবের সেই ফুল দেখলাম। ধরন আর গড়নের কোনও বদল হয়নি। সেই সাদা সাদা সোলার চিলতে।

আমি ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করতাম, 'দিদিভাই এর নাম কি ফুল?'

ঠাকুরমা জবাব দিতেন, 'এর নাম মালাকরের ফুল।'

বকুল নয়, টগর নয়, গন্ধরাজ নয়, শুধু মালাকরের ফুল। ওর আলাদা কোনও নাম নেই, কোনও গন্ধ নেই।

মনে মনে ভাবলাম, এ ফুলের শুধুই রূপ। যা কোনও রূপক জানে না, তত্ত্ব জানে না,

সত্য জানে না, মিথ্যা জানে না। জীবনভর মালাকর কেবল এই একই ফুল ফুটিয়ে গেল। জানি না, এই ফুলের মধ্যে ওর অগাধ আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখ-দুঃখ সাধ-স্বপ্নের কতটুকু ধরে দিতে পেরেছে। ও নিজেই কি তা জানে!

পুজো হয়ে যাওয়ার পর দেখতাম মালাকরের ফুলগুলি জলে ভাসছে। বিসর্জনের পর কারিগরের মাটির প্রতিমা জলের মধ্যে ডুবে গিয়েছে আর মালাকরের গড়া সোলার ফুল নদীর স্রোতে ভেসে চলেছে। সে ফুলের আর কোনও দরকার নাই।

যাদবের কাছে দেশ গাঁয়ের কথা, পাড়াপড়শির কথা আর আমার সেই বহু দূরে ফেলে আসা ছেলেবেলার গল্প শুনতে লাগলাম। সে যেন আর এক জন্ম, আর এক জগৎ।

হঠাৎ খিলখিল হাসির শব্দ শুনে চোখ তুলে চেয়ে দুষ্টু মেয়েটার কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

পা টিপে টিপে যাদবের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে সেই ভাঙা পুরনো সোলা আর রাংতায় গড়া মুকুটটা যাদবের মাথায় পরিয়ে দিয়ে হাততালি দিয়ে হাসছে।

যাদব টের পেয়ে ফিরে তাকাল, তারপর সস্নেহে ধমক দিয়ে বলল, 'খুব দুষ্টুমি হচ্ছে!' মুকুটটা সে খুলে ফেলতে যাচ্ছিল মেয়েটি তার হাত টেনে ধরে বলল, 'না দাদু, খুলতে পারবে না, থাক।'

যাদব নিরস্ত হয়ে বলল, 'থাকবে? তা হলে থাক। আর কোনও মুকুট তো রইল না দিদি, তোমারটা কতক্ষণ থাকে দেখা যাক।'

তারপর সেই মুকুট মাথায় দিয়েই যাদব কলকেতে করে তামাক সাজতে বসল। যাদবের সেই সং সাজা দেখে মেয়েটা হেসে কুটি কুটি হতে লাগল।

আজ লিখতে বসে আমার সেই যাদব মালাকরের কথা বড় মনে পড়ছে।



স্ত্রৈণ

সন্তোষকুমার ঘোষ

নীরদ ভয় পায়নি। কমলার হিম চোখের স্থির মণি দুটির দিকে চেয়ে থাকতে না। সিঁদুর লেপা ভীষণ সুন্দর কপালটা ছুঁতে ও না। পায়ের দিকে চোখ নামিয়েছে; আঙুলগুলো কঠিন, একটু বা বাঁকানো, আলতায় ছোপানো। বুক তবু কাঁপেনি। রাশি রাশি তাজা ফুল মরা শরীরটায় নিজেই ছড়িয়ে দিয়েছে।

পথে নেমেই ওরা কর্কশ গলায় হরিধ্বনি তুলেছিল। নীরদ চমকে উঠেছে, কিন্তু ভয়ে নয়। ওরা বরং চুপ করে থাকলে ভাল হত। এক পশলা বৃষ্টিতে ভেজা পিচের রাস্তায় ওদের খালি পায়ের ছপছপ শব্দ শোনা যেত।

শ্মশানে ওরা বড় বেশি হল্লা করছিল। কোথা থেকে টেনে টেনে এনে ছুঁড়ে ফেলছিল কাঠ, ঘিয়ের ভাঁড় উপুড় করে ঢালছিল। বিড়ি ধরিয়ে খুক খুক করে কাশছিল কয়েকজন, একজন বিশ্রী একটা গান ধরেছিল। শীতার্ত একটা কুকুর ফিরে ফিরে এসে চিতাটিকে প্রদক্ষিণ করে শরীরটা সেঁকে নিল, নাক উঁচু করে উৎকট গন্ধ শুঁকল হাওয়ায়, তারপর মট্ করে একটা হাড় ফাটতেই কেঁউ করে পিছিয়ে গেল। শোকার্ত অশত্থগাছটির পাতা চুঁইয়ে তখন জল ঝরছে।

একজন বলল. 'কী ঠাণ্ডা মাইরি, আর খানিকটা থাকতে হলে বুকে সর্দি বসবে, ওখানেই শুতে হবে।'

ইশারায় সে চিতাটা দেখিয়ে দিল।

আর একজন ভরসা দিয়ে বলল, 'না, বেশিক্ষণ লাগবে না।' বলেই উপরের দিকে তাকাল। 'আর বৃষ্টি যদি না হয়, তবে বড় জোর আধ ঘণ্টা।'

'বউটা কী হালকা আর রোগা। ভাল করে খেতে পেত না নাকি?' বলেই তৃতীয় একজন আড়চোখে নীরদের দিকে চেয়েছে।

নীরদ একটু দূরে বসে ছিল। ঘাটের সিঁড়িগুলো ধাপে ধাপে নেমে যেখানে জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে, তার কাছাকাছি। দশ-বারো বছরের একটা ছেলে তখন থেকে চোখের জল মুছছে। বোধ হয় মা মারা গিয়েছে। ছুটি ওকে নিয়ে এসেছে মুখে আগুন দিতে হবে বলে। যেটুকু করবার, করা হয়ে গিয়েছে, ছুটি পেয়ে এখন ছেলেটি কাঁদছে। শুধুই কাঁদছে

না, মাঝে মাঝে চোখ খুলে ভাটির দিকে ভেসে-যাওয়া কচুরির গাঢ় সবুজ পাতা আর বেগুনি ফুল অবাক হয়ে দেখেছে। হয়তো ঘাটের সিঁড়ি গুনছে। কিন্তু যে কটা ডুবে আছে, তার আর হিসাব পাবে না। যে কচুরিপানাগুলো ভেসে গেল, জোয়ারের টানে তার কিছু কিছু হয়তো এই ঘাটেই ফিরে আসবে, কিন্তু তার মা আর ফিরবে না। কিন্তু এসব কথা কি ছেলেটি ভাবছে? ওই বয়সের ছেলেরা কি কিছু ভাবে, ভাবতে পারে?

আসলে, গায়ের চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নীরদ টের পেল, তার নিজের ভাবনাই সে ছেলেটির উপর আরোপ করেছে। কমলা আর ফিরবে না। কাল রাতে ছিল, ভালবেসেছিল, আজ সকালে ছিল, ঝগড়া করেছিল। একসঙ্গে খেতেও বসেছিল দুজনে।

হঠাৎ জল খেতে গিয়ে কমলা বিষম খেল, নীরদ ধমক দিয়ে বলে উঠল, 'সব কাজে তোমার তাড়াতাড়ি।'

আরও কী বলবে মনে মনে ঠিক করেছিল, কিন্তু বলতে হল না। কমলার হাত থেকে খসে গ্লাসটা তখন মেঝেয় খান খান হয়ে পড়েছে। সেই কাচের টুকরো আর জলের মধ্যেই শুয়ে পড়েছে কমলা, ছটফট করছে।

তাড়াতাড়ি পাখাটা জোরে চালিয়ে দিল নীরদ, জানলা-দরজা খুলে বাইরের রোদ আর হাওয়ার কাছে সাহায্য চাইল।

'বড় কষ্ট।'

কমলার মাথাটা নীরদ তুলে নিল কোলে, ওর জামা-কাপড় ঢিলে করে দিয়ে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

ওরই ফাঁকে একবার উঠে নীচের দোকান থেকে ফোন করে ডাক্তারকে খবর দিতে পেরেছিল।

ডাক্তার ঘরময় ছড়ানো জল আর কাচের টুকরোগুলোর দিকে তাকালেন, চশমার আড়ালে সন্দিগ্ধ ভ্রূ কুঞ্চিত হল, বিরক্ত ঠোঁট উলটে নাড়ি দেখালেন, মাথা নাড়লেন আস্তে আস্তে। কমলার চোখের অপলক মণি ততক্ষণে স্থির হয়ে এসেছে।

নীরদ তখন ভয় পায়নি।

অশত্থগাছের পাতা থেকে টুপটাপ করে জল ঝরছে, কনকনে হাওয়া চিতার আগুনটাকে ঝুঁটি ধরে নাড়ছে! আর জ্বালা জুড়তে নিস্তব্ধ নীল একটি নদীর জলে ঘাটের কয়েকটি সিঁড়ি ডুব দিয়েছে — একটু ছমছমে ভাব, কিন্তু একে ভয় বলে না!

পিঠে কে হাত রেখেছে। নীরদ চমকে ফিরে চাইল। পাশের বাড়ির ভদ্রলোক। উদ্যোগী হয়ে তিনিই সব ব্যবস্থা করেছেন, ডেকে এনেছেন শ্মশানবন্ধুদের।

'ফুরিয়ে গেছে। জল ঢেলে দেবেন আসুন।'

সম্মোহিত নীরদ ভদ্রলোককে অনুসরণ করেছে।

সব ধোঁয়া নিবে গিয়েছে, সব ছাই ধুয়ে গিয়েছে।

নীরদ চলে আসবে, সেই ভদ্রলোকই ওর হাত ধরে টেনেছেন।

'ওদের কিছু দিন। পরিশ্রম হয়েছে, ওরা চা খাবে।'

নীরদ বাক্যব্যয় না করে একটা দশ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়েছে।

'আমি এবার যাই।'

'কোথায় যাবেন?'

'বাসা —বাসাতেই যাব।'

'একটু দাঁড়ান। আমিও আসছি।'

নীরদ অন্য সময় হলে হেসে উঠত। ভদ্রলোক ওকে একা ছাড়তে ভরসা পাচ্ছেন না। যথাসাধ্য নম্র গলায় নীরদ বলল, 'না, আমি একাই যাব।'

ওর স্থির, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভঙ্গি দেখে ভদ্রলোক হয়তো একটু ভয় পেলেন। বললেন, 'আচ্ছা, আসুন।'

তখন পায়নি, কিন্তু নীরদ ভয় পেয়েছে পরে, বাসায় ফিরে এসে।

প্রথমে অভ্যাসবশে বিজলি ঘুন্টির বোতাম টিপেছিল। দরজা খুলল না, হালকা চটিপরা পায়ের পরিচিত শব্দ শোনা গেল না, নীরদ ভয় পেল। সে-ভয়টা মাছির মতো উড়ে এল, একটু অস্বস্তি হল, কিন্তু তাকে তাড়াতেও সময় লাগল না। কমলা নেই, দরজা খুলবে কে? ভয় গেল, তবু ফোকর খুঁজে চাবি পরাতে গিয়ে নীরদকে গলদঘর্ম হতে হল। ঝিমোবে বলে আয়েসি একটা বিড়াল প্যাসেজের নিরালা কোণটি বেছে নিয়েছিল। আলোয় বিব্রত, পায়ের শব্দে চকিত হয়ে সে ছিটকে তাকটার উপরে গিয়ে বসেছে। শোবার ঘরে পা দিতে না দিতে কয়েকটা প্রগল্‌ভ চড়ুই ফরফর করে জানলার বাইরের আকাশে ফেরারি হয়েছে।

চোখে আলো লাগছিল, নীরদ দু-হাতে পর্দা টেনে ঘরে ছায়া বিছিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে, ঠিক ভয়ে নয়, শরীরের সব কটি পেশি সহসা যেন কঠিন হয়ে গেল।

এতক্ষণ বেশ ছিল ঘরটা, ছড়ানো, গড়ানো চওড়া। হঠাৎ ছোট হয়ে গেল। এই রকমই হয়, নীরদ জানে। আলোয় দেওয়ালগুলো আলাদা হয়ে সরে সরে থাকে, যেন কেউ কাউকে চেনে না। কিন্তু যেই একটু একটু করে অন্ধকার ঘনায়, দেওয়ালগুলো পা টিপে টিপে তখন এগিয়ে আসে। ওদের ষড় আছে, নিশুতি রাতে একে অপরের গা ঘেঁষে দাঁড়াবে। অন্ধকারে আলাদা থাকতে কি ওদের ভয়!

আলো নিভলেই, তাই নীরদ হাত বাড়িয়ে কমলাকে ছুঁয়ে থাকত। এই ছমাস ধরে রোজ।

বিছানাটা পাতাই ছিল; নীরদ ইচ্ছে হলে শুয়ে পড়তে পারত। কিন্তু যাকে ছুঁয়ে থাকবে সেই মানুষটা কই! এই বিছানার চাদরটার মতোই নীরদের অভ্যস্ত জীবন আর নিয়মকে এলোমেলো করে দিয়ে সে চলে গিয়েছে। তবু বালিশে মুখ ডুবিয়ে দিতে তারই যেন খানিকটা ফিরে এল। চুলের গন্ধের সঙ্গে থেঁতলানো বেলফুলের গন্ধ মাখামাখি হয়ে মিশে আছে। শুধু ফুল কেন, চুল কেন, ভাবতে ভালো না। তবু সত্যি, একটু ঘামের গন্ধও আছে— এই তিনে মিলে কমলা। তার শরীর, তার ব্যক্তিত্ব। তাকে চেনবার চিহ্ন। তিনেরই এক কাজ, একজনকেই মনে করিয়ে দেয়। তাকে ছায়া-ছায়া ঘরে ডেকে আনে।

আনে বটে কিন্তু ঠিক তাকে নয়, তার মায়াকে। তাকে তখন ছোঁয়া যায় না, কাছে টানা চলে না। সে থাকে দূরে দূরে, সরে সরে, অলৌকিক কণ্ঠস্বরে।

'কষ্ট হচ্ছে না তোমার?'

'হচ্ছে। খুব।'

কনুইয়ে মুখের আধখানা ঢাকা, নীরদ শুয়ে শুয়ে শুনতে পেল।

'কী করবে তুমি এখন?'

'ঘুমোব।'

'সারা বিকেল?'

'সারা বিকেল। সারা রাত্রি।'

মিছে কথা। একটা মরা মানুষকে মিছে কথা দিয়ে নীরদ ভোলাবে না। সে ঘুমোতেই তো চায়, কিন্তু পারছে কই। পেয়ালায় যেমন করে চা জুড়ায়, এক আকাশ রোদ তেমনই জুড়িয়ে ঠাণ্ডা আর হলদে হয়ে এল, নীরদ তখনও বিছানায় শুয়ে আছে। পিপাসা পেয়েছে, মেটাতে পারেনি, কুঁজো আছে, জল নেই, কেননা কমলা নেই। সারা ঘরে ভাঙা কাচের টুকরো ছড়িয়ে সে চলে গিয়েছে।

দেয়ালে অবশ্য এখনও তার ছবি আছে —সে তো কেবলই ছবি। তবু নীরদ তাকেই নালিশ জানাল, 'এই দেখ না, আমি এখনও সেই জামা-কাপড়েই আছি যা পরে শ্মশানে গিয়েছিলাম। তুমি আমাকে শুকনো কাপড় এগিয়ে দিচ্ছ না। আসল কমলা হলে দিতে।'

'আসল কমলা হলে এতক্ষণ স্টোভে কাপ দুই চা-ও গরম হয়ে যেত। বারান্দার টবটাতে এতদিনে ফুল ফুটেছে, সেখানে বেতের চেয়ারে টেনে বসতাম দুজনে। কথা বলতাম। কী-ই বা বলতাম! হয়তো কিছুই বলতাম না। অন্তত কথা দিয়ে বলতাম না।

'আসল কমলা হলে এতক্ষণ ঘাড়ের নীচে, যেখানে ভাঙা খোঁপা -চোয়ানো তেল, পাউডার আর ফুল বিচিত্র একটা উত্তেজক গন্ধ সৃষ্টি করেছে, সেখানে মুখ রাখতাম। ঘ্রাণ নিতাম। আমার নাক কাঁপত, ঠোঁট স্ফুরিত হত, কলজে অতিসচল হত, আঙুলের ডগা শক্ত।

'কিন্তু তুমি, ছবির কমলা তোমাকে নিয়ে আমি কী করব! হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারি, তার বেশে কিছু না। বড় জোর বুকে চেপে ধরতে পারি, কিন্তু সেখানেও কাঠের ফ্রেমের বাধা, কাচের আড়াল। বাসনার পেষণে ঠুনকো কাচটাই চুরচুর হবে।'

'তোমাকে নিয়ে কী করি ! কিন্তু তার চেয়েও বড় সমস্যা হল, কী করি আমার নিজেকে নিয়ে!'

যতক্ষণ বেদনা ছিল কমলার জন্যে, ততক্ষণ নীরদ নিজেকে শক্ত রাখতে পেরেছে। কিন্তু যেই নিজের কথা মনে পড়ল, অমনই চেতনার আকাশ কুয়াশায় ছেয়ে এল। কী করি, কী করি! আজ রবিবার। অন্য অন্য রবিবার আমরা বেড়াতে যেতাম। কমলা হাঁটতে চাইত। জুতোর স্ট্র্যাপ যতক্ষণ না এই-ছেঁড়ে, এই-ছেঁড়ে হত, ততক্ষণে হাঁটতেই থাকত। সো-কেশে সাজানো বেসাতি চোখ দিয়ে চাখত। যেদিন বেড়ানো ছিল না, সেদিন গান শোনা ছিল কিংবা ছবি দেখা কিংবা কিছু না, শুধু বসে থাকা। আমার সব কটি বিকেলের স্বত্ব ওকে বিনা শর্তে দান করেছিলাম। সেই বিকেল আমার হাতে অফুরন্ত অনন্তকাল হয়ে জমে রইল, একে নিয়ে কী করি!

যখের-ধন-পাওয়া দিশাহারা মানুষের মতো নীরদ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। একটা সিগারেট ধরিয়েছিল, নির্নিমেষ চোখ চেয়ে রইল তার ধোঁয়ার দিকে। যেন ওর সব প্রশ্নের জবাব ওই ধোঁয়ার রেখায় রেখায় লেখা হয়ে যাচ্ছে।

সিগারেটের ধোঁয়ায় কখনও মুখের ছায়া পড়ে না, কিন্তু মনটাকে স্পষ্ট পড়া যায়, কিন্তু একথা নীরদ এর আগে তো কোনও দিন ভেবে দেখেনি।

আবার দরজায় তালা দিল নীরদ, রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

বেলা বলল, 'আরে নীরদবাবু যে, আসুন আসুন। তারপর? পথ ভুলে নাকি?'

পর পর কয়েকটা সিগারেট টেনে আর খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিয়ে নীরদের স্নায়ু শক্ত হয়েছিল। হেসে বলল, 'ভুলে নয়, চিনে।'

এসব জায়গায় জুতসই জবাব দেয়াই রীতি।

বেলা ভ্রূভঙ্গি করল, মুচকে হাসল একটু, শেষে বলল, 'আপনি বসুন, এখুনি আসছি।'

বলেই ওঘরে গেল, যেতে যেতে দু ঘরের পর্দাটা টেনে দরজা-জোড়া করে দিতে ভুলল না। পর্দাটা টানবার সময় ঘাড় ফিরিয়ে একটু হাসল।

সে-হাসির যা-খুশি-তাই মানে করা যায়; কোনও মানে নাও থাকতে পারে।

অবশ্য মানে নিয়ে ব্যস্ত হবার দরকার বোধ করেনি। কেননা মাথার উপরে পাখাটা, অনলস এবং বিশ্বস্ত, ঘুরছিল, চেয়ারটা হেলানো অতএব আরামপ্রদ, আর হাতের কাছেই সচিত্র একটা সিনেমা-কাগজ আধ-খোলা। ব্যস্ত হওয়ায় পড়বার ফুরসুত নেই, একটার পর একটা পাতা উলটে যাচ্ছিল। হয়তো একটু আগে পত্রিকাটা ছিল তন্দ্রাতুর বেলার হাতে। সেও সম্ভবত এক বর্ণ পড়েনি, শুধু ছবি দেখেছে। হাওয়া পড়ে না, পড়তে জানে না। মেয়েরা জানে তবু পড়ে না। ছবি দেখে। থাকলে।

যে হাওয়া নিরক্ষর এবং অন্ধ, শুধু পাতা ওলটায়, আর আবর্তে সিগারেট ধরানো দুঃসাধ্য। কিন্তু নীরদ অভ্যস্ত, কোনও অসুবিধা হল না। দীর্ঘ একটা টান দিয়ে সে চাইল পর্দাটার দিকে। হাওয়া তো চপল আর উৎসুকও—সে কী পর্দাও মাঝে মাঝে সরায় না? একবারও কি তার সাধ হয় না, ও ঘরে উঁকি দিতে? যে ঘরে বেলা গিয়েছে?

বেলা এ-ঘরে নেই। এখন নেই। নীরদ আছে। বসে আছে। একটু আগে বেলা এখানেই ছিল, নীরদ ছিল না। নীরদ এল, বেলা রইল না। ও-ঘরে গেল।

আসলে, ক্ষয়ে আসা সিগারেটটার দীপ্ত ডগা ইতিমধ্যেই নীরদকে বুঝিয়ে দিয়েছিল বেলা এখন ও-ঘরে ও নেই। কলঘরে গিয়েছে। মুখ-টুখ ভাল করে ধোবে, ঢুলুঢুলু চোখে জল ছিটিয়ে, ফোলা-ফোলা গাল প্রথমে সাবানে পরে শুকনো তোয়ালেয়, আরও পরে স্নো পাউডার ঘষে ঘষে ঘুমের সব আদরের ছাপ মুছে ফেলবে।

মেয়েদের এসব সংকোচের কোনও মানে কী আছে? যেন ঘুম দ্বিতীয় একটা পুরুষ, যাকে নিয়ে বেলা এতক্ষণ ভরদুপুরে দরজা-ভেজানো ঘরে ছিল; চিহ্ন মুখে-চোখে মেখে নীরদের সামনে এসে দাঁড়াতে বেলার এখন লজ্জার অবধি নেই। যতক্ষণ এ-ঘরে ছিল, ততক্ষণ তাই মুখের আধখানা আঁচলে ঢেকে রেখেছিল।

বেলার কাছে যে ঘুম পুরুষ, নীরদের কাছে সে-ই আবার মেয়ের বেশে দেখা দিতে পারে, 'চোখ বোজ তো' বলেই মনের সব ভাবনার আলো নিবিয়ে দিয়ে, বুকের ভিতরে মুখ লুকিয়ে, মিশে গিয়ে, সত্তাকে অবশ করে দিতে পারে। ততক্ষণ বেলা কলঘরে জল ঢালুক, কিংবা পা টিপে টিপে পাশের ঘরে ফিরে জামা বদলাক, পাটভাঙা শাড়ির চকচকে খোলসে

নতুন হোক। তখন কৌতূহলী হাওয়া পর্দা সরিয়ে ও-ঘরে যত খুশি উঁকি দিক না, ক্ষতি নেই।

'ঘুমিয়ে পড়লেন?'

চকিত নীরদ চোখ মেলল। বেলা স্নান সেরে এসেছে। কনুই রেখেছে ওর চেয়ারের হাতলে, ছোট্ট মোড়াটা টেনে মুখোমুখি বসেছে। মুখ টিপে হাসছিল কিনা নীরদ বুঝতে পারল না, চোখ রগড়ে সোজা হয়ে বসল, তবু জড়তা গেল না, তখন হাই তুলল।

'ঘুমোইনি তো। চোখ বুজে ছিলাম।' এইটুকুই যথেষ্ট হত, তবু নীরদ যোগ করল, 'ভাবছিলাম।'

'আজকাল আর দেখতে পাই না যে! ডুমুরের ফুলটি হয়েছেন।'

'না তো।' নীরদ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'তবে হ্যাঁ, এই, কাজ থাকে।'

'বুঝেছি।' বেলা বলল, 'বউ কাকে। নীরদবাবু, তুমি তো বিয়ে করেছিলে, না? তা বউ কোথায়?'

নীরদ ফস করে বলল, 'নেই।'

'নেই?'

একবার ঢোক গিলল নীরদ, বলল, 'মানে, এখানে নেই।'

'বাপের বাড়ি বুঝি?'

নীরদ ঘাড় কাত করল।

'হঠাৎ বুঝি?'

নীরদ বিরক্ত হয়ে উঠছিল, থামাচ্ছিল। এই জেরার যেন শেষ নেই! ঘরে ছায়া নেমে এসেছে. বিকালের রোদের গায়ে পাকা পেয়ারার রং ধরেছে, নীরদের মনে হল সেটা থকথকে বুড়োটে— নরম, বিস্বাদ। নীরদ নিজেও যেন অক্ষম হয়ে পড়েছে।, ফোকলা মাড়িতে পেয়ারাটাকে চেপে ধরাতে চাইছে, পারছে না, লালায় মাখামাখি হয়ে পেয়ারাটা কেবলই ফসকে ছিটকে পড়ছে।

অস্থির হয়ে নীরদ হাতের সময়-ঘড়িটার দিকে চাইল তারপর বেলার সময়হীন চোখে। বলল, 'চলো না, যাই, একটু ঘুরে আসি।'

সে-কথা বেলা শুনতে পেল না, অন্তত ভান করল না শোনবার। কনুইটা এগিয়ে এনে এবার রাখল নীরদের হাঁটুতে, আর এক হাতে গাল রেখে বলল, 'বললে না তো নীরদবাবু, বউ হঠাৎ বাপের বাড়ি গেল কেন?'

'না, ঠিক হঠাৎ নয়,' এখন ঘাম নেই, তবু নীরদ রুমাল বার করে কপাল মুছল।—'না ঠিক হঠাৎ নয়। শরীর খারাপ হল, মানে এই সময়ে, প্রথমবারে, ওরা সবাই বাপের বাড়ি যায়।'

'ও', বেলা বলল পা দোলাতে দোলাতে। চোখ ছোট করে বলল, 'বুঝেছি।'

তাড়া-খাওয়া চোরের মতো দ্রুতত্রস্ত হাওয়া হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ল , কাঁপতে থাকল পর্দার আড়ালে, ঢুকল খাটের নীচে, চাদরের ঝালরটা শুধু থেকে থেকে কাঁপতে থাকল।

জানলা বন্ধ করে দিয়ে এল বেলা, এবারে চেয়ারের হাতলে বসল। হয়তো স্বেচ্ছায়, হয়তো ভার সামলাতে একটা হাত রাখল নীরদের কাঁধে। পায়ের বুড়ো আঙুল একবার

বাঁকাল, সোজা করল, ফের বাঁকা করল, তারপর শাড়ির পাড়ে সবটাই ঢেকে ফেলল। নীরদ আড়চোখে চেয়ে দেখতে পেল, বেলার চোখে এখনও দুষ্টুমি। আস্তে আস্তে ওর কাঁধ ধরে, ঝাঁকুনি দিয়ে বলছে, 'বলো না নীরদবাবু, এসময়ে তোমাদের বউয়েরা কী করে। বাপের বাড়ি যায়, আর কী? খুব ঘুমোয়, পড়ে পড়ে, না? যাচ্ছেতাই সব জিনিস খুঁটে খুঁটে খায়?'

'খায়।'

'আর তোমরা, তোমরা তখন আমাদের কাছে আস, কেমন?'

হাততালি দিতে গেল বেলা, বার সামলাতে পারল না, কেননা শাড়ির পাড় দিয়ে সম্পূর্ণ করে ঢাকা পা দুটি তখনও ছিল উঁচুতে, গড়িয়ে পড়ছিল, নীরদ হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল, কিন্তু ফেলল না, বরং টানল, টানতেই দু হাতের অঞ্জলি একটি নরম, মসৃণ মুখের স্পর্শে ভরে গেল।

তারপর, তারও অনেক পর, অন্ধকার নামল। নামল নাকি বেরিয়ে এল ঘরেরই কোণ থেকে, যেখানে দুখানি ইটের উপরে তোরঙ্গ আর সুটকেশ সাজানো; রোজ ভোরে অন্ধকার ভয়ে ভয়ে সরে সরে তোরঙ্গের নীচে লুকিয়ে রোদের থাবা থেকে গা বাঁচায়। আবার সন্ধ্যা হতেই ভিতু কচ্ছপের মতো গলা বাড়িয়ে দেয়। আস্তে আস্তে তার সাহস বাড়ে, ক্রমে নিজেকে ছড়ায়, গোটা ঘরখানাই ছেয়ে ফেলে। এই পৃথিবীটা নিমেষে একটা অতিকায় কচ্ছপ হয়ে যায় নাকি, নীরোম-নরম তলপেটে আলো লুকিয়ে একপিঠ অন্ধকার নিয়ে কাঁপে?

কান পাতলে শোনা যায়, নীরদের সমস্ত ইন্দ্রিয়ই এখন শুধু অনুভূতি আর শ্রুতি হয়ে গিয়েছে। তাই সে-ও শুনতে পেল, সেই অন্ধকারও এক সময় গুন গুন করে ওঠে। অন্ধকার নয়, বেলা। বেলা গুনগুন করছে।

নীরদ নিজেকে বলতে শুনল, 'একটা গান করবে?' কোলের শীতলে ডুবিয়ে রাখা মুখ তুলে বেলা বলল, 'এখন, এইভাবে?'

'এইভাবে।'

নীরদ দৃঢ়, গাঢ় গলাতেই বলছিল, তবু বেলা শুনল না, হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আলো জ্বেলে দিল, ঘরের কোণ থেকে এল একটা বাজনা। নীরদ তখন দু-হাতে চোখ ঢাকল।

খানিক পরে গান থামিয়ে বাজনাটা ঠেলে দিয় উঠে দাঁড়াল, আবার সেই আগের মতোই নীরদের খুব কাছে এসে বলল, 'নীরদবাবু, তোমার বউ গান জানে?'

'জানে।'

'গায়? শোনায় তোমাকে?'

'শোনায়।'

'রোজ?'

নীরদ বলল, 'রোজ।'

বেলাকে আবার প্রগল্‌ভতায় পেয়েছে, দু-হাত বাড়িয়ে গলা জড়িয়ে ধরল নীরদের, আধো-আধো গলায় বলল, 'তোমার বউ রোজ আর কী করে, নীরদবাবু?'

'রান্না করে খাওয়ায়।'

'কখন বাড়ি ফিরবে, সেইজন্য বসে থাকে?'

'থাকে।'

'বিকেল হতে না হতে গা ধোয়, খুব সাজগোজ করে?'

'করে।'

'রোজ?'

'রোজ।'

ওর বুকে তর্জনী দিয়ে টোকা দিতে দিতে বেলা বলল, 'আর, আর কী করে?'

'আর,' নীরদ হঠাৎ প্রবল আবেগে বেলার মুখখানা বুকে চেপে ধরে বলল, 'আর, অনেকক্ষণ ধরে, আমার সঙ্গে এইভাবে মিশে থাকে।'

সোজা উঠে এসে দরজায় ফোকরে চাবি গলিয়ে দিল নীরদ, আর ভয় করল না। একেবারে শোবার ঘরে ঢুকে আয়নার সমুখে দাঁড়াল। চোখের মণি এখনও কি বিস্ফারিত, নাকের ডগা স্ফীত ? ঠিক বুঝল না। কাচটা যেন ঘষা-ঘষা।

পকেটে হাত দিল, উঠে এল বেলফুলের মালা। কখন বেলার খোঁপা থেকে ওর আঙুল মালাটা খুলে নিয়েছে, মনে নেই তো। ফুলগুলো তুলে নাকের কাছে ধরল, জানা-জানা গন্ধ। কার? বেলার, না, কমলার? ঠিক চেনা গেল না।

কমলার ছবিটার দিকে চোখ পড়ল তখন। প্রথমে চমকে উঠেছিল, দু-পা পিছিয়েও গিয়েছিল ভয়ে, কিন্তু পর মুহূর্তেই সাহসে ভর করে নীরদ এগিয়ে গেল। মালাটা ঝুলিয়ে দিল ফ্রেমে। জোর করে হাসল। তারপরে খুব কোমল, অবুঝকে লোকে যে সুরে বোঝায়, সেই সুরে বলল, 'জানি, তুমি আমাকে অবিশ্বাসী ভাববে, রাগ করবে। বলবে, একটা দিনও তোমার তর সইল না? কিন্তু এ-রাগের কোনও মানে হয় না। বোকা মেয়ে, কিচ্ছু বোঝ না। আমি তো এতক্ষণ তোমার সঙ্গেই কাটালুক।'

কাচের উপরে আঙুল ঘষে আদর করতে করতে নীরদ আবার বলল, 'ওই দেখ তুমি বিশ্বাস করছ না! বলছ, তোমার সঙ্গে নয়, বেলার সঙ্গে । বেলা নয়, বেলা নয়, সত্যি বলছি, তুমি, তুমি, তুমি। আর কেউ নয়। রোজ ঘরে ফিরে তোমাকে পাই, আজ পেলাম না। সব ফাঁকা ঠেকল। ঠেকল বলেই তো—'

নীরদ হঠাৎ থেমে গেল। সে বুঝতে পেরেছে। বেলা তো নয়ই, কমলাও নয় কেউ নয়। অভ্যাস।

তাড়াতাড়ি সরে এল নীরদ, বারান্দায় দাঁড়াল। বৃষ্টি-ভেজা পিচের পথে ওর আসল মনের ছায়া পড়েছে। সেই ছায়া সব জানে তাই নীরদ তাকেই জিজ্ঞাসা করল : আমরা কি তবে বিশেষ কাউকে নয়, আসলে কয়েকটা অভ্যেসকেই ভালবাসি? হঠাৎ একটা দাঁত পড়লে ফাঁকা লাগে, গালের ভিতরে জিভ ঘুরিয়ে হারানো দাঁতটাকে খুঁজি। সিগারেট ফুরিয়েছে জেনেও পকেটে হাত ঢুকিয়ে প্যাকেট হাতড়াই। সবই কি তাই ।

নির্ভয়, নির্ভার নীরদ আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

ইন্টারভিউ

বিমল কর

কনক হাসতে হাসতে ধনুকের মতন বেঁকে ক্রমশ নুয়ে গেল। হাসির দমক আর থামে না, শেষে আর দম নিতে না পেরে গলা বন্ধ হয়ে এল। কয়েক মুহূর্ত পরে ধনুকের ছিলে কেটে যাবার মতন তার শরীর সোজা হল। সোজা হয়ে বসে হাঁপাতে লাগল, মুখ হাঁ করে, বড় বড় শ্বাস নিতে শুরু করল। হাসির দমকে তার চোখের কোলে জল এসেছে, মুখল টকটকে লাল।

অনুকূলচন্দ্র এতক্ষণ একদৃষ্টে কনকের হাসি দেখছিলেন, এবার স্ত্রী আশালতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একে এক গ্লাস জল এনে দাও, গলা শুকিয়ে গেছে।'

আশালতার কোলে উলের গোলা, হাতে কাঁটা; উল বুনতে বুনতে হাত কখন থেমে গেছে, মুখে কেমন উদ্‌বেগ। এমন করে কেউ হাসে নাকি! বাব্বা, কী মেয়ে!

বোনের দিকে তাকিয়ে আশালতা বলল, কী সৃষ্টিছাড়া হাসি তোর! আমার সামনে ওভাবে হাসিস না, ভয় করে। .....জল খাবি?'

কনক আঁচলে মুখ মুছে নিল, চশমাও মুছল। তার চোখে-মুখে তখনও হাসির ছটা লেগে আছে, তবু হাসির দমকে ক্লান্ত হয়েছে সামান্য। কনক বলল, 'বারে, দোষ আমার!' বলে আড়চোখে অনুকূলচন্দ্রকে দেখিয়ে বলল, 'হাসাচ্ছেন উনি, আর আমি হাসতে পারব না।'

আশালতা উঠল। এক গ্লাস জল হাতের কাছে থাকা ভাল। যে ভাবে মেয়েটা হাসে, এক নাগাড়ে, ভয় করে।

যেতে যেতে আশালতা বলল, 'তোর চাকরি হবে না। অসভ্যর মতন হাসিস। তোকে কে কলেজে পড়াতে নেবে?'

আশালতা চলে গেলে কনক পুরনো হাসির কথাটা মনে করতে করতে বলল, 'আপনাদের কলেজে এমন রত্নটিকে কোথা থেকে আনা হয়েছে জামাইবাবু?'

'পাটনা।'

'গোরু!'

'তুমি কি কলকাতার মোষ দেখবে, তাও আছে।'

'ইশ্ নিজে কোথা থেকে এসেছেন?'

'আমরা এখানে সাতজন কলকাতার রয়েছি। তার মধ্যে পাঁচজন পুঃ, দুজন স্ত্রী। মেজরিটি।'

'পুঃ আবার কী?' কনক চোখ উঁচিয়ে শুধলো, ততক্ষণে আশালতা জল নিয়ে ফিরে এসেছে।

অনুকূলচন্দ্র বাঁকা চোখে স্ত্রীর দিকে একটিবার তাকিয়ে নিলেন, তার পর বললেন, 'একসময় ওটা পুং ছিল, আমরা পুরুষেরা প্রবল ছিলাম, প্রতাপ ছিল আমাদের। হাতে 'ং'-এর তরোয়ালটি থাকত। এখন তরবারি ভগ্ন, দুর্বল 'পুঃ', তুচ্ছার্থক 'পুঃ'- ও বলতে পার।'

কনক আবার হেসে উঠল।

আশালতা বলল, 'তা পুঃ কেন, ফুঃ বললেই হয়।'

অনুকূলচন্দ্র মাথা নোয়ালেন, সবিনয়ে বললেন, 'ন কস্মমাত্মনঃ প্রিয়ং করিষ্যে।'

'সংস্কৃত জানি না— সোজা বাংলায় বলুন'। কনক বলল। বলে আশালতার হাত থেকে জলের গ্লাস নিয়ে ঢকঢক করে সবটুকু খেয়ে ফেলল। শীতের দিনেও ঠাণ্ডা জল অতটা খেয়ে বেশ আরাম পেল কনক।

অনুকূলচন্দ্র বললেন, 'ওটা পুরুষের গুরুমন্ত্র। স্বয়ং কালিদাস দুষ্মন্তর মুখ দিয়ে বলিয়েছিলেন। তুমি তো ভাই পুরুষ নও, বিয়েও করনি, করব করব মনে করে কোনও প্রিয়জনের সঙ্গে ঘোরাফেরাও করছ না। ওর মানে তুমি বুঝবে না। ওটা আমাদের ইষ্টসাধনের মন্ত্র।'

আশালতা ততক্ষণে নিজের জায়গায় বসেছে। বলল, 'যখন তখন তোমার ওই সংস্কৃত শ্লোক, না হয় বাংলা কাব্যি আওড়ানো।.... কাজের কাজ কী করছ বলো। যেমন ভগ্নীপতি, তেমনি শালি। আগে কাজের কাজ মিটুক, তারপর যত খুশি হাসিঠাট্টা করো।'

অনুকূলচন্দ্র চিন্তিত হবার ভান করে একটা সিগারেট ধরালেন। ধোঁয়া গিলতে ও ছাড়তে লাগলেন। আশালতার দিকে তাকালেন একবার। চোখের দৃষ্টিতে কোথাও যেন একটা মতলব ছিল বা ফন্দি। কনক আসার আগে স্ত্রীকে রীতিমতো সব বুঝিয়েছেন, আশালতা সহজে কি বুঝবে। যাহোক, এখন পর্যন্ত আশালতা কোথাও কিছু মচকায়নি।

কনক বলল, 'আপনি জুবিলি কলেজের পুরনো, সিনিয়ার প্রফেসর, সংস্কৃত আর বাংলা ডিপার্টমেন্টের হেড। আপনার কোনও ভয়েস নেই।'

অনুকূলচন্দ্র জবাব দিলেন, 'আমি তো এখানে প্যাসিভ ভয়েস—'তাঁর দিকে একবার স্ত্রীর দিকে পড়ল, তারপর মুখ ফিরিয়ে কনকের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোমার ব্যাপারটায় যে অ্যাকটিভ ভয়েস— সে হল ওই কুসুম হালদার । ওই ছোকরাই বটানি ডিপার্টমেন্ট চালাচ্ছে।'

পুরনো কথা মনে পড়ায় কনক হেসে ফেলল, বলল, 'তার মানে যা করার তা করবে ওই বটানি ব্রহ্মচারী।'

আশালতা বলল, 'কুসুমবাবুকে তো তুমি বললে পার। তোমার শালি জানলে......'

'শালা জানলে হত, শালি জানলে হবে না।'

'কেন হবে না?' কনক তর্ক করার মতন করে বলল।

'হবে না, কুসুম তার ডিপার্টমেন্টে মেয়ে লেকচারার নেবে না।'

'বা বাঃ, মজা আর কী! কেন নেবে না! আপনার কলেজ কো-এডুকেশান, প্রফেসারস

স্টাফেও কজন মেয়ে আছেন। আর আমার বেলায় হবে না। কই বিজ্ঞাপনে আপনাদের কলেজ-কমিটি তো লিখে দেননি, মেয়েরা দরখাস্ত করতে পারবে না—বরং উলটো কথাই লেখা ছিল।'

অনুকূলচন্দ্র জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, বললেন, 'না হওয়াটা অত্যন্ত অন্যায়। জুবিলি কলেজ নতুন, কিন্তু তার ঐতিহ্যে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ নেই। সারা বিহারে এরকম একটা কী বলে যেন..... সহাবস্থানের প্রিনসিপল মেনে চলা কলেজ তুমি আর পাবে না... কিন্তু ওই যে, যা বললাম, আমাদের বটানি-কুসুম সাংঘাতিক রকমের 'পুং'। মেয়েদের দু-চোখে দেখতে পারে না। .... আরে কলেজে নিজেদের কলিগ—চার-পাঁচজন মহিলার ছায়া মাড়াবে বলে নিজের ডিপার্টমেন্টের ঘরে সব সময় বসে থাকে যে মানুষ— সে তোমায় তার আণ্ডারে চাকরি দেবে! অসম্ভব!'

'চাকরি দেবার মালিক নাকি উনি?' কনক এবার বেশ রেগে গেছে।

অনুকূলচন্দ্র বললেন, 'তা খানিকটা তো তাই। কাল যখন ইন্টারভিউ দিতে যাবে, দেখবে কমিটির একজন মেম্বার, আমাদের প্রিনসিপ্যাল সাহেব আর ওই হতভাগা বসে আছে। ওর ডিপার্টমেন্ট, ওই যা করার করবে, আমাদের এখানে সেটাই নিয়ম কিংবা প্রপার ওয়ে বলতে পার।..... কাজেই চান্স নেই-ই ধরতে পার।'

কনক উত্তেজিত হয়ে বলল, 'ভদ্রলোক এমন অসভ্য কেন?'

'ওই রকমই'।

'আমার প্রপার কোয়ালিফিকেশান রয়েছে। আমার হাই সেকেন্ড ক্লাস।'

'আমার তো মনে হয় ফার্স্ট ক্লাস, সুপিরিয়র ক্লাস।' অনুকূলচন্দ্র চোখ মটকে হাসলেন, 'যে পাবে বক্ষে ধারণ করবে।'

'ইয়ার্কি মারবেন না।.... ভদ্রলোককে আমি ফেস করব। দেখি কী করে। আমি মামলা করব........'

'তুমি তো গাইতে টাইতেও পার।'

'তার সঙ্গে বটানি পড়বার কী সম্পর্ক?'

'না, কিছু নয়। এমনি বললাম। মেয়েদের আর পাঁচটা গুণও তো ধরতে হয়।'

আশালতা এবার বলল, 'তুই তো কী সুন্দর থিয়েটার করতে পারতিস। সেই যে একবার কী একটা বইয়ে যেন প্যান্ট কোট পরে সাহেবও সেজেছিলি। খুব বড় পার্ট......। কী সুন্দর মানিয়েছিল.......'

কনক রীতিমতো রেগে গিয়েছিল, বলল, 'আমি কি এখানে থিয়েটার করতে এসেছি।'

অনুকূলচন্দ্র গভীর মনঃসংযোগে কী ভাবছিলেন, অন্তত সেরকম ভান করছিলেন। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে এবং ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বললেন, 'ওই যে....'

আশালতা তাকালেন, কনকও তাকাল। কনক কিছু বুঝতে পারল না। সামান্য তফাতে কলেজ হোস্টেলের মাঠে কয়েকটা ছেলে ক্রিকেট খেলছে।

অনুকূলচন্দ্র কনককে কাছে ডাকলেন। আঙুল দিয়ে দূরে একটা মানুষকে দেখিয়ে বললেন, 'ওই যে পাজামা পরে হেঁটে যাচ্ছে, গায়ে একটা গরম ফতুয়া....ওই লোকটাই কুসুম হালদার।

ও হোস্টেলেই থাকে, সুপারিনটেনডেন্ট আমি সিনিয়ার, সুপারিনটেনডেন্ট বলে ফ্যামিলি কোয়ার্টার পেয়েছি। ও আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট। কিচ্ছু করে না। সব ঝক্কি আমায় বইতে হয়।..... হতভাগা কি করে পায়চারি করছে দেখছ, যেন কত বড় ফিলজফার!'

কনক বিরক্ত চোখে দূরের মানুষটাকে দেখল। অসভ্য, ডার্টি। কাল একবার দেখে নেবে কনক ইন্টারভিউয়ের সময়। চাকরি হবে না—না হোক, চাকরির জন্যে তার গরজ নেই। নেহাত এখানে দিদি-জামাইবাবু আছে, আর সদ্য সে পাশ করেছে, তাই চাকরি করার শখ হয়েছিল। লোকটাকে কাল শিক্ষা দিতে হবে।

কনক বলল, 'আপনাদের বটানি বেহ্মচারীকে কাল আমি দেখে নেব।'

অনুকূলচন্দ্র হঠাৎ মুখ ফেরালেন, শালির দিকে তাকালেন, তারপর স্ত্রীর দিকে। চোখে মুখে একটা ফন্দি এবং চাপা হাসি ভেসে উঠছে। কনকের হাত ধরে ফেললেন, বললেন, 'একটা কাজ করো না , কালকে হবে অফিসিয়াল ইন্টারভিউ, আজ একবার আনঅফিসিয়াল প্রিভিউ হয়ে যাক না। কুসুম একটু জব্দ হোক। একটা শিক্ষা দিয়ে দাও।' অনুকূলচন্দ্র বললেন।

তারপর কুসুম হালদারকে জব্দ করার যে ফন্দিটা মাথায় এসেছে তা শালি ও স্ত্রীর কাছে ব্যাখা করতে লাগলেন।

আশালতা বলতে লাগল, 'না, না, ছি ছি,— তোমার কি মাথা খারাপ। হোস্টেলে ছেলেগুলো রয়েছে না....!'

কনকও মাথা নাড়তে লাগল। 'যাঃ ফাজলামি আর কি। শেষ পর্যন্ত কেলেঙ্কারি হবে.... না, ও আমি পারব না।'

আশালতা যতই না না করুক তাতে তেমন জোর ছিল না। তার আপত্তিটা কৃত্রিম কি না তাই বা কে জানে!

কনকও অবশেষে নিমরাজি হল। লোকটাকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার বলেই হয়তো।

অনুকূলচন্দ্র বললেন, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই, আমি তো রয়েছি, যথাসময়ে তোমায় উদ্ধার করব।'

কনক হেসে বলল, 'করুন যা খুশি। আমি উঠলাম। যা শীত, স্নান করে রোদ পুইয়ে নিই গে। ..... তারপর খেয়ে দেয়ে নাক ডাকব; কাল গাড়িতে সারারাত জেগে।'

কনক ও আশালতা উঠে গেল।

রাত প্রায় আটটা হবে। হোস্টেলের দোতলার একেবারে এক-প্রান্তের একটি ছোট ঘরে কুসুম বিছানার কাছে হেলানো চেয়ারে পায়ে চাদর ঢাকা দিয়ে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল। বেশ শীত, জানলা প্রায় বন্ধই, দরজা আধ ভেজানো, মোটা একটা পরদা ঝুলছে দরজায় । কাল কলেজ হয়ে বড়দিনের ছুটি শুরু হবে। হোস্টেলে আজ খাওয়া-দাওয়া হাসি-তামাসার ধুম পড়েছে, বেশিরভাগ ছেলেই কাল দুপুর নাগাদ বাড়ি পালাবে। তারপর হোস্টেল ফাঁকা।

কুসুমের পিঠের দিকে টেবিল, টেবিলের ওপর কেরোসিন ল্যাম্প। কিছু বই কাগজপত্র, ঘড়ি, চায়ের কাপ টেবিলে। একপাশে একটা বইয়ের র‍্যাক, উত্তরের দেওয়াল ঘেংষে বেতের

গোল টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত কাগজ।

দরজায় খুব মৃদু টক টক শব্দ হল, তারপর পরদা সরিয়ে একটি মুখ উঁকি দিল।

কুসুম মুখ তুলে তাকাল। 'কে'?

পরদা সরিয়ে একটি মূর্তি প্রবেশ করল। গায়ে লম্বা কোট —অনেকটা অলেস্টার মতন, গলা জড়িয়ে পুরু একটা মাফলার—বুকের কাছে একটা প্রান্ত ঝুলছে, কপাল-কান ঢাকা টুপি, মাথা দেখা যাচ্ছে না। পরনে পাজামা, না কি মালকোঁচা মারা ধুতি—কুসুম ঠিক বুঝতে পারল না। কোনও ছাত্র নয় যে তা বুঝে এবং চোখে চশমা ও বেশ আড়ম্বর দেখে কুসুম যেন কেমন বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল প্রথমটায়, তারপর পিঠ সোজা করে বসতে বসতে বলল, 'কি চাই?'

আগন্তুক অতি ভক্তিভরে হাত তুলে কুসুমকে নমস্কার করল।

কুসুম নমস্কারের বিনিময়ে শুধু একটু মাথা নোয়াল। 'কাকে চাই আপনার?'

মাফলারের প্রান্তটা মুখের কাছে ধরে যেন কাশি সামলাচ্ছে, কনক গলার স্বর লুকোবার চেষ্টা করে বলল, 'প্রফেসার হালদারকে।'

কুসুম ঠিক বুঝল না, কানে কেমন যেন লাগল কথাটা। পিঠ আরও একটু সোজা করল। 'আমিই প্রফেসার হালদার।'

'জানি'।

কুসুম সামনের মূর্তিটির আপাদমস্তক ভাল করে দেখার চেষ্টা করল। টেবিল বাতিটায় তেমন আলো হয় না। হাত বাড়িয়ে বাতির পলতে উসকে দিতেও কেমন সংকোচ হল।

'কী দরকার আপনার?' কুসুম খুব নজর করে মূর্তির পা দেখতে লাগল।

'বসব একটু?' অন্যপক্ষ বলল।

'বসুন'।

বইয়ের র‍্যাকের দিকটায় আবছা অন্ধকার যেখানে বেশ গাঢ়, কনক সেখানে একটা চেয়ার টেনে বসল।

কুসুম অপেক্ষা করল কয়েক মুহূর্ত, বলল, 'বলুন।'

'এখানে বড় ঠাণ্ডা। বেশ শীত।'

'হ্যাঁ। কী দরকার বলুন?'

'এ সময় গরম চা এক পেয়ালা পেলে....'

'এখানে চায়ের ব্যবস্থা নেই।'

'টেবিলে কাপ দেখছি।'

'এটা কলেজ হোস্টেল, চায়ের দোকান নয়।'

'বললে চাকর এনে দেবে না?'

কুসুমের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। হাত বাড়িয়ে আলোটা যতটা পারল উজ্জ্বল করে দিল। দিয়ে ভাল করে কনককে দেখল। তারপর লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল। 'আপনি কে? এখানে কেন এসেছেন?'

কনক মুখ টিপে হাসল। বলল, 'গলার স্বর ধরে চিনতে পারলেন বুঝি।'

'কে আপনি? কী দরকার?'

'বলছি, অত ব্যস্ত কেন...এক পেয়ালা চা পেলে সত্যি বড় খুশি হতুম। গলায় যা ব্যথা...। এই ঠাণ্ডায়...'

'বাড়াবাড়ি করছেন।'

'রাগ করছেন। .... বসুন না আপনি। আমার খুব খারাপ লাগছে। না বসলে কি করে বলি।'

কী ভেবে কুসুম আবার বসল। 'তাড়াতাড়ি বলুন।'

'আমার নাম কনক রায়। বটানি নিয়ে পাশ করেছি এবছর। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি। হাই সেকেন্ড ক্লাস। এখানে চাকরির দরখাস্ত দিয়েছি। কাল ইন্টারভিউ। আপনাকে একটু ধরতে......... মানে এই সামান্য আলাপ-পরিচয় করে যেতে এসেছি।'

কুসুম নাক দিয়ে শব্দ করল অদ্ভুত ধরনের, তারপর বলল, 'এটা কলেজ নয়, হোস্টেল, ছেলেরা থাকে।'

'কেন, ছেলেরা কি বাঘ?'

'না.... মানে এই চেহারায় এরকম পোশাক পরে....'

'মেয়ের পোশাকে রাত্তির বেলায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলে কি ভাল হত। ঢুকতে পেতাম ভেতরে!.... পাঁচজনের চোখে পড়ত। এই পোশাকে কেউ বুঝবে না কিছু । চাকরবাকররা তো দেখল আমায়, কেউ কিছু বলল না।... এক নজরে কি আমায় ধরা যায়— । আপনিও প্রথমে পারেননি।' কনক হাসল। সে মাথার টুপি খুলল, গলার মাফলারটাও সরাল। মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে, গলাটাও আটকে আসছে।

কুসুম কেমন যেন চমকে গেল। কান পেতে বাইরের শব্দ শুনল, তারপর বলল, 'হাসবেন না, জোরে জোরে কথাও বলবেন না। প্লিজ......!'

কনক চোখের কেমন এক ভঙ্গি করল। তারপর বলল, 'আপনি আপনার ডিপার্টমেন্টে মেয়ে লেকচারার নেবেন না। তাই একটু বলতে এলুম।'

কুসুম এতক্ষণে খানিকটা ধাতে এসেছে, 'কে বললে, আপনাকে আমার ডিপার্টমেন্টে মেয়ে-লেকচারার নেওয়া হবে না।'

'শুনলাম। একজন বললেন।'

'তিনি কে?'

'নাম তো জানি না। আমি একজনের চিঠি এনেছিলাম কলকাতা থেকে, তাঁরই জানাশোনা কোনও প্রফেসর আপনাদের কলেজেরই।'

কুসুম ঠোঁট কামড়ে যেন ভাবল। দু পলক দেখল কনককে, তারপর বলল, 'আপনি এখানে ক্যানভাসিং করতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ......না। সুপারিশ ঠিক নয়, রিকোয়েস্ট করতে এসেছিলাম। চাকরিটা আমার বড় দরকার। ঘাড়ে মস্ত ফ্যামিলি।'

'কলকাতায় থাকেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'হরিশ মুখার্জি রোড-এ।'

'বাড়িতে কে কে আছেন?'

'মা বাবা ভাই বোন.... সে অনেক, বড় সংসার ।'

'আপনি ম্যারেড না অ্যানম্যারেড?'

'দেখতেই পাচ্ছেন।'

'ভেজিটেবল সেল আর অ্যানিম্যাল সেল-এ তফাত কী?'

মানুষটা তার সঙ্গে ইয়ার্কি মারছে নাকি। কনক যা যা ভেবে এসেছিল, এখানে এসে দেখছে তার বিপরীত হাওয়া বইছে। কোথায় কনক নেবে 'আপার হ্যান্ড'—জামাইবাবু যা বলে দিয়েছিলেন, তা নয়—ওই কুসুমই এখন 'আপার হ্যান্ড' নিচ্ছে। ব্যাপার কী? এ মানুষ তো—জামাইবাবুর ব্যাখা মতন গোরু বা ছাগল নয়, যথেষ্ট সেয়ানা।

'কী হল, জানেন না? জাল ডিগ্রি নিয়ে এসেছেন নাকি চাকরি খুঁজতে!' কুসুম বিদ্রূপ করে বলল। কনক চটে গেল। কোথাকার একটা পাটনার পাশ করা ছেলে তাকে বটানি বোঝাবে! আস্পর্ধা কত!

কনক বলল, 'তফাত অনেক, যেমন আপনাতে আমাতে।'

কুসুম থ মেরে গেল। কোনও রকমে ঢোঁক গিলে বলল, 'রসিকতা করছেন।'

'আপনিই করছেন। ফার্স্ট ইয়ারের ছেলে যা জানে তা আমায় জিজ্ঞেস করার মানে কী!'

'আপনার তো জাল ডিগ্রি।'

'জাল!'

'পোশাকের মতন।'

'তা হলে আমি বলব আপনি জোচ্চোর।'

কুসুম যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। 'কী বললেন?'

'বললাম আপনি জোচ্চোর।'

'বাঃ চমৎকার! কী ল্যাংগুয়েজ।...... আপনি এসেছেন কলেজে চাকরি নিতে!'

'চাই না আপনার চাকরি।...... এমন অসভ্য মানুষের আন্ডারে কোনও মেয়ে চাকরি করতে পারে না।......

'আপনার মতন সভ্য মেয়েকেও কেউ চাকরি দেবে তা তো মনে হয় না।'

'থামুন। আমায় সভ্যতা শেখাবেন না। নিজে শিখুন।'

'আপনিও দয়া করে চেঁচাবেন না, এটা হোস্টেল।'

'আমি চেঁচাব।'

'লোকে অন্য রকম ভাববে!'

'কী!....' কনকের মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল দপ করে, 'আপনি কী মিন করলেন?'

'তেমন কিছু না, আর পাঁচজনে যা ভাবতে পারে তাই বললুম।'

'অসভ্য, আনকালচার্ড কোথাকার....' কনক রাগে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে উঠে পড়ল। সে চলে যাচ্ছে।

কুসুম দু-লাফে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, পথ আটকে দিল কনকের। 'আরে, আরে... এভাবে যাচ্ছেন কি! মাথা ঠাণ্ডা করে যান। নীচে ছেলেরা রয়েছে। আমার যে চাকরি যাবে।'

'যাক। আপনার চাকরি যাওয়াই দরকার।'

'মাথার টুপিটা পরুন, চুল দেখা যাচ্ছে....। চুলের খুব বিউটি তো আপনার।'

'জংলি কোথাকার।'

'মাফলারটা আরও একটু গলার তলায় নামান, ওভারকোটের কলারটা তুলে বুক... সরি, ছাতি ঢেকে নিন। মানে আপনার..... ছেলেগুলোর যা দৃষ্টি।'

'ইডিয়েট', কনক রাগের মাথায় কুসুমকে ধাক্কা মেরে বেরিয়ে যাবার চেষ্টা করল।

কুসুম দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছে। 'এভাবে আপনি যেতে পারবেন না। মাথা ঠাণ্ডা করুন, যেমন ভাবে এসেছিলেন, সেইভাবে চুপি চুপি চলে যেতে হবে, যেন কেউ জানতে না পারে। আমায় বিপদে ফেলে আপনি পালাবেন, তা হবে না।'

অগত্যা কুসুম গরম টুপিটা মাথায় পরল, মাফলারটা গলায় জড়াল, কোর্টের কলার উঁচু করল। এইসব করতে করতে তার মুখে যা আসছিল কুসুমকে তাই বলে যাচ্ছিল। বাঁদর, গোরু ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগেও কার্পণ্য ছিল না।

এমন সময় বারান্দায় পায়ের শব্দ। কুসুমদের ঘরের দিকেই আসছে। কুসুম আতংকের একটা শব্দ করে দিশেহারা হয়ে কনককে খপ করে ধরে ফেলে টানতে টানতে বিছানার কাছে নিয়ে গেল। 'লুকিয়ে পড়ুন খাটের তলায়..... কী সর্বনাশ! লুকিয়ে পড়ুন...' বলতে বলতে সে টেবিল বাতিটাও নিবিয়ে দিল। ঘর অন্ধকার।

খাটের তলায় আধখানা লুকোতে পেরেছে কনক, অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় সে আঁতকে উঠে শব্দ করল।

কুসুম কনকের পাশে মাটিতে বসে ফিসফিস করে বলল, 'চুপ।'

ঘর অন্ধকার এবং নিঃশব্দ।

বাইরে কে যেন কুসুমকে ডাকল। কুসুম বলল, 'সর্বনাশ! অনুকূলদা.....!'

কনকের বুক ধক্ করে উঠল, 'জামাইবাবু।'

বাইরে অনুকূলচন্দ্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকবার কাশলেন।

জামাইবাবু বলেছিলেন, আমি আছি পেছনে—'তুমি নির্ভয়ে এগিয়ে যাও। —এই কি জামাইবাবুর পেছনে থাকা! কনক রাগে দুঃখে ভয়ে লজ্জায় খেপে গিয়ে হাত বাড়িয়ে কুসুমের জামা ধরে কী যেন বলতে গেল, জামার বদলে কুসুমের চুলের গোছা তার মুঠোয় এল। বেশ করে ঝাঁকুনি দিয়ে কনক বলল, ' এটা কী করলেন আপনি! হাঁদা, গাধা কোথাকার! ঘরের দরজা বন্ধ করে বাতি নিবিয়ে দিলেন যে, এখন কী হবে!...... বাইরে জামাইবাবু!'

কুসুম বলল, 'বড্ড লাগছে, চুল ছাড়ুন।'

'আপনি ঘরের দরজা বন্ধ করলেন কেন?'

'বন্ধ নয়, ভেজানো রয়েছে।'

'ন্যাকামি করবেন না......। অন্ধকার ঘর, দরজা ভেজানো, আমরা দুজন এখানে..... এর কৈফিয়ত কী?'

'কৈফিয়ত দিতে হবে না।...... নেক্সট চান্সে দেখবেন দরজায় খিল দেব।.... প্লিজ। বিশ্বাস করুন। অনুকূলদা জানেন। প্রি-অ্যারেঞ্জ্‌ড....'

কুসুম বোধ হয় হেসে ফেলল। কনক আকাশ থেকে মাটিতে পড়ল। প্রি-অ্যারেঞ্জড!... ও, এই মতলব। অনুকূলচন্দ্রকে হাতের কাছে না পেয়ে কুসুমকেই আবার খামচে ধরল কনক। কুসুম যন্ত্রণায় শব্দ করে উঠল।

কনক বলল, 'জোচ্চোর কোথাকার।'

কুসুম বলল, 'জাল কাঁহাকার।'

তারপর দুজনেই কেন যেন হেসে উঠতে গিয়ে সামলে নিল। যদিও পরস্পরের চোখ মনে মনে পরস্পরকে হাসতে দেখছিল।



বাঘিনী

শক্তিপদ রাজগুরু

বনকাটি-কেষ্টপুরের লোক যাদের দুজনকে বলে মানিকজোড়, একজন পতিতপাবন বনকাটি প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার, অন্যজন লোহার পাড়ার বসন্ত। একেবারে আকাট, অক্ষর পরিচয় তার নাই, কিন্তু দুজনের মানসিকতায় অদ্ভুত মিল রয়ে গেছে।

বনকাটি নামটার মধ্যেই কেষ্টপুরের পরিবেশের পরিচয় রয়ে গেছে। চারিদিকে গভীর বন, বিস্তীর্ণ বনরাজ্য, আর ছোট মাঝারি পাহাড়। সবুজ উপত্যকায় বন কেটে এই কেষ্টপুর গঞ্জ গড়ে উঠেছে। এখন সভ্যতার ছায়া হিসাবে একটা পাকা রাস্তা কেষ্টপুর হাটতলা ছুঁয়ে বনপাহাড় টপকে একটা শহরের দিকে চলে গেছে।

চারিদিকে শাল, জারুল, পিয়াশাল, মুর্গা-আরও কত রকমারি গাছের বন। তবে এখন ফাঁকা হয়ে আসছে।

সবুজ বনের সীমানা হটিয়ে দিয়ে মানুষের হাত থাবা বসিয়েছে মাটির বুকে। সবুজ পাহাড়গুলোর বুকের শ্যামলিমাও মুছে আসবে। রুক্ষ তাম্রাভ পাহাড়গুলো রোদে বর্ষায় কী কাঠিন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পতিত মাস্টারের দুঃখ একটাই। সে বলে, 'সব শেষ করে দিল হে। সকালে পাঠশালায় কাজ সেরে পতিত বের হয় বনের মধ্যে। বনের শাল, মহুয়া, পিয়াল গাছগুলো যেন তার চেনা। মঞ্জরী আসে শালবনে, বাতাস আমন্থর হয়ে ওঠে, বুক ভরে নিশ্বাস নেয় পতিত।'

বর্ষার কালো মেঘ নামে পাহাড়ের গায়ে। পেঁজা তুলোর মতো মেঘ থেকে নামে বৃষ্টির ধারা। তৃষিত মৃত্তিকা, বিবর্ণ পাতাগুলো সেই জল যেন পরিতৃপ্ত হয়ে, চাষি পতিত মাস্টার তখনও বনে। মাটির সোঁদা গন্ধে মেশে কুটিফুলের সুবাস। পতিত মাস্টার যেদিন এমনি বর্ষার সময় বনের মধ্যে নিচু জলার ধারে দাঁড়িয়েছিল হঠাৎ দেখে একটি তরুণকে। — 'কী তুলছ?'

তরুণটি বলে, 'তুলিনি গো, লাগাচ্ছি। গাঁ থেকে পদ্মের কোঁড় এনে বনের জলায় পুঁতছি। সবুজ পদ্মবন হবে জলায়। শাল-পদ্ম ফুটবে, সাজবে বনটা।'

পতিত অবাক হয়। এও যেন আর এক পাগল, তার মতোই। বনকে ভালোবাসে,

বনভূমিকে আবার সবুজ দেখতে চায়।

'কী নাম তোমার?'

'বসন্ত, এই বনকাটির লোহার পাড়ায় ঘর গো মাস্টার।'

অর্থাৎ পতিত তাকে না চিনলেও সে পতিতকে চেনে।

আর তারপর থেকেই দুজনে-দুজনকে চিনে ফেলে।

খুশিতে বসন্ত বলে, 'বর্ষার জলে সারা বন কেমন সেজে ওঠে গো। বড় মন টানে তাই চলে আসি ইদিকে।'

পতিত দেখছে ওকে। বলে পতিত—এই বন, এই গাছ মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে হে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কী বলেছেন জানো? পতিতই জানায় আবৃত্তি করে

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগবণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ—
উর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষপরে—
মৃত্তিকার হে বীর সন্তান
সংগ্রাম ঘোষিলে তুমি মৃত্তিকার দিতে মুক্তিদান
মরুর দারুণ দুর্গ হতে।

গাছই পৃথিবীকে শ্যামল সবুজ করে রাখে, মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, বসন্ত এসব কথা এর আগে শোনেনি। আজ তারও ভাল লাগে। বলে সে ঠিক বলছ মাষ্টার। কিন্তু উরা—উরা শোনে না। বন কেটে, কাঠচোরাই করে ফাঁক করে দিলেক মাস্টার।

'বনকে বাঁচাতেই হবে বসন্ত, নাহলে মানুষ বাঁচবে না।'

বনকাটি কেষ্টপুরের মানুষ দুজনকে তাই বলে পাগলা মানিকজোড়। বসন্তকে নিয়ে অবশ্য তার বউ মালতী পাগলই হবে। দশাসই মরদ বাঁশের বাঁশির সুরে যৌবনবতী মালতীই পাগলই হয়েছিল। তাই তাকে নিয়েই ঘর বেঁধেছে।

কিন্তু তারপর ক্রমশ দেখে বসন্তের হাবভাহ, আর ততই অবাক হয়, এখন রেগেই কাঠ মানুষটার উপর।

হঠাৎ কোথায় চলে যায়, মুনিব বাড়ির চাষের কাজ ছেড়ে। উদাস হয়ে বনে বনে ঘোরে, বাঁশির সুর তোলে নির্জন বনে। চিত্রল হরিণের দল—ময়ূরের পেখম মেলে নাচ দেখে বিভোর হয়।

'কোথায় ছিলি দিনভোর! মুনিব এসেছিল, মাঠেও যাসনি।' মালতীর কথায় বসন্ত বলে।

'সোঁদল ফুল ফুটেছে বনে-চলে গেলাম। ওই লাঙল দিতে ভালো লাগে না!'

'খাবি কী?' মালতী খিঁচিয়ে ওঠে।

বসন্ত বলে, 'বনেব কেঁদ, পিয়াল খাম আলু কত কী আছে।'

'ছাই! লোকে খাটে। রোজকার করে ঘর পাতে, তু কী রে?'

মালতীর কথায় জবাব দেয় না বসন্ত, বাঁশিতে সুর তোলে। কেমন উদাস এক পাগল বনবাউল।

তাই সংসারে এর জন্য মালতীকেই যেতে হয় কাজে, না হয় বনে। বনের শালপাত তুলে এনে কুচিকাঠি দিয়ে সেলাই করে গোল বড় পাতা বানায়, শ-দরুনে কেষ্টপুর হাটের মহাজন কানাই ঘোষের আড়তে দিয়ে কিছু রোজগার হয়, না হয় ভোর বেলাতেই মহুয়ার সময় চলে যায় বনে, রাতাভাব মহুয়ার হলুদ মিষ্টি নেশা আনা ফুলগুলো পড়ে থাকে তলা বিছিয়ে। বস্তাবন্দী করে কুড়িয়ে আনে। নতুন কেঁদপাতা আসে গাছে গাছে। সেই কচিপাতার দামও অনেক। সেই পাতা তুলতে, বনের থেকে জ্বালানি কাঠ আনতে যায় তারা।

সেদিন ডুংরির মেয়েদের সঙ্গে বনে গেছে মালতী। কাঠ-পাতা তুলছে ওরা। লবঙ্গ বলে, 'অ মালতী, গাছের ডাল ভাঙছিস, পাগলা মাস্টার আর তুর মরদ দেখলে কিন্তু মুশকিল হবে।'

ফুলি বলে, 'ছাড়তো! একে মা মনসা তার উপর ধূপের ধুনো। মালতী তোর মরদটাকে সামলা, খাটাতে পাঠা। বনে বনে উদাস হয়ে ঘোরে পাগলা ম্যাস্টারের সঙ্গে তাহলে ঘর করা কেনে রে?'

মালতী তো কথাটা ভেবেছে। নিজেই সব কাজ করে। তাই রাগও হয়। দেখেছে মালতী অন্য মরদদের। তারা কেমন কাজের।

অথচ সংসারের জন্য তাকেই একা খেটে মরতে হচ্ছে।

কানাই ঘোষ বন-কাটি কেষ্টপুরের হাটে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। হাটে তার ছোট্ট দোকান এখন বেশ বড়সড় হয়ে উঠছে। ওদিকে আড়ত।

আর এখন সবচেয়ে চালু ব্যবসা তার কাঠের ডিপো—করাত কল। নিজের ট্রাকে মালপত্র চালান দেয়। ফরেস্ট থেকে পারমিট করিয়ে কিছু শাল, অন্য কাঠ কাটাই করে কিন্তু বুদ্ধির ফেরে আর বাঁ হাতের জোরে এক পারমিট দেখিয়ে চার গুণ ভালো সগা রাতারাতি কাটাই হয়ে বাইরে চলে আসে। করাত কলে সাইজ মতো কাটাই হয়ে যায়।

শালপাতার টাল কেনে কানাই ঘোষ মেয়েদের কাছ থেকে। গোলগাল ঠোঁট কানাই ঘোষের নজর রয়েছে মালতীর উপর। মেয়েটা বেশ হাসিখুশি আর সঠিকদার। তবে বড্ড তেজি। তাই কানাই ঘোষ একটু সাবধানে এগোতে চায়। ওকে হাতে আনতে পারলে কাজে আসবে তার।

তাই সেদিন মালতীকে পাতা বেচতে আসতে দেখে এগিয়ে যায় কানাই ঘোষ।

'কেমন আছিস রে মালতী? তা পাতা এত কম কেন রে?'

মালতী বলে, 'সময় পাই কই! একা হাতে সব করতে হয় যি গো।'

'তা সত্যি! তা বসন্ত ওটা কী করছে? দেখিতো বনেই হিকদারি করে ওই পাগলা মাস্টারের সঙ্গে।'

মালতী চুপ করে থাকে। ব্যাপারটা সেও জানে।

কানাই ঘোষ পরম হিতৈষীর মতো বলে, 'ওটাকে এখানে করাত কলেই পাঠা—না হয় কাঠগোলায় কাজ করবে, কুড়ি টাকা রোজ দেব।'

মালতী অবাক হয়— 'সত্যি!'

'হ্যাঁরে!' কানাই ঘোষ গদগদ স্বরে জানায়।

'তাহলে বলি ওকে।'

বসন্ত অবসর সময়ে তার ঘরের চারিদিকে পতিত ডাঙায় বৃষ্টি জলে ভেজা মাটিতে কিছু শাল, সেগুনের বীজ পুঁতছে। একদিন এই প্রান্তরে ছিল সবুজ শালবন। সব কেমন নিঃস্ব হয়ে গেছে। তাই আবার সবুজ করে তুলছে চায় এই মাটিকে।

মালতীর ডাকে চাইল, —'অ্যাই মরদ কাজ করতে হবেক তুকে! বসে বসে খাবিই, ক্যামন কথা।'

'কাজ! কেনে করছি তো!'

'ই কাজ নয়, ইতো বেগার। ঘোষমাশায়ের কাঠগোলায় কাজ করবি তুই, এক কুড়ি ট্যাকা রোজ দিবেক। চল, চল তু!'

বসন্তকে আজ মালতী টেনে নিয়ে চলেছে। বসন্ত শুধোয়—'কাজটো কী বলবি তো?'

'সি বলবেক ঘোষমশাই। চলতো তু!' মালতী ওকে টেনে এনে হাজির করে কানাই ঘোষের সামনে।

কানাইও মালতীকে দেখছে। তেজি মেয়েটার নিটোল বুক কাঁপছে উত্তেজনায়, ক্লান্তিতে এসেছে সুন্দর পাথর খোদাই করা নিটোল মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

বলে সে, 'লাও মহাজন, বলেছিলা, লিয়ে এসেছি মরদকে।'

কানাই ওকে হাতে রাখতে চায়। তাই বলে, 'ঠিক আছে। তাহলে কাঠগোলায় কাজে লেগে যা।'

বসন্ত আর সব পারে কাজ ছাড়া।

মালতী ওকে নিয়ে বিপদে পড়েছে। যখন তখন বনে বের হয়ে যায়। কোন গাছে নতুন ফুল এসেছে, কোথায় কোন খরগোসের দল, হরিণের দল ঘুরছে তার জানা।

কিন্তু কাজ! তবু যেতে হয় তাকে মালতীর চাপে।

মালতী ঘর গড়তে চায়। জমি-খেতি করবে। তার ঘরে আসবে একটি নতুন অতিথি। তার চাই টাকা, কিছু নির্ভর। তাই বসন্তকে কানাই ঘোষের করাত কলে পাঠায়। সেখানে গিয়ে চমকে ওঠে বসন্ত। গাছের গুঁড়িগুলো মরা পড়ে আছে। একদিন সবুজ পাতায় ফুলে সেজেছিল। নিষ্ঠুর কুঠারের আঘাতে তাদের কেটে এনে ওই ধারালো ইলেকট্রিক করাতে ফেলছে। কর্কশ শব্দে ধারালো দাঁত বের করে একটা দৈত্য যেন সেই সবুজ সুন্দর অরণ্যশিশুদের কেটে-ফালা ফালা করছে।

এই কর্কশ আর্তনাদ যেন বসন্তের কানে বাজে।

সে সরে আসে। বলে, 'এমনি করে গাছগুলোকে চুরি করে শেষ করো ঘোষমশাই।

তুমি তো সাংঘাতিক লুক হে।

কানাই ঘোষ বলে অমায়িক স্বরে, 'ও গুলোকে না কাটলে আমাদের পেট চলবে কী করে?'

বসন্ত বলে, 'তুমি মানুষ খুন করতে পারো। ই কাজ আমি করব নাই—। দরকার নাই তুমার ট্যাকার।' সটান কেটে পড়ে বসন্ত।

হাসছে কানাই। মালতীও খবর পেয়ে এসেছে ওর কাছে। তার সংসারে এখন টাকার দরকার, লোকটা তা বোঝে না।

কানাই ঘোষ রাগলেও হাসে। বিচিত্র মানুষ সে। ওর হাসিটা কেমন হৃদয়হীন, কঠিন। বলে সে-বুঝলি মালতী, তোর মরদটাতো দেখে শুনে পালালো। গাছ কাটার কাজ উ করবে না।

মালতী বলে, 'কুঁড়ে, আলসে ওটা। এখন কী হবেক?'

কানাই বলে, 'তোর ভাবনা নাই, আমিতো আছি। শোন, তুই বনে বনে ঘুরিস। ভাল গাছের সন্ধান পেলে বলবি। তারপর কী হবে বলে দেব নে।'

কিছু টাকাও দেয় মালতীকে। আর ফাউ হিসাবে একটু আদরও করে কানাই—'লক্ষ্মী মেয়ে। আরও অনেক টাকা পাবি বুঝলি।'

মালতী রেগে বাড়ি আসে। আজ বসন্তের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবে সে। এমন চাকরিটা ছেড়ে পালিয়ে এল। কিন্তু কোথায় বসন্ত?

বসন্ত তখন বনে। মেঘ ডাকছে বন পাহাড়ে। মেঘগুলো ঠেকেছে পাহাড়ে-বনে। কালো মেঘে বৃষ্টি নামে।

পতিত মাস্টারের আবৃত্তি শোনা যায় বনের মধ্যে—বসন্ত তার মুগ্ধ শ্রোতা।

ইন্দ্রের অপ্সরা আসি মেঘে মেঘে হানিয়া কঙ্কণ
বাষ্পপাত্র চূর্ণ করি সীমানৃত্যে করেছে বর্ষণ
যৌবন অমৃতরস-তুমি তাই নিলে ভরি ভরি
আপনার পত্রপুষ্পপুটে, অনন্ত যৌবন করি
সাজাইলে বসুন্ধরা।

বনে বনে বৃষ্টির সুর। পাতায় পাতায় বৃষ্টির বিন্দু ঝরে পড়ে, বনের ঝর্নায় সেই সুর বাজে।

বসন্ত মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে ওই অরণ্যরাজিকে পরম মমতাভরে। প্রতিটি গাছ যেন তার প্রিয়।

কদমগাছে ফুল ফোটে, যেন বনদেবী সেজেছে নতুন সাজে।

বনের ধারে মালতীর ঘর। বনের কিছু শালগাছ অন্য গাছ কেটে সে ফসল বুনছে। মকাই শাকসবজি হবে।

দুটো ভীরু খরগোস পালায়, ছুটে পালায় হরিণ একটা।

মালতী তির মারতে যাবে ওদের। মালতী তির ছুঁড়তেও জানে।

'না—না। মারবি না। খবরদার।' বাধা দেয় বসন্ত।

চাইল মালতী-বর্ষায় ভাল খাবার হত। বসন্ত বলে, 'না। আর বন কাটবি না। জানোয়ারও মারবি নাই।'

মালতী বলে, 'গম ধান মকাই হবে—'

বসন্ত শোনায়।

'পেটের জ্বালায় অনেক কিছুই তো করছিস। মা বসুমতীকে লুঠ করবি নাই। উকে সাজানো সবুজ থাকতে দে।'

মালতী বলে, 'বাঁচবি কী করে?'

'জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি।'—বলে বসন্ত।

গজগজ করে মালতী, 'সংসারে এবার আর একটা প্রাণীও আসছে।'

'তাই নাকি?'

অবাক হয় বসন্ত। মালতী মা হতে চলেছে। বলে বসন্ত, 'দেখবি মাঠে খাটব এবার। ঠিক খাবার জুটবে। কাজই করব ইবার। তুই ভাবিস না।'

কদিন বনে বাঘের উপদ্রব শুরু হয়েছে। হাটে-গ্রামে রটে যায় কথাটা। কে ছুটে আসে হন্তদন্ত হয়ে বলে সে, 'নিজের কানে বাঘের হাঁকাড়ি শুনলাম। দেখলামও এক নজর। ইয়া ডোরাকাটা বাঘ গো।'

বনে কাঠপাতা তোলাও বন্ধ। মাঝে মাঝে বাঘ আসে এই বনেও। কানাই ঘোষ কিন্তু খুশি। রাতের অন্ধকারে তার জোগান বেড়ে ওঠে। তার করাত কলে কাঠ, দামি কাঠও আসছে। আর আড়ালে কানাই মালতীকে টাবা দেয়। বলে, 'চালিয়ে যা। টাকা আরও দেব।'

টাকা চাই মালতীর। দামাল মেয়েটাও কি নেশায় মেতে উঠছে।

ওদের কাজটা কী তা অজানাই থাকে।

বনে বাঘের ডাক গ্রাম থেকেও শোনা যায়। ভয়ে গ্রামের লোক ঘর থেকে বের হয় না। কখন কাকে ধরে কে জানে?

হঠাৎ রাতে ঘুম ভেঙে যায় বসন্তের। জেগে উঠে চাইল। দেখে বিছানা খালি, মালতী নেই। অজানা ভয়ে চমকে ওঠে বসন্ত। গেল কোথায় মালতী। বনে বাঘ বের হয়েছে। বনের ধারেই ঘর। বসন্ত বের হয়ে পড়ে অন্ধকারে। মালতী বাইরেও নাই। গেল কোথায়? এই বন তার চেনা। ডাকটা ওঠে ওদিকে—বাঘের ক্রুদ্ধ গর্জন!

চমকে ওঠে বসন্ত। বনে কাঠ কাটার কাজ চলেছে পুরোদমে। ও এগিয়ে যায় সাবধানে। এদিকে বাঘের ডাক, ওদিকে কারা অরণ্যকে কাটছে। কাটছে দামি গাছ। ওদের কুনালের কোপে ধরাশায়ী হল একটা শিশু সেগুন।

দূর থেকে দেখে বসন্ত তার প্রিয় শালগাছটা মঞ্জরী নিয়ে আর্তনাদ করে আছড়ে পড়ল কুড়ুলের ঘায়ে। আর দেখা যায় ওই অরণ্যে কানাই ঘোষকে, নিষ্ঠুর লোভী শয়তান দামি গাছের গুঁড়িটাকে কেটে ট্রাকে তুলে পাচার করছে তার লোকজন নিয়ে।

আশেপাশে বন্দুক নিয়ে রয়েছে ওর লোকজন। বসন্ত এগোতে পারে না সরে আসে ঝোপের এদিকে।

বাঘের ডাকও চলছে। চমকে ওঠে বসন্ত—ডাকটা শোনা যায় পাশের ঝোপেই চাইল সে ভয়ে। চমকে ওঠে বসন্ত। কোথায় বাঘ। একটা হাঁড়ির মধ্যে মুখ রেখে বাঘের ডাক ডাকছে মালতীই। তাহলে বাঘ নয়, বাঘিনী সাজিয়েছে ওরা মালতীকেই।

মালতী বসন্তকে দেখেনি। সে কাজ শেষ হতে উঠে যায় এগিয়ে যায় কানাই ঘোষের দিকে। গাছ তখন পাচার। কানাই খুশি। পনেরো-বিশ হাজার টাকার কাঠ সে পেয়ে গেছে ভয় দেখিয়ে। বাঘের ভয়ে গ্রামের কেউ আসেনি। তার কাজ এইভাবে চলছে। বনের সেরা গাছগুলোকে শেষ করছে সে ওই নকল বাঘিনীর ভয় দেখিয়ে, লোক তাড়িয়ে।

মালতীকে বেশ কিছু টাকা দেয় কানাই ঘোষ।

'কেনে কেনে ই কাজ করিস? জানিস গাছ দ্যাবতা। গাছ মানুষের কত কাজে লাগায়। বন আছে তাই মেঘ নামে, বৃষ্টি হয়। চাষ হয়। মাটিতে সোনা ফলে। ওই বন আমাদের নিশ্বাসের বাতাস জোগায়-আর সামান্য ট্যাকার জন্য এত বড় পাপ করবি তুই?'

হাসে মালতী বসন্তের কথায়। বলে সে, 'থামতো। ঘরে যে আসছে আমাদের খোকন তার জন্য খরচ চাই? একটা গাই গরু কিনতে হবেক। চালাটা ছাইতে হবেক।'

বসন্ত বলে, 'না। উ সব পাপ কাজ করবি নাই। মা বনদেবীর কোপ লাগবেক। বাব করম ঠাকুর শাপমন্যি দিবেক। আমি জন খাটছি, তুই চাষে খাট, দুজনে রোজকার করব?'

মালতী খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে —'তুই আস্ত বোকারে। জন খেটে কী পাব? আর এক রেতে —দ্যাখ।' মালতী দেখায় প্রায় দুশো টাকার বাণ্ডিলটা।

বসন্ত মালতীর গায়ে টাকাটা ছুঁড়ে দেয়।

'ই পাপের টাকা নিস না।'

কে শোনে কার কথা।

বসন্তের মনে হাহাকার জাগে। বনের সুন্দর গাছগুলো আর নাই—আর খরগোস, হরিণের দলকে দেখা যায় না।

পাখিদের কলরবও নাই। বলে সে পতিতকে—'একি হচ্ছে ম্যাস্টার। টাকার জোরে লুট করে লিবেক সারা বন? সব সবুজ। ওই শয়তানের দল মানুষকে লুভি করে দিবেক। অরণ্যদেবতা কি নাই গো? বনদেবীও কি নাই?'

পতিত মাস্টার বলে, 'এই পাপের ফল একদিন পেতেই হবে। মরুভূমির জ্বালা জ্বলবে ওদের বুকে। এর জবাব আমিই দেব তার আগে।'

মালতী মা হতে চলেছে। তার ঘর এবার ভরে উঠবে। এই ঘর তার সন্তানের জন্য, মালতী নানাভাবে কিছু টাকা রোজগার করেছে। বড় সাধ তার ঘরে বংশধর আসবে। শালগাছের মূল থেকে বের হয় নতুন চারা, মাটিতে ওই শালগাছের পরিচয় বয়ে চলে। তেমনি ওই শিশু তাদের পরিচয় রেখে যাবে।

বসন্ত বলে, 'বনে, সবুজ ঝোরার ধারের পদ্মবনে নিয়ে যাব ছেলেটাকে, দেখাব

বনের হরিণ ময়ূর।'

মালতী বলে, 'না, পাঠশালে পাঠাবো ছেলেকে, ইস্কুলে পড়াবো। তোর মতো বনে বনে কেনে ঘুরবেক?'

সেই মুহূর্ত আসে। পাড়ার বয়স্কা মহিলারা এসে পড়ে। ক্ষ্যান্ত বুড়িই ডুংরির গর্ভবতী মেয়েদের অনেকের বাচ্চা প্রসব করিয়েছে। সেও এসেছে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে মালতী।

বসন্ত মহুয়া গাছের নীচে বসে আছে অধীর আগ্রহ নিয়ে। হঠাৎ মালতীর আর্তনাদটা স্তব্ধ হয়ে যায়। নবজাতকের কান্নাও শোনা যায় না। সব কেমন স্বব্ধ হয়ে গেছে।

চমকে ওঠে বসন্ত অজানা আতঙ্কে। তাহলে মালতী! মালতী কি নেই। ছুটে আসে সে। হাঁক পাড়ে।

'কী হল খুড়ি, অ খুড়ি। মালতী কেমন আছে?'

ক্ষ্যান্ত বুড়ি বলে, 'মালতী ভাল আছে রে। কিন্তুক—কিন্তুক—কী হল?'

বসন্তর কথায় ক্ষ্যান্ত বুড়ি বলে, 'ছেইলাটা নাইরে—মরা ছেইলাই প্রসব করাইছি। আহা! চাঁদপারা মুখটোরে।'

স্তব্ধ হয়ে যায় বসন্ত। তাহলে তাদের বংশধর ফিরে গেল। মরে গেল কচি থোড় অবস্থাতেই।

মালতীর চোখে জল নামে। আজ সব স্বপ্ন তার ব্যর্থ হয়ে গেল। মা হতে পারল না সে। তার বুক থেকে কে যেন কঠিন হাতে তার সন্তানকে ছিনিয়ে নিল।

ক্ষ্যান্ত উদাস অপরাহ্ন বেলা। রিক্ত দিন—ব্যর্থ শূন্য নিঃস্ব তাম্রাভ প্রান্তরে কী শূন্যতার বেদনা জাগে।

বসন্ত বলে মালতীকে, 'এখন কাঁদছিস কেনে?'

বসন্ত বলে, 'মায়ের বুক থেকে ছেইলাকে কেড়ে নিলেক, কাঁদব নাই। কত দুঃখ জানিস?'

বসন্ত বলে, 'মা বসুমতীর বুকের থেকেও গাছটাকে কেটে নিলে মা বসুমতীর কত কষ্ট হয় বুঝ তাহলে? ওই শালা কানাই ঘোষের মতো শয়তানের সাথে হাত মিলিয়ে তু এত বড় পাপ করলি তার শাস্তি এই রে। মা বসুমতীর বুক দুখাইলি—এখন বুঝ। তু মা নোস, বাঘিনী রে।'

কী বেদনায় মালতীর দু-চোখ বেয়ে নামে বাঁধনহারা অশ্রু। মনে হয় মা বসুমতীকে সেও অনেক দুঃখ দিয়েছে।

প্রশ্ন

গৌরকিশোর ঘোষ

এবার অনেকদিন, বেশ কয়েক বছর পরে, ও এল। এল আমার অফিসেই। পরনে ঢলঢলে প্যান্ট আর গায়ে কোঁচকানো শার্ট। জুতোর দিকে আর চাইলাম না। ও দিকের অবস্থা যে কী, বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। আশ্চর্য, এই কয়েক বছরে একটুও বদলায়নি। না পোশাকে, না স্বভাবে। ক-বছর আগে প্রচণ্ডভাবে অপমান করার পর ওকে যেমনভাবে রাস্তায় ফেলে চলে গিয়েছিলাম, ঠিক তেমনিভাবে অবিকল সেই পোশাকেই ও দরজা ঠেলে আমার কামরায় ঢুকল।

স্বভাবসিদ্ধ মৃদু গলায় আমাকে বলল, 'এই যে। এইটে তাহলে তোমার ঘর। সত্যি তোমার কত উন্নতি হয়েছে। দেখে ভাল লাগল।'

ওকে দেখে আমি হঠাৎ শক্ত হয়ে গেলাম। একটু বিভ্রান্তও হয়ে পড়লাম। কোনও কথা না বলে মুখ নিচু করে কাজে মন দিলাম। ঝাঁ করে মনে পড়ল, সেবার ওর সঙ্গে খুবই রূঢ় ব্যবহার করেছিলাম। অতটা কড়া না হলেও বোধহয় চলত।

একটু থেমে যেন আপন মনেই বলে উঠল, 'হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছে। এত হাঁটতে হয় আজকাল। তারপর শরীরটাও ভাল নেই। বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছি। একটু হাঁটলেই মাথা ঘোরে। বুকটাও কেমন ধড়ফড় করে। আজকাল তো আর কলকাতায় থাকিনে। থাকি হালিশহরের ওইদিকে। ট্রেন ধরতেও অনেকখানি হাঁটতে হয়। অনেক সকালে বেরিয়ে পড়ি। সব দিন খেয়েও আসতে পারিনে।'

আমি নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম। আমার ভিতরে প্রবল একটা বিতৃষ্ণার ভাব এরই মধ্যে এসে গিয়েছে। আমি সেটাকে দমন করবার চেষ্টা করছিলাম। গতবারের ঘটনা মনে পড়ল। এবারও ও ভিক্ষা চাইতে এসেছে— কথাটা মনে হতেই চমকে গেলাম। এটাকে ভিক্ষা বলছি কেন? ছিঃ।

ও মৃদুস্বরে বলল, 'তোমার শরীর খারাপ হয়েছিল শুনেছিলাম। এখন তো ভালই আছ, না? তোমার এ ঘরটা তো বেশ বড়ই। টেবিলও বেশ বড়। পাশের টেবিলে কে বসেন? তোমার কোনও কলিগ বুঝি?'

ও এত কথা বলছে কেন? কোনও কথা না বলে ও যদি চুপ করে বসে থাকত তাহলে হয়তো ওর উপর আমার এত রাগ হত না। না, আজ আমি নিজেকে কিছুতেই ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করব না। যা খুশি ও বলুক।

ও আপন মনেই বলে উঠল, 'অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আমি, তুমি কি একটু বসতেও বলবে না।'

ঝপাৎ করে কেউ যেন আমাকে চাবুক মারল। বললাম, 'বসো। কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে দেব না। কাজ আছে।'

খালি চেয়ারে বসে পড়ে তেমনি আস্তে আস্তে ও বলল, 'কাজ তো আছেই। তোমার কাজে বাধা দেব না। আমি এখনই চলে যাব। একটু চা খাওয়াবে না? গলা শুকিয়ে গিয়েছে'

বেয়ারাকে ডেকে চা আনতে বললাম। ও বলল, 'শুধু চা-ই খাওয়াবে? তোমাদের এখানে তো অনেক কিছুই পাওয়া যায়। কিছু আনতে বল না।'

হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'এটা অফিস। খাবারের দোকান নয়।'

ও দুঃখও পেল না। অপমানও ওর গায়ে লাগল না। তেমনি ধীর স্বরে বলল, 'এটা অফিস তাতো জানি। তুমি এমন ভাব করছ যেন তুমি খিধে পেলে এখানে কিছু খাও না বা অন্য কাউকেও কখনও কিছু খাওয়াও না। নাও, কিছু আনতে বলো। আজ সারাদিন কিছু খাইনি।'

ভাবলাম কিছু আনিয়ে দিই। কিন্তু মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, 'তোমার খাওয়া হয়নি তো আমি কী করব? এটা সদাব্রত নয়, আমার বাড়িও নয়।'

ও অম্লান বদনে বলে বসল, 'তবে তোমার বাড়িতেই নিয়ে চলো না। ভাল করে খাইয়ে দাও না একদিন। কতদিন যে ভাল কিছু খাইনি।'

বললাম, 'চা খাও। খেয়ে চলে যাও। আমার কাজ আছে।'

আমার স্বর তিক্ত হয়ে উঠেছে।

ও বলল, 'সত্যিই কিছু খাইনি আজ। আমাকে তবে কিছু টাকা দাও।'

হয়তো আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না। আমার ভিতরে একটা নির্দয় মানুষ তখন জেগে উঠেছে। সে ছোবল মারবার ফাঁক খুঁজছে।

ও কোনও কিছুই গায়ে মাখল না। আপন মনেই বলে চলল, 'তবে তুমি আমাকে পাঁচটা টাকা দাও। আমি খুব মুশকিলে পড়েছি। জানো?'

গলার স্বর চড়িয়ে ওকে বললাম, 'তোমাকে কিছুই দেব না। তুমি চলে যাও।'

ও তেমনি মৃদুস্বরে বলল, 'পাঁচটা টাকা তোমার কাছে এমন কী? পাঁচটা টাকা তুমি অনায়াসেই দিতে পার।'

আমি যেন কথা দিয়ে ওকে খুন করব। বললাম, 'তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না। তোমাকে এখান থেকে চলে যেতে বলছি।'

ও উঠল না। বসে রইল। বলল, 'তবে আমাকে দুটো টাকা দাও।' আমি কাঁপতে কাঁপতে বলে উঠলাম, 'তুমি যদি এখনই না ওঠো, তবে আমাকে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।'

ও বলল, 'তুমি কিছু না দিলে আমাকে আবার হাঁটতে হবে। এই খালি পেটে.... শরীর

দুর্বল.... একটা মানুষ কত আর হাঁটতে পারে..... তুমি মাঝে মাঝে কেন যে এত অবুঝ হয়ে ওঠো.... এমন কী ভাল দুটো কথাও বল না।.....'

আমি কাঠ হয়ে বসে রইলাম। ও চলে গেল।

আবার হয়তো কয়েক বছর আসবেই না। হয়তো কালই আসবে। পঁচিশ বছর ধরে এইরকম চলছে। আশ্চর্য, ওর কোনও পরিবর্তন নেই। পঁচিশ বছর আগেও যে-রকম ছিল, আজও সেই রকম। পঁচিশ বছর আগে আমি আর ও একই রকম ছিলাম। তবে কে ওকে, কেন আজ সহ্য করতে পারিনে।



বিহিত

সমরেশ বসু

নিঝুম দুপুরের স্তব্ধতাকে আচমকা ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে, সেই ভয়ংকর জান্তব শব্দটা পাড়ার ভিতর দিয়ে নিমেষে বরিয়ে গেল। পাড়ার দু-পাশের বাড়িগুলি দেওয়াল কেঁপে উঠল। ঠকঠকিয়ে ঝনঝনিয়ে উঠল দরজা জানলা। কোথা থেকে ভেসে এল একটি শিশুর আর্ত চিৎকার। কোনও বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার হঠাৎ ঘুম ভাঙা গোঙানির শব্দ কি শোনা গেল ? শান্ত পাড়াটা মুহূর্তেই যেন অশান্ত হয়ে উঠল, দরজা-জানলা খোলার শব্দ। একটা কুকুর হঠাৎ ভয় পেয়ে ডেকে উঠেই চুপ করে গেল।

চৈত্রের দুপুর। আমি লিখছিলুম। এখন আমি দু-কামরার এই ফ্ল্যাটটিতে একা আছি। এ সময় দরজা জানলা বন্ধ রাখি। পাখা খুলে দিয়ে, কাজে ডুবে থাকি। আমার কাজের ছেলে, অনন্ত এ সময়ে আমার আবাসগৃহে খেতে যায়। এখন বেলা আড়াইটে। । অনন্ত আসবে ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে বিকেল তিনটেয়। এসে আমাকে চা দেবে।

আজ নিয়ে তিন-চারদিন ধরে ঠিক এ সময়ে, এ ঘটনা ঘটেছে। আমার এই ফ্ল্যাট তিন তলায়। পুব-দক্ষিণে দুটি ব্যালকনি আছে। আমার উলটো দিকের চারতলা বাড়িটির, চারতলায় থাকেন সীতেশ সেন, বিশিষ্ট আইনজীবী। দোতলায় তাঁর ছোটভাই ডাক্তার বীরেন সেন। একজন চিকিৎসক এবং সমাজসেবী। পাড়ায় এঁরা ছাড়াও দু-একটি পরিবারের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় আছে। সকলেই সজ্জন প্রতিবেশী। পাড়াটি যাকে বলা যায় কসমোপলিটান, সেইরকম। খ্রিস্টান, পারসি, মুসলমান, হিন্দু, সবরকমের অধিবাসীই আছেন। অবিশ্যি হিন্দুই বেশি। বাঙালি-অবাঙালি মিলিয়ে।

গতকাল সকালে ডাক্তার বীরেশ সেন আমাকে চেক-আপ করতে এসেছিলেন। আমার হৃদযন্ত্রটি কিছু বিকল হওয়ায়, ডাঃ সেন অনুগ্রহ করে আমাকে মাঝে মাঝে চেক আপ করেন। গতকাল তিনি যখন এসেছিলেন, আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'কী ব্যাপার বলুন তো? কে এই মোটরবাইক আরোহী চালক, যে সাইলেনসার পাইপের পুরোটাই খুলে দিল। রোজ দুপুরে ওরকম বীভৎস শব্দ করে এ পাড়া দিয়েই বিশেষ করে কয়েকবার চক্কর দেয়?'

'আর বলবেন না।' ডাঃ সেন গম্ভীর বিষণ্ণ স্বরে বলেছিলেন, 'শব্দটা বীভৎসের চেয়েও আরও ভয়ংকর কিছু। আমার শরীরও তো তেমন ভাল নয়। রোজ দুপুরে ওই সময় আমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করি। আর এই কদিন ধরে ওই শব্দে হঠাৎ যে কেবল ঘুমের চটকা ভেঙে যায়, তা নয়। ওই শব্দে মনে হয়, হার্টবিট্স বন্ধ হয়ে যাবে। আমার শিশু নাতিটি যে-ঘরে থাকে, সে ঘরের দরজা-জানলা খুব ভাল করে বন্ধ করা সত্ত্বেও, শব্দটা যেন দেয়াল ফুঁড়ে ভেতরে ঢোকে, আর নাতিটি ভয়ে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। আমি বুঝি, পাড়ার শিশু, বৃদ্ধ আর অসুস্থদের এই শব্দের ধাক্কা সামলাতে কী অসহ্য কষ্ট হয়। কিন্তু কী করবেন বলুন। এই সব জীবদের আপনি কী করে দমাবেন?

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'কেন, জীবটি কি এতই ক্ষমতাশীল, তাকে দমানো যাবে না? অন্তত তাকে অনুরোধ করা যেতে পারে, সে যেন তার মোটরবাইকের সাইলেনসার পাইপটি পুরোটা জুড়ে দেয়।'

'তাই যদি দেবে তা হলে ওর মজাটাই মাঠে মারা যাবে।' ডঃ সেন হতাশ হেসে মাথা নেড়েছিলেন।

আমি ব্যাপারটা কিছু না বুঝে, ডাঃ সেনের মুখের দিকে অবাক জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলুম। তিনি খোলা দরজা দিয়ে একবার বাইরের দিকে দেখেছিলেন। বলেছিলেন, 'এ পাড়ার চৌত্রিশ নম্বর বাড়ির —মানে, আমি সরখেলদের বাড়ির কথা বলছি। সরখেলদের বাড়ির এক মেয়েকে নাকি ও প্রেম নিবেদন করেছিল। কিন্তু মেয়েটি একটু ভিন্ন ধাতুর। কোনওরকম সাড়া তো দেয়নি বটেই, বরং সরাসরি নাকচ করে দিয়ে নাকি ওকে জানিয়ে দিয়েছে, প্রেম ব্যাপারটা কিছু বাজারের বেচা-কেনার জিনিস নয়। ইচ্ছে করলেই দর দেওয়ার মতো, প্রেম-নিবেদন করা যায় না। হঠাৎ কী হল? কীসের প্রেম নিবেদন? কথাবার্তা পরিচয় থাক বা না থাক, প্রেম নিবেদন করলেই হল? মেয়েটির কাছ থেকে ওরকম জবাব পাবার পরেও নাকি আরও চেষ্টা করেছিল। কিছুতেই যখন ওর আশা ফলল না, তখন থেকেই এই ভরদুপুরের এই শুয়োর-ডাকা চিৎকারের অভিযান শুরু হয়েছে। এটা হল, প্রতিশোধ নেবার শুরু। তারপরে কোন দিকে ব্যাপারটা মোড় নেবে কেউ বলতে পারে না।'

'ও বা ওর বলতে আপনি কাকে বোঝাতে চাইছেন? এই মোটরবাইকের চালককে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওর কী অধিকার আছে। একটি অপরিচিত মেয়েকে প্রেম নিবেদন করবে?'

'অপরিচিত নয়। মেয়েটিকে ও চেনে। কিন্তু পরিচয় বলতে যা বোঝায়, তা ছিল না।'

'ওটাকে অপরিচিতিই বলে।'

'তা বলে। কিন্তু ও যে জানে, ও যখন মেয়েটিকে চেয়েছে, তখন ওকে পেতেই হবে।' ডাঃ সেন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিমর্ষ হেসেছিলেন।

আমি ডাঃ সেনের চোখের দিকে তাকিয়েছিলুম। তাঁর কথার অন্তর্নিহিত অর্থটি যে ধরতে পারিনি, তা না। তবু আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'একটা প্রবাদ আছে , খুঁটির জোড়ে ম্যাড়া নড়ে। ওর খুঁটিটা কী? কোথায়?'

'ওর খুঁটি দু-জায়গায়।' ডাঃ সেনের মুখ ও চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠেছিল। এবং কণ্ঠস্বরও, 'লোকাল থানা আর রাজনৈতিক দল।'

ওইরকম কিছু শোনবার আশঙ্কা আমার ছিল।

'ও কে? কোথায় থাকে?' আমি আবার জিজ্ঞেস করেছিলুম।

ডাঃ সেন বলেছিলেন, 'এ পাড়ারই কাছে-পিঠের ভট্টাচার্য বাড়ির ছেলে। মোটামুটি লেখাপড়াও এক সময়ে শিখেছে। দেখেছিলুম , কিছুদিন এক রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করছে। তারপরে তো দেখছি ওর হাতে রক্তে মাখামাখি। ও এ এলাকার মুকুটহীন রাজা এখন।'

মনে মনে বলেছিলুম, সত্যি কঠিন সমস্যা। কী এর সমাধান? ওই জাতীয় জীব বর্তমানে

সারা দেশেই ছড়িয়ে আছে। আর ওরা জানে, ওদের সবরকমের অধিকার আছে। ওরা যা চাইবে, তা ওদের পেতেই হবে। অতএব, মধ্য কলকাতার, শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদের একটি পাড়ার সমস্ত লোককে কষ্ট দেবার অধিকার ওর আছে। এটা হচ্ছে ওদের এক ধরনের নিজের শক্তি-পরীক্ষা। শুধু সরখেলদের নয়, গোটা পাড়ার বাসিন্দাদের ও জানিয়ে দিতে চায়, ওর শিকারের দিকে ও হাত বাড়াচ্ছে। কারোর যদি বাধা দেবার ক্ষমতা থাকে, থানায় গিয়ে পাড়ার শান্তি রক্ষা করতে চায়, তারা সেই চেষ্টা করতে পারে। ডাঃ সেন ঠিকই বলেছেন, প্রতিশোধ নেবার এটা হল শুরু। যখন দেখবে, পাড়াটাকে ও ওর বিভীষিকার দ্বারা কব্জা করতে পেরেছে, তখন সকলের চোখের ওপর দিয়েই ও শিকার মুখে করে নিয়ে যাবে।

ডাঃ সেন বিদায় নেবার আগে অন্যমনস্ক স্বরে বলেছিলেন, 'জানিনে এর কী বিহিত হতে পারে।'

দরজা জানলা বন্ধ। লেখার টেবিলে, লেখা থামিয়ে যখন এইসব ভাবছি, তখন মোটরবাইকের সেই দেওয়ালে কাঁপানো, কানের পর্দা ফাটানো, জান্তব শব্দটা দ্বিতীয় বারের পরিক্রমায় এগিয়ে আসছে। আমি কলমটা রেখে, পুবের দরজাটা খুলে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালুম। ও দক্ষিণ থেকে ঝড়ের বেগে মোটরবাইক চালিয়ে এগিয়ে আসছে। ওর দৃষ্টি সামনে। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, 'বুলেট' নামে সাড়ে তিন অশ্বশক্তির দ্বিচক্রযানটির আরোহীর পরনে জিন্‌স। গায়ে বোতাম খোলা একটা পাঞ্জাবি। গলায় চিকচিক করছে সোনার চেন। বাঁ হাতের কবজিতে ঘড়ি। ডান হাতে একটা স্টেনলেস স্টিলের বা রুপোর মোটা চেন। চুল উড়ছে। দেখলেই বোঝা যায়, দীর্ঘদেহী, স্বাস্থ্যবান। মুখ-চোখও খারাপ না। মাথায় হেলমেট না রাখার আইনভঙ্গটার কোনও মূল্যই নেই ওর কাছে, সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

ও আমার কাছাকাছি হতেই, গলার স্বরটা যতটা সম্ভব চড়িয়ে ডাকলুম, 'এই যে, শুনছেন?'

ও আমার কথার মধ্যেই বেশ খানিকটা এগিয়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু দূর থকেই পিছন ফিরে একবার আমাকে তাকিয়ে দেখল। দেখে মুখ ফিরিয়ে নিল। আদৌ কোনও পাত্তাই দিল না। সেই জান্তব শব্দ তুলে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। আমি ঘোর দুপুরের নির্জন খাঁ খাঁ রাস্তাটার দিকে দেখলুম। আশেপাশের কয়েকটি বাড়ির খোলা জানলায় দু-চারটি মহিলা-পুরুষের মুখ। দোতলায়, পাশের খোলা জানলায় ডাঃ সেনও দাঁড়িয়ে আছেন। অবাক জিজ্ঞাসু চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। অন্যান্যদের চোখও আমার দিকেই ছিল।

ও সাধারণত তিন থেকে চারবার এই রাস্তা প্রদক্ষিণ করে। গত তিন-চার দিনের অভিজ্ঞতা থেকে এটাই বোঝা গিয়েছে। আমি মিনিট দুয়েক দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে উদ্যত হতেই, দক্ষিণ থেকে বীভৎস জান্তব শব্দটা আবার এগিয়ে আসতে লাগল। আমি ধৈর্য হারালুম। দেখলুম ও দ্রুত ঝড়ের বেগে এগিয়ে আসছে। আমি টেবিল থেকে জল ভরা গেলাসটা তুলে নিলুম। ব্যালকনিতে গেলুম। ও আমাকে পেরিয়ে যাবার আগেই আমি গেলাসের জল ছুড়ে দিলুম। অব্যর্থভাবে জলটা ওর গায়ে-মাথায় পড়ল। ও কিছু বুঝে ওঠার আগেই বেশ খানিকটা এগিয়ে চলে গিয়েছে। কিন্তু ও দাঁড়াল। পিছন ফিরে দেখল না। আগে গায়ে-মাথায় হাত দিয়ে দেখে নিল। তারপর মোটরবাইক ঘুরিয়ে আবার ব্যালকনির

নীচে এসে দাঁড়াল। মোটরবাইকের এঞ্জিন বন্ধ করল। চোখ তুলে আমার দিকে তাকাল। দুটি জ্বলন্ত বাঘের চোখ। আর বাঘের চাপা গর্জনের মতোই শোনাল, 'আপনি আমার গায়ে জল দিয়েছেন?'

'হ্যাঁ,' আমি ঘাড় ঝাঁকালুম।

'কেন?'

'নইলে যে আপনি শুনতে পেতেন না।'

'তাই জল ছুঁড়লেন গায়ে ?'

'হ্যাঁ।'

'কী বলতে চান আপনি!'

'আপনাকে একটা অনুরোধ করছি। আপনি দয়া করে আপনার মোটরবাইকের সাইলেনসার পাইপটা ঠিক করে নিন। শব্দটা বড় যন্ত্রণাদায়ক।'

'সেইজন্য জল ছুঁড়লেন?'

'হ্যাঁ।'

তিনতলা থেকে স্পষ্টই দেখলুম, ওর চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠলো। মোটরবাইকের হ্যান্ডেলে রাখা হাতের মুঠো দুটি মুঠি পাকিয়ে উঠেছে। দু-চোখ হিংস্র জ্বলন্ত দেখাচ্ছে। গলার স্বরের চাপা গর্জন শোনা গেল, 'একবার নীচে নেমে আসবেন?'

'আপনি আমার ঘরে আসুন।' আমি ডাকলুম।

ও কয়েক মুহূর্ত আমার দিকে অপলক জ্বলন্ত চোখ তাকিয়ে রইল। বলল, 'আসছি।' বলে মোটরবাইকের এঞ্জিন চালু করে, সেই জান্তব শব্দে গোটা পাড়া কাঁপিয়ে, দক্ষিণে চলে গেল।

আমি দেখলাম অনন্ত আসছে। তার মানে তিনটে বাজল। ঘরে ঢোকার আগে দেখি ডাঃ সেন ছাড়াও আশেপাশের বেশ কয়েকটা বাড়ির দরজা-জানলায় কিছু মুখ উঁকি দিচ্ছে। তাঁদের সকলের চোখই আমার ওপর। কারওর মুখে বিস্ময়। কারওর মুখে উদ্‌বেগের ছায়া। আমি ডাঃ সেনের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে ঘরের মধ্যে ঢুকলুম। দরজাটা বন্ধ করে দিলুম।

আমার মধ্যেও কী অস্বস্তি কী উদ্‌বেগ একটুও ছিল না? ছিল বই কী। কিন্তু কোনও কোনও সময় আমি যে নিরুপায় বোধ করি। এটা যেন একটা অনিবার্য দায়বদ্ধতার মুখোমুখি আমাকে দাঁড় করিয়ে দেয়। অনন্ত কলিং বেল টেপার আগেই আমি ভিতরের বারান্দায় গিয়ে বাইরের দরজা খুলে দিলুম। অনন্ত কলিং বেলে হাত দিতে যাচ্ছিল। আমি ডাকলুম, 'আয়।'

অনন্ত ভিতরে ঢুকল। আমি পাশের ঘরে ঢুকলুম। অনন্ত দরজা বন্ধ করে পাশের ঘরে এল। দেখছি ওর চোখে-মুখে উদ্‌বেগ উত্তেজনা, 'আপনি কি ওই ছেলেটাকে কিছু বলছেন নাকি?

'হ্যাঁ। আমি ওর গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়েছিলুম।' বলে আমি কাঠের আলমারির পাল্লা খুলে, একটা চাবির গোছা বের করলুম।

অনন্ত উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে উঠল, 'সর্বনাশ! ওর গায়ে জল ছিটিয়ে দিয়েছেন? ও

আপনাকে কী বলে গেল?'

'ও আমাকে নীচে ডাকছিল।' আমি আলমারির ভিতরে একটা চোরা খোপের চাবির মুখে চাবি গলিয়ে খোপের ঢাকনা খুললাম। 'আমি ওকে আমার ঘরে আসতে বললুম।'

অনন্তর গলার স্বর রুদ্ধ, উদ্‌বিগ্ন, 'ও কী বললে?'

'ও আসছে।' আমি খোপের মধ্যে হাত ঢোকালুম।

অনন্ত আমার দিকে দু-পা এগিয়ে এল। ওর গলার স্বর উদ্‌বেগ-ব্যাকুল, 'বাবা, আপনি এখনই ও বাড়ি ফিরে যান। একটা সর্বনাশ ঘটে যাবে। ও আসবার আগেই আপনি বাড়ি চলে যান।'

'অনন্ত আর তা হয় না।' আমি সিক্স রাউন্ডারটা খোপ থেকে বের করলুম। কেউটে সাপের মতোই আগ্নেয়াস্ত্রটি চকচক করছে। আনলক করে খুলে দেখলুম। ছটি গুলি ভরা আছে। দু-সপ্তাহ আগেও এটা পরিষ্কার করেছি। অনন্তর উদ্‌বিগ্ন মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালুম। 'ও যখন আসছে বলে গেল, এখন আর আমি ঘর ছেড়ে যেতে পারিনে। কারণ আমি ওকে আসতে বলেছি।'

আমি আলমারির ভিতরে চাবির গোছা রেখে, পাল্লা বন্ধ করলুম। অনন্ত আর্ত স্বরে বলল, 'বাবা আমার পা কাঁপছে। আমি এ দরজা খুলে দেব না।'

'তুই না দিলে আমাকেই দরজা খুলে দিতে হবে।' আমি একটা চেয়ার তুলে, ঘরের এক কোণে নিয়ে গেলুম, 'তোকে আমি বলছি, ভয় পাসনে। ভয় জিনিসটা ময়ালের মতো। কেবলই পাকে পাকে জড়ায়। জ্যান্ত মরা করে দেয়। তোকে ও কিছু বলবে না। তুই কেবল দরজা খুলে দিবি।'

আমি চেয়ারে বসতে না বসতেই সেই বীভৎস শব্দ দক্ষিণ থেকে ভেসে এল। অনন্ত ছুটে আমার লেখার ঘরে চলে গেল। পুব দিকের ব্যালকনির দরজা খোলার শব্দ পেলুম। অনন্ত ব্যালকনিতে যাচ্ছে। মোটরবাইকের জান্তব শব্দটা আমার তিনতলার নীচে এসে দাঁড়াল। জানি, সিঁড়ি ওঠার নীচের দরজা খোলা আছে। অনন্ত দৌড়ে এল পাশের ঘরে। ওর কালো মুখ ফ্যাকাসে। দু চোখে আতঙ্ক। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'বাবা, ডাক্তারবাবু, আরও অনেক লোক দরজা-জানলা খুলে দাঁড়িয়ে দেখছেন।'

'দেখতে দে।' আমি ডান হতে রিভলবারটি নিয়ে, দরজার দিকে মুখ করে বসলুম।

অনন্ত আবার বোধ হয় লেখার ঘরে চলে গেল। মোটরবাইকের শব্দ থেমেছে। ও বোধ হয় এখন সিঁড়ি ভাঙছে। সমস্ত পাড়াটায় এখন নিঝুম দুপুরের সেই স্তব্ধতা নেমে এসেছে। কিন্তু সেই স্তব্ধতাও যেন গভীর উৎকণ্ঠায় কান পেতে আছে। কলিং বেল বাজল টুং টাং। শব্দট শোনাল যেন দুটো গুলির শব্দের মতো।

বাইরের দরজা খোলার শব্দ হল। এক সেকেন্ড। ও দরজার ভিতরে পা দিতে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। জ্বলন্ত চোখে আমার ডান হাতের দিকে দেখল। ওর মুখে যেন বিদ্যুৎ ঝিলিক হেনে গেল। বাজ ডাকার মতো ওর গলার স্বর শোনা গেল, 'ও! তৈরি হয়ে বসে আছেন দেখছি।'

'হ্যাঁ, আপনাকে রিসিভ করার জন্য।' আমি ওর চোখে স্থির চোখ রেখে উঠে দাঁড়ালুম,

'কোমরের কাছ থেকে হাত সরান। আর বলুন, কেন আমাকে নীচে ডাকছিলেন?'

ও নিজেও আমার চোখে চোখ রেখে, কোমরের কাছ থেকে হাত সরাল। একটু হাসল, 'এখন তো আর বলা যাবে না, কেন আপনাকে ডেকেছিলাম। পরে এক সময় বলব।' ও ওর তীক্ষ্ণ চোখ নামিয়ে আমার সিল্ক রাউন্ডারের দিকে দেখল। চোখে এক ঝলকের জন্য সন্দেহ ফুটল। কেটেও গেল মুহূর্তেই। ওর নীচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরল।

বোঝা যাচ্ছে, পারলে ও আমাকে ছিঁড়ে খায়। এবং সম্ভবত ওর জীবনে আমাদের মতো শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকদের কাছে এরকম অভ্যর্থনা এই প্রথম কপালে জুটল। ও সামান্য মাথা ঝাঁকাল। 'আচ্ছা, আজ চলি। আবার দেখা হবে।'

'আসবেন।' আমি ওর চোখে চোখ রেখে বললুম, 'আর যদি আমার অনুরোধটা রাখেন, খুশি হব।' ওর ভুরু কুঁচকে উঠল, 'কোন অনুরোধ?'

'মোটরবাইকের সাইলেনসার পাইপটা ঠিক করে লাগিয়ে নেবেন।'

ওর চোয়াল নড়া দেখে মনে হল, দাঁতে দাঁত ঘষছে, 'নইলে কি আবার জল ছুঁড়বেন?'

'ছুঁড়তে পারি।'

'আমিও তৈরি থাকব।' ও পিছন ফিরতে উদ্যত হল, 'তবে আমি নিজের মর্জিতে চলি, কারওর অনুরোধের ধার ধারি না।'

'পেছন ফেরার সময় হাত দুটো মাথার ওপরে তুলবেন।' আমি এগিয়ে গেলুম।

ও পিছন ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে একবার দেখল। তারপর দু-হাত মাথার ওপর তুলে বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। দরজার পাশে অনন্ত দাঁড়িয়েছিল। ওর দু-চোখে ঘৃণা আর ভয়। আমি অটোমেটিক লক দরজার পাল্লাটা ঠেলে দিলুম। লেখার ঘরে গিয়ে, অস্ত্রটি টেবিলের ওপর রেখে বাইরের ব্যালকনিতে গেলুম। ও ইতিমধ্যেই নীচে নেমে গিয়েছে। চেপে বসেছে মোটরবাইকের সিটে। আমি অবাক হয়ে দেখলুম, আশেপাশের অন্তত দশটা বাড়ির খোলা জানলায়, ব্যালকনিতে, গলিতে, দোতলা, তেতলা, চারতলার মহিলা-পুরুষরা ভিড় করে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের সকলের দৃষ্টি এখন আমার দিক থেকে সরে নীচে ওর দিকে পড়েছে। ও রাস্তার দু-ধারের বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপরে আর উত্তরে না গিয়ে দক্ষিণে ফিরে গেল। তখন আবার সবাই আমার দিকে তাকালেন। ডাঃ সেন, তাঁর স্ত্রী, পুত্রবধূ, সবাই আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। চোখাচোখি হতে হাসলেন।

আমি ফিরে গিয়ে লেখার টেবিলে বসলুম। অস্ত্রটা কী বিশ্রী বেমানান দেখাচ্ছে লেখার টেবিলে। ওটার সেফটি ক্যাচ লক করে টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিলুম। কলম তুলে নিলেও, তখনই কাজে মনোনিবেশ করতে পারলুম না। ওর গায়ে জল দেওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত ঘটনাটা আদ্যোপান্ত একবার ভেবে নিলুম। অস্বীকার করার উপায় নেই, বেশ খানিকক্ষণ সময় একটা টেনশানে কেটেছে। এখনও তার ভাইব্রেশন রয়েছে। ভেবেই আমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হল, আমার বাসগৃহে যাবার সময় অস্ত্রটি নিয়েই আমাকে নীচে নামতে হবে। অবিশ্যি গাড়িতে ওঠার সময় দূর থেকে বোমা ছোঁড়াটা খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার নাও হতে পারে। আমাকে সাবধানে থাকতেই হবে। আর আজ আমার স্ত্রীর উদ্‌বেগ শুরু হবে।

টেলিফোনটা বেজে উঠল। অনন্ত পাশের ঘর থেকে লাইন ধরল। অবাক হব না, যদি

আমার স্ত্রীও বাড়ি থেকে টেলিফোন করে থাকেন। কিন্তু অনন্ত এসে বলল, 'ডাক্তারবাবু আপনাকে টেলিফোনে ডাকছেন।'

আমি টেবিলের বাঁ দিকে রাখা টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিলুম। 'বলুন ডাঃ সেন, আমি বলছি।'

'আমি সমস্ত ঘটনাটা এখনই থানার ও সিকে জানিয়ে দিলুম।' ডাঃ সেনের স্বরে উদ্‌বেগ ও উত্তেজনা স্পষ্ট, 'আপনি ঠিক আছেন তো?'

হেসে বললুম, 'ঠিক আছি। আমি জানতুম, ও প্রস্তুত হয়ে আসবে। আমিও প্রস্তুত ছিলুম।'

'ও.সি. আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার রিভলবারটির লাইসেন্স আছে কি না।' ডাঃ সেনের স্বরে ঝাঁজ ফুটল, 'আমি বললুম, কার সম্পর্কে কী বলছেন? উনি বেআইনি অস্ত্র রাখবেন, এরকম কথা অপনি ভাবলন কী করে? তারপরে অবিশ্যি ক্ষমা চাইলেন। বললেন, আমাদের পাড়ায় পুলিশ পিকেট বসাবেন।'

আমি হেসে বললুম, 'থানাও তো ওর একটা খুঁটি। পুলিশ পিকেটে কি ওর ঔদ্ধত্য, অসভ্যতা বন্ধ করা যাবে? দেখুন কী হয়?'

'ঘটনা যা ঘটল, আপনি একটু সাবধানে থাকবেন।' ডাঃ সেনের স্বরে অকৃত্রিম অনুরোধ।

আমি বললুম, 'তা থাকব।'

রিসিভার নামিয়ে রাখলুম। অনন্ত ধূমায়িত চায়ের কাপ টেবিলে রাখল। বলল, 'বাবা, আমার কিন্তু খুব ভয় লাগছে।'

'ভয় করলে তো সব সময় চলে না' আমি কলম নামিয়ে রাখলুম, 'তুই যেন বাড়ি গিয়ে আবার মাকে এত বড় করে লাগাসনি। যা বলবার তা আমিই বলব।'

অনন্ত এতক্ষণে একটু হাসল, 'না, আমি আর মাকে কী বলব। ওকে ভয় পায় না, এ এলাকায় এমন লোক একজনও নেই। ওর দলের কয়েকজনকে আমি চিনি।'

আমি মাথা ঝাঁকালুম। কিছু না বলে, চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কাজে মন দেবার চেষ্টা করলুম। কতক্ষণ কেটেছে খেয়াল করিনি। মোটরবাইকের সেই জান্তব শব্দটা দক্ষিণ দিক থেকে আবার এগিয়ে আসতে লাগল। আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়লুম। এখন পাড়ার রাস্তায় কিছু ছেলে খেলা করছে। শব্দটা ঘরবাড়ি রাস্তা কাঁপিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। অনন্ত পুরো ব্যালকনির খোলা দরজা দিয়ে ঢুকল। ওর ফ্যাকাসে মুখে ও চোখে উদ্‌বেগ, 'বাবা, মোটরসাইকেলের পেছনে ওর দলের একজন বসেছিল । ও তাকে হাত দিয়ে আমাদের তেতলার দিকে দেখাল।'

'দেখাক।' আমি বাঁ হাতের কবজির ঘড়ি দেখলুম। সাড়ে চারটে বাজে। আরও ঘন্টাখানেক কাজ করতেই হবে। নইলে সামলাতে পারব না।

পরের দিন।

আজ রবিবার। চাকরিতে ছুটি মেলে। নিজের পেশায় ছুটি মেলে না। অতএব অন্যান্য দিনের মতো, আজও আমি কাজে বসেছি। গতকাল সন্ধ্যায় আমি নির্বিঘ্নেই বাড়ি ফিরে গিয়েছিলুম। এবং যা ভেবেছিলুম তাই হয়েছে। আমার স্ত্রী উদ্‌বেগে গত রাতে ঘুমোতে

পারেননি। আমার আশ্বস্ত করার চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি চেয়েছেন, এখন থেকে দুপুরে তিনি এ ফ্ল্যাটে চলে আসবেন। অনেক বলে কয়ে ওঁকে নিবৃত্ত করেছি। তবে দুপুর থেকেই টেলিফোন শুরু হবে, এটা বুঝেছি।

অনন্ত বেলা একটায় আমাকে দুপুরের খাবার খাইয়ে চলে গিয়েছে। আমি কাজ করছিলুম। হঠাৎ এক সময়ে রবিবারের ক্লান্ত ঘুমন্ত নিঝুম দুপুরকে কাঁপিয়ে দিয়ে মোটরবাইকের সেই জান্তব বীভৎস শব্দ দরজা-জানলা খটখটিয়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। আমার কাজ থেমে গেল। প্রথম পরিক্রমা । ও তা হলে কথা রাখেনি। বরং সাইলেনসিয়ার পাইপের যেটুকু অবশিষ্ট রেখেছিল, সেটুকুও খুলে দিয়েছে। সেই শিশুর ভয়ে ডুকরে কেঁদে ওঠা কান্নার শব্দ। ভয় পাওয়া কুকুরটার ডেকে উঠেই চুপ করে যাওয়া।

কী করা যায়? এ অন্যায় ঔদ্ধত্যের কি জবাব আছে? সকালে আসবার সময় দেখছি, দক্ষিণের মোড়ে, ফুটপাতের দু'জন সশস্ত্র সেপাই টুলে বসে আছে। পুলিশ পিকেট। কিন্তু ওকে কে থামাবে? আর আমি রোজ একটা লোকের গায়ে জল ছিটিয়ে দিতে পারি? অসম্ভব। গতকাল ওর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য জল ছুঁড়েছিলাম। রোজ রোজ আমি তা পারি না। মানায়ও না।

আমার চিন্তার মধ্যেই আবার শব্দটা ধেয়ে এল। যেন একটা খ্যাপা জানোয়ার প্রচণ্ড গর্জনে অন্ধ মত্ত হয়ে ছুটে চলেছে। ওর শিকার চাই। আর নিশ্চয়ই ও ঠোঁট বাঁকিয়ে আমার ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে দেখে যাচ্ছে। কিন্তু আমি ওর হাতের ক্রীড়নক হতে পারি না। ও আমাকে উসকে দেবার হাজার চেষ্টা করলেও না। অথচ এ ঔদ্ধত্য সহ্য করাও কঠিন। পুলিশ পিকেট কেন বসানো হয়েছে, কে জানে।

দ্বিতীয় পরিক্রমার পর, জন্তুর সেই বীভৎস জান্তব চিৎকার পাড়া কাঁপিয়ে তৃতীয় পরিক্রমায় ঝড়ের বেগে এড়িয়ে এল। আসতে আসতে হঠাৎ আমার ফ্ল্যাট ছাড়িয়েই যেন শব্দটা থেমে গেল। তার মানে ও মোটরবাইকের এঞ্জিন বন্ধ করেছে? ও দাঁড়িয়ে পড়েছে? পুলিশ তাহলে ওকে বাধা দিয়েছে?

ব্যাপারটা কী দেখার জন্য আমি চেয়ার ছেড়ে উঠলুম। পুবের ব্যালকনির দরজা খুলে বাইরে গেলাম। আমার চোখের সামনে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! আমার সামনে এবং উত্তর-দক্ষিণে যতগুলি বাড়ি আছে, সব বাড়ির সব তলায়, ব্যালকনিতে, জানলায় মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে ভিড় করেছেন। তাঁদের অধিকাংশের হাতে জলের গেলাস। চওড়া পিচের রাস্তাটা দেখে মনে হচ্ছে, এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। আর ও মোটরবাইক থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ওর মাথার চুল থেকে টুপিয়ে জল পড়ছে। সিল্কের বোতামখোলা পাঞ্জাবিটা জলে ভিজে গায়ের সঙ্গে লেপটে গিয়েছে। আমার প্রতিবেশী মহিলা পুরুষ সবাই হাসছেন। সবাই একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন। আর ও যেন চূড়ান্ত ভূতগ্রস্ত অসার অবাক চোখে পাড়ার এই চেহারা দেখছে। ঠিক যেন বিশ্বাস করে উঠতে পারছে না।

রবিবার ছুটির দিনে আমাদের পাড়ায়, দুপুরে এমন একটা ছবি অকল্পনীয়। রবিবার বলেই, আজ প্রত্যেক বাড়িতে ভিড়ও বেশি।

ও মোটরবাইক থেকে নেমে, যানটিকে কেরিয়ারে দাঁড় করাল। দাঁড়িয়ে ডান দিকে বাঁ

দিকে উত্তর দক্ষিণে মুখ তুলে তাকাল, দেখল । ওর ডান হাত পাঞ্জাবির নীচে, কোমরের কাছে। ও কি রিভলবার বের করে হঠাৎ কোনওদিকে গুলি চালাতে আরম্ভ করবে?

আর একটি নতুন ঘটনা ঘটল। ও মোটরবাইক থেকে নেমে দাঁড়াতেই, যে কুকুরটা ভয়ে একবার ডেকেই থেমে যায়, সে আজ ফুটপাত থেকে ওর দিকে তাকিয়ে প্রচণ্ড শব্দে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। কেবল ঘেউ ঘেউ করল না, তাড়া করার ভঙ্গিতে কয়েক পা এগিয়ে গেল। ও কুকুরটার দিকে দেখল। কুকুরটা আরও দু-পা এগিয়ে এল। ও কোমরের কাছ থেকে হাত বের করল। হাতে একটা রিভলবার। হাত তুলে কুকুরটার দিকে তাক করল।

কুকুরটার আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কে কোনও অভিজ্ঞতা নেই। ও সমানে ঘেউ ঘেউ করে চলল। আমি ঝটিতি একবার দক্ষিণ মুখ ফিরিয়ে পুলিশ পিকেট দেখার চেষ্টা করলুম। কিন্তু কিছু চোখে পড়ল না। পাড়া কাঁপিয়ে একটা শব্দ হল, গুড়ুম। কুকুরটা শেষ বারের মতো একবার কঁকিয়ে উঠেই, খানিকটা ছিটকে গিয়ে ফুটপাতে লুটিয়ে পড়ল। এবং মুহূর্তেই চারদিক থেকে যেন বৃষ্টিপাত শুরু হল।

ও রিভলবার তুলে ধরল। তৎক্ষণাৎ একটি জল ভরা কাচের গেলাসে ওর মাথার পিছনে এসে পড়ল। গেলাসটা রাস্তায় পড়ে চৌচির হল। ওর মাথা কাটেনি, ফাটেওনি। এখন আর শুধু জল না। জল ভরা কাচের গ্লাস বৃষ্টি শুরু হল চারদিক থেকে। ও নিজেকে বাঁচাবার জন্য রিভলবার-সুহ দু-হাত দিয়ে মাথা ঢাকল। আমি দেখছি, আমার প্রতিবেশীরা ব্যালকনি ছেড়ে, কেউ কেউ রাস্তায় নেমে আসতে শুরু করেছেন। ও দেখল বেগতিক। জানি না, ওর রিভলবারে কতকগুলো গুলি আছে। তবে ও বুঝতে পেরেছে, একটা রিভলবার দিয়ে এই মারমুখো বাহিনীর সঙ্গে লড়তে পারবে না। মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে মানসিক শক্তিও নিঃশেষ। ও রিভলবারটা পকেটে ঢুকিয়ে, দ্রুত মোটরবাইকটা কেরিয়ার থেকে নামিয়ে, লাফ দিয়ে ঘোড়া চড়ার মতো সিটে বসল। এঞ্জিন স্টার্ট করতেই সেই জান্তব বীভৎস শব্দ। উত্তরে না গিয়ে, চোখের পলকে মোড় ফিরে দক্ষিণে চলে গেল ঝড়ের বেগে।

জল ভরা কাচের গেলাসের বৃষ্টি থেমে গেল। রাস্তার অনেকখানি জলে ধুয়ে গিয়েছে। কয়েকজন মহিলা-পুরুষ নারকেল কাঠির ঝাঁটা নিয়ে বেরিয়ে এলেন। কাচের টুকরো থেকে রাস্তাটাকে পরিষ্কার করতে হবে।

আমি আমার প্রতিবেশীদের দেখছে। চোখ ভরে দেখছি। জয় ও গৌরবের আনন্দে দেখছি।

লেখক মহাশয়,

আপনার 'বিহিত' নামে কাল্পনিক গল্পটি পড়লুম। পড়ে ভাবলুম, বাস্তবে যদি আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে ওইরকম ঐক্যবোধ থাকত, যদি তারা ওইরকম সাহসী হতেন, তাহলে অনেক অন্যায় ঔদ্ধত্যের মুখোমুখি হওয়া যেত।

ইতি

পর্বত

মহাশ্বেতা দেবী

সার্কাসের হাতি—পর্বত। আজ সাত দিন ধরে শুধু অপেক্ষা করছে সে। ধুলোর ওপর হাঁটু গেড়ে বসে, চোখের পর্দা ঢেকে পিঁচুটি আর কুয়াশার ভিতর দিয়ে মানুষদের দেখতে দেখতে, সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে। কখন সে-মুহূর্ত আসবে, তা পর্বত জানে না।

গায়ের ফাটা চামড়ার ফাঁকে ফাঁকে ঘা। তাতে মাছি বসছে। পায়ে শিকল বাঁধার দাগ বেয়ে ঝরছে রক্ত আর পুঁজ। মাথার ওপর দিয়ে রোদ যাচ্ছে দিনভর। বালতি ভরা জল আর চাল-বিচালির ডাবা পড়ে আছে যেমনকার তেমনি, ছোঁয়নি পর্বত। মালিক তার হাত মোচড়াচ্ছে তাঁবুতে। বুড়ো মাহুত বসে বসে বিড়ি ফুঁকছে, আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে পর্বতকে। সমস্ত গা দিয়ে একটা গন্ধ বেরুচ্ছে। এ গন্ধ কোনও ঘা, অসুখ বা নোংরার জন্যে নয়। এ হল মৃত্যুর গন্ধ। হাতিদের যখন মৃত্যু ঘনিয়ে আসে তখন এমনি ভাবেই জানান দেয়, তবু মালিক বুঝছে না। বলছে, খেলাতেই হবে পর্বতকে।

সার্কাসটা নতুন কিনেছে মালিক। এখন লোকসান দেখছে। কেমন করে তাকে বোঝাবে মাহুত, ভেবে পায় না। তোমার লোকসান হোক আর না হোক, ও মরবেই। মালিকের আর এক দুর্ভাবনা, জমি কিনতে হবে, গোর দিতে হবে হাতিকে। গোর দাও আর না দাও,ও মরবেই। মালিক ভাবেছে, খেলা না দেখালে দর্শকরা খেপে যাবে। মাটিতে থুথু ফেলে মাহুত বিড়বিড় করে। পর্বত তাকে দেখেও দেখে না। আশি বছর ধরে মানুষ দেখছে তার চোখ। এখন সে একটু বন খোঁজে। মাটির গন্ধ, ঘাসের গন্ধ খোঁজে ধুলোতে শুঁড় ডুবিয়ে।

কোনও গন্ধ, কোনও স্বাদ পায় না। কয়েকদিন থেকেই শরীরের ভিতরে জানান দিচ্ছে সেই অনুভূতি। প্রথমে এই বিশাল দেহের স্নায়ু, শিরা সব বিকল হয়। শিরশিরে আর অদ্ভুত একটা অনুভূতি গুঁড়ি মেরে মেরে এল তার হৃৎপিণ্ডের কাছে। যে কোনও মুহূর্তে সময় হবে আর চলে যেতে হবে তাকে।

সময় এল সন্ধের ঝোঁকে। জল ঢেলে, জল খাইয়ে, অনেক করে তাকে ঠেলেঠুলে তুলেছিল মাহুত, মালিকের বউ রঙিন ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল সার্কাসের এরিনাতে। পর্বতের পিঠে উঠে

বসল সে। শুরু হল বাজনা। চমক ভাঙল পর্বতের, ভিতরে যেন তার ভূমিকম্প হচ্ছে। যেমন হত তার বন্ধনহীন জীবনে, ত্রিপুরার জঙ্গলে। ঝাঁকুনি নয়, আঘাত করছে কেউ। আর সেই আঘাতে একটার পর একটা বাঁধন ছিঁড়ছে। পায়ে শিকল, পেটে পিঠে দড়ি, আবার তার ভিতরটাকেও বেঁধেছিল নাকি মানুষ, পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে? ছটফট করে ওঠে পর্বত। টলে ওঠে তার দেহ। বেঞ্চি রয়েছে, পা তুলতে হবে, লোহার বল গড়াতে হবে? এখনও এইসব হুকুম, পুতুলের মতো মতো মেপে মেপে বাঁচবার নির্দেশ? নিজেকে একবার ঝাঁকানি দেয় পর্বত। না পায়ে তার শিকল নেই। বেরিয়ে যেতে চায় সে। শুধু মানুষ আর মানুষ। জায়গা চাই। নির্জন জায়গা চাই।

আতঙ্কিত জনতা চিৎকার করে ওঠে। ক্লাউন, ব্যান্ডপার্টি, মালিকের বউ, গ্যালারি, চেয়ার সব ছিটকে ছিটকে পড়ে। ফাঁক কোথায়? তাঁবুর কাপড়, দড়িদড়া সব টেনে নিয়ে ছিঁড়ে বেরিয়ে যায় পর্বত। শুঁড় বাড়িয়ে এদিক ওদিক শুঁকে শুঁকে খোঁজে। শুধু ধুলোর গন্ধ, মানুষের গন্ধ। সার্কাসের গেট ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়। হাজার হাজার মানুষের চিৎকার—হাতি খেপে গিয়েছে! হাতি পাগলা হয়ে গিয়েছে, তার কানে আসে না। মেহগনি আর শিরীষের ছায়াঢাকা রাস্তা দিয়ে টলতে টলতে ছুটে গেল পর্বত। হাটুরেদের গোরুর গাড়িগুলো কিছু মাড়িয়ে, কিছু ফেলে দিয়ে, পুরনো গোরস্থানের পাশ দিয়ে, লেভেল ক্রশিং পেরিয়ে ছুটতে থাকে। শুঁড় বাড়িয়ে কীসের যেন গন্ধ পেতে চায়, আর তা না পেয়ে তীব্র চিৎকারে আকাশ চিরে ফেলে। মানুষের ওপর যে-রাগ তার আশি বছর ধরে জমেছে এখন সেটা ফেনা হয়ে নামতে থাকে। এই সময় এতটুকু বন, ঘাস, নীরবতা তাকে দেবে না, এ হল চরম বিশ্বাসঘাতকতা। আস্তে আস্তে মানুষের ছোঁয়াচ কমে আসে। ঝোপঝাড় শুরু হয়। বড় বড় গাছের জঙ্গল নয়। ছোট ছোট ঝোপঝাড়, পুকুর। তার ওপাশে ধান খেত। খেতভরা কচিকচি ধানের সমুদ্র। এই বিশাল বিস্তৃতি দেখে তবু তার ভাল লাগে। চুপ করে দাঁড়ায় পর্বত। ধানখেতটা দলে-মথে ফেলেছে দুপায়ে। তার গন্ধ এখন সে পাচ্ছে। শুঁড় ডুবিয়ে ঘ্রাণ নিতে নিতে তার মনটা স্থির হয়। চুপ করে দাঁড়ায় পর্বত। এখন আর কোনও অস্থিরতা নয়। এখন চুপ করে থাকতে হবে। কেননা এখন সেই সময় এসেছে। বহুদিন আগে তার পূর্বপুরুষরা এমনি করে অপেক্ষা করত জঙ্গলের গভীরে গিয়ে। সে-ও অপেক্ষা করে।

এখন অনেক কথা মনে পড়ল তার। আশি বছরের জীবনখানা জলছবির মতো পর্বতের চোখে এল। তিন বছরের পর্বত, তাদের দলের সঙ্গে ঘুরছে আসাম-ভুটান সীমান্ত দিয়ে। রাইডক নদীর পাড়ে লোনা পাথর। তারা চাঁদনিরাতে সেই পাথর চাটছে। মানুষের ঘৃণ্য গন্ধ পেতেই সর্দার কেমন সামলে বেরিয়ে গেল গোটা দল নিয়ে। মনে পড়ল আসামের জঙ্গলে সেই খেদার কথা। প্রথম 'মস্তি' আসবার পর কুনকি দেখে মেতে গেল পর্বত। তাতেই হল মরণ। তারপর থেকে পরিচয় শুধু মানুষের সঙ্গে। শহরের পিলখানায় বন্দি জীবন। একফালি চাঁদের মতো সুন্দর দাঁতজোড়া দেখে কুমার নাম রাখল পর্বত। কুমারকে পিঠে নিয়ে বেরোবার মুখে সেই সাদর সংবর্ধনা। পাকা ধানের গোছা আর মিঠাই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মাহুত। আবার পিলখানায় দুই দাঁতালে লড়াই। খেপে বেরিয়ে গেল বাহাদুর। একখানা দাঁতের আধখানা রেখে গেল পরাজয়ের চিহ্ন। বাহাদুর পরাজয় মানল কি? পিলখানার কুনকিদের

ডাক রোমাঞ্চ জাগাত তার মনে, ছুটে যেত সে। শহরের প্রান্ত দিয়ে আঁধার রাতে। কমিশনার সায়েবের গুলিতে বাহাদুর মাটি নিয়েছে আগরতলা থেকে ন-মাইল দূরে। মানুষ এমনিতেই ঘৃণ্য। শিকার আর হত্যার মুখোমুখি হলে তার গায়ের গন্ধ আরও কত ঘৃণ্য। সেই একটা সময় মনে পড়ল তার। শিকার করতে নিয়ে গিয়েছে কুমার সায়েব। খ্যাপা দাঁতালের সঙ্গে লড়াই হল। দাঁতাল মরল। জখম হল সেও। এত নির্বোধ মানুষ, যে, গুলি করল তাকেও। সেই জখমেও সে পঙ্গু হল। খরচ কমাতে সার্কাস দলে বেচে দিল তাকে।

সেই বিশাল ঐতিহ্য তার মনে পড়ল। জঙ্গল, পাহাড়, চরাই, উতরাই নদী জুড়ে তার যে স্বাভাবিক বিচরণক্ষেত্র পেয়েছিল জন্মসূত্রে -- সেইসব বিশাল ও মহৎ ব্যাপ্তি থেকে তাকে সরিয়ে এনেছে মানুষ। তার সেইসব পূর্বপুরুষ, হাজার হাজার বছর ধরে যারা বিচরণ করছে পৃথিবীর বনেজঙ্গলে— তাদের সঙ্গে যোগসূত্র অনুভব করল সে। মানুষের আগে তাদের অধিকার কায়েম ছিল পৃথিবীতে। মানুষ তাদের বঞ্চিত করেছে। নির্মম, নির্বোধ ও চূড়ান্তভাবে বঞ্চনা করেছে। কিন্তু তাতেই কি মানুষের জয় সম্পূর্ণ হল?

শুঁড় দিয়ে হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস টানে পর্বত। মানুষ জয় করতে পারেনি তাকে। আশি বছরের বন্দি জীবন আজ এমনি তুচ্ছ হল। মৃত্যুর মহান লগ্নে তার পূর্বপুরুষরা নির্জন স্থান খুঁজেছে। স্থির হয়ে গ্রহণ করেছে মৃত্যুকে। সেও তাই করেছে এবং এতেই সে পিতৃপুরুষের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রের বাঁধন অনুভব করছে। এখন শুধু স্থির হতে হবে। শুঁড় নামাল পর্বত। আকাশের পটভূমিকায় সেই বিশাল দেহ স্থির হয়ে রইল।

শহরে এদিকে সারারাত হট্টগোল চলল। হাজার হাজার মানুষ ছুটোছুটি করল। আলো নিভল না। জরুরি খবর নিয়ে মোটর সাইকেল ছুটল, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ-সুপার, ডিসি-র কুঠিতে। ঘুম ভেঙে সৈন্যরা উঠল। বিপদের ঘণ্টা শুনে জামাকাপড় পরল। বন্দুক নিল। ছুটে বেরুল। সব নিয়মমাফিক।

সবাই যখন এসে পৌঁছল তখন ভোর হয়ে আসছে। আকাশ সবে ফিকে হয়েছে। পুলিশসুপার চাপা গলায় হুকুম দিলেন। গুঁড়ি মেরে এগোল সৈন্যরা। দুদিক থেকে ঘিরে এল। ধানখেতের জলকায়দায় পা ডুবে যাচ্ছে। তবু শব্দ করছে না মুখে। প্রত্যেকটি সৈন্য নিজের কৃতিত্ব অনুভব করল।

ফায়ার! সুপারের গলা আর বন্দুক একসঙ্গে গর্জন করল। সবুজ ধানের ওপর ঝরঝর করে পড়ল লাল রক্ত আর আস্তে আস্তে, কাঁপতে কাঁপতে, পড়তে পড়তে পর্বত তীব্র চিৎকার করল।

মানুষের নির্বোধ আচরণের বিরুদ্ধে সেই অন্তিম প্রতিবাদ আকাশের কত দূরে গেল কে জানে। কেন না তার পরেও সূর্য উঠতে লাগল, সমস্ত ছবিটা আরও পরিষ্কার দেখা গেল তাতে। মানুষের মুখে ফুটল সাফল্যের হাসি। পুলিশ সুপার বুটপরা পা তুলে দিলেন পর্বতের গায়ের ওপর আর এই চূড়ান্ত নির্বোধ ও নিষ্ঠুর প্রহসনের ওপর তেতো থুথু ফেলতে লাগল বুড়ো মাহুত। এতজনের মধ্যে একমাত্র সে-ই বুঝল, পর্বত সাবধান করে গেল সবুজ অরণ্যবাসী তার জাতভায়েদের।

আর বুঝল এক ঝাঁক পাখি। রক্তের গন্ধমাখা মাটি ছেড়ে আকাশে উঠতে উঠতে ডেকে উঠল তারা।

গুপ্তধন

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

রেল ইয়ার্ডের পাশে ইন্দির ওকে টানতে টানতে নিয়ে এল। জায়গাটা এমনিতেই নির্জন, তা এখন তো সন্ধ্যা উতরে গেছে। এখন কেউ ভুলেও এদিকে পা দেয় না।

কুতকুতে চোখ চারপাশ একবার তাকিয়ে দেখে নিল টিটো। একদিকে টিনের বেড়া, অন্যদিকে কয়েক থাক ভাঙা রাবিশের স্তূপ, কিছু বনতুলসী আর বুনো কচুর ঝোপ। বিকেলের দিকে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পায়ের নীচে তাই কাদা কাদা ঠেকেছে। তাছাড়া পেটগুলনো কেমন একটা গন্ধ ভেসে আসছে মাঝে মাঝে। কিন্তু ও সব তখন বড় কথা নয়, কাদা বা গন্ধ টিটো গ্রাহ্য করে না। ওর সারা গা জুড়ে তখন কেমন একটা ভিন্ন ধরনের চাপা উত্তেজনা গড়াতে শুরু করেছে। বুকের ভেতর যেন দক্ষযজ্ঞ চলছে। একটু কান পেতে থাকলেই যেন শোনা যেতে পারে ঢিবঢিব করছে বুকটা। কিন্তু ইন্দিরার সে দিকে কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই। সাঁড়াশির মতো কেবল ওর হাতের কবজিটাকে ধরে রেখেছে ইন্দির। আর টানতে টানতে ওকে আরও অন্ধকারের ভিতর সেঁধিয়ে নিয়ে চলেছে।

আরও খানিকটা এগোতেই টিটো ফিস ফিস করে বলল, 'কেউ দেখে ফেললে কিন্তু চোর ছ্যাঁচড় ভাববে রে ইন্দির, সেটা কি ভাল হবে?'

ইন্দির তখনও ওর হাত ছাড়েনি। বিচ্ছুটাকে ওর বিশ্বাস নেই, হাত আলগা পেলেই ছুটে পালাতে পারে। সাহস দেবার জন্য বলল, 'এদিকে কেউ এলে তো দেখবে। আর একটু ওপাশে চল টিটো, জিনিসটা একবার একটু দেখেই তোকে ছেড়ে দেব।

টিটোর ডান হাতে রয়েছে একটা কাগজের মোড়ক। কী রয়েছে তাতে কে জানে। তবে

যাই থাক, টাকা-পয়সা যে নয়, তাতে সন্দেহ নেই। টাকা পয়সা কেউ অমনভাবে কাগজে জড়িয়ে নিয়ে যায় না। তাহলে কী থাকতে পারে, সোনা-গয়না? ধুস্, ধুস্, সোনাই যদি হবে তাহলে অমনভাবে কেউ ওটাকে সিটের পাশে ফেলে রেখে নেমে যায় না। টাকা পয়সা বা সোনা-গয়না নাই থাক, কিছু একটা যে আছেই তাতে সন্দেহ নেই। টিটো খুব সতর্কভাবে ওটাকে আগলে রেখেছে।

ইন্দিরেরও নজর সেই মোড়কটাই দিকে। নইলে কোথায় ওর লিলুয়ায় নামার কথা ও-নেমে পড়ল টিটোর পেছন পেছন।

ঘটনাটা ঘটেছে খানিকক্ষণ আগে। দুজনই ওরা ডানকুনি লোকালে বাড়ি ফিরছিল। দুজনেরই লিলুয়ায় নামার কথা, কিন্তু মাঝপথে একটা মজার ঘটনা ঘটল। ওদের কামরাটা ছিল ফাকা ফাঁকা। স্টেশনে ঢোকবার মুখে গাড়িটা একটু দাঁড়াতেই , দুজন লোক তড়িঘড়ি ট্রেন থেকে নেমে চোখের নিমেষে কোথায় মিলিয়ে গেল। নামতেই পারে, কত লোকই তো ওরকম নেমে যায়। কিন্তু টিটোর চোখে পড়ল একটা কাগজের মোড়ক। লোক দুটোই হয়তো ভুলে ওটা ফেলে গেল। কী ভুলো মন রে বাবা! টিটো এগিয়ে এসে সুট করে মোড়কটা তুলে ধরল। কিন্তু খুলতে সাহস হল না। এদিক ওদিক তাকাল, তারপর কামরা পালটাবার জন্য গেটের কাছে আসতেই ইন্দির এসে খপ্ করে ওর হাত ধরল, 'কী রে?'

টিটো বলল, 'কিছু না।'

'কিছু না মানে, আমি দেখিনি বলতে চাস?'

ইন্দিরের যা স্বভাব, হইচই বাধিয়ে দিতে পারে। টিটো ফিসফিস করে বলল, 'চেঁচাস না। ভাল হবে না।'

'ঠিক আছে, চল নামি তাহলে।'

টিটো বুঝল ও ধরা পড়ে গেছে। এ সময় চেঁচামেচি করলে বলাই, বিষ্টুরাও ছুটে আসতে পারে। আর তাহলে সবাই মিলে দেখতে চাইবে জিনিসটা। যদি কিছু দামি মাল থাকে, চোর ঠাওরাতে পারে ওকেই। কেউ বিশ্বাস করবে না, মালটা ওর কুড়িয়ে পাওয়া। ফলে ইন্দিরের কথায় ও নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

নেমে পড়তেই ইন্দির ওর কবজি ধরল, 'আয় এদিকে আয়।'

'কোথায়?'

'আয় না! আমি একটা মেয়ে বই তো নই। আমাকে অত ভয় পায় পাওয়ার কী আছে অ্যাঁ?'

ভয় ঠিক নয়। টিটো এই তেরো-চোদ্দ বছরের খেঁকুরে মেয়েটাকে কোনওদিন বিশ্বাস করে না। ভুলিয়ে ভালিয়ে ও জিনিসটাকে যে হাতাবার তাল কষছে তাতে সন্দেহ নেই। তবু টিটো এক মুহূর্তে কী ভাবল, তারপর রাজি হয়ে গেল। মনে মনে ঠিক করে নিল, তেমন অবস্থা বুঝলে ও ধানখেতের মধ্যে দিয়েই দৌড় লাগাবে। ইন্দির তো দূরের কথা, অনেক বড়রাই ওর সঙ্গে দৌড়ে পারে না।

ইন্দিরের সঙ্গে গায়-গায় সেঁটে ও এগিয়ে চলল। কিন্তু ততক্ষণে বেশ অন্ধকার নেমে এসেছে। রেল ইয়ার্ডের পাশটায় আরও অন্ধকার। সামনেই একটা আদ্যিকালের তেঁতুল গাছ।

সন্ধ্যা হলেই এসব গাছে হাজার হাজার পাখি এসে ভিড় জমায়, পাখিগুলো এখন ডালে পাতায় কোথায় কোথায় লুকিয়ে পড়েছে, কে জানে!

টিটো গাছটার দিকে বেশিক্ষণ তাকাল না। তবু ভাল ইন্দির এখন ওর পাশে আছে। নইলে একা একা ও এই ভুতুড়ে গাছটার দিকে এগোতেই পারত না। অনেক সময় মানুষের আত্মাও যে ওইরকম পাখির বেশ ধরে গাছের ডালে বসে থাকে না, কে বলতে পারে। কোনটা আসল পাখি আর কোনটা প্রেতাত্মা, টিটোর পক্ষে তা বিচার করা সম্ভব নয়।

আরও খানিকটা এগিয়ে একেবারে তেঁতুল গাছের গোড়ায় এসে ইন্দির বলল, 'বোস এখানে! এই অন্ধকারে এদিকে কেউ আসবে না! একটু শান্ত হয়ে এবার বোস তো!'

টিটোর কেমন ভয় ভয় লাগছিল। উপায় না দেখে ও ইন্দিরের গা ঘেঁষে বসে পড়ল। হাঁটুতে হাঁটুতে ছুঁইয়ে রাখল ও। মাথা ঘোরাতেই ইন্দিরের গায়ের গন্ধটা ও টের পেল। ঘেঁটু ফুলের মতো ভেজা ভেজা কেমন যেন একটা গন্ধ আছে ওর গায়ে। গন্ধটা ওর স্নায়ুর ভেতর ঢুকে কেমন যেন গেঁথে যেতে লাগল।

ইন্দির বলল, 'দে এবার। জিনিসটা দেখি।'

টিটো এরকমই একটা ভয় পাচ্ছিল। গা ঝাড়া দিয়ে উঠল, 'ওটা আমার।'

'আমার তো কী হয়েছে। দেখলে ক্ষয়ে যাবে নাকি! দে না!'

টিটো এবার একটু সরে বসার চেষ্টা করে। কিন্তু গাছটার দিকে চোখ পড়তেই আবার চমকে ওঠে। এদিককার ডালটা কি আগে থেকেই এত ঝোলানো ছিল। নাকি টিটো একটু সরার চেষ্টা করতেই ওটা অমন ঝুলে পড়ল। ও বলেই ফেলল, 'আমার ভয় করছে।'

ইন্দির ওর দিকে তাকিয়েই ছিল, বলল, 'তুই চুরি করেছিস না ডাকাতি করেছিস যে ভয় করবে।'

'ও কথা না।' টিটো আঙুল তুলে তেঁতুল গাছের ঝোলানো ডালটার দিকে ইঙ্গিত করল।

'কী আছে গাছে?' কেমন কৌতুক তাকায় ইন্দির।

টিটো ঠিক বুঝিয়ে উঠতে পারল না, এই রাত্রিবেলায় ওখানে কী থাকতে পারে। আবার ও খানিকটা সরে ইন্দিরের গায়-গায় সেঁটে বসল।

আর সেই সুযোগে ইন্দির ওকে বুকের কাছাকাছি টেনে নিল।

ইন্দিরের গাটা কেমন কুকুরের পেটের মতো গরম। এক চাপ নরম মাংসও যেন চেপে বসেছে ওর গায়ে। টিটোর সারা গায়ে কেমন ঝিম ঝিম করা ভাল লাগার একটা স্রোত বইতে শুরু করল। বোবা হয়ে গেল ও।

ইন্দির ওর ঘাড়ের ওপর একটা হাত তুলে রাখল, 'তুই না একটা ক্যাবলা। পুরুষমানুষের অত ভয় থাকতে নেই।'

টিটো কথা বলল না। কথা বলার মতো অবস্থা ছিল না ওর।

'আমি যদি তোর মতো ছেলে হয়ে জন্মাতাম, এত দিনে দেখতিস কত কিছু করে ফেলতাম।' ইন্দির ওর গালে আলতো করে একটা টোকা মারল।

'ঘোড়ার ডিম করতিস।' ছোট্ট করে উত্তর দিল টিটো।

'অবশ্য তুই এখনও পুরোপুরি ছেলে হয়ে জন্মাসনি। তুই এখনও শিশু, মায়ের দুধ

খাস।'

'ভ্যাট।'—এক ঝটকায় ইন্দিরের হাতটাকে কাঁধের ওপর থেকে সরিয়ে দিল টিটো।

ইন্দির আবার হাতটা তুলে আনল ওর কাঁধে, 'খাস না বুঝি? কত বয়স তোর শুনি? আমি যতদূর জানি, তোর এখনও দশ হয়নি।'

টিটো দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'এখানে হাত দিয়ে দেখ না, গোঁফ উঠছে আমার। দশ বছরে কারও গোঁফ ওঠে না।'

'দেখি!' অন্ধকারে ইন্দির হাত তুলে এনে ওর ঠোঁটের ওপর বুলিয়ে নিল, 'আই বাপ্ মেয়েদের মতো ঠোঁট রে তোর। কী নরম।'

'বাজে কথা। তোর ঠোঁট বুঝি ছেলেদের মতো?'

'হাত বুলিয়ে দেখ না। দেখলেই বুঝতে পারবি।'

'আমার দরকার নেই।' টিটো আবার গাছটার দিকে তাকাল। গাছের অন্ধকারটা ক্রমশ যেন ফেঁপে ফেঁপে বড় হয়ে উঠেছে। অথচ ইন্দিরটার কোনও নজর নেই সেদিকে। একটা কিছু হয়ে গেলে তখন বুঝবে।

ইন্দির বলল, 'ঠিক আছে, অনেকক্ষণ তো হল, এবার খুলে দেখা। কী পেয়েছিস দেখি।' টিটো আবার শক্ত করে মোড়কটাকে ধরে বুকের মধ্যে লুকোল।

'কী হল, দেখা না। কথা দিচ্ছি আমি ছোঁব না। দেখা।'

টিটো বলল, 'ঠিক আছে, তুই যদি না ধরিস তাহলে আমি দেখাতে পারি।'

'বললাম তো ধরব না।'

টিটো এবার আড়চোখে একবার ইন্দিরের চোখের ভাষা বোঝবার চেষ্টা করল। কিন্তু অন্ধকারে ছাই কিছু বোঝা যায় না। তার বদলে ওর চিবুকের কাছে হঠাৎ একটু ইন্দিরের গরম নিশ্বাসের হাল্‌কা লাগল।

'ঠিক আছে, তুই একটু সরে বোস, আমি দেখাচ্ছি।'

একটু ঢিল হয়ে সরে বসল ইন্দির।

টিটো কাগজের মোড়কটা কোলের ওপর রেখে ধীরে ধীরে গুপ্তধন আবিষ্কার করতে বসে গেল।

'হায়, হায়, এ কী রে!' কেমন যেন মিইয়ে পড়ল টিটো। কয়েক ফেত্যা কাগজের ভাঁজ খুলতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল পাকে পাকে সুতলি জড়ানো দুটো বোমা। এতক্ষণ এ দুটোকেই গুপ্তধন মনে করে বুকের ভেতর আঁকড়ে রেখেছিল ও। কী বোকা!

ইন্দির টিটোর অবস্থা দেখে হি হি করে হেসে উঠল, খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে। আরও ওটা আমার আমার কর্।

'আমি কী করে বুঝব, লোক-দুটো বোমা ফেলে যাবে ট্রেনে।'

'তুই একটা অপয়া। আমি ভাবছিলাম মণিমুক্তো মোহর কত কিছু থাকবে।'

'তোর জন্যই তো এমন হল। তুই যদি অমন করে আমার পিছু না লাগতিস তাহলে এমন হত না।'

'ঘোড়ার ডিম হত তাহলে। দাঁড়া ও দুটোকে আবার জড়িয়ে রাখি। কপাল ভাল, এতক্ষণ

ও দুটো নিয়ে ঘুরছিস, ফেটে যায়নি। ফেটে গেলে কী কেলেঙ্কারি হত বল তো!'

ইন্দির ভয়ে বোমা দুটোকে আবার কাগজের মোড়কে জড়িয়ে একপাশে সরিয়ে রাখল।

'মিছিমিছি আমরা গাড়ি থেকে নেমে এই এখানে এলাম।' টিটোর গলায় আক্ষেপ।

'এখানে এসে ভালই হয়েছে। বোকার মতো কোথায় গিয়ে তুই ওটাকে খুলতিস আর অমনি পুলিস এসে খপ্ করে তোকে ধরত। তুই তো এখনও পুলিশের গুঁতো খাসনি কোনওদিন। খেলে বুঝতিস।'

'তুই খেয়েছিস বুঝি?'

'আমি বড় হয়ে গেছি না। মেয়েদের গায়ে পুলিশ কখনও হাত দেয় না। তাছাড়া এবার থেকে আমি ফ্রকের বদলে শাড়ি পরতে শুরু করব।'

টিটো একটুক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'মেয়ে হয়ে জন্মেছিস বলে তোর অনেক সুবিধে।'

'সুবিধে কেন?' কৌতুকে ড্যাব ড্যাব করে তাকায় ইন্দির।

'কেন কী আবার। নারানবাবু তোকে মাঝে মাঝেই পয়সা দেয়, আমি দেখিনি বুঝি।'

'সে তো আমি ওর গা-হাত -পা টিপে দিই বলে, দোকান থেকে চা সিগারেট এনে দিই, জল তুলে দিই, তাই।'

'তুই মেয়ে বলেই তোকে দিয়ে ও ওসব করায়। আমি কাছে গেলে কেমন খ্যাঁক খ্যাঁক করে ওঠে দেখিস না। এমন ভাব দেখায় যেন ভিক্ষুক তাড়াচ্ছে।'

ইন্দির হেসে উঠল, 'তুই বড্ড ছেলেমানুষ। এই জন্যই তো বলছিলাম, তুই মায়ের দুধ খাস।' আবার খানিকটা বিরক্ত হয় টিটো। 'সত্যি কথা বললে তো তোর গায়ে লাগবেই।'

'সত্যি কথা আবার কি, নারানবাবু আমাকে এমনি এমনি পয়সা দেয় না, রীতিমতো খাটিয়ে পয়সা দেয়।'

টিটোর ঠোঁটের ডগায় অনেক খারাপ কথা এসে যাচ্ছিল, চেপে গেল। অনেক সময় অনেক সত্যি কথা বলা যায় না। তাছাড়া ইন্দিরকে এ সময় খারাপও লাগছিল না। ভগবান যেন ওকে ছানা-মাখন দিয় গড়েছে। তাছাড়া ওর শরীরের গন্ধটার মধ্যেও কেমন যেন একটা আকর্ষণ রয়েছে।

আবার একটু গা ঘেঁষাঘেষি করে বসেছে ওরা। টিটোর কাঁধের ওপর আবার একটা হাত তুলে দিয়েছে ইন্দির। টিটোর বুকের ভেতর যেন দুম দুম করে শব্দ হতে শুরু করেছে। কেমন আড়ষ্ট হয়ে সামনের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে ও।

ইন্দিব ওর হাতখানা এবার নিজের কোলের ওপরেই টেনে নিল, 'ঠিক হয়ে বোস না টিটো। তুই না ভয়ানক ভিতু, ভয়েই মরে গেলি। অথচ এই সাহস নিয়ে তুই রেলে ঘুরে বেড়াস কী করে, বুঝি না।'

টিটো অস্বীকার করতে পারেনা যে ও ভীতু। চুপ করেই থাকে ও।

'তাছাড়া তোর গায়ে একদম জোর নেই, এই তো তোর শুকনো শুকনো হাত।'

টিটো একটু বিব্রতভাবে হাসবার চেষ্টা করে। তারপর বলে, 'তোর চেয়ে বেশি জোর। ইচ্ছে করলে আমি কালুদার মতো ঘুষি মেরে নারকেল ফাটাতে পারি।'

'ছাই পারিস। যাদের হাত-পা অত ঠাণ্ডা তারা কিছু পারে না।'

'তোরও তো ঠাণ্ডা।' টিটোর গলার স্বর ফ্যাস ফ্যাস করে উঠল।

আর ঠিক এই সময়ই ওরা দুজনে চমকে উঠল। কে একটা লোক যেন এগিকেই এগিয়ে আসছে। হাতে একটা টর্চ। ইন্দির ফিসফিস করে বলল, 'চুপ।'

টিটো ঘাড় উঁচু করে দেখার চেষ্টা করল, সত্যি সত্যি একটা ছায়ামূর্তি। মূর্তিটা কি তেঁতুল গাছর দিকটাতেই এগিয়ে আসছে নাকি! কী জানি বাবা, কী মতলব রয়েছে মাথায়।

কে রে বাবা! এদিকে এই অন্ধকারের দিকে কি চায়ও। ইন্দিরও ঠিক বুঝতে পারছে না, কে হতে পারে লোকটা। হঠাৎ যদি ওদের দেখে ফেলে এখানে নির্ঘাত চোর চোর করে চেঁচিয়ে উঠবে।

স্টেশনের দিকটা এখন নিঝুম হয়ে থাকার কথা। এ সব স্টেশনে ট্রেন এলেই যা একটু লোকজন দেখা যায়। অনায়াসে ওরা স্টেশনে গিয়ে বসেও গল্প করে কাটাতে পারত। পরের লোকাল আসতে রাত নটা।

ইন্দির ফিসফিস করে ওর কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'কথা বলিস না টিটো। লোকটা বোধহয় চৌকিদার। শেডের পিছন দিকটা দেখতে এসেছে।'

টিটো কথা বলবে কি, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। ইন্দিরই এখন ওর ভরসা। মেয়েটার আর যাই হোক, বেশ সাহস আছে। ফলে ইন্দিরের গায়-গায় একদম ও সেঁটে যাচ্ছিল। যেন ইন্দিরকে ও সামনে রেখে পাঁচিলের মতো পিছনে লুকোবার চেষ্টা করছিল।

ছায়ামূর্তির হাতের টর্চটা একবার তেঁতুল গাছের গা ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। আলোটা আর একটু নীচের দিকে নামলেই ওরা ধরে পড়ে যেত।

কিন্তু ইন্দিরের যেন ভয়ডর বলতে কিছুই নেই। এই অবস্থাতেই ও ফিসফিস করে কী যেন বলতে চাইছে।

'কী? কী বলছিস?'

'এখানে বসাটা ঠিক হচ্ছে না। চট করে ওই রাবিশগুলোর পেছনে চল।' টিটো একটু ঝাঁকি খেল। 'তুই আগে যা।'

'ঠিক আছে। আয়, আমার পেছনে আয়। শব্দ করিস না যেন।'

ইন্দির হামাগুড়ি দিয়ে খানিকটা এগিয়ে সুট করে রাবিশের স্তূপের পিছনে এসেই মাথা নিচু করে বসে পড়ল।

টিটোও অনুসরণ করল ওকে। যত রাজ্যের খোয়া ভাঙা আর পাথেরের ঢেলার মধ্যে গড়িয়ে পড়ল টিটো।

ইন্দির আবার ওর গায়-গায় সেঁটে গেল। তারপর একটু একটু করে মাথা তুলে দেখতে লাগল লোকটা কী করে।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। হঠাৎ ইন্দির ফিসফিস করে বলল, 'আর একটু জোরে চেপে ধর না আমাকে, বেশ লাগছে।'

অন্য সময় হলে টিটো ওর নাকের ওপর ঘুঁষি চালিয়ে দিত, কিন্তু এখন ইন্দির ছাড়া ওর উপায় নেই।

টর্চ ঘোরাতে ঘোরাতে লোকটা ততক্ষণে প্রায় তেঁতুল গাছটার কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। একটু থমকে দাঁড়িয়েছে। কী জানি বাবা কাগজের মোড়কটা ওর চোখে পড়ে গেছে কিনা।

ইন্দির ওর গালটাকে টিটোর গালের সঙ্গে চেপে রেখেছে। ভীষণ বিড়ি খায় ইন্দির। ওর মুখ থেকে বিড়ির গন্ধ ভেসে আসছে। তা হোক, এখন আর বিড়ির গন্ধ নিয়ে ভাবলে চলবে না ওর।

ছায়ামূর্তিটা কিন্তু এবার শেডের দিকটা দেখে নিয়ে আবার ফিরে যেতে শুরু করেছে। চৌকিদার যে সন্দেহ নেই। চৌকিদার না হলে অমনি করে ফালতু ফালতু আসে কেউ।

'যাক বাবা বাঁচা গেল।' ইন্দির আরও কিছুক্ষণ পর বলল।

টিটোও যেন ততক্ষণে আবার প্রাণ ফিরে পেয়েছে। তবু নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য জিজ্ঞেস করল, 'চলে গেছে?' ইন্দিরের দিকে তাকিয়ে থাকল ও।

'হ্যাঁ গো মশাই, গেছে। ভয়ে একেবারে কেঁচো হয়ে গেছিস তুই।'

টিটো একটু সহজ হবার জন্য হাসল, 'ভয় না। আসলে লোকটা আমাদের দেখে ফেললে ঝামেলা হত।'

'ছাই করত আমাদের। আমরা তো আর চোর নই। যারা চুরি করে তাদের ধরুক না ও। এই টিটো আর একটু চেপে ধর না আমাকে।'

'ধুত্!' টিটো মুহূর্তের মধ্যেই ওর হাত দুটো ইন্দিরের গা থেকে সরিয়ে আনল। 'চল, উঠি এবার।'

'উঠে কোথায় যাবি? পরের লোকাল আসবে রাত নটায়। এখনও ঢের দেরি।'

'চল না প্ল্যাটফর্মে যাই? লোকটা আবার যদি দেখতে আসে?'

'ছাই আসবে। তুই না একটা নাম্বার ওয়ান ক্যাবলা।'

'ক্যাবলা তো ক্যাবলা।' টিটো ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে।

ইন্দির বলল, 'তুই একলা যাস তো, আমি চেঁচিয়ে চৌকিদারকে জানিয়ে দেব।'

চৌকিদারের কথায় আবার একটু থমকে দাঁড়ায় ও। এদিক-ওদিক তাকায়। ইন্দিরও ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে একপলক ও টিটোকে দেখে নিয়ে হি হি করে হেসে উঠল।

'হাসছিস যে?' প্রশ্ন করে টিটো।

'তোর অবস্থা দেখে।'

'কেন, কী করেছি আমি? তুই না এমন করেছিস, যেন —'

'ঠিক আছে বাবা ঠিক আছে। আর হাসব না। এই আমার দিকে একটু তাকা দেখি।'

টিটো ওর চোখের দিকে তাকাল. 'কী হয়েছে?' দেখল, অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে ইন্দিরের চোখ।

ইন্দির ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর হাত দুটো বিছিয়ে দিল, 'দাঁড়া , একটা মজা করব।'

'কী মজা।' বুকের ভেতর আবার ঢিব ঢিব শব্দ শুরু হয় টিটোর।

'আমার দিকে তাকিয়ে থাক না।'

'তাকিয়েই তা আছি।' টিটো মন্ত্রমুগ্ধের মতো ইন্দিরের দিকে তাকিয়ে থাকল। ছায়া ছায়া অথচ নিটোল মোমের মতো ইন্দিরের মুখখানা যেন এগিয়ে আসছে। ইন্দির যেন সম্মোহন করে ফেলেছে ওকে। টিটো চোখ ফেরাতে পারল না। জাদুকরীর মতো ইন্দির যেন এখন চোখের খেলা দেখাতে শুরু করছে।

এক ঝলক উষ্ণ নিশ্বাস ওর কপালে ছুঁয়ে গেল। টিটো ভয়ে চোখ বুজে ফেলল। ঝাঁজালো একটা গন্ধ যেন ক্রমশ ওকে ঘিরে ফেলেছে। বিড়ি-খাওয়া কটু একজোড়া ঠোঁটের স্পর্শ পেল ও। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বুকের ভেতর দুম দুম করে বোমা ফাটতে শুরু করল। অনাস্বাদিত একটা জগতে ধীরে ধীরে পৌঁছে যেতে শুরু করল টিটো।

অনেকক্ষণ ওইভাবে কেটে গেল ওদের। লালায় আর রক্তে ঠোঁটটা জ্বালা করে উঠতেই টিটো একটু শব্দ করে ককিয়ে উঠল।

আর সঙ্গে সঙ্গে ওকে ছেড়ে সরে দাঁড়াল ইন্দির, 'কী হল?'

সমস্ত শরীরটা তখনও থরথর করে কাঁপছে। কথা বলতে পারল না টিটো। জামাটা উলটে নিয়ে ঠোঁট মুছতে শুরু করল।

ইন্দির বলল, 'ধুত্! ফালতু। মায়ের দুধ খা-গে-যা।'

টিটো কথা বলল না।

ইন্দির বলল, 'চল রে ক্যাবলা । প্ল্যাটফর্মেই যাই চল। আয়।' টিটোর হাত দুটো আবার সাঁড়াশির মতো চেপে ধরল ও।

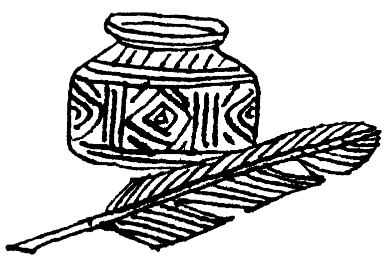
রাবিশের স্তূপ থেকে তেঁতুল গাছটার কাছে আসতেই টিটোর চোখে পড়ল কাগজের মোড়কটা।

ইন্দির বলল, 'কী দেখেছিস ? ভয় নেই রে ক্যাবলা, ফাটবে না আয়।'

'ফাটবে না কেন?' ফ্যালফ্যাল করে তাকায় টিটো।

ইন্দির হাসে, 'সব বোমাই কি ফাটে নাকি! তোর মতো ভেজা যে, আয়।'

ওরা প্ল্যাটফর্মের দিকে হাঁটতে লাগল।



দারুব্রহ্মকথা

সৈয়দ মুস্তফা সিরাজ

গঙ্গাহাটির সেই পাখিডাকা দিনগুলিন আর শেয়ালডাকা রাতগুলিন কোথায় গেল? কোথায় গেল শুয়োরচরা নালার পাড়ে কাঁটামাদার, কেয়াঝাড়, আকন্দ-কালকাসুন্দের জঙ্গলশোভা? দহের ধারে একলা দাঁড়িয়ে থাকত একটা শিমুলগাছ। ঋতুর রাজা আগাম যাকে আঁচড়ে-কামড়ে রক্তারক্তি করে জানিয়ে দিত, আসতে দেরি নেই, সেও গেল! গেল কোথায়?

জীবদ্দশায় বহু দুঃখে তারারানি যাঁকে বলতেন, 'দারুবেম্ম', কারণ তিনি সবতাতে মিতবাক এবং নির্বিকার, সেই দারুব্রহ্ম ব্রজগোপালের মুখে এদিন এই সব হাহুতাশ শুনে চক্রধারী স্বভাবজ সাংকেতিক শব্দ বের করেন, 'পপুলেশন।' তারপর একটি প্যাঁচালো উক্তি করেন, 'বগা চরতে ২ যায়/ বিল মরতে ২ যায়।

উক্তিটি বহুপ্রচলিত ধাঁধা, যার সমাধান ব্রজগোপালের জানা। বলেন, 'লম্প! লম্পের কথা আসছে কেন?'

'আসছে।' বাঁকা ও রহস্যময় হাসেন ধূর্ত গ্রামীণ ভাঁড়পুরুষ। 'বগার চরা শেষ হলে লম্পও নিবিয়ে যাবে হে দারুবেম্ম!' বলে শিমুলগাছটার কথায় যান। 'শিমুলগাছ শিমুলগাছ করছ। ওটা ছিল না।'

দারুব্রহ্ম বলেন, 'ছিল না! তাহলে ছোটবেলা থেকে এতগুলিন বছর'—চুপ করে যান হঠাৎ। আজকাল গঙ্গাহাটিতে অসংখ্য না হ্যাঁ এবং অসংখ্য হ্যাঁ না হয়ে যাচ্ছে। কিংবা হ্যাঁ ও না-এতো তফাতে লোকে বুঝতে পারছে না। কাজেই চুপ করে থাকাই ভাল।

চক্রধারী ব্যাখ্যা করেন, 'ছিল না মানে রেকর্ড-পরচায় ছিল না। তিরিশ ডেসিমেল মাটিটা ছিল। নো টিরি।'

খুব হাসতে থাকেন। যেহেতু সমস্তটাই প্রমোদযোগ্য বিষয় সেইহেতু ট্রিকে 'টিরি'-তে পরিণত করা চলে। ইংরেজ আমলে থার্ড ডিভিসনের ম্যাট্রিকুলেট চক্রধারী যতকাল হাঁটাহাঁটি করতে পারতেন, ততকাল মামলায় তদ্‌বিরকারী ওরফে 'দালাল' ছিলেন, আঞ্চলিক লোক-টার্মে। তার বিবিধ বিষয়ে তাঁর প্রতিভা ছিল। গাজনের সং ও ছড়া বেঁধে নিম্নবর্গীয় সমাজে জোগান দিতেন, ফলে জনপ্রিয় ছিলেন। পড়ো পড়ো দশা জমিদারবাড়ির ঠাকুরদালানে তরজা

পাঁচালি, এমন কী কবিয়াল গাইতেও পটু ছিলেন। তবে কার কী গোপন কেলেঙ্কারি পরবর্তী গাজনের সঙে বা ছড়ায় ফাঁস হবে, সেই আমোদগেঁড়ে প্রতীক্ষা এবং যুগপৎ উদ্‌বেগের টানাটানিতে চক্রধারী বারবার একটা দড়ি টানাটানির খেলায় মধ্যিখানে আটকে গিয়েছিলেন। সেইজন্যই, নাকি মামলার দালাদালির দরুন তার একটি ঠ্যাং নড়বড়ে হয়ে যায়, নিজের ভাষা অনুযায়ী অবশ্য তা নিছক দুর্ঘটনাজনিত। দুর্ঘটনাটি মহকুমা শহরেই ঘটেছিল, তাও ঠিক। তারপর থেকে তিনি নড়ি হাতে লেংচে হাঁটেন। পোস্টাপিসের বারান্দায় বসে অবাঙালি শ্রমিকদের মানিঅর্ডার ফরম লেখেন। সর্বশেষ একমাত্র জীবিকা।

এদিকে শিমুল গাছটির অন্তর্ধানের দিন ব্রজগোপাল গঙ্গাহাটিতে ছিলেন না। পেনসনের টাকা সাত বছর ধরে আটকে। নাকি ফাইল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এদিন সদর শহরের আপিসে গিয়ে কনিষ্ঠতম করণিকের ধমক খেয়ে প্রায়-মূক, মিতবাক দারুব্রহ্ম বিদীর্ণ হবার চেষ্টা করেন পইতে ছিঁড়ে এবং সেই পৌরাণিক অভিশাপ কম্পিউটারযুগ একুশ শতকের যাত্রীদের অট্টহাসির থাপ্পড় হয়ে তাঁর সর্বাঙ্গে পড়ে। তখন নিছক দারুমূর্তি হয়ে বেরিয়ে আসেন। ফেয়ারওয়েল সংবর্ধনায় সাত বছর আগে উপহার পাওয়া, বড় অবাক এই উপহার, বারো ইঞ্চি বাই ছ-ইঞ্চি ট্রানজিস্টার, যেটা সারাক্ষণের সঙ্গী, পইতে না ছিঁড়ে সেটাকেই কেন আছড়ে ভেঙে দিয়ে এলেন না। ভেবে পরে একটু পস্তেছিলেন। এ ছিল এমন একটা কষ্টের রাত , যখন ভগবানকে শালা বলে গাল দিতে ইচ্ছে করে। শেষে শান্তি খুঁজতে বিগত সাত-সাতটা বছর দিনরাতগুলিনের অভ্যাসমত সঙ্গীত শুনতে যন্ত্রটির নব ঘোরান। তাঁর মতেই বুড়ো যন্ত্রটি ঘড়ঘড় করে ওঠামাত্র পেছনবাড়ির লক্ষ্মী ঠাকরুন খোলা জানলার বাইরে এসে, এ রাতে ফুটফুটে জ্যোৎস্না ছিল, ব্যস্তভাবে তাঁকে বলেন, 'গাঁয়ে গণ্ডগোল, আমরা সাতে-পাঁচে নেই বট্‌ঠাকুর। শুনলে পরে ভাববে, মজা দেখছি।' কিন্তু সত্যিই মজা দেখার মতো করে সারাটা রাত কোথায় নির্ঘোষ মাইক্রোফোন বাজল। আজকাল গঙ্গাহাটির কিছু বোঝা যায় না।

চক্রধারীর কাছে গণ্ডগোলের ব্যাখ্যা চাইতে গিয়ে ওইসব সাংকেতিক সংলাপ, যার অনেকটাই বুঝে নিতে দেরি হয়। ধূর্ত ও চিররসিক ভাঁড়পুরুষ দহের ধারের তিরিশ ডেসিমেল ভেস্টেড মাটি কীভাবে কালাচাঁদ সরকারের কাছে লাভ করে, করলেও জামশেদ-খোকন-পণ্ডাবাহিনী সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকা শিমুল গাছটিকে আইনত অস্তিত্বহীনতাহেতু নির্মূল করে নিয়ে যায়, তার কাঠগুলিন এ মুহূর্তে কোথায় আছে, নির্মূল করার সময় ও পরে ঠিক কতগুলিন বোমা ফাটে, গঙ্গাহাটির রাজপথে যে-মিছিল বেরোয় তার প্রকৃত জনসংখ্যা, তার শ্লোগান, যাবতীয় বিষয় বর্ণনা করেন—অবশ্যই সাংকেতিক শব্দবিন্যাসে। শেষে বলেন, 'থাকত যদি তোমার সাধন-স্বপন!'

এই কথায় ব্রজগোপালের একটি শ্বাস ফোঁস করে। কেন সাধন আর স্বপন, এই দুই তালেবর পুরুষের আবির্ভাব হয়েছিল তাঁরই ঔরসে, এও বোঝা যায় না। আজকাল চারদিকে এত ফাঁদ কে পাতল? ট্রানজিস্টারটি একরাতে তাঁকে শুনিয়েছিল, 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে!' সেই থেকে খালি ফাঁদের কথাটাই মাথায় ঘোরে। হিংসার রাজনীতি করতে গিয়ে সাধন জেলে মৃত্যুরোগাক্রান্ত, কাগজের খবর চক্রধারী পাচার করেছিলেন দারুব্রহ্মকে! তারারানি

বেঁচে থাকলে 'দারুবেম্ম' শুনে শুনে কান ঝালাপালা হত। তবে স্বপন —স্বপন প্রশ্ন সৃষ্টি করে গেছে।

পেছনবাড়ির লক্ষ্মীঠাকরুন, পাশের বাড়ির মন্মথ, দূরের বাড়ির এই চক্রধারী ধ্যাবড়া পোঁচে রঙবেরঙের সমবায় চিত্রকলা চর্চা করতেন। সেটির সস্নেহে ক্যাপশান : 'এই ছেলেটা ভেলভেলেটা গঙ্গাহাটি কিনবে।' পরে ব্রজগোপালের মনে হয়েছিল, খারাপটা যে খারাপ, আজকাল সেটাও লোকরা চিনতে পারে না। তিনিও পারেননি। স্বপনের টাকায় এই মাটির বাড়ির চালে টালি ওঠে, দেয়ালে চুনকাম, এমন কী নিয়মিত অন্নবস্ত্রও জোটে। কিন্তু পেনসনের আটকে-থাকা ফাইল বেরিয়ে পড়ার আগে সুহালে তিনি চিতেয় উঠবেন, এমন বেপরোয়া প্রত্যাশা অতর্কিতে বোমা-বিস্ফোরণে টুকরো হয়ে যায় এক গ্রীষ্মের দুপুরে। হতভম্ব ও স্থাণু দারুমূর্তির সামনে এসে চক্রধারী নাক ঝেড়ে মর্মবেদনা প্রকাশ করেন এবং সাংকেতিকভাবে বলেন, 'পাকা বেল নয় যে মাথায় খসে পড়ল। বেদের মরণ সাপের হাতে, বোঝালেও বুঝত না হে!' সদরের কাগজে খবর হয় : 'বোমা বানাতে গিয়ে সমাজবিরোধীর মৃত্যু।' চক্রধারীর প্রাক্তন 'দালাল' হৃদয় মোচড় দেওয়ায় কয়েকটি দিন দারুমূর্তিটির কানে ক্রমাগত ফুসমন্তর ঢালতে থাকেন, 'ডিফেমেশান ঠুকে দিই, এস। অন্তত লাখখানেক। স্বপন সমাজবিরোধী ? আমাদের সকলের ভালবাসায় ধন স্বপন।'

সত্যিই আজকাল খারাপকে খারাপ বলে আলাদা করে চেনা যায় না। ভাল-খারাপ জড়িয়ে-মড়িয়ে আছে। টালির চাল, নিয়মিত অন্নবস্ত্র, এসবের সঙ্গে বোমা বানানো, সমাজবিরোধী হওয়া মিলে-মিশে ছিল। বুঝে উঠতে সময় লেগেছিল।

মাটির বাড়ি আমূল ও পারিপার্শ্বিক ওতোপ্রোত সার্চের পর দারোগা মথুরামোহন বলেছিলেন, 'আপনি শুনলাম সদব্রাহ্মণ, মহাশয় ব্যক্তি। তা আপনি এত অ্যান্টিসোশ্যালের জন্ম দ্যান ক্যামনে?' তারপর হাঁটুর নীচে বেটন ঠুকতে ঠুকতে 'মাইয়্যা নাই?'

দারুমূর্তি কাঠের। তাই তাঁর পক্ষে থেকে নেতিবাচক জবাব দেন চক্রধারী প্রমুখ। নেই শুনে আইনরক্ষক মুচকি হেসে 'বাঁইচ্যা গেছেন' বলে স্থানত্যাগ করেন। মাটির বাড়ি ও পারিপার্শ্বিকে সমাজবিরোধী ছেলেটা ভেলেভেলেটা ন্যূনতম নিদর্শনও রেখে যায়নি।

স্বপনের এই নিদর্শন না-রাখার ঘটনা বুকে ধাক্কা দিলে দারুমূর্তি জীবন্ত হয়ে ঝাপসা চোখে ভেবেছিলেন, সদ্‌ব্রাহ্মণ মহাশয় ব্যক্তি জন্মদাতার প্রতি সমাজবিরোধ ও ক্লাস টেনের ড্রপ আউট পুত্রের এটা কিসের নিদর্শন? চক্রধারীর এ বিষয় সাংকেতিক বক্তব্য : 'তোমার ছেলে দুটিন ভাল, তবে কালধর্ম'— ব্রজগোপালের ভেতরে সেই প্রথম একটি প্রশ্নের পোনামাছ ছেড়েছিল। পোনামাছ প্রশ্নটি ক্রমে পূর্ণকায় ও চঞ্চলতর হচ্ছে।

এভাবে পেনসন আটকে থাকা অবসরপ্রাপ্ত এক প্রাক্তন করণিকের জীবন থেকে ছেলেদুটিন-সহ আরও কতকিছু চলে গিয়ে হাতে রইল ট্রানজিস্টার। ব্যাটারি কেনার অভাবে মুমূর্ষু যন্ত্রটি বেশি ঘড়ঘড় এবং চিঁচিঁ করে। তবু কী অদ্ভুত প্রক্রিয়ায় সেই ক্ষীণ হাহাকার ফিরিয়ে আনে সুখকর স্মৃতিগুলিনকে। তখন চক্রধারীর 'বাঞ্ছাকল্পতরুতলে বাস ছিল হে, ভুল করেছ' এই ব্যাখ্যাটি মনঃপূত হয়। তরুটি ছিল অফিসঘরে। এতদিনে টের পান। মনে পড়ে

যায়, তরুটির কাছে তাঁর সহকর্মীদের কেউ-কেউ বা অনেকেই যা বাঞ্ছা করেছিল, সত্যিই মিলেছিল। আবদুল গফুর, চিত্তরঞ্জন, কী যেন নামটা ছিল—সাধুখাঁ, আরও অনেক। সত্যিই তাঁর মতো 'ভ্যাবলা মানুষ' চোখে পড়ে না, এই খেতাবটিও অবশ্য তারাসুন্দরীর। নিজের ভ্যাবলামি যত দিন যায়, এভাবে তুলনামূলক দৃষ্টান্তে বেশি করে চোখে পড়ে এবং যন্ত্রটি বন্ধ করে অভিমানী চোখে শুওরচরা নালার পরে তাকিয়ে থাকেন। অবাক লাগে, কাঁটামাদার কেয়াঝাড় আকন্দ-কালকাসুন্দের ব্যাপক দারুমৌন এফোঁড় ওফোঁড় করে হুইসল দিতে দিতে গর্জে বেড়াচ্ছে ভুসকালো শান্টিং ইঞ্জিন। দেখতে দেখতে রেলইয়ার্ডে কোথায় চলে এল! ক-বছর ধরে একটা একটা ওয়গান প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ঠিক তাঁরই মতো পায়ের তলা ও চারপাশটাতে ঘাস গজিয়ে গেল। চক্রধারীর ভাষ্যে 'উটিন প্রেমঘর।' জানলার ধারে বসে ব্রজগোপাল কখনও সখনও প্রেমিক-প্রেমিকাদের ছায়ামূর্তির প্রবেশ-নির্গমন না দেখছেন, এমন নয়। আসলে বড় বেশি দখলের সময় চলছে। কালাচাঁদের পাওয়া মাটির শিমুল গাছটিকেও দখল করা হল। নালার পারের জঙ্গলশোভা দখল করল রেলইয়ার্ড। ওয়াগনটি দখল করল প্রেমিক-প্রেমিকারা। স্টেশনের কাছে রেলের জমিতে শুয়োরপালকদের দখলের উচ্ছেদ করতে গেলে হিংসার রাজনীতি সাধন নামে নেতা প্রসব করেছিল। শেষে শুয়োরপালকদের ঝোপড়ি থেকে গেল, কিন্তু সাধন জেলে মৃত্যু রোগাক্রান্ত। আরও অদ্ভুত ঘটনা, রেলকোয়ার্টারের জমাদার চাঁদঘড়িও অন্যতম শুয়োরপালক, যদিও সে ঝোপড়িবাসী ছিল না, দুপুরবেলা এই নালায় তার শুয়োরগুলিনের তদন্তে এসে চেরাগলায় গান গায়, 'ক্যায় সা বদল হো গয়া হ্যায়। অ্যায়সা বদল না চাহিয়ে' এবং 'অ্যায়সা বদল না চাহিয়ে'-কে পুনঃ পুনঃ টান দিয়ে যেন ঘোষণা করতে চায়, এ বদল অভিপ্রেত ছিল না —সত্যিই ছিল না, অথচ এই কথাগুলিন এবং অন্তর্নিহিত হিংসার রাজনীতির; বস্তুত এই গানটিই হিংসার রাজনীতির অভ্যুত্থানের সময় সাধনরাই ওদের বোঝাবার মতো পদ রচনায় এবং লোকসঙ্গীতের সুরে বেঁধেছিল।

কিছু বোঝা যায় না তার, কিছুই না। দারুব্রহ্ম ছটফট করেন কী গূঢ় জ্বালায়। গানটি তাঁরও আজ অন্তরের গান বলে মনে হয়। চক্রধারীর নির্দেশিত লম্প নিভে যাওয়ার পরিণামটি ত্বরান্বিত কি না খোঁজখবর নিতে চক্রধারীর চেয়ে আরও ঘোরালো দার্শনিকতার ভূতগ্রস্ত দারুব্রহ্ম ট্রানজিস্টার হাতে (পাছে সম্বল চুরি যায়) গ্রাম পরিক্রমা করতে থাকেন। খারাপগুলিন কতটা খারাপ হচ্ছে দেখতে গিয়ে প্রথমে দহের ধারে পোড়ো জমিটাতে কালাচাঁদের ঝাকড়মাকড় বেগুনখেতের অভ্যুদয় আবিষ্কার করেন এবং তখনই ধারণা হয়, খারাপগুলিন আরও খারাপ হচ্ছে আসলে ভালগুলিনকে জায়গা দেবার জন্যই। তিনি কালাচাঁদের তারিফ করেন, এক দক্ষ রূপকার, মাটির অভাবে পৃথিবীকে রূপবতী করতে পারছিল না ভেবে, এবং শিমুলগাছটির জন্য হুতাশ বৃথা। ফলে রূপকার কালাচাঁদ তাঁকে একটি প্রকাণ্ড বেগুন উপহার দেয়, যেটি পুড়িয়ে খেয়ে সে-বেলার মতো ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় ব্রজগোপালের।

দারুব্রহ্ম, সদ্‌ব্রাহ্মণ মহাশয় ব্যক্তি ব্রজগোপালের জীবনের অন্যপর্ব এভাবেই শুরু হল। সামান্য একটি বেগুন থেকেই।

পেছনবাড়ির লক্ষ্মীঠাকরুন পাড়াসম্পর্কে বট্‌ঠাকুরকে কখনও খাওয়া-দাওয়ার কথা তির্যক

জিজ্ঞেস করতেন, 'এ বেলা কী রাঁধলেন বট্‌ঠাকুর?' ঠাকুর হাসবার চেষ্টা করলে বোঝা যেত, রাঁধার মতো কিছু নেই। দয়াময়ী লক্ষ্মী অন্নপূর্ণাটি হয়ে কিছু অন্নব্যঞ্জন দিয়ে যেতেন। 'আপনার খাওয়া তো জানি, পক্ষীর আহার।' এই শুনে ইচ্ছে করত বলতে, 'আমি পক্ষী নইকো, মানুষ'। সাক্ষাৎ দারুব্রহ্ম যিনি, তাঁর একথা মুখ ফুটে বলা সাজে না। অন্যের তুলনায় তাঁর খাওয়া কম, সেটা সত্যি। তাই বলে এই 'দুমুঠিন' আরও যন্ত্রণা দেয়। যন্ত্রণা অপমানজনক হয়, যেচে অন্নটুকু বদলে চাল ধার চাইলেই। লক্ষ্মীঠাকরুনের ছেলে নেই। একটি কানাপুকড়ো মেয়ে। রোগাভোগা বলে রেলের চাকুরে জামাই ফেরত দিয়ে গেছে মায়ের কাছে যত্ন ও চিকিৎসার ছলে। তিনবছর খবর নেই আর। চক্রধারীর কাছে চিঠি লেখাতে গেলে তিনি বলেন, 'বাঁজা ডাঙায় চাষ!' তবে ফাঁপরে পড়া মা ও মেয়ের জন্য দেড়বিঘে ধানী জমি আছে। নাম ছেলেটা ভেলেভেলেটা স্বপনের বোমাবিদারক মৃত্যুর ফলে রেকর্ডভুক্ত হয়েছে এবং লক্ষ্মীঠাকরুন হাততোলা পান, ফলে বট্‌ঠাকুর তাঁর ওপর রাগ করতে পারেন না। শুধু অপমানে ভোগেন। শেষে বোঝেন, ভালগুলিন খারাপগুলিনের সঙ্গে জড়িয়ে-মড়িয়ে আছে। তবে খারাপগুলিন ভালগুলিনকে জায়গা একদিন দেবে এবং তাঁর আটকে থাকা পেনসন-ফাইল এই নিয়মেই বেরিয়ে পড়বে, আশা পিছু ছাড়ে না।

কিন্তু তারক মুদি, নিবারণ গয়লা, ঘুঁটেবেচুনি গদার মা, কয়লা-কেরোসিনের ডিলার রহমত আলি, জয় মা কালী বস্ত্র ভাণ্ডারের ধুলু দাস, এমন কী অগতির গতি হোমিওপ্যাথি (এম. বি.) শিবু ডাক্তার প্রমুখ তাঁর মতো আশাবাদী নন। এমন সুদিন গেছে, স্বপন যখন সমাজবিরোধী নয়, নেহাত হাফপেন্টুল পরা ছেলেটা ভেলভেলেটা, সেই যুগের পেনসন আটকে থাকার বিশ্বাস বলবৎ ছিল গঙ্গাহাটির বাজারে। ধারবাকি অনিচ্ছা করেও দেওয়া যেত। স্বপনের মরার পর কীভাবে রটে যায়, দারুবেহ্ম কবে সরকারের কাছে পেনসন বেচে খেয়ে বসে আছেন। ফাইল আটকে থাকার চালাকি বুড়োর! যিনি দেখতে মৌনীবাবা, মহাশয় ব্যক্তিস্বরূপ, তাঁর ফাইল কেউ আটকাতে পারে না। আর, দেখ —এমন লোকের ঔরসে কাদের জ্ঞান! দারোগার বাণী পল্লবিত হতে থাকে, 'আপনি এত অ্যান্টিসোশ্যালের জন্ম দ্যান ক্যামনে?'

বেগুনপোড়া খাওয়ার দিন গ্রামপরিক্রমারত দারুব্রহ্ম সন্ধ্যার দিকে চক্রধারীর বাড়ি গেলেন। চক্রধারীর দাঁতে জোর নেই। প্রায়ই মাড়ি ফোলে। ডাক্তার দাঁত তুলতে বলায় আর সেপথ মাড়ান না। গরম নুনজল কুলকুচি করেন তিনবেলা। সন্ধ্যার আহারে বসেছিলেন সবে। বন্ধুকে দেখে শুধু বললেন, 'শালার দাঁতগুলিন!'

ব্রজগোপাল বারান্দার ধারে পলেস্তারা -ওঠা মেঝেয় বসতে যাচ্ছিলেন, চক্রধারীর মেয়ে শীলা ব্যস্তভাবে একটুকরো আসন দিতে এল। আসনে বসে হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'খাচ্ছে কী হে?'

চক্রধারী খাচ্ছিলেন না, গিলছিলেন কিছু। ভাঁড়োচিত সাংকেতিকে বললেন, 'নিউটিরিশন!'

ব্রজগোপালের আবার মনে হল, এখানেও খারাপগুলিন-ভালগুলিন মিলেমিশে আছে। গঙ্গাহাটিতে নিউট্রিশন সেন্টার হয়েছে! স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কৃতিত্ব দাবি করা হচ্ছে এবং

আসন্ন ভোটের সঙ্গে তা জড়ানো হচ্ছে। শীলা রোজ সকালে নিউট্রিশন সেন্টারে দুধ আর মাইলো বিলোনের কাজ পেয়েছে। ব্রজগোপাল 'তাহলে—' বলেই থেমে গেলেন।

বুদ্ধিমতী শীলা অতি শীঘ্র ব্যাখ্যা। দিল। 'পাওডার মিল্ক তো! গুলে জ্বাল দিয়ে ফুটিয়ে নিলে নষ্ট হয় না। কে দিচ্ছে জ্বাল? যে যারটুকু বাড়ি নিয়ে গিয়ে জ্বাল দিয়ে ফোটাও। এদিকে মাইলো সেদ্ধ করতেই যত কয়লা পোড়ে, তত কি গভমেন্ট দেয়? দিলে তো —হুঃ!' শীলার মুখটা গোলগাল। তুলনায় ছোট বলা চলে। কুমারীর কপালে অসময়ে টিপ কেন? ব্রজগোপালের মনে পড়ে, একদিন বিকেলে একেই যেন রেলইয়ার্ডের প্রেমঘরের দিক থেকে চাতিবাঘিনীর মতো আসতে দেখেছিলেন। বন্ধুর মেয়ে— তবে যিনি সতত দারুমূর্তি, তাঁর মুখ দিয়ে এসব সন্দেহজনক গতিবিধির খবর হওয়া সম্ভব নয়। ভাবতে ভাবতে শুনলেন শীলা এখনও ব্যাখ্যা দিচ্ছে। 'জলে গোলা দুধ আর মাইলোসেদ্ধ কোনও কোনও দিন সবটা বিলি হয় না। আজকাল ছোটলোকদের হাতে পয়সা হয়েছে। বরং ভদ্রলোকেরাই — ওইদিকে গভমেন্ট ভাবছে—'

চক্রধারী বললেন, 'সেল্‌ফ্ -রেসপেক্ট।'

সেটা কাদের তা বোঝা গেল না। ব্রজগোপাল শুধু বলেলন, 'বুঝেছি।' ওই সেল্‌ফ্-রেসপেক্ট বশেই তিনি যে উদ্দেশ্যে এসেছেন বলতে দ্বিধা হচ্ছিল।

ক্রচধারী সেদ্ধ মাইলোর সঙ্গে দুধ গিলে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে উঠোনের কোণে জবাঝোপের কাছে আঁচাতে গেলেন। শীলা রান্নাঘারে ঢুকে বুঝি খেতে বসল। চক্রধারী ধুতিতে হাত মুছে উঠোনে লম্বা হলেন। হেরিকেনের আলোয় মুহূর্তে বোঝা যায় না, তার একটি ঠ্যাং খোঁড়া কি না। বিড়ি ধরিয়ে বললেন, 'ভ্যাঁ করো।'

অর্থাৎ হাতের ট্রানজিস্টারের বাজাও শুনি। বড় আশা নিয়ে ব্রজগোপাল ভ্যাঁ করতে গেলেন, কিন্তু নব ঘোরালে খুট করে একটু শব্দই দিল যন্ত্রটা। ইদানিং মাঝে মাঝে এমন বেগড়বাঁই করে না, এমন অবশ্য নয়। ঝাঁকুনি দিলে কিংবা থাপ্পড় মারলে মুখ খোলে। ব্রজগোপাল অনেক কিছু করলেন। চক্রধারী গতিক বুঝে তাঁকে তাতানোর ভঙ্গিতে অনবরত 'হুঃ, হ্যাঁ -অ্যাঁ, হিঃ, এইসব সাংকেতিক চালিয়ে গেলেন। শেষে ব্রজগোপাল কানের কাছে তুলে যখন নাড়া-চাড়া করেছেন, রান্নাঘরের দরজা থেকে শীলার গোলাকার, টিপপরা মুখ বেরিয়ে বলল, ব্যাটারি জ্যাঠামশাই, ব্যাটারি!'

তবে তাই। সেই কবে পুজোর সময় ব্যাটারি কিনেছিলেন শাল বিক্রি করা টাকায়। শীতে খদ্দরের চাদর গায়ে কাটিয়ে এখন মধুর বসন্ত-উষ্ণতা। ফের শীত আসতে যথেষ্ট দেরি এবং ততদিনে পেনসনের ফাইল বেরিয়ে পড়বে। ট্রানজিস্টারের পেছনকার খোপ হেরিকেনের আলোয় দেখতে থাকেন ব্রজগোপাল। ব্যাটারিরও কি প্রাণ আছে প্রাণীদের মতো, যে প্রাণীদের মতোই গলে-পচে যায়? বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল কথাটা ভেবে। চক্রধারী হাসছিলেন। তাঁর মেয়েও হাসছিল। এটা হাসির সময় নয়, যখন কোনও ট্রানজিস্টারের ব্যাটারিগুলিনের মৃত্যু হয়, যখন গানগুলিন বাজনাগুলিন আবহমণ্ডলে নানা মাপের তরঙ্গে অশ্রুত হয়ে ভাসতে থাকে, অথচ তুমি তাদের ধরতে পার না। যখন কত গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক

খবরগুলিনও অগোচর থেকে যা এমন খবরও তো গভমেন্ট ঘোষণা করতে পারেন, আটকে-থাকা ফাইলগুলিন ক্রিয়ার না করলে বেত্রাঘাত, মৃত্যুদণ্ড, ল্যাট্রিন সাফাইয়ের নির্দেশও!

'ল্যাট্রিন সাফাই' কে যেন বলেছিল? সাধনই বলেছিল। কী সূত্রে বলেছিল মনে পড়ে না। এই চৈত্রের সন্ধ্যারাতে গভমেন্ট কী ঘোষণা করেছেন, ফাইল আটকে রাখার শাস্তি ল্যাট্রিন সাফাই, অথচ তিনি স্বকর্ণে শুনতে পাচ্ছেন না, এ একটা কষ্টকর ঘটনা। সেই কষ্টের সময় শীলা বলে কী, ' বেচে দিন না জ্যাঠামশাই আমাকে, আর চক্রধারী সাংকেতিকে বলে ওঠেন 'নতুন —' এই দুমুখো ধাক্কা খেয়ে রাগ করে ব্রজগোপাল ওঠেন। হাতের সম্বল বেচবেন. না, সেটা কথা নয়। কথাটা হল, চক্রধারী মেয়েকে বলতে চায়, কিনতে হলে নতুনই কিনবি। দারুমূর্তিটি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন।

জীবনের সবচেয়ে সংকটপূর্ণ একটি রাত ছিল, এটি দারুব্রহ্মের জীবনে।...

সংকটপূর্ণ রাত। কারণ সেই রাতটি পোহালেই ক্ষুধার্ত বৃদ্ধ, যিনি দারোগার ভাষ্য অনুযায়ী সদ্‌ব্রাহ্মণ মহাশয় ব্যক্তি, লজ্জার মাথা খেয়ে ভিখিরি হতে থাকেন। এই মেটামরফসিসের সূচনা অবশ্য সূক্ষ্ম, এমনকি অতি সূক্ষ্মও বল চলে। মূক যন্ত্রটি হাতে নিয়ে তিনি প্রথমে মাঠের চাষিদের কাছে হাত পাতেন। চৈত্রের কয়েকটি দিনেই তাঁর মাঠের ভিক্ষাবৃত্তি শেষ হয়ে যায়। বারবার চাষিরা একই মানুষকে বেগুনটিন, পটলটিন, ঝিঙেটিন, শশাটিন দিয়ে দিয়ে হাল্লাক। শেষে খেতের আনাচে-কানাচে দেখলেই কাকতাড়ুয়াটিন হয়ে হাত নাড়ে! খেতে লাঠির ডগায় রাখা মড়ার খালিটিন হয়ে দাঁত ভ্যাংচায়। গঙ্গাহাটির জুড়ে খবর হয়, দারুবেম্ম ভিখিরি হয়েছেন। এতে পেনসন বেচে খাওয়ার ধারণাটি দৃঢ় হয়। তাঁকে দেখামাত্র মানুষসকল তাঁর চেয়ে কঠিন বস্তু প্রস্তুতিমূর্তি হয়ে ওঠে। বাজারে ছেলে-ছোকরারা যাঁকে ' টেরাজিস্টারদাদু' বলত, তাঁকে তারাই পরামর্শ দেয় 'টেরানজিস্টারটিন বেচে ফেলতে।' কারণ এ জিনিস হাতে থাকলে ভিক্ষুকের বিপদ। অদ্ভুত কথা, এদেরই কেউ-কেউ স্বপনের বন্ধু ছিল! জামশেদ খোকন পঞ্চার আড্ডা হাটতলার যে চায়ের দোকানে, সেখানে তাঁকে দেখলেই তারা বলে স্বপনের মৃত্যু তাদের খুব নাকি ভুগিয়েছিল। কেউ খিঁচিয়েও ওঠে, 'ভিক্ষে করতে লজ্জা করে না, বুড়ো ভাম? কিছু বোঝা যায় না, কিছু না। হাতে একটা ট্রানজিস্টার এবং পেনসনের ফাইল আটকে থাকলে কেন এমন অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে থাকে, বোধগম্য হয় না ক্ষুৎকাতর এবং পা টেনে কষ্টে হাঁটা দারুব্রহ্মের। তিনি মূক ছিলেন, আরও মূক হতে থাকেন। শুধু শীর্ণ জরাজীর্ণ ফ্যাকাশে হাতের তালু। আর বিশেষ বলার কথা, লক্ষ্মীঠাকরুনও বটঠাকুরের জানলায় এসে দাঁড়ান না। কোথায় গা ঢাকা দিলেন লক্ষ্মীঠাকরুন? কেন পাওয়া যায় না আগের মতো পেছনবাড়িতে তাঁর সাড়া? কোথায় গেল তাঁর রোগাভোগা মেয়েটাও? পাশের বাড়ির মন্মথই বা কোথায় গেল? আর চক্রধারীই বা কেন আসা ছেড়ে দিলেন? রেলস্টেশনে হাত পেতে পেতে কদাচিৎ দশ বা বিশ পয়সা, কারুর বাড়ি বিয়ে বা শ্রাদ্ধের ভোজকাজে কখনও পেটপুরে খাওয়ার সুযোগ, এভাবে চলতে চলতে পোস্টাপিসের বারান্দায় একদিন চক্রধারীর সামনে দাঁড়ালে তিনি সাংকেতিকে বলেন, 'বার্ধক্যভার পিটিশান' এবং দুঃখিত বন্ধুবর তাঁর একটি সইও নেন জড়ানো অস্থির দুর্বোধ্য কিছু রেখামাত্র। ক-দিন পরে ফের বিপুল আশায় চক্রধারীর সামনে গেলে

যথারীতি সাংকেতিক বলেন, 'স্যাংশন হল না। সাধন-স্বপন।' সেই পোনামাছ প্রশ্ন এখন পূর্ণকায় এবং বুকের ভেতর ঘাই মারলে দারুব্রহ্ম কাতর হয়ে ফিরে আসেন।

চৈত্র শেষ হয়ে আসছে। ভোরের দিকে এখন গাঢ় কুয়াশা শুয়োরচরা নালার পারের রেলইয়ার্ডকে ঢেকে রাখে। আবছা দেখা যায় প্রেমঘরটিকে। সেখানে জ্বলে ওঠে আগুন। শেষ রাতে বড় বেশি শীত পড়েছিল। দুজন সেন্ট্রি আগুন ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকে। দারুব্রহ্ম তাঁর মাটির ঘরের জানলায় বসে এই ভোরে ট্রানজিস্টারে ধর্মসঙ্গীত শুনতেন। এখন যন্ত্রটা তাঁর মতো মূক। তবু অভ্যাসে বসে থাকেন, কখন কুয়াশা সরে রোদ ফুটবে, স্টেশনে যাবেন হাত পাততে। আর এভাবেই একটা ঘটনা ঘটতে দেখেন, একইভাবে বোধগম্য হয় না কিছু।

দুটো ছোট্ট মানুষ তাঁর চোখের সামনে কিছুদিন থেকে এগুলিন করছে। শুয়োরচরা নালার পারে আকন্দঝাড়ের গায়ে কাঁটাতারের বেড়া গলিয়ে গঙ্গাহাটির অতীতের খেঁকশিয়ালগুলিনের মতো তারা রেলইয়ার্ডে ঢুকে পড়ে। কুয়াশার ভেতর কিছুক্ষণ ঢুকে থাকে। তারপর দুজনে তাদের উপযোগী চটের থলে টানতে টানতে গুঁড়ি মেরে বেড়া গলিয়ে ফেরে। নালা এখন শুকনো। নালায় থলেটা ফেলে তারা কতক্ষণ খেঁকশিয়ালদৃষ্টে আগুনের কুণ্ডটার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর নালা নামে। একটি ছেলে, অপরটি মেয়ে। চেনা চেনা মনে হয়।

জানলার নীচে খাঁ খাঁ একফালি কাঁচা রাস্তা চলে গেছে দহের দিকে। নিশিন্দাঝোপের ভেতর থেকে খুদে মানুষ দুটিকে এভাবে থলে টানাটানির প্রথম দেখার দিন দারুব্রহ্মের বাক ফুটেছিল, 'আই! কী , কী?' খুদে পুরুষটি ধমকেছিল, 'চুপ বুড়ো? খুদে মেয়েটি মুখ ভেংচেছিল।

বাজারে বটতলায় জুতো সারে হড্ডুলাল। তারই ঔরসজাত। কারণ হড্ডুলালের বউ ছাউনি এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে কাছে গেল এবং থলেটি বুকের কাপড়ের তলায় লুকিয়ে চলে গেল, পেছন ছানা দুটিন এবং ছানাদ্বয় ফিরে দারুমূর্তিকে মুখ ভেংচে শাসিয়ে গেল।

তার মানে, তাঁর চোখের সামনে দুটো ছোট্ট মানুষ চোর হয়ে উঠছে। চোর হওয়া খারাপ না ভাল, এই সংকটকালে বিচার করা কঠিন। কারণ, ঘটনাটার দ্বিতীয় দিনে হড্ডুলালের বউ জানলায় বসে থাকা দাদুঠাকুমোশাকে একটি সিকি প্রণামি দিয়ে যায়। সর্বশেষ ঘটনার দিন আসে স্বয়ং হড্ডুলাল। সে ঠাকুরমশাইকে একটি আধুলি দিয়ে নমো করে। এদিন থলিয়াটিন অতিশয় ভারী ছিল এবং বালক-বালিকা শেষ চৈত্রের হিমনিশিভোরে, যখন নাকি গঙ্গাহাটির প্রাচীন প্রবাদ 'চত্তিরের জাড়ে মোষের শিঙ্গ নড়ে' হাড়ে বোঝে যায়, ঘামছিল আর হাঁফাচ্ছিল। হড্ডুলাল ভিক্ষুকে পরিণত এবং অ্যান্টিসোশ্যালদের জন্মদাতা —হেভু বার্ধক্যভাতায় বঞ্চিত, পেনসন আটকে থাকা, এমন কি অ্যান্টিসোশ্যালদের কদর্য গালখাওয়া ঠাকুমোশাকে সকাতরে ইস্পাতপিণ্ডগুলিন একবেলার জন্য ঘরে ঠাঁই দিতে বলে। আরও একটি আধুলির লোভ দেখায়।

তাই শুনে দারব্রহ্ম করুণা ও লোভে বিগলিত হন। আধুলি দুগণে এক টাকার পাঁউরুটির

সাইজ, এক ভাঁড় চা তাঁর অবিকল চক্ষুগোচর হাতে থাকে এবং তিনি খিক খিক করে হাসতেও পারেন, বহুদিন পরে এই হাসি একটা স্বাধীনতার মতো, একটা অতীত ও সুখী গঙ্গাহাটির সৌরভ ছিল এতে। তিনি দরজা খুলে দিলে হড্ডুলালের বউও নিশিন্দাঝোপের ভেতর থেকে আশ্চর্যভাবে নির্গত হয়। তার সপরিবারে ওজনদার থলিয়াটিন ঘরে ঢোকায়। কিন্তু ঘর; রুক্ষ ডাঙাজমির মতো শূন্য। হড্ডুলাল বলে, তক্তাপোশ নাই ঠাকুমোশা?'

ঠাকুমোশা চুপ করে থাকেন। তক্তাপোশ কবে গোপনে মুসলমানপাড়ার ইসমাইলকে বেচে দিয়েছেন, মনে পড়ে না। হড্ডুলালের বউ বলে, 'ঢাকব কিসে, কুছু তো দিবেন? আঠান্নিটিন দুবো।'

পরবর্তী আধুলির আশায় অগত্যা ছেঁড়া সতরঞ্চিখানিই দিতে হয়। হড্ডুপরিবার স্থানত্যাগ করা মাত্র সেই পূর্ণকায় প্রশ্নমাছ সজোরে ঘাই মারে। বুকের ভেতর জলের শব্দ তোলপাড় হতে থাকে। খারাপগুলিন এবার তাঁর ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তিনি ভালগুলিনের ওপর চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তাঁকে এভাবেই দাঁড় করিয়ে রাখতে চেয়েছিল তাঁরই ঔরসজাত অ্যান্টিসোশ্যাল ভেলভেলেটা। সহসা বোমাবিস্ফোরণ না ঘটলে সে তার জন্মদাতাকে ভালগুলিন নামক বেদিতে দাঁড় করিয়ে রাখত। খারাপগুলিন থেকে দূরে প্রতিষ্ঠিত যথার্থ দারুব্রহ্ম, যিনি সদ-ব্রাহ্মণ মহাশয় ব্যক্তি ও পূজ্যপুরুষ। হিংসার রাজনীতি-করা ছেলেটাও বলত, পচা-গলা লাশের কবর থেকে তাজা জীবন বেরিয়ে আসবে।

তিনি ফোঁস করে শ্বাস ফেলেন। ছটফট করেন। ঘণ্টাটাক পরে একটি সাইকেলরিকশো আসে। আধুলি দুগুণে একটাকা প্রাপ্তিযোগের ফলে পাঁউরুটির সাইজের দিকে মনস্কতাসহ ব্রজগোপাল নড়বড় করে হাঁটতে থাকেন। তাঁর পূর্ববিশ্বাস বলশালী হয়, খারাপগুলিন তাঁর মতো ভালগুলিনে এসে জড়িয়ে গেল আরও খারাপ হয়ে আরও ভালগুলিনকে জায়গা দেবার জন্য।

ভকতলালজির লোহালক্কড়ের দোকানের সামনে হড্ডুলাল ও সাইকেলরিকশোটি আবিষ্কার করে তাঁর বুকের ভেতর প্রশ্নমাছ আবার জোরালো ঘাই দিল। খারাপগুলিন আরও খারাপ হওয়ার জন্য ভালগুলিনেরই খারাপ হওয়া দরকার।....

এইখানে কাঁটামাদার, কেয়াঝাড়, আকন্দ-কালকাসুন্দের জঙ্গলশোভা ছিল। পাখিডাকা দিন শেয়ালডাকা কত রাত চলে গেছে এইখান দিয়ে। কৃষ্ণপক্ষের শেষ রাতে হিমে ও কুয়াশায় চাঁদের ফালি পোড়ো ওয়াগন প্রেমঘরের কোনায় আটকে গেল, যেহেতু দারুব্রহ্ম গুঁড়ি মেরে হাঁটছিলেন। হালকা নরম ও হলুদ আলো খুবই উঁচু পোস্ট থেকে ভূতের চোখে নজর রেখেছে। এই প্রথম হাতের সম্বল, ফেয়ারওয়েল সভায় কলিগদের মর্মব্যথা যার ভেতর বাকি জীবনের জন্য ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেই ট্রানজিস্টার ব্যাটারির ক্ষুধায় মূক, আর ক্ষুধা কী ভয়ঙ্কর তিনি তো জেনেছেনই, তাকে ফেলে রেখে এসেছেন ঘরে। এই প্রথম সে তার সঙ্গছাড়া।

রেলইয়ার্ডে আজ শেষ রাতে এত ওয়াগন, শুধু ওয়াগনের সারি ক্রমান্বয়ে, চারদিকে! গোলকধাঁধায় পড়ে যান দারুব্রহ্ম। কোথায় ইস্পাতপিণ্ডগুলিন? যেদিকে গুঁড়ি মেরে এগোন,

ওয়াগন সেদিকে। ওয়াগনগুলিন তাঁকে কি ফাঁদে ফেলেছে? যত নড়াচড়া করেন, খোঁজেন, দেখতে পান ওয়াগনগুলিন তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছে ক্রমে ক্রমে। শেষ চৈত্রের মোষের শিং-নাড়িয়ে দেওয়া শেষরাতের হিম তাঁকে নখের আঁচড় দেয়, কামড়ায়। কাঁটাতারের বেড়ায় আটকে যাওয়ার ভয়ে খদ্দেরের চাদরটা রেখে এসেছেন। ঠকঠক করে কাঁপেন। কোণঠাসা শেয়ালের মতো তাকান জুলজুলে চোখে। গতকাল সকালের পাঁউরুটি দুপুর অব্দি খেয়েছেন। তারপর শুধু জল। গলা শুকিয়ে গেল এবার। জীবন্ত হয়ে ওঠা ওয়াগন-পারিপার্শ্বিক, উঁচু থেকে অজস্র হলদে ভূতচক্ষু , হিম ও তৃষ্ণা বিপন্ন ফাঁদেপড়া দারুব্রহ্মকে মরিয়া করে তুলল। তখন ইস্পাতপিণ্ডগুলিনের আশা ছেড়ে দিয়ে সোজা হলেন। তারপর যেই কয়েক পা টলতে টলতে এগিয়ে গেছেন, কোথায় একটা অমানুষিক গর্জন শুনলেন এবং থমকে দাঁড়াতেই অদ্ভুতভাবে ইস্পাতপিণ্ডগুলিনকে আবিষ্কার করলেন এতক্ষণে, যেহেতু সেগুলিন ঋজু গতিতে ঝাঁকে ঝাঁকে এসে তাঁর শরীরে ঢুকে গেল। মূক দারুব্রহ্মকে পাশের ওয়াগন ভক্তি ও যত্নে গ্রহণ করতে গেল, কিন্তু শেষাবধি পাথরকুচিগুলিন তাঁকে বুকে নিল ! পাথুরকুচির স্তূপে কয়েকটি ঘাস মাথা তুলেছিল। রক্তে ভিজে গেল।..

গঙ্গাহাটিতে এভাবে আরও একটি হ্যাঁ না হওয়ার অর্থাৎ দারুব্রহ্মপতনের খবর হয়। কেউ হাসে, কেউ জিভ চুকচুক করে। হড্ডুলাল সপরিবারে সাবধান হয়ে যায়। এক সপ্তা পরে চৈত্র-সংক্রান্তির গাজন। বহু বছর পরে ব্যথিত চক্রধারী তাঁর বন্ধুর জন্য ছড়া রচনায় বসেন। রস ও খেউড়ের ধুয়ো দুঃখবশে তিনি এরূপ রচনা করেন, যা ব্যতিক্রম এবং কাশীদাসী মহাভারত থেকে টোকা।

দারুব্রহ্মকথা রে ভাই অমৃতসমান।
চক্রধারী শর্মা ভনে শুনে পুণ্যবান।।

তবে একটি বিশেষ কথা, এই ছড়ায় 'ট্রানজিস্টরটিন' থাকলেও 'পেনশন' শব্দটি ছিল না। অনুমান হয়, রসহানি এবং নিউট্রিশন সেন্টারই তার কারণ।.....



লিফলেট

মনোরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

অবনবাবু চেয়ারে বসেই ঘরের বড় ঘড়ির সঙ্গে হাতঘড়ি মিলিয়ে নিলেন। প্রতিদিনেরই অভ্যাস। কলিগদের কেউ কেউ ভাবে বাতিক। এখন দশটা পাঁচ। আজ পাঁচ মিনিট লেট। মনকে বলে নিলেন, পাঁচটা পাঁচে চেয়ার ছাড়ব। হাতে জলের গ্লাস তুলে একটু থমকে গেলেন। টের পেলেন ঠোঁট দুটো হালকা কাঁপল। মনে মনে হাসি যাকে বলে। বেয়ারা গৌর টেবিলের একপাশে ফাইল গুছোচ্ছে। ওর মুখ দিয়ে কিছুতেই স্যার বলানো গেল না। বলবে বড়বাবু। বড়বাবু শব্দে কেমন যেন ফিউডাল-ফিউডাল গন্ধ। গৌর তর্ক করে বলে, 'স্যার তো ইস্কুলের মাস্টারদের বলে।'

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে সেকশনের চারপাশে চোখ বুলালেন। অবসরমুখী চণ্ডী ব্যানার্জি আর বিধু মাইতি ছাড়া তেইশজনের আর কেউ চেয়ারস্থ হননি। আবার সেই অদৃশ্য হাসি। এই হাসিটা তার বেশ লাগে। কোম্পানির কারখানায় খরা। অফিসে কর্ম সংস্কৃতি উজ্জ্বল থাকবেই বা কেন!

একে একে টেবিলের হাজিরা খাতায় সই দিয়ে চলে গেলেন যে যার চেয়ারে। অবনবাবুকে ও ব্যাপারে লক্ষ রাখতে হয় না। তিনি জানেন, কুড়ি-পঁচিশ মিনিট লেট হলেও টাইমের খোপে সবাই দশটাই লিখবেন। ব্যাকরণে নিপাতনে সিদ্ধ মতো আর কী। এই ফাঁকে কেউ পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে একটা লিফলেট রেখে গেছে। জলের গ্লাস তুলতে গিয়ে নজরে পড়ল। পুরো জলটা খাওয়া হল না। লিফলেটটা পড়ে ফেললেন। মনে হল, এ তো নোটিশ! আসলে একটা আবেদন। কিন্তু অবনবাবু কাঁপা হাতে কাগজটা পকেটে ঢুকিয়ে ফেললেন, যেন কোনও অপরাধ লুকোলেন।

কাল মহালয়া। অফিস থেকে বেরিয়ে অবনবাবু কাঁধের সাইড ব্যাগ থেকে মার লেখা পোস্টকার্ডখানা বের করলেন। বাড়িতে দেবীকে আড়াল করে পড়তে আত্মসম্মানে লাগে। বাস এমনিতেই কম সল্টলেক অঞ্চলে। আসে দেরিতে। ছাউনির এক কোণে সরে গেলেন। কাঁপা হাতে ধরে ধরে লেখা — 'বাবা অবু, পর পর তিনবারে এবারই তোমার শেষ পিতৃতর্পণ। বউমাকে বুঝিয়ে রাজি করাবে। রাগারাগি কোরো না।' এইটুকু পড়ে দম ছাড়লেন। হঠাৎ মনে হল, পাশের মহিলাটি তাঁর এই লুকিয়ে চিঠি পড়া লক্ষ করছে। সরে গেলে

ছাউনির বাইরে মার খুব ইচ্ছে এবার পুজোয় কয়দিন পিক্‌লুকে যেন হোমে তার কাছে পাঠিয়ে দিই। কত সরল মা আমার, তাকে যেখানে রেখে এসেছি, সেখানে যে সংসার তুলে আনা যায় না, — বোঝে না যে সংসার থেকে উপড়ে এনেই রাখার জায়গা ওটা। মাকে বলেছিলাম, 'তুমি হলিডে হোমে যাচ্ছ।' এই নিয়ে মাঝে মাঝেই লাগে দেবীর সঙ্গে। ও বলে, 'খোলাখুলি জানালে কী দোষ। এখন তো আজকাল ঘরে ঘরে গা-সওয়া হয়ে গেছে। আমরা তো এমনিই জলে ফেলে দিইনি। থোক টাকা জমা দিয়ে রেখেছি। এতে লজ্জা পাওয়ার ঢং কর কেন।'

রান্নাঘরে কড়াইতে খুন্তির সঙ্গে সঙ্গে দেবীর এইরকম কথা যখন ছিটকে আসে, তখন অবনবাবুর শরীর মন জুড়ে থাকে আম্মার একমাত্র নাতি পিকলু। আম্মার কোলে তেলে-জলে শরীর পাওয়া বড় আদরের পিকলু। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে অবনবাবুর মনের মধ্যে যে ভূমিকম্প হয়েছিল, তার বিধ্বংসী ছবি স্ত্রী কেন স্বয়ং ঈশ্বরও দেখতে পায়নি।

সেদিনের বাইরের ছবি ভেসে ওঠে। মানুষ করা ছেলের হাতে সুটকেস। মা-বাবার ছবির নীচে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে। শরীর কাঁপছিল। পিকলু কিছুই বুঝতে পারছে না। ছুটে গিয়ে আম্মার কাপড় টেনে বলল, 'ও আম্মা তুমি কাঁদছ কেন?' দেবী ছেলের হাত ছাড়িয়ে টেনে নিল কাছে। বলল, 'আম্মা যাচ্ছে হলিডে হোমে। বুড়ো বলে আরাম চাই তো, তাই।'

'কেন? সেখানে কেন?'

'সেখানে ডাক্তার আছে, আম্মার বন্ধুরা আছে। ভাল থাকবে তাই। এখন বিরক্ত কোরো না। আর আপনাকেও বলি মা, নাতির সামনে নাটকটা না করলে হত না?'

পিকলু কোলাপসিব্‌ল গেট ঝনঝনিয়ে বলছিল, ঠিক আছে তোমরা যখন বুড়ো হবে, তখন আমিও ট্যাকসি ডেকে আনব। তোমরাও হলিডে হোমে যাবে।'

না, কান্না চাপতে পারেনি। ধুপধাপ করে সিঁড়ি ভেঙে ছাদে চলে গিয়েছিল পিকলু। ছাদের কার্নিশে মাথা হেলিয়ে দেখেছিল আম্মার ট্যাকসি আম্মা হয়ে করুণাময়ীর বাঁকে মিলিয়ে গেল।

মহালয়ার কাকভোরের আগেই পাড়া জাগানিয়া চণ্ডীপাঠ শুরু হয়েছে। অবনবাবু নীরবে বেরোবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। পিতৃতর্পণে যাবেন গঙ্গার ঘাটে। গতরাত থেকেই পিকলুর বায়না সেও যাবে বাবার সঙ্গে। ঘরের খুটখাট আওয়াজে সে উঠে পড়েছে। মার বারণ শোনেনি। বলে, আমিও বাবার সঙ্গে গঙ্গাপুজো করব। বাবা-মা হিমসিম খেয়েছে। কে বোঝাবে তাকে পিতৃত্বর্পণ তার জন্য নয়। শেষে একটা শর্তে পিকলু শান্ত হল। এবার পুজোর দিনগুলিতে হরিদেবপুরে আম্মার সঙ্গে হোমে থাকবে। তাকে নিয়ে যেতে হবে—শুনে অবনবাবু অস্বাভাবিক দ্রুততার সঙ্গে জামা গলিয়ে অস্থির পা ফেলে বেরিয়ে গেলেন। পিছু পিছু পিকলু — 'বলো না, নিয়ে যাবে তো! বলো না—'

অবনবাবু ভেতর থেকে স্বগতোক্তির মতো অস্ফুট স্বর বেরিয়ে এসেছিল — 'হবে, হবে।'

পিকলু কতদিন আম্মাকে স্বপ্নে দেখেছে। বাড়িতে আম্মার কথা কেউ বলে না। প্রথম-প্রথম পিকলুই গল্প করত। শেষে থেমে গেছিল মার ধমক খেয়ে। পিকলু মনে মনেই প্রশ্ন

করে — মা-বাবা কী কোনওদিন ছোট ছিল না! আম্মা ছিল না! উত্তর খুঁজে পায় না সে। মন খারাপ হলেই ছাদে গিয়ে কার্নিশে থুতনি রেখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আজ ছুটির দিন। রান্নায় মন নেই। ডাইং ক্লিনিং-এ ধুতি পাঞ্জাবি দেওয়ার জন্য গুছোতে গিয়ে পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ পড়ে গেল। দেবী সেটা কুড়িয়ে পড়ল। পড়েই নিভাঁজ কাগজখানা মুঠোতে চেপে বসে পড়ল চেয়ারে। একবার মনে হল ঠিক মতো পড়েছে তো! কিন্তু আবার পড়তে গিয়ে থেমে গেল। বুকটা ঢিপ ঢিপ করছে। কপালে ঘাম। পাশের ঘরে পিকলু কার্টুন ছবি দেখছে টি.ভি খুলে। দেবী ওর পাশে গিয়ে মাথায় হাত রেখে বসল।

'মা —'

'বল।'

'পুজোর আর কদিন?'

'কাল ষষ্ঠী।'

'পিকলুর চোখ টি-ভি-তে। সেভাবেই কথা হচ্ছে।'

'মা —'

'বল।'

'আম্মার বাড়ি কি কলকাতার বাইরে?'

'হরিদেবপুরে। কলকাতার গায়েই।'

'বাবার কি কাল ছুটি?'

'না। সপ্তমী থেকে।'

'কাল থেকেই পুজো। তুমি আমাকে নিয়ে যাবে। যাবে?'

'কাল আমার ষষ্ঠীর উপোস।'

'বিড়াল কি ষষ্ঠী?'

'কে বলল?'

'আম্মা। তাই বিড়াল মারতে নেই।'

কয়দিন ছুটির আগে কাজের চাপ সামলে অবনবাবুর ফিরতে রাত হয়ে গেল। দেবী পিকলুকে পাশে শুইয়ে ওর চুলে হাত বুলোচ্ছে আর হালকা নরম সুরে যে গানটা গাইছে, অবনবাবুর চেনা — তুমি নির্মল করো মঙ্গল করো.....

দেবীর আজ হল কী! হাই-প্রেসার মেজাজ উবে গেল নাকি! হারানো লিফলেটটা খুঁজতে খুঁজতে টেনশনের সঙ্গে একটা মিশ্র অনুভূতি যেন সারা গায়ে লেপ্‌টে গেল তাঁর।

'যেটা খুঁজছ পাবে না।'

'তার মানে?'

'ওটা আমার কাছে।'

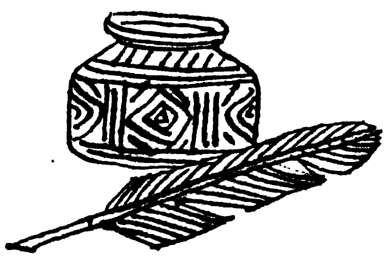
'পড়েছ?'

'পড়েছি।'

আর কারও কোনও কথা নেই। যে যার মনের অ্যাকোয়ারিয়ামে এলোমেলো মাছেদের সাঁতার। নীরবতা ভাঙল দেবীই। কাশ ভাঙা গলায় বলল, 'জানো, পিকলুর একটু জ্বরও হয়েছে, শুধু আম্মা আর আম্মা। ভেবেছিলাম দুজনেই যাব মার কাছে। দেখাও হবে। ওকে রেখেও আসা হবে। কিন্তু...... কেন ওটা ঘরে ঢোকালে বলো তো!' কান্না চাপতে পারেনি।

'পড়ো পড়ো — আমাকেই লুকোতে চেয়েছিলে তো? আমাকেই শোনাও — এই নাও তোমার সমন।'

অবনবাবু যন্ত্রর মতো পড়লেন, 'হরিদেবপুরে বৃদ্ধাশ্রমে মাতৃবন্দনায় সবার নিমন্ত্রণ। শুধু যাঁরা তাঁদের বৃদ্ধ মা-বাবাকে এই হোমে রেখেছেন, দয়া করে তাঁরা আসবেন না। তাঁদের জন্য প্রবেশ নিষেধ।



মানুষ কতদিন বাঁচতে পারে

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

শীত এখনও পড়েনি। ভোর রাতে চাদর লাগে বিছানায়। পাখার রেগুলেটার নেই। না চালালে গরম লাগে। চালালে শীত করে। তাই অখিল একবার উঠে চালায়। চালিয়ে ঘন্টাখানেক ঘুমোয়। শীত করলে উঠে নিভিয়ে দেয়। দিয়ে আবার ঘন্টা খানেক ঘুমোয়। এইভাবে রাত এগারোটা থেকে পরদিনের ভোর সাতটায় পৌঁছে তবে উঠে বসে সকালের বেড-টি খেল।

বেড-টি দিল তার সাতান্ন বছরের বউ । খুকু অখিলের চেয়ে তিন বছরের ছোট। দুই ছেলেমেয়ে। ছেলেরা চাকরি নিয়ে দূরে দূরে। সেখানে যে যার সংসার, অফিস, অফিসের বন্ধু, বন্ধুদের সঙ্গে ফ্যামিলি নিয়ে পিকনিক, নয়তো এল টি সি নিয়ে বেড়াতে যেতে মেতে থাকে। তবে দুজনই বিজয়ার পর পোস্টকার্ড দেয়। শ্রীচরণকমলেষু মা ও বাবা। আশা করি তোমরা ভাল আছ। তোমরা আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিও। পূজায় পাঠানো টাকা দিয়া তোমরা গায়ে দেবার চাদর কিনিয়াছ তো? এখন আর জমাইয়া কী করিবে?

এই দুই ছেলেকে নিয়ে অখিল আর খুকু তাদের জীবনের চব্বিশ-পঁচিশ বছর খুব ব্যস্ত ছিল। দাঁত ওঠা, দুধের দাঁত পড়া, হাতে খড়ি, তার লেখা লেখানো, ভর্তি টনসিল, হুপিং, কাফ, অ্যানুয়াল এগজামিন, কলেজ, ইন্টারভিউ, প্রথম চাকরিতে জয়েন, বিয়ে, বাচ্চা হলে তাদের খানিক খানিক বড় করে দেওয়া—এইসব করতে করতে অখিলের মাথায় চুল পিছিয়ে গেল। খুকুর এলো খোঁপায় এখন অনেকটাই সাদার প্যাচ। ঠিক যেন নদীর কালচে সাদা ঘূর্ণি ঢেউ।

বেড-টি খেয়ে অখিল বিছানার দিকে তাকাল। একটা পাশ বালিশের ওপাশেই সারা রাত খুকু শুয়ে ছিল। কোনও দাগ নেই বিছানায়। কালিপূজোর পরেরকার রোদ। বেশ চকচকে। সে আলোয় খুকুর মুখখানিও ঝকমক করছে। খুব গম্ভীর হয়ে খাবার টেবিলে চা নিয়ে বসেছে। এইসময় ওর মুখখানি দেখে অখিলের মনে হল—নিশ্চয় মনে মনে হিসেব করে দেখছে —জীবনে কী হল? কিংবা নিজের জীবনটাই খুকু এখন বাতাসের ভেতর দেখতে পায়। দেখে মনে মনে হয়ত বলে—জীবনে কিছুই তো হল না। কত কী করার ছিল। এইসব ভাবে খুকু আর এক সিপ্ করে চা খায়।

কাছেই বাজার। থলেটা হাতে নিয়ে গায়ে জামা গলিয়ে অখিল বলে, 'কী আনবো?'

'তোমার যা ইচ্ছে।'

'কাঁচালঙ্কা আছে?'

'হুঁ। পঞ্চাশ এনো। আর এক প্যাকেট নুন।'

'কালকের মাছ আছে না?'

'তিনটে পারশে আছে। গরম করে দেখি ঠিক আছে কিনা।'

অখিলের মনে পড়ল, দশ-বারো বছর আগেও বাজার করে ফেরার সময় একটা জয়ের আনন্দে তার বুক ভরে থাকত। বড় খোকনের জন্যে কাটা পোনা। ছোটজনের জন্যে অসময়ের দামি ফুলকপি, খুকুর জন্যে নতুন ওঠা জলপাই —কত কী নিয়ে সে ফিরত। এখন

সে জানে শরীরের ভেতর কঙ্কালটা কাঠামোর ওপর বেশি মাংসের চাপানো ভাল নয়। তাতে বুকের ভেতর বাঁ-দিকের ছোট পাম্পসেটের ওপর চাপ পড়ে। সেই কবে থেকে পাম্প করে আসছে সেটটা। একদম জিরোয়নি। তাছাড়া যে ভাত-রুটি নিয়ে এত চাষবাস, আন্দোলন, ইকনমিক্স— সেই ভাত-রুটিই এই শরীরটাকে অযথা ঢ্যাপঢেপে করে তোলে। মাছ-মাংসে যতই শক্তি থাক না কেন—সমান ঘাম ঝরানো খাটুনি না খাটলে—তাই-ই নাকি মুখে - এখানে সেখানে থপথপে লেপে দেয় শরীরে। তার চেয়ে হালকা সবজি, দুই শরীরটাকে হালকা-পলকা সতেজ রাখে।

তবু বাজারে বেরোবার সময় অখিল জানতে চাইল, 'কোন মাছ আনব?'

'যা-ই আনো—কাটিয়ে আনবে। বঁটিতে ধার নেই।'

'কেন? নেপালের মা কুটে দেবে—'

'আজ আসবে না নেপালের মা।'

'কোন মাছ বললে না তো? না, মাংস আনি। মুরগির?'

'আমার কোনও পছন্দ নেই।'

এ কী রকম বউ-রে বাবা! —মনে মনে এ কথা বলে অখিল এগোল। তার মনে হল, বিয়ের বত্রিশ বছর পরেও শ্বশুরবাড়ি, স্বামী, সংসার হয়ত পছন্দ হয়নি খুকুর। কোনও কোনওদিন অখিলের আগে ঘুম থেকে উঠে খুক স্যান্ডেল পায়ে হাঁটতে বেরোয়। ফেরার সময় ঝরা শিউলি কুড়িয়ে এনে খাবার টেবিলে একটা প্লেটে রেখে তাতে সামান্য জল দেয়। পাছে তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

এ পাড়ার মাসখানেক হল এসেছে ওরা। জায়গাটায় ফোন, ইলেকট্রিক, ডাক্তারখানা থাকলেও গুচ্ছের পুকুর, সূর্যের অঢেল আলো, মশা, অ্যাসশ্যাওড়ার জঙ্গল আছে। গ্রিল কারখানা ছাড়া আর কোনও কারখানা নেই। বাতাস পরিষ্কার। ভোটের সুবিধার জন্যে কয়েকটা পিচ আর কয়েকটা খোয়ার রাস্তাসমতে জায়গাটাকে বছর-পাঁচেক হল কলকাতা কর্পোরেশনে ঢোকানো হয়েছে। অটোতে পাতাল রেল মিনিট পনের মাত্র। পায়ে স্যান্ডেল গলিয়ে অখিল বলল, 'মাজার ব্যথাটা কমেছে?'

'অনেক কম।'

'তাহলে তো হোমিওপ্যাথিতে কাজ হয়েছে।'

'বোলো, মাথা ঝিমঝিম-করে। ঘুম আসে না।'

'আমারও ওষুধটা আনব। ফের বুকে সর্দি জমে ঘড়ঘড় করছে।'

'আজ কি থাকবেন সরকারমশাই?'

'বেস্পতিবার দক্ষিণ বারাসত না কোথায় দেশ—সেখানে ফ্যামিলি—চলে যান। শনিবার শনিবার সবজির ফার্স্ট ট্রেনে ফিরে আসেন। পসার তো ভালই জমিয়ে ফেলেছেন।'

খুকু বলল, 'ভাগ্যিস ওর কারখানা আজ ছবছর বন্ধ। শুনলাম চাকরি নট হওয়াতে সরকারমশাই হোমিওপ্যাথির বই আর বাকসো নিয়ে বসে যান!'

'আমাদেরও ভাগ্যি বল!'

'কেন? কেন?'

আগে আগে এমন সর্দি জমলে প্রায় পঞ্চাশ টাকার এক কোর্স অ্যান্টিবায়োটিক খেতাম। এখন দেখছি তিন থেকে ছটাকার হোমোপ্যাথি করলে বুক বিলকুল পরিষ্কার।'

'ভালই তো। দু-মাস মাইনে পাও না। কবে পাবে —তাও জানো না।'

'কীভাবে চলবে তাও জানি না। বাড়ি বদলে এখানে উঠে এলাম —আর অমনি অফিসে এই দশা। কবে যে নর্মাল হবে জানি না। ভাগ্যিস কিছু জমানো ছিল। কিন্তু তাই বা কতদিন চলবে? বাড়িভাড়া আছে—ইলেকট্রিক বিল। নেপালের মায়ের মাইনে । কেরোসিন। কাঁচা বাজার—'

সব অঙ্ক একসঙ্গে মনে মনে যোগ দিতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে উঠল অখিলের। বছর পাঁচেক আগে প্রথম যেদিন এভাবে মাথা ঘুরে ওঠে—তখন তখনই ডাক্তার দেখিয়ে, ঘাড়ের ছবি তুলে আনা যায় অখিলের স্পনডিলোসিস হয়েছে। ওজন চাপিয়ে ঘাড়ে টানা দেওয়া থেকে বিশেষ বিশেষ ফ্রি হ্যান্ড ব্যায়াম করে সে ফের চাঙ্গা হয়ে ওঠে। কিন্তু এই ঝিমঝিম করে মাথা ঘুরে যাওয়া তো কোনও ব্যায়ামেই সারার নয়। একে বলে সংসার চিন্তামণি। চাল চিনি নিয়ে চিন্তা করতে করতে তলিয়ে যাওয়া। তবে ভরসা এই—এখন খুকু বা অখিল—কেউই খুব একটা ভাত খায় না। চায়ে চিনিও নেয় আধ চামচেরও কম। কিন্তু ডাল? চোদ্দ টাকা? পটল? দশ টাকা! আলু? তিন টাকা চল্লিশ; আড়াইশো মাছ? পনের টাকা! তেল? চৌত্রিশ টাকা!

অখিল বলল, 'কী যে হল অফিসটার বুঝি না। এত ভাল অফিস ছিল।'

'তোমরা সবাই মিলে বুড়োকে ধর।'

'চার পুরুষের কোম্পানি। বুড়ো তো দ্বিতীয় পুরুষ। বয়স বলেই নব্বই। আসলে একশো পেরিয়ে গেছে। কিন্তু জ্ঞান টনটনে। ইউনিয়ন মামলা করে কোর্টে তুলেছিল বুড়োকে। কাঠগড়ায় গিয়ে বুড়ো বলেছে—আমি কিছু জানি না— বোঝো খুকু!'

খুকু চটেমটে বলল, 'বাঃ! আবদার? তুমি ম্যানেজিং ডিরেক্টর—এত বড় একশো বছরের পুরনো কোম্পানির তুমি ম্যানেজিং ডিরেক্টর। তুমি কিছু জানো না বললেই ছেড়ে দেওয়া হবে? এতগুলো লোকের মাইনে দাওনি। পি এফ. গ্রাচুইটি. এল আই সি-র টাকা তুলে তুলে সরিয়েছ—ব্যাঙ্ক থেকে সরিয়েছ।' মেশিনপত্তর বেচে দিয়েছ—ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে কাঠগড়ায় গিয়ে বুড়ো চেয়ার চাইল। বলল, 'ধর্মাবতার! আমার হাত-পা কাঁপে। বসার জন্যে একটা চেয়ার পেতে পারি? জজ তো ভয় পেলেন। এই বুঝি হার্টফেল করে বুড়ো। চেয়ার দিতে, বসেই বুড়ো বলল, বছর দশেক হল কিছুই মনে রাখতে পারি না ধর্মাবতার। এই মাত্তর যা শুনলাম—খানিকবাদে তাই ভুলে যাই। জজ তাড়াতাড়ি উঠে এসে বললেন, আপনি বাড়ি যান। বুড়ো চলে এল।'

খুকু বেশ দেমাকি গলায় বলল, 'ওসব খোকাপনার কথা তোমাদের যেন বলে বুড়ো। অ্যাতো তো সম্পত্তি আছে— কে খাবে? মানুষ কতদিন বাঁচতে পারে? এত জায়গা-জমি, বাড়ি-ঘর-বাগান—কতোদিন আর উনি বাঁচবেন। সব বেচে ব্যাঙ্কের দায় শোধ দিলেই তো তোমাদের অফিস তো ভাল চলে।'

একটু আগে মাথাটা ঘুরছিল অখিলের। সেই ঘূর্ণির ভেতর খুকুর একটা কথা তীরের

মতো অখিলের মাথার ভেতরে গিয়ে বিঁধে গেল। মানুষ কতদিন বাঁচতে পারে? সে খুকুকে বলল, 'জানো রিটায়ারের পর ছাব্বিশজন মরে গেছেন। তাঁরা পি. এফ. পাননি। গ্র্যাচুইটি পাননি। অনেকে রিটায়ার করে এল আই সি-র টাকা পাচ্ছে না।'

'কেন?'

'মাইনে থেকে টাকা নিয়ে সে-টাকা জমা দেয়নি। ব্যাঙ্কের লোন নিয়ে আসল, সুদ-কোনওটাই ফেরত দেয়নি। পাওনাদারদের টাকা দেয়নি। কয়েক লাখ টাকা ইলেকট্রিক আর টেলিফোনের বিল বাকি করে ফেলেছে।'

'গুণের আর ঘাট নেই কোনও।'

'ইলেকট্রিক লাইন মাঝে মাঝে কেটে দেয়।'

'তখন?'

'তখন গিয়ে কয়েক হাজার টাকা জমা দিয়ে বলে —এই দিয়ে যাচ্ছি। তখন আবার অফিসে আলো আসে।'

'খুকু রায় দিল, গম্ভীর গলায়। 'বুড়োতে তোমরা সবাই মিলে গিয়ে বল—আপনি আর কতদিনই বা বাঁচবেন? আপনার বাবার প্রতিষ্ঠান আপনার হাতে বড় হয়েছে। আপনার হাতেই মরে যাবে—এই চান? তিন পুরুষের পাছার কাপড় তুলে টিকির আগুন ঘষে দিতে হয়!'

'কোম্পানির নতুন বিল্ডিংটা বানাল পেল্লায়—দশতলা—'

'সেটা ভাড়া দিলেও তো তোমাদের মাস মাইনে হয়ে যায়।'

'তা দেবে না। ফিনিশ না করে ফেলে রেখেছে। লিফ্‌ট বসায়নি। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে দম বেরিয়ে যায়।'

'উঠেও তো স্বস্তি নেই। ওপরে উঠে নিজের চেয়ারে বসে শুনতে হয়—মাইনে কবে হবে কেউ জানে না।'

'আমি ভাবি খুকু একটা লোকের কত টাকা লাগে?'

'একটা বলছ কেন? বল তিনটে। বুড়ো তার সত্তর বছরের ছেলে—আর বছর পঁয়তাল্লিশের নাতি। তিনজনের—'

'বুড়োকে বাদ দাও। কলকাতার বাইরে বিশাল বাগানবাড়িতে পাখির ডাক শুনে দিন কাটান। সেখানে প্রাইভেট সেক্রেটারিকে সঙ্গে নিয়ে সকাল-বিকেল নিয়ম করে মাইল দুই ঘুরে ঘুরে হাঁটেন। আতস কাচ দিয়ে চিঠিপত্তর দেখেন। আর খাবার বলতে কাঁচাকলার ঝোল আর মাগুর মাছ। তাহলে ছেলে আর নাতির অন্য গুণ আছে নিশ্চয়।'

'তা তো আছেই। দুজনেরই আছে। কিন্তু সেজন্যে এত টাকা সরাতে হবে? সেজন্যে এত টাকা লাগে? ওসবে একজন পুরুষের কতই বা লাগতে পারে?'

খুকু অখিলকে শুধরে দিল। 'একজন নয়। দুজন।'

'দুজনেরটাই ধর। ছেলে আর নাতি—দুজনের ওসবে এত কোটি টাকা লাগে? না লাগতে পারে! অ্যাতো তো জাহাঙ্গির বাদশারও লাগত না। একজন দিল্লিতে বসে থাকেন। আরেকজন কলকাতায়— বোম্বেতে নানন ফ্ল্যাটে।'

'বুড়োর ছেলেই বা কতোদিন বাঁচতে পারে?'

'তারও সত্তর হল। কিংবা কিছু বেশি। দু-চার বছর হাতে রেখেছে হয়তো।'

খুকু বলল, 'এই বয়সে কত আর সুখ আহ্লাদ করতে পারে একজন মানুষ।'

নিয়মে থেকে এখন অখিলের ব্লাডপ্রেসার কোলেস্টেরল, ব্লাড-সুগার একদম কপিবুকের সুস্থ মানুষের মতোই বলা যায়। সে মনে মনে বলল, ইচ্ছে থাকলে অনেকদিন পারে। মুখে বলল, 'পয়সার তো অভাব নেই—'

খুকু খেপে উঠল। বলল, 'তোমাদের মাস মাইনের মেরে দেওয়া পয়সা তো। তাই কোনও অভাব নেই।'

'যে-পয়সাই হোক! বছর দুই আগে একবার অফিসে এসেছিল বুড়োর ছেলে। ব্যাঙ্কে এত কোটি দেনা—বাজার পাওনাদারে ভর্তি—আমাদের অ্যাতো টাকা গায়েব—হাঁটছে যেন অমিতাভ বচ্চন। মাথায় তিনথাক অ্যালবার্ট। পরনে চুড়িদার। ভাবখানা—অফিসে যেন সেট পড়েছে—শুটিং করতে এসেছেন!'

'তা হিরোকে তোমরা ঘিরে ধরলে না কেন?'

'তখনও তো পিকচারটা অ্যাতো ঘোলাটে হয়ে পড়েনি। তখনও তো আমাদের দিচ্ছি, দেব বলে চলেছেন। কী চেহারা—বছর তিরিশের ছোকরার চলাফেরা। আর লম্বাও তো অনেকটা। বেশ দেখতে— '

'দ্যাখো গিয়ে বিলেত থেকে অপারেশন করে এসেছেন হয়ত। ওঁদের তো ইন্টারন্যাশনাল যোগাযোগ। আজারবাইজানের পাহাড় থেকে শেকড়-বাকড় আনিয়েও বেটে খেতে পারেন।'

'খেলে কী হয়!'

'দেড়শো, পৌনে দুশো বছর বাঁচে। প্রথম বউয়ের বয়স হয়ে গেলে দিব্যি একশো, সওয়া শো-বছর বয়সে ফের বে করে— ছেলে-মেয়েও হয়। যতদিন বাঁচতে পারে—তার চেয়ে বেশিই তো বাঁচতে চায় মানুষ। বুড়োর ছেলে কলকাতায় এলে কিছু শেকড়-বাকড় চেয়ে নেব।'

'বকেয়া মাইনে—দু বছরের বোনাস পাওনি— সেসব চাইবে না?'

'নাঃ। ওসব চাইলে তো পাব না। তার চেয়ে কিছু শেকড় যদি—'

'কী করবে?'

'দেখি যদি ফের ছেলে-পিলে হয়। বেশি বয়সে তারাই আমাদের দেখবে।'

'আমায় দিয়ে হবে না কিন্তু। অন্য জায়গায় চেষ্টা কর।

বাজারের ব্যাগ হাতে খাবার টেবিলেই চেয়ার টেনে বসে পড়ল অখিল। বসে বলল, 'কতদিন বাঁচব কে জানে! পি এফ, গ্রাচুইটিও গায়েব। ক-মাস পরে কী হবে বলতে পারো খুকু?'

'কী আর হবে! অন্য জায়গায় চাকরি নাও।'

'এই বয়সে কে নেবে আমাকে? এখনও প্রায় দু-বছর কাজ ছিল। সার্টিফিকেটে বাইশ মাস বয়স কমানো ছিল।'

'তাহলে তো প্রায় ঠিক বয়সেই চাকরি গেল! পি এফ গ্রাচুইটি নিয়ে যদি অফিস বন্ধ হত

তো আপত্তি ছিল না। পেনশন নেই আমাদের। এই অবস্থায়, এতগুলো টাকা গায়েব। ভাব তো। খালি হাতে বসে খাব? তাহলে চল বড়খোকনের ওখানে গিয়ে উঠি আমরা।'

'তা পারব না খুকু।'

'আমি চলে যাই। একজনের খরচ তো কমে যাবে।'

'আমি একা থাকতে পারি না। তোমারও গিয়ে ভাল লাগবে না। বড়খোকনের বাচ্চার, ঠাকুমা হয়ে গিয়ে উঠবে। শেষে বেবি সিটার হয়ে যাবে। যাই বাজারটা সেরে ফেলি।'

এখানে একটা মুণ্ডুকাটা বটগাছের নীচে বাজার বসে একবেলা। সবাই বলে বটতলার বাজার। সেখানে গুলকয়লা থেকে ব্লাডপ্রেসারের ডায়টাইড্ বড়ি, দর্জি থেকে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি, জমির দালালের ঘাঁটি থেকে লোকাল পার্টি অফিস সবই গোলকধামের কোর্টের মতোই সাজানো। পুরো ভিউটার ওপর একটা রুমাল ধুলো। তার দখল নিতে পারে পনেরো মিনিটের ডিসট্যান্স থেকে একটা পুরোদস্তুর আরবান তাবা এসে মাথার ওপর ঝুলছে। কেন না পাঁচ বছর আগের বাঁশবাগানেও এখন প্রোমোটার। ছ-তলা ফ্ল্যাট বাড়ি।

সেদিকে তাকিয়ে বাজে লাগল অখিলের। সেই একই মাছ। একই ঝিঙে। কাঁচালঙ্কা। টমেটো। শসা। একই পথ দিয়ে শরীরে ঢুকিয়ে একই পথ দিয়ে বের করে দেওয়া। এই করে দিনের পর দিন জঠরের আগুন শান্ত করা। একইভাবে। তিনশো পটল। দুশো চারাপোনা। পঞ্চাশ লঙ্কা। দেড়শো টমেটো। ভীষণ বাজে লাগল অখিলের। এই করে করে পুষ্টি, আয়ু, প্রভা, তেজ—কত কী ! এসব ডানদিকে।

বাঁ-দিকের রাস্তা ধরে এগোলে কাঠের মিস্ত্রি, মুদিখানা, সঙ্গীত শিক্ষায়তন। তার পরেই সরকার ফার্মেসি। সরকার ডাক্তার টালির নীচে টেবিল ফ্যান আর একডুমের আলো নিয়ে বাক্স খুলে বসে গেছেন ভোর ভোর। দেশে এত লোক। তাদের সবাইকে ধরে ফেলার মতো খবরের কাগজ, ট্রানজিস্টার, টিভি, সিনেমা, মদের দোকান কিংবা ফার্মেসি নেই।

শীতের শুরুতে সর্দি ঘড়ঘড় রোগীই বেশি। একটা-আধটা কালীপুজোর তারাবাজির বার্নিং কেস। দুটো ভয়ঙ্কর বুড়ো। তাদের একজনের একদম দাঁত নেই। অন্যজনের ওপর পাটিতে মাত্র তিনটি। তারাই জড়ানো কথাবার্তায় আউ আউ করে সিমেন্টের মেঝেতে চ্যাটাই বেড়ার ভেতর বেঞ্চে বসে,— মানুষের এই মিউজিয়াম সকালবেলাই মাত করে রেখেছে।

সরকার ডাক্তার অখিলের নাড়ি হাতে নিয়ে প্রথমেই জানতে চাইলেন, 'বাহ্যে হয়েছে?'

'এই তো আপনার ওষুধ নিয়ে বাজার করে ফিরব। আর এক কাপ চা খেলে তবে—'

'বাহ্যেটা হওয়া দরকার। ওই পথ দিয়েই তো সর্দির সিক্সটি পারসেন্ট বেরোবে। বাকি ফর্টি পারসেন্টের তো গলা দিয়ে বেরোচ্ছে না ডাক্তারবাবু।'

'বেরোয়, আপনি দেখতে পান না।'

তর্ক করল না অখিল। সরকার ডাক্তার তাকে দিনে একবার করে খেতে বলেছিলেন। আটটি করে গুলি। কাশির ঘং ঘং—বুকের ভেতর সোঁ সোঁ থামানোর জন্যে সে মাঝরাতে উঠে আরও দু-একবার খেয়ে তবে রিলিফ পেয়েছে।

সরকার ডাক্তার খুদে শিশিতে খুদে গুলিগুলোকে একটা তরল ঢেলে শুষিয়ে নিচ্ছিলেন।

অখিল ঠিক তখনই কথাটা পাড়ল। সরকার জ্ঞানের কথা খুব ভালোবাসেন।

'আচ্ছা, মানুষ কতদিন বাঁচতে পারে?'

'এই একটা প্রশ্নের মত প্রশ্ন করলেন! দেখুন এক সময় তো মানুষ হাজার হাজার বছরও বাঁচতো শুনেছি—'

'হাজার?'—বলে চুপ করে গেল অখিল। যে কারখানা বন্ধ হওয়ায় সরকারবাবু হোমিওপ্যাথিতে নামেন—রোগী দেখতে দেখতে তা দখলে এনে ফেলতে পেরেছেন— সেই কারখানায় কী করতেন তিনি? কোনও তর্কে গেল না অখিল। মানুষ কি হাজার বছর বাঁচতে পারে? কী দরকার কোশ্চেন তুলে। সরকার ডাক্তারের খুদে খুদে গুলিতে পুরিয়ায় যখন সর্দিটা সল হচ্ছে—খুকুর কোমরের ব্যথাটা যখন নরম হচ্ছে। কী শুনেছে কে জানে! হাজার হাজার বছরের কথাটা তাহলে শোনা।

সরকার ডাক্তার লম্বা পজ দিয়ে খুব অর্ডিনারি কথা বলেন। এই যেমন— বাহ্যে হয়েছে? বুকটা কেমন বুঝছেন? একটু পরিষ্কার লাগছে না?— এইসব কথার ফি শব্দের মাঝখানে অন্তত দশ সেকেন্ডের গ্যাপ থাকে। সেইসব গ্যাপের মাঝখানে সর্দি ঘড়ঘড়, পোড়া তারাবাজির গরম কাঠি মাড়িয়ে ফেলার বার্নিং কেস, কনস্টিপেশনের রোগীরা চোখের পলক না ফেলে এমনভাবেই তাকিয়ে থাকে — যেন কোনও অবতারের বাণী শুনছে। যেমন কিনা— পেঁয়াজ খাবেন না কিন্তুক। এইসব শূন্যস্থান দশ সেকেন্ডের এক একটি চুপ করে থাকা দিয়ে ভরানো। ওইসব চুপ করে থাকার ভেতর আবছামতো ফার্মেসির ঝাপসা আলোয় শিশির গুলিগুলোকে তিনি তরল ওষুধে সোক্ করিয়ে নেন। শিশিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।

তখন অখিলের মনে হয়—সরকার ডাক্তার তো আমার চেয়ে বছর দশেকের ছোট। ইট চাপা ঘাসের মতো গায়ের রং। মৃদু গলা। ক্ষীণ শরীর। হপ্তায় একবার দক্ষিণ বারাসতে ফ্যামিলির কাছে কাটিয়ে আসেন। আর হপ্তাভর এখানে পসার জমান। কতদিন বা বাঁচবেন মানুষটি। কতদিন বাঁচতে পারেন? বটতলা বাজারের হেটোলের ভাত। তার সঙ্গে নরম হয়ে আসা চারাপোনা মাছের ঝোল। তাই দিয়ে লাঞ্চ। জলখাবার খেতে তো দেখি না কখনও।

'শুনেছি—আমার ঠাকুর্দার যৌবনে? সে কতদিন আগে? একশো বছর রামায়ণের দারা সিংয়ের মত একটা তাগড়া লোক এসেছিল দক্ষিণ বারাসতে —(টিভিতে হনুমানের রোলে দারা সিং?)

তার একটা লেজ ছিল—

(যা ভেবেছি—)

লোকটা এসেই দক্ষিণ বারাসতের রেল প্ল্যাটফর্মে একটা চড় মারে। সঙ্গে সঙ্গে সিমেন্ট করা প্ল্যাটফর্ম ফেটে যায়—

(তখন কি সিমেন্ট আবিষ্কার হয়েছিল?)

তাই বলছিলাম—

প্রতিটি শব্দের মাঝখানে দশ সেকেন্ডর গ্যাপ। সেসব অদৃশ্য গ্যাপের দিকে রোগীরা সব চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে। এরাই গত কর্পোরেশনের ভোটে একবগ্গা ভোট দিয়েছে। কারণ, রাস্তা সারাই হবে বলে একটি রোড রোলার ও দশ লরি ঝামা বটতলায় এনে ফেলা

হয়। ভোটের মাসখানেক আগেই।

'বলছিলাম কি—খুকুর মাথা ঝিমঝিম করে—ঘুম হয় না একদম।'

'আপনার মিসাসের?'

'হ্যাঁ। আমার মিসাসের।'

'তা মানুষের আয়ু সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কমে এল। সেই কমা আয়ু অ্যালোপ্যাথি এসে আরও—'

'তবু একজন মানুষ কতোদিন বাঁচতে পারে?'

'ওবেলাও মরতে পারে। আবার টিকে থাকল তো—'

'টিকে থাকল?'

'ধরুন ঠিক ঠিক ডায়গ্‌নসিস হলে—ঠিক জায়গায় ঠিক ব্রায়োনিয়া কি সাইলেসিয়া কিংবা নাক্স ভোমিকা—বা এক পুরিয়া লাগদার ক্যালি ফসেই টাট্টুঘোড়া হয়ে উঠে দাঁড়াল।'

'তবু? কতদিন বাঁচতে পারে?'

'এ প্রশ্ন কেন করছেন?'

অখিল বলল, 'ধরুন একজন লোক অনেকদিন বাঁচতে চায়। কিন্তু তার টাকা ফুরিয়ে গেল। তখন সে কী করবে? হাতে আর টাকা নেই তার। অথচ বাড়িভাড়া মুদিখানা।'

'ওঃ! এটা কোনও মেডিক্যাল কোশ্চেন নয়।'

'কিংবা ধরুন ব্যাঙ্কে একজন লোকের অনেক টাকা। বাড়িতে তার মিসাস খুব ভাল রাধেন। লোকটা ফট করে মরে গেল। তার মিসাস পায়ের ওপর পা দিয়ে সেই টাকা ভোগ করবেন।'

'ব্যাপার কী জানেন—আয়ু বা টাকা কোনটা আগে ফুরোবে কেউ জানে না। তাই যদি জানা থাকত—একজন মানুষ কতদিন বাঁচতে পারে?'

সরকার ডাক্তার একগাল হেসে বলল, 'আপনি চাইছেন—আয়ু আর টাকা একসঙ্গে ফুরোক! এটাও কোনও কোশ্চেন নয়।'

'আসলে আমি চাইছি—মানুষ অনেকদিন বাঁচুক—নীরোগ শরীরে—'

'কতদিন?'

'এই ধরুন— দেড়শো বছর।'

'ওরে বাবা! নীরোগ দেহে দেড়শো বছর? তাহলে তো ফার্মেসিতে আমাদের মাছি তাড়াতে হবে।'

'আর ওই দেড়শো বছরে হাতে টাকাও যেন না ফুরোয় মানুষের।'

'এটাও কোনও মেডিক্যাল কোশ্চেন নয়। এই নিন আপনার মিসাসের ওষুধ। ভোরে খালি পেটে এক পুরিয়া।'

'চা খেয়ে?'

'খেতে পারেন। আর রাতে শোয়ার সময় এক পুরিয়া। আপনি কি খুব স্বপ্ন দেখেন ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে?'

'তা হয়তো দেখি। তবে এই সর্দির ওষুধটা খাবার পর থেকে কোনও স্বপ্ন টপ্ন আর দেখি

না। কাশতে কাশতে জেগে উঠতে হয় তো। স্বপ্ন দেখতে থাকলেও তা ওই ঘং ঘং কাশিতে ছিঁড়ে ফর্দাফাই হয়ে যায়।'

'এই কেসটা শেষ হোক। আপনাকে দু-হপ্তার ওষুধ দেব। কোনও স্বপ্ন আর দেখবেন না তাহলে।'

'অ।'

'আর নন্ মেডিকেল হলেও আপনার প্রশ্নের একটা জবাব দিতে পারি। কোনও কাগজে পড়ে থাকলো—প্রতি পনেরো-ষোলো বছর অন্তর আমাদের দেহের সব কোষ আগাগোড়া পালটে যায়। পশ্চিম পুটিয়ারি থেকে বালিগঞ্জে বাসা বদল করে আসার মতো।'

'আমিই তো দু-তিন বছর অন্তর বাড়ি বদলাই। এই আছি পাইকপাড়ায় তো চলে গেলাম বেহালার শকুন্তলা পার্কে।'

'ধরুন তাই। এই পনেরো-ষোলো বছর অন্তর আমাদের দেহের এক একটা গাঁট। এই গাঁটেই বিপদ ওৎ পেতে থাকে। কোষ বদলের সময় মৃত্যু এসে হানা দেয়। একটা গাঁটের শেষে—আরেকটা গাঁট শুরু হওয়ার ঠিক আগে।

'তাহলে যে যটা গাঁট পেরোতে পারে— সে পনেরো-ষোলো বছরের ততটা করে আয়ু পায়?'

'এই তো ঠিক ধরেছেন।'

'তাহলে দশটা গাঁট পেরোলে একশো পঞ্চাশ ষাট বছর বাঁচতে পারি।'

'রাইট।'

ওষুধ নিয়ে বাজারের দিকে চলল অখিল। আমি তাহলে জীবনের চারটে গাঁট পেরিয়ে এসেছি প্রায়। আর একটা পেরোলেই পঁচাত্তর ক্রস করব? অথচ দু-মাস হল মাইনে পাই না। ব্যাঙ্কের টাকা তো গোনাগাঁথা। জীবনের পঞ্চম গাঁটে পৌঁছবার আগেই যদি টাকা ফুরিয়ে যায়?

বাজারের কাছাকাছি সে এসে পড়ল। চল্লিশ টাকা কেজির খোকা ভেটকিরা তাকে ডাকছে। আয় অখিল। আয়—আমাকে কিনে নিয়ে যা! আমি চারশো। মোট ষোলো টাকা পড়বে। বেশি না। মাঝখান থেকে দুফালি করলে ল্যাজ খাবে তোর মিসাস। তুই মাথা। আমার শরীরে শুধু শিরদাঁড়াতেই কাঁটা।

দূর থেকেই থমকে দাঁড়াল অখিল। মহেঞ্জোদড়োতেও তো এইভাবেই হাট বসত। এখন অব্দি পৃথিবীর ইতিহাসে বিজ্ঞানীদের হিসেবে মোট ছ-হাজার কোটি মানুষ জন্মে মারা গেছে। তাদের ছাই—তাদের হাড় এ মাটিতে মিশে আছে। তাদের আরও বেঁচে থাকার ইচ্ছে এই বাতাসে কেমিকালি অকসিজেন হয়ে আছে। আমরা খালি চোখে রাতের আকাশে মাত্র ছ-হাজার পর্যন্ত তারা দেখতে পাই। বিজ্ঞানীরা বলছেন— ওখানে ছ-হাজার কোটি তারা আছে। সারা ইন্ডিয়ায় ছ-হাজার রেল স্টেশন —দু'হাজার সিনেমা হল—ছ-হাজার পোস্ট অফিস আছে। ফি গাঁটের পনেরো-ষোলো বছর ধরলে আমি কি আয়ুর ছ-টা গাঁট পেরোতে পারব?

বাজারে ঢুকে অখিল কোনওরকমে ছ-শো ভোলা ভেটকি কিনল। তিনটে সবুজ শশা।

চারটে মুলো। আর পঞ্চাশ লঙ্কা। আরও কী কিনত। কিন্তু সেই সিক্সটি পারসেন্ট সর্দির কথা মনে পড়ল। সেই সর্দিও একই পুরনো পথ দিয়ে বেরোয়। আর কিছু কিনতে পারল না।

বাড়ি ফিরছিল তাড়াতাড়ি।

সরু রাস্তার গায়ে ঢোলকলমির অগোছালো বেড়ার ভেতর একখানি টালির ঘর। অখিল জানে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সমস্ত ইয়াংকি সোলজাররা এই অমর আগাছাকে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে ইন্ডিয়ায় সঙ্গে করে এনেছিল। বেড়া দেবার জন্যে। এদের কেটে মেরে ফেললেও আবার জন্মায়। আসলে এরা কতদিন বাঁচতে পারে—তার কোনও আন্দাজ নেই কারও।

কে যেন ডাকল। 'অখিলদা—এই অখিলদা—' ফিরে দেখল অখিল। মাঝবয়সী প্রায় ছেচল্লিশ বছর বয়সের একজন সুঠাম কালো পুরুষ—চোখে চশমা—খালি গা—পাজামা গুটিয়ে ধারালো দায়ে ঢোলকলমির ডালগুলো কচকচ করে কাটছে।

'চিনতে পারলাম না তো।'

'প্রায় চল্লিশ বছর আগে কাশীপুরে গঙ্গার ধারে আপনাদের বাড়ির পাশে থাকতাম। আমি কুনাল। আমার ছোটভাই কিন্নর। আমরা আপনার ছোট ভাইদের সঙ্গে নেতাজি সংঘের ক্লাবঘরে ক্যারাম খেলতাম। মনে পড়ছে?'

স্মৃতির পাতালে কুনালকে খুঁজে পেল অখিল। 'তুমি তো বড়ভাই কুনাল। সি. এ পড়তে।'

'হ্যাঁ। দুটো পাস করে আর পড়িনি। এই তো আমার বাড়ি।'

'ওঃ! এই টালির ঘর তোমার?'

'হ্যাঁ। ইচ্ছে করেই পাকা বাড়ি তুলিনি। ইচ্ছে করলেই পারি। আসুন না—'

ঘরে ঢুকতেই অখিল বলল, 'কতটা জায়গা? এখন তো এখানে লাখ টাকা কাঠা।'

'চার কাঠা। প্রোমোটার বলছে—জমিটা দিন। রাস্তার গায়ে জমি তো। বারোটা ফ্ল্যাট বানিয়ে দু-টো আমায় ফ্রি দেবে।'

'নিয়ে নাও। ভালই তো।'

'নাঃ। ভাবছি নিজেই বাড়ি তুলব। তুলে ভাড়া দেব। আমি কিনেছি এইট্টি ওয়ানে। এগারোশো টাকা কাঠা।'

'তাই নাকি? বাঃ!' বলে অখিল নিজের মনে বলল, এইট্টি ওয়ানে কত এগারশো টাকা হাত দিয়ে গেছে। তখন যদি জানতাম। তখন যদি কিনতাম। তাহলে আমি দুটো না হোক একটা ফ্ল্যাট তো ফ্রি পেতাম!—এই বাচ্চাটি কার? একটি বছরখানেকের মেয়ে মেঝেতে হামা দিচ্ছে। তাকে ধরতে অল্পবয়সী একটি বউ পাশের রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল।

'আমার। এই আমার বউ অখিলদা।'

অখিল অবাক হয়ে তাকাল। কুনালের এত বাচ্চা বউ? এত কচি মেয়ে?

তার মুখে তাকিয়ে কুনাল একগাল হাসল। 'আপনি অবাক হচ্ছেন তো? ও আমার শালী ছিল আগে। এখন বউ। আমার স্ত্রী মারা গেছেন।'

'কী সে?'

'ক্যান্সারে। আধুনিক হোমিওপ্যাথির কোনও চিকিৎসাই বাকি রাখিনি। ওই দেখুন।'

অখিল কুনালের আঙুল বরাবর চ্যাটাই বেড়ার দেওয়ালে তাকাল। সেখানে বড় একখানা

অয়েল পেইন্টিং। কপালে ডগডগে সিঁদুর। বাচ্চা বউটি বলল, 'আমার দিদি—'

বউটির দিদি সর্বক্ষণ তার ছোটবোনের এই সংসারের দিকে তাকিয়ে আছে।

অখিল জানতে চাইল, 'কোনও বাচ্চা, টাচ্চা?'

'না। হয়নি। ইউটেরাসে ক্যান্সার। বিয়ের দু-বছরের মাথায় ধরা পড়ল। শেষদিকে সরকার ডাক্তারের পুরিয়া এনে দিলাম। ভাল হয়ে যাচ্ছিল মনে হয়। কিন্তু ফট করে মরে গেল।'

অখিল জানে না শালীকে বিয়ে করলে কেমন লাগে। ক্যান্সারে শেষ পর্যন্ত সরকারকে? আশ্চর্য! সে বাজারের থলি হাতে বাড়ি ফিরে এল। আসার সময় জানতে চাইল, 'তোমাদের অফিস কোথায়?'

কুনাল একটা বড় নামী কোম্পানির নাম বলে জানাল, 'ওদের অ্যাকাউন্টস সবটাই আমায় দেখতে হয়। ব্যালান্স সিট আমারই হাতে। ফিরতে ফিরতে রাত আটটা-নটা হয়ে যায়।' বাচ্চা বউটি নালিশ জানাল অখিলকে, 'দেখুন না দাদা—বাড়ি ফিরেও অন্যসব অফিসের খাতা লেখে—খাতা ঠিক করে দেয়। ভাত নিয়ে বসে থাকতে থাকতে ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসে। এক-একদিন রাত একটা-দেড়টা হয়ে যায়। আপনি ওকে একটু সকাল সকাল খেয়ে নিতে বলুন তো।'

'খেয়ে নিলেই পারো কুনাল।'

'নেব। নেব। কিন্তু এই খাতা লিখেই তো সোনারপুর স্টেশনের গায়ে ছ-কাঠা কিনি সেভেন্টিনাইনে। ছশো করে কাঠা। সেখানে এখন পার কাঠা পঞ্চাশ হাজার হয়েছে। আরও বাড়বে— সোনারপুরের ওপর দিয়ে সত্তরখানা ট্রেন যায়। আসেও রোজ সত্তরখানা ট্রেন।'

'তাই নাকি?'

'বলেন কেন! আরও দশ কাঠা কেনা আছে বেহালার গোড়াগাছায়। সানে তিনশো টাকা করে কাঠা। এখন বেড়ে কাঠা দশ হাজার। লাইট গেলেই ডবল হয়ে যাবে। অটো দৌড়চ্ছে দিন-রাত।'

'তাহলে তুমি কোথায় বাড়ি করবে?'

'সেটাই ভাবছি। কোনটা কোথায় শেষ পর্যন্ত কত টাকার কাঠায় গিয়ে ঠেকে—তাই বুঝে একটা ডিসিশন নিতে হবে। সামনের বছর ঠিক এইসময় নিয়ে ফেলব।'

'তাড়াতাড়ি নাও। ল্যান্ড সেলিং আইন কিন্তু কলকাতার বাইরেও আরও কড়া হয়ে যাবে।'

'কবে থেকে বলুন তো?'

তা জানে না অখিল। বেরিয়ে আসার সময় দেখল, কুনালের মুখে বেশ উদ্‌বেগ। সেদিনই অনেক রাতে ঘুম ভেঙে যাওয়ায় বারান্দায় বেরিয়ে এসে একটা সিগারেট ধরাল অখিল। ধরিয়ে দেখতে পেল, কুনালের ঘরের চ্যাটাই বেড়ার দেওয়াল দিয়ে বাইরের শীতের নিশুতি রাতে আলো এসে পড়েছে। নিশ্চয় খাতা লিখছে ও এখন। আর অয়েল পেইনন্টিংয়ের বউ চোখের পলক না ফেলে-তাকিয়ে। ঘুপচি মতো রান্নাঘরে ভাতের থালা ঢাকা দিয়ে বাচ্চা বউটি বসে ঢুলছে। তার দিদির নিশ্চয় আরও বাঁচার ইচ্ছে ছিল। আরও বাঁচতে পারত। যদি অ্যালোপ্যাথি হত। আচ্ছা মানুষ কতদিন বাঁচতে পারে।

ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চাশ টাকার নোটটা হাতে নিয়ে বসে রইলেন রশিদ খান। ছেলে-মেয়ে দুটি এ টাকা প্রত্যাখ্যান করেছে। ছেলেটা শুধু মাথা নেড়েছে হাত জোড় করেছে, মেয়েটি জিভ কেটে বলেছে, 'আমাদের প্রতিদিন মুদ্রা ছুঁতে নাই গো বাবু।'

মাটির ভাঁড়ে চা খাচ্ছে সিলিপ্ সিলিপ্ শব্দ করে। একটু আগে আর্দালি ওদের যথাযথ ভাবে কাপ-প্লেটে চা দিতে এসেছিল। তখন মেয়েটি বলেছিল, 'মাপ করবেন গো, আমরা বাসন-কোসনে কিছু খাই না।'

রশিদ খান ভাবলেন, টাকা নিতে চাইছে না কেন ওরা? পঞ্চাশ টাকা কি কম হয়েছে? একশো দিলে নেবে? মেয়েটি বলেছে, প্রতিদিন মুদ্রা ছুঁতে নাই। এর মধ্যে প্রতিদিন কথাটার মানে কী?

মেলার একটেরেয় পুলিশ সাহেবের রঙিন তাঁবু। এর নাম সুইস কটেজ। খানিক আগে একবার টহল দিতে বেরিয়ে রশিদ খান এই দুজনকে দেখতে পান। দুজনেরই বয়স বেশি না। ছেলেটি বছর তেইশ-চব্বিশের, মেয়েটি একুশ-বাইশ। দুজনেরই মুখে এখনও কৈশোরের লাবণ্য। এলা মাটিতে ছোপানো এক জনের ধুতি আর পিরান, অন্য জনের শাড়ি, দুজনেরই মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা।

সরকারিভাবে মেলা শেষ হয়ে গেছে গতকাল। এখন ভাঙা মেলা, ফেরার পালা। তবু মানুষ জন আছে যথেষ্ট। ভিড়ের মধ্যে গান শোনা যায় না। নানা দিকে নানা অ্যামপ্লিফায়ারের ক্যাকোফোনি। তাই রশিদ খান ওদের ডেকে এনেছে নিজের তাঁবুতে। হাঁটতে হাঁটতে তিনি জেনে নিয়েছিলেন এরা কোনও প্রসিদ্ধ বাউলের চেলা নয়। এদের কোনও আখড়া নেই, দুজনে মিলে জুটি বেঁধেছে। এক জঙ্গলের মধ্যে নাকি ওদের দেখা হয়েছিল। কথা বলে বেশ টুসটুসে রস মিশিয়ে।

'তোমাদের বাড়ি ছিল কোথায়? কোন গ্রামে?' —এই প্রশ্নের উত্তরে মেয়েটি বলেছিল, 'গ্রামে তো নয়, মরুভূমিতে?' আর ছেলেটি বলেছিল, 'সাগরে, আমি ভাসতে ভাসতে এসেছি।'

'আর গান শিখেছ কোথায়?'

মেয়েটি বলেছিল, 'বাতাসের কাছ থেকে। কত শত গান তো বাতাসে উড়ে উড়ে এসে আমাদের কানে সেঁধিয়ে যায়। বাতাস না থাকলে তো কিছুই শোনা যায় না।'

ছেলেটি বলেছিল, 'মানুষ যখন কাঁদে, তখন তার মধ্যেও গান থাকে। তাই নয় কি বাবু?'

রশিদ খান মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'ঠিক।'

গ্রামের অনেক মানুষই রূপক মিশিয়ে ভাবের কথা বলে। এসব শুনতে তাঁর মন্দ লাগে না।

কিন্তু এরা টাকা নেবে না কেন? বাউল তিনি ঢের দেখেছেন। বাউলরা তো আর যাযাবর নয়। তাদের মাথার ওপর একটা ছাউনি থাকে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে একটা সংসার থাকে। টাকা-পয়সা বর্জিত জীবন যাপন করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারও কারও মধ্যে কিছুটা ভোগবাদও ঢুকে গেছে। তা অস্বাভাবিকও নয়। এই তো কিছুদিন আগে এক বাউল তার ছেলেকে বিদেশে পড়তে পাঠাবে বলে পাসপোর্টের জন্য তাঁর কাছে সাহায্য চাইতে এসেছিল। যেখানেই বাউলরা গান শোনাতে যায়, সেখানে কি তারা কিছু টাকা-পয়সা আশা করে না? খুব বিনীত ভঙ্গিতে দরাদরিও করে। ট্রেনে যারা গান গায় —

রশিদ খান কখনও কারুকে ভিক্ষা দেন না। কেউ গলায় কাছা বেঁধে করুণ গলায় অভিনয় করে বাবার শ্রাদ্ধের জন্য সাহায্য চাইতে এলে তিনি বলেন, যে ছেলে অন্যের সাহায্য নিয়ে বাবার শ্রাদ্ধ করে, তার বাবার আত্মার মুক্তি হয় না, ভূত হয়ে ফিরে আসে, তা জানো না?

কিন্তু ট্রেনে কেউ গান গেয়ে ভিক্ষা করলে রশিদ খান সব সময় কুড়ি-তিরিশ টাকা দেন তাকে। এটা তো ভিক্ষা নয়, একজন সঙ্গীত-শিল্পীর দক্ষিণা।

চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। ছেলে-মেয়ে দুটি এবার বিদায় নেবে। রশিদ খান ঝোঁকের মাথায় একটা কাণ্ড করে ফেললেন।

অনেকেই বলে, তাদের মধ্যে তাঁর কয়েক জন বন্ধুও যে পুলিশ শুধু মানুষের কাছ থেকে নিতেই পারে, কোনও মানুষকে কিছু দেয় না। সেই কথাটা হঠাৎ মনে পড়ায় তিনি একটু হাসলেন। তারপর পকেট থেকে পার্সটা বার করে পঞ্চাশ টাকার নোটটা ঢুকিয়ে বার করলেন একটা পাঁচশো টাকার নোট।

সেটা বাড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'এটা নাও, তোমাদের কাজে লাগবে!'

এবারেও ছেলেটি হাত জোড় করে মাথা নাড়তে নাড়তে পিছিয়ে গেল। মেয়েটি বলল, 'মাপ করেন গো বাবু, আজ আমাদের মুদ্রা ছুঁতে নাই।'

ঈষৎ বিরক্ত হয়ে রশিদ খান বললেন, 'আজ ছুঁতে নাই মানে? আজ তোমাদের কোনও ব্রত আছে?'

মেয়েটি হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল, 'না গো, ব্রত-ট্রত কিছু নাই। আজ আমাদের মন ভাল আছে।'

'বেশ, মন ভাল আছে। কিন্তু কিছু খেতে-টেতে তো হবে! খিদে-তেষ্টা তো থেমে থাকবে না!'

'মন ভাল থাকলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা তেমন গায়ে লাগে না। কিছু খেলেও হয়, না খেলেও চলে।'

'তা-ও না হয় বুঝলাম। কিন্তু কাল যদি মন ভাল না থাকে, তখন যে হু হু করে ক্ষুধা-তৃষ্ণা বেড়ে যাবে।'

'আপনি আশীর্বাদ করেন গো বাবু, যেন কালও আমাদের এমনটিই মন ভাল থাকে।'

এর পর আর কথা চলে না। রশিদ খান গুম হয়ে রইলেন।

নমস্কার জানিয়ে ছেলে-মেয়ে দুটি তাঁবু থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত পরেই রশিদ খান গা ঝাড়া দিয়ে উঠে হাঁক দিলেন, 'নিতাই, নিতাই! আর্দালি, নিতাইকে ডাক।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিতাই এসে উপস্থিত। নীল রঙের হাফ হাতা জামা আর ধুতি পরা। তার সরু গোঁফের মতন চোখের দৃষ্টিও ছুঁচোলো। সে এক জন আধা-পুলিশ। ইনফরমার। পার্ট-টাইম কাজ করে।

রশিদ খান বললেন, 'নিতাই, তোমাকে আমি একটা ডিউটি দিচ্ছি। এই যে ছেলেটা আর মেয়েটা বেরিয়ে গেল। তুমি ওদের খুব ডিসক্রিটলি ফলো করবে। দেখবে ওরা কোথায় যায়, কী খায়, কাদের সঙ্গে মেশে, রাত্তিরে কোথায় থাকে। এখন কটা বাজে? পৌনে আটটা। রাত বারোটা পর্যন্ত তোমার এই ডিউটি, আমি সব ডিটেল্‌স চাই।'

নিতাই কুতকুতে ধরনের হাসি নিয়ে বলল, 'আপনি স্যার ঠিকই আন্দাজ করেছেন। এদান্তি কিছু ছিনতাইবাজ আর ছিঁচকে চোর মাঝেসাঝে বাউলের ভেক ধরে থাকে। এমন অ্যাকটিং করে, যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না। আপনার স্যার অভিজ্ঞ চোখ।'

রশিদ খান বললেন, 'বটে! সে রকম কারুকে কারুকে তুমি চেন নিশ্চয়ই!'

নিতাই বলল, 'তা তো আলবত চিনি। কয়েক ব্যাটাকে ধরিয়েও দিয়েছি। আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে স্যার, গত মাসে এক ডাকাতির আসামি আবার ধরা পড়ল, এক বার পুলিশের ভ্যান থেকে লাফিয়ে পালিয়েছিল। সে ব্যাটাও তো আলখাল্লা পরে ঘাপটি মেরে ছিল এক বাউলদের ঠেকে। আমিই দূর থেকে আঙুল দেখিয়ে....'

রশিদ খান জিজ্ঞেস করলেন, 'এই ছেলে-মেয়ে দুটোও সেই দলের?'

নিতাই বলল, 'তা এখনই ঠিক বলতে পারব না স্যার। এরা লাইনে নতুন এসেছে। আগে দেখিনি। তবে জানি, ছিনতাইবাজদের যে রিংটা আছে, তারা এখন বেছে বেছে অল্প বয়সিদের রিক্রুট করছে।'

রশিদ খান বললেন, 'যাও, আর দেরি কোরো না। যদি ওরা হারিয়ে যায়....'

নিতাই চলে যাবার পর রশিদ খান অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে জরুরি কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আজ ভাঙা মেলাতেও তিনটি ছিনতাইয়ের কেস ধরা পড়েছে। দুটো ধরা পড়েনি। একটা বাচ্চা মেয়ে হারিয়ে গেছে, একটা দোকানের ক্যাশ থেকে চুরি গেছে সাঁইত্রিশ হাজার টাকা....

এই সময়ে ওই ছেলে-মেয়ে দুটির কথা তিনি ভুলে গেলেন, অথচ মনেও রাখলেন। অর্থাৎ মনের ওপরের স্তরে শুধু কাজের কথাবার্তা, আর ভেতরের স্তরে গাঁথা রইল ওদের

মুখচ্ছবি।

সাড়ে ন-টার পর তিনি একলা থাকতে চান। এ সময়ে তাঁর কয়েক পাত্র হুইস্কি পান না করলে চলে না। ক্যাসেটে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাজে। পুলিশের পরিচয়ের বাইরে তিনি একজন সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ এবং শখের কবি।

রশিদ খান তাঁর হেড কোয়ার্টারে বেশি থাকেন না, প্রায়ই ট্যুরে যান এদিক-সেদিক। পরিবারে তার সেরকম কিছু অশান্তি আছে তা নয়। ঘুরে বেড়ানো তার নেশা। বিভিন্ন ডাকবাংলোতে কিংবা তাঁবুতে থাকা তার বিশেষ পছন্দ। অনেক সময়ে তার কয়েকজন বন্ধুও সঙ্গে থাকে। এ বারেও দুজন কবিবন্ধু ছিল। তারা ফিরে গেছে সন্ধের একটু আগে।

রাত্রি জাগরণেও তাঁর ক্লান্তি নেই। যথেষ্ট হুইস্কি পান করলেও তিনি সহজে বেত্রক্তার হন না। বরং তাঁর কান তখন অনেক বেশি স্পর্শকাতর হয়, গান বেশি করে মর্মে যায়।

রাত বারোটা পঞ্চাশে নিতাই তাঁবুর বাইরে থেকে সন্তর্পণে মৃদু গলায় ডাকল, 'স্যার, স্যার!'

ভেতরে এসে নিতাই যে রিপোর্ট দিল তা বেশ সংক্ষিপ্ত এবং মামুলি। সত্যতার প্রমাণ দেবার জন্য সে একটা ছোট খাতায় লিখে এনেছে। আটটা পঁচিশে রথতলার টিউকলে জলপান, আবার হাঁটা, এক জায়গায় দুটো লরি অ্যাকসিডেন্ট করেছে, ওরা দাঁড়ায়নি। নটা দশ একটা গাছতলায় বসল। পৌনে এগারোটায় আবার হাঁটা। সাইড রোড দিয়ে ব্যাক করেছে। বাঁকিপুরের যে পুরোনো শিবমন্দিরের চাতাল, বসল গিয়ে সেখানে। আরও কয়েকজন শুয়ে ছিল। ওরা খানিকটা দূরে। তার পর বারোটা পাঁচ পর্যন্ত নিতাই ওদের ওয়াচ করেছে।

না, গাঁজা খায়নি। অন্য কোনও লোকের সঙ্গে কথা বলেনি। কোনও খাবারও খায়নি, যত দূর মনে হয়, হয়তো একটা পুঁটুলিতে চিঁড়ে-মুড়ি থাকতেও পারে। রশিদ খান জিজ্ঞাসা করলেন, 'শিবমন্দিরের চাতালে গিয়ে শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল?'

নিতাই বলল, 'না স্যার, আমি যত ক্ষণ ছিলুম, ওরা শোয়নি, মুখোমুখি বসেই ছিল, আর গাইছিল গুনগুন করে।'

'কী গান গাইছিল, শুনেছিলে?'

'না স্যার, অত কাছে যাইনি, তবে এক বার একটা পাখি ডেকে উঠল। ওই যে-পাখি রাত্তিরেও ডাকে— চোখ গেল, চোখ গেল বলে, হিন্দিতে বলে পিউ কাঁহা, সেই পাখিটা ডেকে উঠতেই এ মেয়েটা গলা মেলাল। পাখিটাও উত্তর দিল!'

একটু থেমে নিতাই আবার বলল, 'একটা কথা বলব স্যার? আমার মনে হল মেয়েটাই ছেলেটাকে পটকেছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, ছেলেটা নরম-সরম, মেয়েটা ওস্তাদনি, ওই ছেলেটাকে বাপ-মায়ের কাছ থেকে টেনে এনেছে। এখন হিঁদু আর মোছলমান হলেই গন্ডগোল হতে পারে। এই সব প্রেম তো পাবলিক পছন্দ করে না। এক বার বক্রেশ্বরের এক গোয়ালাদের মেয়েকে নিয়ে একটা মোছলমান ছেলে পালিয়েছিল—'

রশিদ খান হাত তুলে নিতাইকে থামতে বললেন।

নিতাই তবু বলল, 'স্যার, কাল আবার ওদের ফলো করব? যদি জাত-ফাতের গন্ডগোল থাকে....'

রশিদ খান বললেন, 'এ সব নিয়ে তুমি বিনোদ চ্যাটার্জির সঙ্গে কথা বলো। আমাকে আর কিছু রিপোর্ট করার দরকার নেই।'

রশিদ খান ওই ছেলে-মেয়ে দুটি সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেললেন। জাত-ফাতের ব্যাপার নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে রাজি নন। পাঁচশো টাকার নোট নিতে অস্বীকার করার জন্যই তিনি ওদের সম্পর্কে কৌতূহলী হয়েছিলেন। হয়তো ভাল বংশের ছেলে-মেয়ে, হয়তো জমানো টাকা আছে। ওরা যে গান গেয়েছিল, তা আহামরি কিছু নয়, মাঝারি গোছের বলা যেতে পারে। রশিদ খান তেমন কিছু বাউল গানের ভক্তও নন, দু-তিনখানার বেশি শুনতে চান না, একঘেয়ে লাগে। তাঁর মন মজে আছে মার্গ সংগীতে। সুতরাং ওই বাউল যুগলকে মনে রাখার কোনও কারণ রইল না।

দু-দিন পর তিনি ছেলে ও মেয়েটিকে দেখতে পেলেন আমেদপুরের রাস্তায়। সারা সকাল আকাশ মেঘে কালো হয়ে ছিল। শোনা যাচ্ছিল গুরু গুরু শব্দ, সূর্যকে দেখা যায়নি। দুপুরের পর শুরু হয়েছে বর্ষণ, আকাশ যেন পুকুর ঢেলে দিচ্ছে।

গাড়ি নিয়ে বোলপুরের দিকে যেতে যেতে তিনি ড্রাইভারকে বললেন, 'থামো থামো!'

বৃষ্টির মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ছেলেটি ও মেয়েটি। বৃষ্টির জন্য কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই, জ্যোৎস্নার মধ্যে বসন্ত বাতাসেও মানুষ এভাবে হাঁটতে পারে।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে রশিদ খান বললেন, 'এই ভিজছ কেন? উঠে এসো, উঠে এসো।'

দুজনেই হাসিমুখে তাকাল তাঁর দিকে। হাত তুলে নমস্কার করল।

রশিদ খান আবার বললেন, 'ওঠো, গাড়িতে উঠে এসো।'

ছেলেটি বলল, 'কেন সাহেব? আমাদের হাঁটতেই ভালো লাগছে।'

রশিদ বলল, 'তা বলে এইভাবে ভিজবে? অসুখ করবে যে!'

মেয়েটি বলল, 'এই যে গাছগুলো ভিজছে? ওই যে মাঠে কয়েকটা গোরু, ওরা ভিজছে। ওদের তো কোনও অসুখ করে না!'

গাড়িতে অন্য পুলিশরাও হেসে উঠল।

রশিদ খান বললেন, 'ওদের সঙ্গে বুঝি মানুষের তফাৎ নেই, মানুষ তো জামা-কাপড় গায়ে দেয়।'

মেয়েটি বলল, 'আমরা বৃষ্টিকে ডাকছিলাম, কখন বৃষ্টি আসবে! এখন বৃষ্টি এসেছে, আমরা যদি পালিয়ে যাই বৃষ্টি রাগ করবে না?'

রশিদ খান তার সহকর্মীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পাগল আর কাকে বলে। অবশ্য বয়স কম, ভিজুক। ভিজুক যত ইচ্ছে।'

গাড়িটা ওদের ফেলে বেরিয়ে গেল।

দিল্লি থেকে একজন বেশ বড় গোছের ভি আই পি আসছেন শান্তিনিকেতনে। তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিখুঁত করার জন্য রশিদ খানকে এখন প্রায়ই আসতে হচ্ছে এদিকে।

যাওয়া-আসার পথে আমেদপুরের রাস্তাতেই আবার দেখতে পেলেন ছেলেটিকে। এক

বিকেল সায়াহ্নের আলো-আঁধারিতে। গুপী যন্ত্র বাজিয়ে গান গাইছে। এক গাছতলার নির্জনে।

ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললেন, খানিকটা এগিয়ে গিয়ে গাড়িটা আবার পিছিয়ে এল। ওরা কী খায়। কেমন করে খাওয়া জোটায়, এটাই তিনি জানতে চান।

ওদের দেখেও ছেলেটি গান বন্ধ করল না। রশিদ খান ধারে-কাছে কোথাও মেয়েটিকে দেখতে পেলেন না। অথচ তার মনে হয়েছিল, ওরা অবিচ্ছেদ্য।

তিনি এখন ব্যস্ত, তাই গান শেষ হবার অপেক্ষা না করেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'ওহে, তোমার সঙ্গিনীটি কোথায় গেল? সে যে মরুভূমির মেয়ে?'

ছেলেটি গান থামিয়ে ভক্তিভরে নমস্কার জানিয়ে মৃদু গলায় বলল, 'সে তো এখানে নেই। তাকে মরুভূমির মানুষরাই নিয়ে গেছে।'

রশিদ খান বুঝতে না পেরে বললেন, 'মরুভূমির মানুষরা মানে? ওদের বাড়ির লোকজনরা?'

ছেলেটি বলল, 'না গো বাবু। মরুভূমির মানুষরা, যাদের হৃদয়ে দয়া-মায়া কিছু নেই।'

এবারে অস্থির হয়ে খানিকটা ধমক দিয়ে বললেন, 'রহস্য ছাড়ো। সোজা কথায় বলো, কারা নিয়ে গেছে? জোর করে?'

ছেলেটি বলল, 'চার-পাঁচ জন জোয়ান মদ্দ, মনে হয় যেন তারা পাতালের প্রাণী, হাতে লাঠি-সোঁটা, সকলে নিয়ে গেল।'

রশিদ খান বললেন, 'মেয়েটাকে কেড়ে নিয়ে গেল, তুমি কিছু করতে পারলে না?'

ছেলেটি নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'অত জনকে রুখব, সে শক্তি তো ভগবান আমাকে দেননি। আপনি থাকলে পারতেন।'

রশিদ খান বুঝলেন, এ প্রশ্ন করা তার উচিত হয়নি। এ ছেলেটাকেও যে খুন করে রেখে যায়নি, সেটাই আশ্চর্যের।

'কখন এটা ঘটেছে?'

'আজকের দিনটা গেল। কালকের রাত, তার পরের দিন যখন শুরু, সবেমাত্র পাখি ডেকেছে।'

'তুমি এর মধ্যে আমাকে খবর দাওনি কেন?'

'আজ্ঞে, আমি এ জায়গা ছেড়ে যাই কী করে? সে যখন ফিরে আসবে, তখন সে আর আমাকে খুঁজে পাবে না।'

রশিদ খানের চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। ফিরে আসবে? ওরা আর ফিরে আসে না। নারীহরণের ঘটনা সম্প্রতি বেড়েছে। মেয়েটির তেমন কিছু রূপের জেল্লা না থাকুক, শরীরটা তো বাঁকাচোরা নয়, সুস্বাস্থ্যের একটা দীপ্তি আছে। ওইসব লোকদের চোখে সে শুধু লোভনীয় নারীমাংস। আজকাল গাছতলার নীচে পথিকরা ঘুমোয় না।

ধরে নিয়ে গিয়ে শুধু ধর্ষণ নয়, তার পর খুন করেও ফেলাটাই এখানকার রেওয়াজ। ছ-সাত বছরের মেয়েকেও ধর্ষণ করে। তাতেও আনন্দ পায়? না, আনন্দ-টানন্দ কিছু নয়, সে বোধ যাদের থাকে, তারা রক্ত দর্শন করে না। ধর্ষণের পর বিক্রিও করে দেয়, অনবরত জ্যান্ত মেয়েশরীর চালান যাচ্ছে দেশ-বিদেশে।

প্রথম ছেলেটার ওপরেই খানিকটা রাগ হল তাঁর। এই ছেলেটা এত অপদার্থ কেন? শুধু কাব্য করলেই চলে? সঙ্গিনীর নিরাপত্তার কথা না ভেবে মন্দিরের চাতালে কিংবা গাছতলায় শুয়ে থাকছে? এ তো ওদের লোভ দেখানো!

তিনি কর্কশ গলায় বললেন, 'থানাতেও খবর দাওনি, শুধু এখানে বসে থাকলেই চলবে?'

ছেলেটি বলল, 'আমার তো অন্য কোথাও যাবার উপায় নেই। সে এখানেই ফিরে আসবে যে! এখানেই আবার দেখা হবে!'

'যারা জোর করে তাকে ধরে নিয়ে গেছে, তাদের হাত ছাড়িয়ে সে ফিরবে কী করে?'

'ফিরতে তো তাকে হবেই। যদি বাঁধন ছিঁড়তে না পারে, তাহলে বাঁধনের মধ্যে সে ডুব দেবে।'

'ধরো যদি সত্যিই সে ফিরে না আসে?'

'বললাম তো বাবু, কোনও বাঁধনই তাকে ধরে রাখতে পারবে না। শরীরটা পড়ে থাকবে, কিন্তু সে আর থাকবে না সেখানে। আর তাই-ই যদি হয়, তাহলে সে খবরও আমি ঠিক পেয়ে যাব। এখানে বসে বসেই পাব। বাতাস শুনিয়ে যাবে। তখন আমি আর এখানে বসে থেকে কী করব। এই খাঁচা থেকেও পাখিটাকে উড়িয়ে দেব।'

রশিদ খান মনে মনে বললেন, এ যে দেখছি এ যুগের রোমিও-জুলিয়েট। আদিখ্যেতা আর কাকে বলে! তার পরে তিনি তার সহকর্মীর দিকে ফিরে তীব্র ঝাঁজের সঙ্গে বললেন, 'বিনোদবাবু, আপনারা কী করতে আছেন? প্রায় প্রত্যেক দিনই যে একটা-দুটো মেয়েকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে.....'

বিনোদবাবু বললেন, 'স্যার, এফ আই আর করা হয়নি।'

আরও গলা তুলে রশিদ খান বললেন, 'জেনারেল সিচুয়েশন যে এত খারাপ হচ্ছে, সেটা আপনারা দেখবেন না। এফ আই আর-এর নিকুচি করেছে। ক্রাইম হবার আগে প্রিভেনশনও বুঝি পুলিশের কাজ নয়? সেসব বুঝি ভুলে গেছেন! শুনুন, আমি আপনাদের ঠিক আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে মেয়েটাকে খুঁজে বার করতেই হবে। আগে দেখুন, কাছাকাছি তার বডি পাওয়া যায় কি না। যদি না পাওয়া যায়, ওয়েল অ্যান্ড গুড, তাকে কোথাও আটকে রেখেছে পাচার করার জন্য। সেইসব গ্যাং-এর যে-কোনও একটাকে ধরুন। আপনারা চেনেন, আমি জানি। ওরা একদমেই মেয়েগুলোকে অনেক দূরে নিয়ে যায় না। থেমে থেমে যায়। ওদের অনেক হাইড আউট থাকে। রেল পুলিশকে অ্যালার্ট করুন। বর্ধমান আর মুর্শিদাবাদের এস পি-দের মেসেজ পাঠান। আমি বেশি রাত্তিরে ওদের সঙ্গে কথা বলব।'

পুলিশ অনেক কিছুই পারে না। আবার অনেক কিছু পেরেও যায়। যা পারে না, তা বোধহয় পারতে চায়ও না। আর যা পারতে চায়, তা পেরে যেতে দেরি হয় না।

আটচল্লিশ ঘণ্টার একটু আগেই সেই বাউল সঙ্গিনীটিকে উদ্ধার করা হল হেতমপুরের এক পোড়ো বাড়ি থেকে। মৃত নয়, জ্যান্ত। সঙ্গে আরও সাতটি মেয়ে।

টেলিফোনে খবর দেওয়া হল রশিদ খানকে। অন্য মেয়েদের থানায় রেখে এই মেয়েটিকে নিয়ে আসা হল তাঁর কাছে। তিনি তখন বোলপুরের পি ডব্লিউ ডি বাংলোতে অবস্থান করছেন।

মেয়েটির দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন তিনি। এই কয়েকটি দিনেই তাকে অনেক শীর্ণ মনে হচ্ছে। চোখের নীচে যেন কেউ কালি লেপে দিয়েছে ভুসো কালি। পোশাক ধুলিমলিন, কাঁধের কাছে একটু ছেঁড়া। কিন্তু শরীরে দৃশ্যমান আঁচড়-কামড়ের দাগ নেই। চুল খোলা বলে তার মুখটাও একটু অন্যরকম।

রশিদ খান একটু পরে কোমল গলায় জিজ্ঞেসা করলেন, 'তোমার খুব কষ্ট হয়েছে, তাই না?'

সে দু-দিকে আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, 'না, তেমন কিছুই নয়।'

রশিদ খান আবার বললেন, 'তোমার ওপর ওরা, ইয়ে, মানে অত্যাচার করেছে?'

মেয়েটি বলল, 'শরীরটাকে যদি কখনও মনে করা যায়, এটা আমার নয়.... মানে এই শরীর আর নিজের নয়, এই বোধ পাকা হলে তখন কে কী অত্যাচার করল না করল, তাও বোঝা যায় না। তখন শরীর হয়ে যায় দেহ। তার কোনও সাড়াশব্দ নেই।'

বেশ চিন্তিত হয়ে রশিদ খান বললেন, 'এ তো বেশ উচ্চাঙ্গ জ্ঞানের কথা। তুমি এত কম বয়েসে এ সব শিখলে কী করে?'

মেয়েটি বলল, 'আমি তো কিছু শিখিনি। আমি শুধু আমার মনটাকে বোঝবার চেষ্টা করি। মনই তো সব কথার উত্তর দেয়।'

'তোমাকে যখন ওরা জোর করে তুলে নিয়ে গেল, তখন তুমি ভয় পাওনি?'

'মরুভূমিতে তো কত রকম বিপদ-আপদই ঘটে। কত মানুষ অসময়ে হারিয়ে যায়। আবার এই সবের মধ্যেই তো কত সাধ-আহ্লাদ।'

শেষ কথাটুকু না শুনেই রশিদ খান চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তাঁর মনে পড়ে গেছে সেই ছেলেটির কথা। সে বলেছিল, গাছতলাতেই বসে থাকবে। আরও বলেছিল, বাতাস তাকে দুঃসংবাদ দিলে সেও এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবে! বাতাসে তো কত রকম ভুল খবর, দুঃসংবাদ ছড়ায়। এর মধ্যে ছোকরাটি আবার আত্মহত্যা-টত্যা করে বসেনি তো? তখন এই মেয়েটি, আবার রোমিও-জুলিয়েট?

এই দু-দিন ভি আই পি-ব্যস্ততার জন্য তিনি ছেলেটির কোনও খবরই নিতে পারেননি।

তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'গাড়িতে স্টার্ট দাও, এক্ষুনি যেতে হবে।'

গাড়িতে বসে মেয়েটির সঙ্গে আর কোনও কথা হল না। তাঁর মনে পড়ল রজনীকান্তের একটা গান, 'যবে তৃষিত এই মরু ছাড়িয়া যাইব....।' সংসারটাকে মরুভূমির সঙ্গে তুলনা দেবার একটা ধারণা এদের মধ্যেও চালু আছে। আর ছেলেটি যে বলেছিল সাগরের কথা, ভবসমুদ্র তো বলেই! বই না পড়েও এরা এগুলো শিখে যায়।

তিনি ভাবতে চেষ্টা করলেন, এবার দেখা হওয়ার পর ওরা দু-জনে প্রথমে কী বলবে?

তিনি কল্পনায় দেখলেন, সেই গাছতলায় পৌঁছবার পর গাড়ি থেকে নেমেই মরুকন্যাটি ছুটতে ছুটতে গেল সেই সাগর-সন্তানের দিকে। কোনও কথা নয়, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে শুধু কান্না।

কান্নার মধ্যে মিলন দৃশ্য যেমন মধুর, তেমনই দুর্লভ। ছেলেটি বলেছিল, মানুষের কান্নার মধ্যেও গান থাকে। ঠিকই বলেছিল।

আসলে কিন্তু তেমনটা ঘটল না। সেই গাছতলায় এসে গাড়িটা থামল রাস্তার উলটো দিকে। ছেলেটি বসে আছে গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়ে, যেন সে এই ক-দিন ওখান থেকে একবারও ওঠেনি। যেন সে গৌতমবুদ্ধের মতো বসে আছে সাধনায়। আকাশ আজ পরিষ্কার, জ্যোৎস্নায় তাকে দেখা যাচ্ছে আবছাভাবে।

মেয়েটি আস্তে আস্তে নামল গাড়ি থেকে। দৌড়ে গেল না। সে বলে উঠল, 'সেই ফুল কোথায় গেল গো, যে ফুলে ভ্রমর বসেনি....'

ছেলেটি উঠে দাঁড়াল না, কোনও উত্তেজনা নেই। সে বলে উঠল, 'নদীতে নাই জলের ধারা, নদী আছে সেইখানে'

সুর দিয়ে বলছে ছেলেটি, মেয়েটির বাণীতেও একটু সুর ছিল।

মেয়েটি আবার সুর করে বলল, 'একাদশীর চাঁদ উঠেছে, বাজিছে মোহনবাঁশি।'

ছেলেটি গাইল, 'পিঁপড়ায় মধু খেয়েছে, পিঁপড়া এখন দিক জানে না।'

মেয়েটি গাইল, 'অচিন দেশের নাইয়া এখন নাওয়ের মধ্যে ঘুমায়।'

ছেলেটি গাইল, 'চক্ষু ভরে দেখছ রে মন, চক্ষু কিন্তু মন দেখেনি।'

বিস্ময়ে রশিদ খানের চোখ দুটি ঠিকরে পড়ার মতন অবস্থা। এ রকম বিপর্যয়ের পরও দেখা হতে ওরা গান গাইছে? এ কী হিন্দি সিনেমা? এটা ওদের দেখানেপনা।

তার পরেই তিনি বুঝলেন, এর মধ্যে একটুও কৃত্রিমতা নেই। এ গান ঠিক সংলাপও নয়, চরণের শেষে মিল নেই। যেন আলাদা আলাদা গানের লাইন। পরস্পরের কুশল সংবাদের বদলে গানের বিনিময়। কিংবা, এ কি কোনও গুপ্ত সংকেতের ভাষা? এর মধ্যে রয়েছে এক তীব্র আকুতি, যেন দুটি পাখির সাড়া দেওয়ার ডাক।

হঠাৎ এক তীব্র ভালোবাসার আবেগে রশিদ খানের বুক ভরে গেল। তিনি এক বার কেঁপে উঠলেন।

তাঁর উপলব্ধি হল, আর কোনও মানুষের সঙ্গে ওদের তুলনা হয় না। নিশ্চিত ওরা এই পৃথিবীর কেউ নয়। একটু বেড়াতে এসেছে। ইচ্ছে করলেই ওরা এই মরুভূমি ছেড়ে চলে যেতে পারে যে-কোনও সময়ে।

ওরা কি সেই কথাই বলতে চাইছে গানের মধ্যে। তা হলে তো এখনি ওরা অদৃশ্য হয়ে যাবে। সে দৃশ্য দেখতে নেই।

এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে রশিদ খান চক্ষু বুজে ফেললেন। কতক্ষণ লাগবে অদৃশ্য হতে? বড় জোর দশ সেকেন্ড, তার মধ্যেই ওরা দুজন দুজনকে ছুঁয়ে ফেলবে হাত বাড়িয়ে। তিনি মনে মনে গুনতে লাগলেন, এক দুই তিন চার....

স্বাদ

প্রফুল্ল রায়

কাচের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের এই ঘরটা সুন্দর করে সাজানো। মেঝেতে মেরুন রঙের ম্যাট্রেস এক ধারে গ্লাসটপ, সেক্রেটারিয়েট টেবিল, রঙিন টেলিফোন, ফোম-লাগানো চেয়ার, মাথার ওপর ঝকঝকে সিলিং ফ্যান —এ ঘরের সব কিছুর মধ্যেই সুরুচির ছাপ।

এখান থেকে বাইরে তাকালে মহেশমুণ্ডা শহরের অনেকটা অংশ চোখে পড়ে। ছোটনাগপুরের ছোট্ট নিরিবিলি শহর মহেশমুণ্ডা এক কথায় চমৎকার।

এই মুহূর্তে অজিতেশ তাঁর চেয়ারটিতে বসে ডান দিকের জানলা দিয়ে অলস চোখে বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি এই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার।

আজ তেমন কাজের চাপ নেই। ফাইল-টাইল যা ছিল, সব দুটোর মধ্যে পরিষ্কার করে দিয়েছেন অজিতেশ। ক্লিয়ারেন্সের জন্য গোটা পঞ্চাশেক চেক জমা পড়েছিল, ফিক্সড ডিপোজিট আর লকারের জন্য এসেছিল আট-দশজন লোক। সেসবও দুটোর মধ্যেই চুকে গেছে। তারপর থেকে চেয়ারে আধশোয়ার মতো করে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে মহেশমুণ্ডা শহরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

কলকাতা হেড অফিস থেকে মাত্র এক মাস হল মহেশমুণ্ডার ব্রাঞ্চে ম্যানেজার করে অজিতেশকে পাঠানো হয়েছ। এখানে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা ভীষণ ভাল লেগে গেছে তাঁর।

অজিতেশের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। নাকমুখ কাটা-কাটা; শরীরে বয়সের ভার তেমন পড়েনি। তবে চুলের আধাআধি রুপোর তার হয়ে গেছে। তিনি অবিবাহিত। এই ব্যাঙ্ক-বাড়িটার দোতলায় কোয়ার্টারে। অজিতেশের সংসার পুরোপুরি ভৃত্যতান্ত্রিক । একটি চাকর আর রান্নার জন্য একটি মৈথিলি ঠাকুর ছাড়া এখানে তাঁর আর কেউ নেই।

এখন চারটের মতো বাজে। সময়টা জুনের মাঝামাঝি। আকাশ জুড়ে কালো কালো মেঘেরা হানাদারের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে আর কদিনের মধ্যেই বর্ষা নেমে যাবে।

মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলায় মহেশমুণ্ডা শহরটাকে ফ্রেমে আটকানো একখানা ছবির মতো মনে হচ্ছে। জায়গাটার পাহাড়ি মেজাজ। চারদিকে চড়াই আর উতরাই। উতরাইয়ের ঢালে ঢালে এবং টিলার মাথায় নানা জাতের গাছপালা — দেবদারু, ওক, ইউক্যালিপটাস ইত্যাদি। তাদের ফাঁকে ফাঁকে সুন্দর সুন্দর বাড়ি; আর চোখে পড়ে কালো ফিতের মতো আঁকাবাঁকা রাস্তা। দূরে পেনসিলের অস্পষ্ট আঁচড়ের মতো পরেশনাথ পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে।

দূরমনস্কর মতো দেখে যাচ্ছিলেন অজিতেশ। হঠাৎ কে যেন খুব কাছ থেকে ডেকে উঠল, 'স্যার—'

চমকে ঘুরে বসতেই অজিতেশ হরিনারায়ণ সান্যালকে দেখতে পেলেন। লোকটা কখন যে ইঁদুরের মতো সুড়ুত করে এ ঘরে ঢুকে পড়েছে তিনি টের পাননি।

হরিনারায়ণের বয়স চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন, বাঁকানো বেতের মতো ঢ্যাঙা চেহারা। শরীরের মাংসের চাইতে হাড় বেশি। চৌকো মুখ, চোখ এক ইঞ্চি গর্তে ঢোকানো, চুল ধোঁয়াটে রঙের। লোকটা এই ব্যাঙ্কের কেরানি, টাকা তোলার জন্য চেক জমা দিলে ক্লায়েন্টকে টোকেন দেওয়া তার কাজ। তিরিশ বছর ধরে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্বটা পালন করে দিচ্ছে।

অজিতেশ শুনেছেন, তিরিশ বছর আগে চাকরি পেয়ে সেই যে হরিনারায়ণ মহেশমুণ্ডার এই ব্রাঞ্চে এসেছিল তারপর থেকে আর নড়েনি। আসলে ট্রান্সফার আর প্রোমোশনের জন্য অনেক চেষ্টা করেছে কিন্তু তার খুঁটির জোর নেই, ফলে কিছুই হয়নি। তাই এই মহেশমুণ্ডায় জীবন কাটিয়ে দিতে হচ্ছে।

অজিতেশ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিছু বলবেন?'

হরিনারায়ণ টেবিলের ওপর অনেকখানি ঝুঁকে হাত কচলাতে কচলাতে বিনীতভাবে বলল, 'স্যার, আজ কি আপনার সময় হবে?'

'কেন বলুন তো?'

'আপনি বোধহয় আমার ব্যাপারটা ভুলে গেছেন। কথা দিয়েছিলেন আমাদের বাড়িতে যাবেন—'

এবার মনে পড়ে গেল অজিতেশের।

তিনি মহেশমুণ্ডায় আসার পরই হরিনারায়ণ ধরেছিল, একদিন তাদের বাড়ি নিয়ে যাবে। দু-চারদিন পর পরই কথাটা মনে করিয়ে দেয় সে। 'যাব, যাব' করে একমাস কেটে গেছে কিন্তু ব্যাঙ্কের নানারকম কাজে যাওয়াটা আর হয়ে ওঠেনি। ব্যস্তভাবে অজিতেশ বলে উঠলেন, 'না না, ভুলব কেন? আপনার বাড়ি নিশ্চয়ই যাব।'

হরিনারায়ণের বাঁকানো শরীর আরও একটু ঝুঁকে পড়ল, 'আমার খুব ইচ্ছে, আজই চলুন। অফিস ছুটির পর আমি আপনাকে নিয়ে যাব। আজ আর "না" বলবেন না স্যার।'

কাজের চাপ-টাপ নেই। ছুটির পর হয় দোতলার কোয়ার্টারে গিয়ে ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে ইংরেজি ক্রাইম ফিকশান কি থ্রিলার-ট্রিলার পড়ে সময় কাটাতে হবে, নইলে একা একা মহেশমুণ্ডা শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন। তার চাইতে হরিনারায়ণের সঙ্গে তাদের বাড়ি গিয়ে খানিকক্ষণ গল্প-টল্প করে সময় কাটিয়ে এলে মন্দ লাগবে না। একটু হেসে অজিতেশ বললেন, 'ঠিক আছে যাব।'

খুশিতে হরিনারায়ণের ভাঙাচোরা মুখ চকচকিয়ে উঠল। একটু উচ্ছ্বসিতভাবেই সে বলল, 'অ্যাদ্দিনে স্যার, আমি সাকসেসফুল হলাম।'

হরিনারায়ণের এই উচ্ছ্বাসটুকু ভালই লাগল অজিতেশের। তিনি হাসলেন, কিছু বললেন না।

ঘণ্টাখানেক বাদে ব্যাঙ্ক ছুটির পর হরিনারায়ণের সঙ্গে বাইরের রাস্তায় আসতেই সে বলল, 'স্যার, একটা রিক্‌শা ডাকি?'

অজিতেশ জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার বাড়িটা কতদূরে?'

'উঁচা মহল্লায়।'

উঁচা মহল্লা এই ব্যাঙ্ক থেকে মাইল দেড়েকের মতো রাস্তা। অজিতেশ বললেন, 'রিক্‌শার দরকার নেই, চলুন হাঁটতে হাঁটতে যাই। বিকেলে পায়ে হেঁটে বেড়াতে ভালই লাগবে।'

হরিনারায়ণ তবু জিজ্ঞেস করল, 'কষ্ট হবে না তো?'

'একটুও না।'

দুজনে পাশপাশি হাঁটতে লাগলেন।

এই মহেশমুণ্ডা শহরে কম করে কুড়ি-পঁচিশটা মাইকা মাইন অর্থাৎ অভ্রের খনি রয়েছে। গিরিডিকে বাদ দিলে অভ্রখনির সংখ্যা এখানে সব চাইতে বেশি। ইন্ডিয়া থেকে যত মাইকা বিদেশে এক্সপোর্ট করা হয় তার সিকি ভাগ জোগায় মহেশমুণ্ডা। এখানকার যে কোনও রাস্তার দু-ধারে চকচকে পাতলা আঁশের মতো অভ্র ছড়িয়ে আছে; কোথাও কোথাও পাহাড়ের মতো অভ্রের স্তূপ চোখে পড়ে।

চড়াই-উতরাই ভেঙে উঁচা মহল্লায় হরিনারায়ণের বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল।

বাড়িটা একটা ছোটখাটো টিলার মাথায়, অনেকটা বাংলো ধরনের। ওপরে টালির চাল, চারধারে ইটের দেয়াল, মেঝে টকটকে লাল সিমেন্টের । সামনের দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে সুন্দর ফুলের বাগান।

বাইরের ঘরের টিউব লাইট জ্বালিয়ে একটা বেতের সোফায় অজিতেশকে বসিয়ে হরিনারায়ণ বলল, 'স্যার, এক মিনিট আপনাকে একটু থাকতে হবে। আমি ভেতরে খবর দিয়ে আসি।'

অজিতেশ হরিনারায়ণের মতলবটা বুঝতে পেরেছিলেন। হেসে হেসে বললেন, 'বাড়ির লোকেদের একদম ব্যস্ত করবেন না। এক কাপ বিনা-চিনি চা ছাড়া আমি কিন্তু আর কিচ্ছু খাব না।'

হরিনারায়ণ বিনীতভাবে হাসল, 'সে দেখা যাবেখন। এতদিন বলে বলে বাড়ি আনতে পেরেছি। চিনি ছাড়া শুধু এক কাপ চা খেয়ে গেলে কি আমাদের ভাল লাগবে স্যার?'

'ঠিক আছে, ওর সঙ্গে দুখানা বিস্কুট দেবেন। নাথিং মোর—'

'আপনার কথা বাড়ির মেয়েদের বলব। তারপর তারা যা ভাল বোঝে তাই করবে। আমার কিন্তু সেখানে হাত নেই।'

হরিনারায়ণ ভেতরে চলে গেলেন। অজিতেশ বসে বসে বাইরের ঘরটা দেখতে লাগলেন।

ঘরটা ভারি ছিমছাম। বেতের সোফা-টোফা ছাড়া এক ধারে কাচের বুক-কেসে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী সাজানো রয়েছে। বুক-কেসটার পাশে গোল একটা টেবিলের ওপর হায়দ্রাবাদি ফুলদানিতে একগুচ্ছ টাটকা রজনীগন্ধা। আরেক ধারে কারুকাজ কর কাঠের স্ট্যাণ্ডে ব্রোঞ্জের নটরাজ মূর্তি। দেওয়ালগুলো হালকা সবুজ রঙের। এক দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের একটা পেন্সিল স্কেচ, তার উলটো দিকের দেয়ালটায় একটি হাসিমুখ তরুণীর ফোটো।

ফোটোটা দেখতে দেখতে হঠাৎ কেমন চেনা চেনা লাগল। কোথায়, কবে, কতদিন আগে তাকে দেকেছেন, প্রথমটা মনে করতে পারলেন না!

ছবির মেয়েটা দুরন্ত আকর্ষণে তাঁকে যেন টানছিল। পলকহীন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর কখন যে নিজের অজান্তে উঠে এসে ফোটোটার সামনে দাঁড়িয়েছেন, অজিতেশের খেয়াল নেই। সেটা দেখতে দেখতে আচমকা বিদুৎচমকের মতো সব মনে পড়ে গেল। সময়ের উজান টানে তিনি যেন তিরিশ-বত্রিশ বছর আগের পূর্ব বাংলার এক মফস্বল শহরে ফিরে গেলেন।

তখন অজিতেশের বয়স আর কত? খুব বেশি হলে ষোলো-সতেরো। আর সুধার চোদ্দো-পনেরো। হ্যাঁ, ফোটোর মেয়েটার নাম সুধাই।

ধলেশ্বরী পারের এক ছোট্ট নগণ্য গ্রাম দীঘাপোতা ছিল অজিতেশদের দেশ। তাঁরা ছিলেন ভীষণ গরিব। বাবা দীঘাপোতা হাই স্কুলের সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন; বাড়িটা ছাড়া বাড়তি এক ইঞ্চি জমিজমা ছিল না তাঁদের। সে-আমলে বাবা মাইনে পেতেন তেত্রিশ টাকা বারো আনা, আর করতেন যজমানি। এই সামান্য উপার্জনে সাত-আটজনের বিরাট সংসার কীভাবে যে চালাতেন তিনিই জানেন।

অজিতেশকে ঘিরে বাবার উচ্চাশা ছিল আকাশছোঁয়া। ওই অল্প কটা টাকা থেকেই কিছু কিছু বাঁচিয়ে তিনি অজিতেশকে পড়িয়েছিলেন। হয়তো ভেবেছিলেন, এখন একটু কষ্ট করলে শেষ জীবনে ছেলেটা দাঁড়িয়ে গেলে ডাল ডিভিডেণ্ড পাবেন।

ফার্স্ট ডিভিসনে অজিতেশ ম্যাট্রিকটা পাশ করায় বাবার উচ্চাশা দশগুণ বেড়ে গিয়েছিল। তিনি ঠিক করে ফেলেছিলেন, ছেলেকে আরও পড়বেন।

কিন্তু দীঘাপোতা গ্রামে কলেজ-টলেজ ছিল না। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর নবীপুরের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল বাবার। নবীপুর তাঁদের বাড়ি থেকে পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে বেশ নাম-করা একটা মফস্বল শহর; মোটরলঞ্চে গেলে ঘণ্টা চার-পাঁচেক লাগত। সেখানে একটা ভাল ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ছিল আর ছিলেন মহীতোষ মজুমদার। মহীতোষ নবীপুরের সব চাইতে নাম-করা ফৌজদারি উকিল, দুর্দান্ত পসার তাঁর; হুড় হুড় করে তাঁর ঘরে তখন পয়সা ঢুকছে। নবীপুরে নদীর ধার ঘেঁষে কুড়ি বিঘা জমি ঘিরে পুকুর বাগান এবং তেতলা প্রকাণ্ড বাড়ি বানিয়েছিলেন। সব চাইতে যেটা জরুরি ব্যাপার তা হল মহীতোষ মজুমদার অজিতেশদের দূরসম্পর্কের আত্মীয় এবং মানুষ হিসেবে খুবই দিলদরিয়া। দুহাতে যেমন রোজগার করেন, দশ হাতে খরচও করে থাকেন।

মহীতোষের কথা মনে হওয়া মাত্র বাবা তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন যদি অনুগ্রহ করে তিনি

অজিতেশকে তাঁর বাড়িতে থেকে কলেজে পড়বার ব্যবস্থা করে দেন, এ উপকার জীবন ভুলবেন না। চারদিনের মাথায় উত্তর এসে গিয়েছিল। চিঠি পেয়েই যেন অজিতেশকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে পড়ানোর সব দায়িত্ব মহীতোষের।

উত্তর পাওয়ার পরের দিনই লঞ্চে উঠে নবীপুরে চলে গিয়েছিলেন মহীতোষ। মনে পড়ে, ভোরবেলা নবীপুরের জেটিঘাটে তাঁদের লঞ্চটা এসে থেমেছিল। তখন রোদ ওঠেনি। যদিও সময়টা পুজোর কাছাকাছি, পাতলা সিল্কের মতো কুয়াশায় চারদিকে ঝাপসা হয়ে ছিল।

টিনের সুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে আর শতরঞ্চি-মোড়া দড়ি দিয়ে বাঁধা বিছানাটা কাঁধে চাপিয়ে লঞ্চ থেকে নিশ্চল জেটিতে নামতেই বিরাট লম্বা-চওড়া চেহারার একটি লোকের ওপর তাঁর চোখ অনিবার্যভাবেই গিয়ে পড়েছিল। ভদ্রলোকের পরনে ঢলঢলে সাদা ফুল প্যান্ট আর হাফ শার্ট, কোমরে বেল্ট, পায়ে ভারি বুট।

ভদ্রলোক এধারে ওধারে তাকাতে তাকাতে অজিতেশকে দেখে ফেলেছিলেন। বড় বড় পা ফেলে তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কি দীঘাপোতা থেকে আসছ?'

অজিতেশ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলেছিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তোমার নাম কি অজিতেশ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আমি মহীতোষ মজুমদার।'

আত্মীয়তা থাকলেও মহীতোষকে আগে আর কখনও দেখেননি অজিতেশ। ঠিকানাটা অবশ্য জানা ছিল। ভেবেছিলেন লঞ্চ থেকে নেমে লোকজনকে জিজ্ঞেস করে করে বাড়িটা বার করে ফেলবেন। কিন্তু মহীতোষ নিজেই যে তাঁকে লঞ্চঘাটায় নিতে আসবেন, এতটা আশা করা যায়নি। মালপত্র নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি ঝুঁকে প্রণাম করেছিলেন অজিতেশ।

দুহাতে তাঁকে তুলে ধরে মহীতোষ বলেছিলেন, 'ফাস্ট ডিভিসনে পাস করেছে, আমি রিয়ালি হ্যাপি। চলো এবার—' বলে তিনি নিজে অজিতেশের টিনের বাক্সটা তুলে নিয়েছিলেন। অজিতেশ আপত্তি করলেও শোনেননি।

লঞ্চঘাটার গা ঘেঁষে বড় রাস্তা। সেখানে একটা ফিটন দাঁড়িয়ে ছিল। মহীতোষ অজিতেশকে নিয়ে সেটায় উঠতেই কোচোয়ান গাড়ি হাঁকিয়ে দিয়েছে।

নদীর গা ঘেঁষে রাস্তাটা চলে গেছে। ফিটনের স্বাস্থ্যবান লাল ঘোড়াটা টগবগিয়ে ছুটছিল।

পাশাপাশি বসে একধারে নদী, আরেক ধারে নবীপুরের বাড়িঘর দেখতে দেখতে মহীতোষের নানা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে গিয়েছিলেন অজিতেশ।

মহীতোষ বলেছিলেন, 'তোমার বাবা ভাল আছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বাড়ির আর সবাই?'

'সবাই ভাল আছে।'

'আমার বাড়িটা তোমার নিজের বাড়ি বলে মনে করবে, বুঝলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোনওরকম সংকোচ করবে না।'

'আচ্ছা।'

'তোমার যখন যা দরকার, চেয়ে নেবে।'

'আচ্ছা।'

'কলেজে অনেক রকম বাজে ছেলে রয়েছে। বদ সঙ্গ সবসময় অ্যাভয়েড করে চলবে। তোমার বাবা বহু কষ্ট করে তোমাকে মানুষ করতে চাইছেন। অনেক আশা নিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তাঁর আশাভঙ্গ ঘটে এমন কিছু করবে না।' বলে একটু থেমেছিলেন মহীতোষ। পরক্ষণেই আবার শুরু করেছিলেন, 'আমার কাছে দু-বছর থেকে তুমি ইন্টারমিডিয়েট পড়বে। দু-বছর বাদে যে অজিতেশকে আমি তোমার বাবার কাছে ফেরত পাঠাব সে যেন হীরের টুকরো হয়।'

ভদ্রলোককে সেদিন ভোরে অত্যন্ত সহৃদয় আর আপনজন মনে হয়েছিল অজিতেশের। তিনি বলেছিলেন, 'আমি আপনার মর্যাদা রাখতে চেষ্টা করব।'

'খুব ভাল কথা।'

একটু চুপচাপ। তারপর মহীতোষই আবার বললেন, 'আরেকটা কথা—'

অজিতেশকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকিয়েছিলেন।

মহীতোষ বলেছিলেন, 'তুমি আমার কাছে থেকে পড়াশোনা করবে, প্রতিদানে কিছুই আমি চাই না। শুধু আশা করব, তুমি এমন কিছু করবে না যাতে আমার সম্মান নষ্ট হয়। আর আমার ঘরের ভিতে কখনও সিঁধ চালাবে না।'

অজিতেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলেন। প্রতিধ্বনির মতো করে বলেছিলেন, 'সিঁধ চালাব!'

'বুঝতে পারছ না নিশ্চয়ই?'

'আজ্ঞে না—' বিমূঢ়ের মতো মাথা নেড়েছিলেন অজিতেশ।

'পরে পারবে।'

কথায় কথায় ফিটনটা মহীতোষের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল। ততক্ষণে রোদে উঠে গেছে।

একতলায় যেখানে গাড়িটা থেমেছিল সেখানে চোদ্দো-পনেরো বছরের একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তার পরনে সোনালি সিল্কের শাড়ি আর কনুই পর্যন্ত হাতাওলা ব্লাউজ, ব্লাউজের হাতায় কুঁচি দেওয়া ঝালর। মেয়েটার মুখ প্রতিমার মতো, সরু তুলিতে আঁকা ভুরু, পাতলা রক্তাভ ঠোঁট, ভাসা ভাসা টানা চোখ, ফুরফুরে ধারালো নাক। চেহারাটা রোগামতো।

অজিতেশরা নামতেই মেয়েটা দৌড়ে কাছে চলে এসেছিল। আদুরে গলায় মহীতোষকে বলেছিল, 'আমাকে তুমি কেন লঞ্চঘাটায় নিয়ে গেলে না বাবা, কেন নিয়ে গেলে না?'

মহীতোষ বলেছিলেন, 'তুই ঘুমুচ্ছিলি, তাই আর ডাকিনি।'

'কেন ডাকলে না? কেন ডাকলে না?'

'ডাকলে তো রেগে উঠতিস।'

মেয়েটা পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলেছিল, 'না রাগতাম না।' নাকের ভেতর একটানা হুঁ হুঁ শব্দ করে গিয়েছিল সে।

বোঝা গিয়েছিল, মহীতোষ তাকে লঞ্চঘাটে নিয়ে যাবেন কথা দিয়েছিলেন। না নিয়ে

যাওয়ার জন্য সে রেগে গেছে। যাই হোক, তিনি বলেছিলেন, 'এরকম করতে নেই সুধা।'

সেই প্রথম মেয়েটির নাম জানতে পেরেছিলেন অজিতেশ।

সুধা মহীতোষের কথা না শুনে সমানে হুঁ হুঁ করে গিয়েছিল আর হাত-পা ছুঁড়েছিল। মহীতোষ বলেছিলেন, 'এদিকে আয়, তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—'

অজিতেশের দিকে তাকিয়ে হাত-পা ছোঁড়াটা বন্ধ করেছিল সুধা। কিন্তু নাকি সুরে হুঁ হুঁটা করেই যাচ্ছিল। সে বলেছিল, 'না।'

'লক্ষ্মী সোনা, আয়। এরকম করতে নেই। সারা রাত জেগে ছেলেটা এসেছে। দেখছিস না, ও আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না?'

দ্রুত এক পলক অজিতশকে লক্ষ করে নাকের ভেতরকার সেই হুঁ হুঁ শব্দটা থমিয়ে দিয়েছিল সুধা। তারপর পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছিল। মহীতোষ বলেছিলেন, 'এ হল তোমার অজিতেশদাদা—' আর অজিতেশকে বলেছিলেন, 'এ আমার একমাত্র মেয়ে সুধা।'

সুধা একদৃষ্টে লক্ষ করেছিল অজিতেশকে। সেদিন তাঁর চুলে ছিল কদম ছাঁট, চোখেমুখে স্পষ্ট গ্রাম্য ছাপ। তাঁর পরনে ছিল ক্ষারে-কাচা লালচে ধুতি আর লালচে হাফ শার্ট, পায়ে তালি মারা লাল কেড্‌স। নিজের মাথাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এপাশ থেকে ওপাশ থেকে অজিতেশকে দেখতে দেখতে সুধা বলেছিল, 'একেবারে গেঁয়ো ভূত —'

মহীতোষ বলেছিলেন, 'ছিঃ, এরকম কথা বলতে নেই।'

সুধা হঠাৎ ঝর্ণার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠেছিল, 'বাবা, ওর চোখ দুটো দেখেছ — ঠিক বাছুরের মতো। জামা কাপড়ের ছিরি দেখ! আর জুতোটা!' সে হেসেই যাচ্ছিল, হেসেই যাচ্ছিল।

মহীতোষ অজিতেশকে বলেছিলেন, 'ওর কথায় কিছু মনে কোরো না বাবা; একেবারে পাগল মেয়ে। এসো—'

অজিতেশকে সঙ্গে করে মহীতোষ বাড়ির ভেতর যাবেন, সেই সময় দারুণ রূপসী মধ্যবয়সী একটি মহিলা বেরিয়ে এসেছিলেন।

এক পলক অজিতেশের দিকে তাকিয়ে মহিলা জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'এই বুঝি?'

মহীতোষ বলেছিলেন, 'হ্যাঁ।' তারপর অজিতেশের দিকে ফিরে বলেছিলেন, 'ইনি সুধার মা।'

পরে অজিতেশ জেনেছিলেন, সুধার মায়ের নাম মনোরমা।

অজিতেশ মনোরমাকে প্রণাম করতেই তাঁর চিবুকে আঙুল ঠেকিয়ে তিনি চুমু খেয়ে বলেছিলেন, 'বেঁচে থাকো বাবা। তোমার ভাল করে পাশের খবর পেয়ে আমরা কী খুশি যে হয়েছি!'

মহীতোষ বলেছিলেন, 'ও কোন ঘরে থাকবে?'

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই মনোরমা বলেছিলেন, 'সে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি সব ঠিক করে রেখেছি।' স্নিগ্ধ সদয় গলায় অজিতেশকে বলেছিলেন, 'এসো বাবা।'

একতলাতেই কোণের দিকের একটা ঘরে অজিতেশের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই ঘরটার জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে সুন্দর ছায়াছন্ন বাগান পেরিয়ে রাস্তা, রাস্তার ওপারে

নদী।

যেদিন তিনি সুধাদের বাড়ি গিয়েছিলেন সেদিনই মহীতোষ তাঁকে কলেজে ভর্তি করে দিয়েছিলেন।

অজিতেশের মনে পড়ে, সেসব দিনে তিনি ছিলেন ভয়ানক লাজুক। কারোর মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারতেন না; কারোর সঙ্গে মিশতেনও না। বিশেষ করে সুধাকে দেখলে একেবারে জড়সড় হয়ে যেতেন। তখন কলেজে যাওয়া ছাড়া প্রায় সারাদিনই নিজের ঘরে বই-টই নিয়ে বসে থাকতেন, কিংবা পুরনো আমলের ভারি খাটের ওপর শুয়ে অলস চোখে রাস্তার ওপারে নদীর দিকে তাকিয়ে থাকতেন।

সুধার মা মনোরমা প্রায়ই তাঁর ঘরে এসে তাড়া দিতেন, 'কীরে ছেলে, এরকম করে সারাদিন বই মুখে করে বসে থাকে! যাও, নদীর পাড় থেকে একটু ঘুরে এসো।'

মহীতোষও তাঁর মক্কেলদের নিয়ে ব্যস্ত থাকার ফাঁকে ফাঁকে অজিতেশের খবর নিতেন। বলতেন, 'এখানে কিরকম লাগছে?'

অজিতেশ বলতেন, 'ভাল।'

'কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

'আজ্ঞে না।'

'তোমার মাসিমার কাছে শুনি দিনরাত পড়াশোনা কর। ঘর থেকে বেরোও না। দিস ইজ ব্যাড। একটু না বেড়ালে শরীর ভাল থাকে! রোজ বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে টিফিন খেয়ে বেড়িয়ে আসবে।'

কয়েক দিন তাড়া দিলে তবে হয়তো একদিন অজিতেশ বেড়াতে যেতেন।

মনে পড়ে, প্রথম কয়েকদিন সুধা তাঁর কাছে আসেনি বা কথা-টথা বলেনি। দূর থেকে ঠোঁট কামড়ে আর চোখ কুঁচকে তাঁকে লক্ষ করত। তারপর এক ছুটির দিনের দুপুরে গোটা বাড়ি যখন নিঝুম, মহীতোষ আর মনোরমা ওপর তলায় ঘুমোচ্ছেন আর নীচের তলায় অজিতেশ ইকনমিক্সের একটা জটিল প্রশ্নের উত্তর লিখছেন; সেই সময় জানলার বাইরে হঠাৎ কাকাতুয়ার ডাক শোনা গিয়েছিল।

মুখ তুলে তাকিয়েছিলেন অজিতেশ কিন্তু কাকাতুয়া দেখা যায়নি। আবার তিনি খাতায় ঝুঁকে পড়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বুনো টিয়ার ডাক শোনা গিয়েছিল —টর্‌র, টরর্‌ — মুখ তুলে এবারও টিয়া দেখা যায়নি। কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকার পর আবার লিখতে শুরু করেছেন অজিতেশ, পায়রার ডাক কানে এসেছিল। এইভাবে একে একে চড়াই, শালিক, কাক ইত্যাদি নানা পাখির ডাক ভেসে এসেছে, কিন্তু মুখ তুললেই কেউ নেই।

কীরকম একটা সন্দেহ হতে পা টিপে টিপে জানলার কাছে যেতেই দেখা গিয়েছিল একধারে দাঁড়িয়ে আছে সুধা। বোঝা গিয়েছিল এসব পাখির ডাক তারই কাজ। মেয়েটা এতরকম পাখির গলা নকল করতে পারে, ভেবে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন অজিতেশ। কিন্তু তাকে কী বলবেন, ঠিক করে উঠতে পারেন নি। ফিরে যে যাবেন তা-ও পারছিলেন না।

সুধা বলেছিল, 'খুব ভালছেলেগিরি দেখানো হচ্ছে না?'

কিছু একটা বলতে চেষ্টা করেছিলেন অজিতেশ, গলা দিয়ে স্বর বেরোয়নি।

সুধা আবার বলেছিল, 'আমরা জানি তুমি ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করেছ। খুব গর্ব, না? আমাদের দিকে ফিরেও তাকানো হয় না। ঠিক আছে, গুড বয়গিরি তোমার বার করছি। আমার বছর বছর ফেল করব আর তুমি ফার্স্ট ডিভিসনে পাস করবে, স্কলারশিপ পাবে, সেটি কিছুতেই হবে না। আজ আমি যাচ্ছি, কাল থেকে মজাটি টের পবে।'

পরের দিন থেকে সুধা সত্যি সত্যি তার পেছনে ফেউয়ের মতো লেগে গিয়েছিল। পড়তে বসলেই সে বই কেড়ে নিত। কখনও কলেজ থেকে ফিরে অজিতেশ দেখতেন তাঁর নোট-নেওয়া খাতার ওপর কালি ঢালা রয়েছে। কোনওদিন বা দেখা যেত বইয়ের পাতা কাঁচি দিয়ে কাটা।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই সুধার সম্বন্ধে সন্ধি করতে হয়েছিল। অজিতেশ ভয়ে ভয়ে জানতে চেয়েছিল, কী করলে সুধার আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

সুধা বলেছিল, 'আমি যেভাবে বলব ঠিক সেইরকম চলতে হবে।'

অজিতেশ বলেছিলেন, 'কীভাবে চলব, বলে দিন।'

সুধা অবাক হয়ে বলেছিল, আমি তুমি করে বলছি আর তুমি আমাকে আপনি করে বলছ! এখন থেকে আমাকে তুমি করে বলবে।'

'ঠিক আছে। আপনাকে তুমি করে বলব।'

'বজ্জাতি হচ্ছে! একসঙ্গে আপনি তুমি কী ? শুধু তুমি।'

অজিতেশ ঘাড় কাত করে বলেছিলেন, 'আচ্ছা, কী করতে হবে বল—'

সুধা একটু ভেবে বলছিল, 'আমার সঙ্গে নদীর পাড়ে বেড়াতে যাবে।'

অজিতেশ চমকে উঠেছিলেন, 'কিন্তু তোমার মা-বাবা ?'

'দূর হাঁদাগোবিন্দ, বাবা-মাকে লুকিয়ে যাব, আমি আগে যাব। তারপর তুমি। একসঙ্গে বেরলে ধরা পড়ে যাব না!'

'কিন্তু বাইরে কেউ আমাদের দেখে যদি বলে দেয়?'

'আমরা সবার সামনে ঘুরে বেড়াব নাকি?'

'তা হলে?'

'তোমাদের কলেজের ওধারে নদী যেখানে বেঁকে গেছে, সেখানে বেশি লোক যায় না। আমরা সেখানে যাব।'

শুনতে শুনতে মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে ঠাণ্ডা বরফের মতো কিছু একটা ওঠা নামা করেছিল। বুকের ভেতর অনবরত হাতুড়ির আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। আস্তে ঘাড় হেলিয়ে মাথা নেড়েছিলেন অজিতেশ।

সেই শুরু। তারপর তাঁকে নিয়ে কী না করেছে সুধা! একদিন একটা জেলেডিঙি চুরি করে ধলেশ্বরীর চরেও গিয়েছিল। আরেক দিন লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়েছিল যাত্রা শুনতে, তারপর ভোর হবার আগেই ফিরে এসেছিল।

অজিতেশের সব সময় ভয় হত, এই বোধহয় ধরা পড়ে গেলেন। তারপর ধীরে ধীরে কবে যে ভয়টা কেটে গিয়েছিল, এতদিন বাদে আর মনে পড়ে না। সুধাকে ঘিরে দিনগুলো যেন স্বপ্নের মতো কেটে যেতে শুরু করেছিল। গরমের ছুটিতে কিংবা বড়দিনের সময়

বাড়ি ফিরে যেতেন ঠিকই কিন্তু সেখানে ভাল লাগত না। ধলেশ্বরীর পাড়ের সেই সুন্দর ছোট্ট মফস্বল শহরটায় কবে ফিরে আসবেন সেজন্য ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে থাকতেন।

দেখতে দেখতে, দুটো বছর কেটে গিয়েছিল।

মনে আছে, সেদিন তাঁর ইন্টারমিডিয়েট ফাইনাল পরীক্ষা শেষ হয়েছে। সন্ধ্যের একটু আগে আগে কলেজ থেকে ফিরে নিজের ঘরে খাটের বাজুতে হেলান দিয়ে চুপচাপ বসে ছিলেন অজিতেশ। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে যাচ্ছিল তাঁর। তার কারণও ছিল। কারণটা হল পরীক্ষা শেষ হয়েছে, দু-একদিনের মধ্যে তাঁকে বাড়ি যেতে হবে। তারপর সুধাদের এই শহরে আর ফেরা হবে না। কেননা এই শহরে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা আছে। বি.এ. পড়তে হলে তাঁকে ঢাকায় যেতে হবে। সুধার সঙ্গে আর দেখা হবে না, এই কথাটা যত ভাবছিলাম ততই বুকের ভেতর অদ্ভুত এক কষ্ট অনুভব করছিলেন অজিতেশ। তাঁর আঠারো-উনিশ বছরের নরম মন দুঃখে ভেঙেচুরে যাচ্ছিল।

কতক্ষণ বসে ছিলেন, খেয়াল নেই। হঠাৎ সুধা ঘরে এসে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ভূতের মতো চুপ করে বসে কী ভাবছ?'

অজিতেশ বলেছিলেন, 'কী আবার ভাবব, কিছু না।' বলে মুখ ফিরিয়ে নদীর দিকে তাকিয়েছিলেন।

'নিশ্চয়ই ভাবছ। বলো—' সুধা অজিতেশের মুখটা তার দিকে ফেরাতে ফেরাতে বলেছিল।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেননি অজিতেশ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ঝাপসা গলায় বলেছিলেন, 'আমি কাল কি পরশু বাড়ি চলে যাচ্ছি।'

'কেন?'

'বা রে, পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল না!' বলতে বলতে একটু থেমে ফের বলেছেন, 'তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না সুধা।'

সুধা চমকে উঠেছিল, 'কেন?'

'তোমাদের এখানকার কলেজে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত পড়া যায়। সেটা তো হয়েই গেল। এরপর বি.এ. পড়তে হলে অন্য কোথাও যেতে হবে। তোমার সঙ্গে আর কী করে দেখা হবে বল—'

সুধা জোরে জোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বলেছিল, 'না—'

অজিতেশ বলেছিলেন, 'কী না?'

'তোমার এখান থেকে যাওয়া হবে না।'

'কিন্তু পরীক্ষা হয়ে গেল। আমি এখানে কী করে থাকব বল?'

হঠাৎ এক কাণ্ডই করে বসেছিল সুধা, দু-হাতে অজিতেশকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করেছিল, 'আমি জানি না, জানি না, জানি না—'

যে মেয়েটা এই দু-বছর ধরে তাঁর ওপর সমানে জোর খাটিয়ে এসেছে আচমকা তাকে কাঁদতে দেখে কী করবেন, ভেবে পাননি অজিতেশ। তা ছাড়া আগে আর কখনও সুধা তাঁকে এভাবে জড়িয়ে ধরেনি। বুকের ভেতর শিহরন খেলে গিয়েছিল তাঁর। অসহ্য

উত্তেজনায় আর সুখে ভীষণ কাঁপছিল সারা শরীর। অজিতেশ বলেছিলেন, 'কিন্তু আমি কী করব বল—' তাঁর কাপুনিটা গলার স্বরেও যেন ভর করেছিল।

সুধা বলেছিল, 'সে তুমি বুঝবে। আমি তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না!'

অজিতেশ কী উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, ঘরের ভেতর হঠাৎ বাজ পড়ার মতো ভারি মোটা গলা শোনা গিয়েছিল, 'হারামজাদা বজ্জাত!'

চমকে উঠে সুধাকে বুকের ভেতর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে অজিতেশ দেখেছিলেন, পাঁচ ফুট দূরে মহীতোষ দাঁড়িয়ে আছেন। অজিতেশ তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারেননি, ঘাড় নিচু করেছিলেন।

মহীতোষ চিৎকার করে বলেছিলেন, 'প্রথম আসার দিন ওয়ার্নিং দিয়েছিলাম আমার ঘরে সিঁধ চালাবে না। সেই সিঁধটি চালিয়ে দিলে! স্কাউন্ড্রেল , শুয়োর, ভেবেছ কী, তোমার মতো গেঁয়ো স্কুলমাস্টারের ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেব! দয়া! করে এখানে এনে পড়িয়েছি আর তার রিটার্ন হল এই! দাঁড়াও, চাবকে তোমার পিঠের চামড়া তুলে দেব। আমার চাবুকটা কোথায়?'

দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে মহীতোষ চাবুক আনতে যাবেন, সেই সময় সুধা বলে উঠেছিল, 'ওর কোনও দোষ নেই। ওকে মেরো না বাবা, মেরো না বাবা, মেরো না। সব দোষ আমার—'

মহীতোষ বলেছিলেন, 'ঠিক আছে, আত্মীয়র ছেলে—মারব না।' বলেই অজিতেশের দিকে ফিরেছিলেন, 'উপকার করেছিলাম, তার যথেষ্ট প্রতিদান পাওয়া গেছে। কিন্তু আর না, আজই এখনই তুমি আমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। এ শহরে যেন আর কখনও তোমাকে না দেখি। গেট আউট —' বলে সুধার হাত ধরে টানতে টনতে বেরিয়ে গিয়েছিলেন।

আর নিজের টিনের সুটকেশে জামাকাপড় বইপত্তর পুরে তখনই সুধাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন অজিতেশ।

মনে পড়ে, সেদিন বাড়িতে ফিরে যাবার লঞ্চ ছিল না। লঞ্চ পাওয়া যাবে পরের দিন সকালে । সারা রাত শহরের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সকালে লঞ্চঘাটায় এসেছিলেন অজিতেশ। টিকিটঘরটা ছিল নদীর পাড়ে। টিকিট কেটে অজিতেশ জেটির দিকে যাবেন, সেইসময় দৌড়ুতে দৌড়ুতে সুধা এসেছিল। ঝাপসা গলায় সে শুধু বলেছিল, 'তোমাকে বাবা ওভাবে তাড়িয়ে দিল! আমাকে ক্ষমা করো অজিতেশদা—'

অজিতেশ শুধু বলেছিলেন, 'তুমি আবার এখানে এলে কেন? মেসোমশাই জানতে পারলে ভীষণ রাগারাগি করবেন।'

'করুক রাগারাগি —' বলে একটু থেমে সুধা আবার বলেছিল, ' তোমাকে একটা কথা বলবার জন্য এসেছি ।'

'কী কথা?'

'তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না, তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করব।' বুকের ভেতর তোলপাড় করে ঢেউ উঠেছিল অজিতেশের।

সুধা আবার বলেছিল, 'আমার কথা তোমার মনে থাকবে অজিতেশদা?'

অজিতেশ গাঢ়, গভীর গলায় বলেছিলেন, 'থাকবে, নিশ্চয়ই থাকবে।'

লঞ্চ ছাড়ার ঘণ্টা পড়ে গিয়েছিল। আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। অজিতেশ ঝাপসা গলায় বলেছিলেন, 'যাই —'

মনে পড়ে, বাড়ি ফিরে যাবার কিছুদিন বাদেই পূর্ব বাংলায় সাম্প্রদায়িক খুনোখুনি শুরু হয়ে গিয়েছিল। গ্রামে থাকতে থাকতেই অজিতেশ শুনেছিলাম, দাঙ্গায় সুধার বাবা মারা গেছেন। সুধারা কোথায় চলে গেছে কেউ খবর দিতে পারেনি। দাঙ্গার পর হল দেশভাগ। হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে উদ্‌বাস্তু হয়ে অজিতেশরা এপার বাংলায় চলে এলেন। এপারে এসে বেঁচে থাকার জন্য নতুন করে যুদ্ধ শুরু হল। প্রথম দিকে থাকতেন শিয়ালদা স্টেশনে। তারপর যাদবপুরের ওদিকে জবরদখল কলোনিতে বাঁশ-টালি দিয়ে ঘর তুলে বাবা-মা ভাইবোনদের নিয়ে গেলেন অজিতেশ। ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত রেজাল্টটা ভালই ছিল। তার জোরে রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টে চাকরি পেয়েছিলেন। সেটা ছেড়ে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দিয়ে এলেন ব্যাঙ্কের চাকরিতে।

পার্টিশনের পর পশ্চিম বাংলায় এসে কোনওদিকে তাকাবার সময় ছিল না অজিতেশের। একে একে ভাইদের মানুষ করতে হয়েছে তাঁকে, তাদের জন্য চাকরি-টাকরি জোগাড় করে জীবনে দাঁড় করিয়ে দিতে হয়েছে, বোনেদের বিয়ে দিতে হয়েছে। এসব করতে করতে কবে যে জীবনের পঞ্চাশটা বছর পার হয়ে গেছে কে জানে। সবাইকেই তিনি ঘর-সংসার করে দিয়েছেন শুধু নিজেরাই বিয়ে-টিয়ে করা হয়নি। কখন যে হাতের ফাঁক দিয়ে বিয়ের বয়সটা বেরিয়ে গেছে, টের পাননি।

সুধার কম বয়সের ফোটোটার দিকে কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন মনে নেই। হঠাৎ হরিনারায়ণের ডাক কানে এসেছিল ডাক কানে এসেছিল, 'স্যার —'

চমকে ঘাড় ফেরাতেই অজিতেশের চোখ পড়েছিল, একটু দূরে হরিনারায়ণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার পাশে সাতচল্লিশ আটচল্লিশ বছরের একটি মহিলা এবং তেরো-চোদ্দো বছরের একটি ছেলে আর দশ-বারো বছরের একটি মেয়ে।

হরিনারায়ণ বলেছিলেন, 'এ আমার ছেলে রানা, ও আমার মেয়ে শমিতা , আর এ আমার স্ত্রী—'

রানা আর শমিতা অজিতেশকে প্রণাম করেছিল। কিন্তু যেদিকে লক্ষ ছিল না অজিতেশের। ততক্ষণে তাঁর চোখ এসে পড়েছে মহিলাটির দিকে। এত বছর বাদেও সুধাকে চিনতে অসুবিধা হচ্ছিল না। বয়সের কিছু ভার নেমেছে তার শরীরে, সিঁথিব কাছে দু চারটে চুল রুপোর তার হয়ে গেছে তবু ধলেশ্বরীপাড়ের সেই খেয়ালি জেদি একরোখা মেয়েটাকে সময় ভেঙেচুরে একেবারে বদলে দিতে পারেনি।

সুধাও একদৃষ্টে অজিতেশের দিকে তাকিয়ে ছিল। কিছুক্ষণ পর আধফোটা গলায় বলল, 'অজিতেশদা না!'

এতকাল পরও তাঁকে তবে চেনা যায় ! সময় তাঁকেও একেবারে পালটে দিতে পারে নি! অজিতেশ বললেন, 'হ্যাঁ। এত বছর বাদে তোমাকে এখানে দেখব ভাবিনি। কেমন আছ

তুমি?'

একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে সুধা হাসল, 'মন্দ কী। তুমি?'

'চলে যাচ্ছে।'

হরিনারায়ণ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল। এবার বলে উঠল, 'স্যার আপনি আমার স্ত্রীকে চেনেন!'

'তা-ই তো মনে হচ্ছে। ইস্টবেঙ্গল ওদের বাড়িতে দু-বছর থেকে আমি পড়াশোনা করেছি।'

এরপর চা এবং মিষ্টি-টিস্টি এল। খেতে খেতে প্রচুর গল্প হল। অজিতেশ নিজের কথা বললেন। দাঙ্গার পর কিভাবে মহীতোষের মৃত্যু ঘটেছিল, কী ভাবে একটি মুসলমান মাঝি সুধাদের তারপাশায় নিয়ে এসে গোয়ালন্দের স্টিমারে তুলে দিয়েছিল, তারপর কলকাতায় এসে কিভাবে আত্মীয়দের বাড়িতে অনেক কষ্টের মধ্যে দিন কেটেছে, কীভাবে শেষ পর্যন্ত হরিনারায়ণের সঙ্গে তার বিয়ে হয় —সব শুনে গেলেন অজিতেশ। শুধু একটা কথাই অজিতেশের জানা হল না। সেদিন লঞ্চঘাটে সুধা কথা দিয়েছিল, তাঁর জন্য অপেক্ষা করবে। তবু হরিনারায়ণকে বিয়ে করল কেন? পরক্ষণেই তিনি ভাবলেন, হয়তো এই বিয়েটা না করে সুধার উপায় ছিল না। তবু কথাটা তার মুখ থেকেই শুনতে ইচ্ছা করছিল অজিতেশের। কিন্তু হরিনারায়ণের সামনে সে প্রশ্ন করা যায় না। তিনি ভাবলেন, সুযোগ পেলে কথাটা জিজ্ঞেস করবেন।

এরপর থেকে হরিনারায়ণ অজিতেশকে প্রায়ই তাদের বাড়ি নিয়ে যেতে লাগল। বোঝা যায়, সুধাই নিয়ে যেতে বলে।

অজিতেশের খুব খারাপ লাগে না। ব্যাঙ্কের কাজ ছাড়া বাকি দিনটা একা একাই কাটত এতকাল। এখন ওদের সঙ্গে গল্প করে সময়টা ভালই কাটে। নিয়মিত যেতে যেতে ব্যাপারটা নেশার মতো দাঁড়িয়ে গেল। মনে হল, সুধার যেন বিয়ে হয়নি, আর তিনিও এখনও সেই ইন্টারমিডিয়েট কলেজের ছাত্রই রয়েছেন। আর তাঁরা ছোটনাগপুরে অভ্রখনির এই শহরে নয়, ধলেশ্বরীপাড়ের সেই ছোট্ট মফস্বল শহরে যেন ফিরে গেছেন।

শেষ পর্যন্ত এমন দাঁড়াল, প্রতিদিন ছুটির পর সুধাদের বাড়ি একবার না গেলে তাঁর ভাল লাগে না। ছুটি হলে কোনওদিন সবাইকে নিয়ে অজিতেশ উশ্রী ফলস দেখতে যান, কোনওদিন যান পরেশনাথ পাহাড়ের দিকে, কোনওদিন বা দল বেঁধে মধুপুর কি গিরিডিতে পিকনিক করতে। কিন্তু হরিনারায়ণ এমনভাবে গায়ের সঙ্গে জুড়ে থাকে যে সেই কথাটা আর জিজ্ঞেস করা হয় না।

দেখতে দেখতে কটা মাস কেটে গেল। তারপর সেই দিনটি এল।

সুধাদের বাড়িতে বিকেলে অজিতেশের আসার কথা। কিন্তু সেদিন দুপুরের দিকেই তিনি চলে এলেন। বাইরের ঘরের কাছাকাছি এসে হরিনারায়ণকে ডাকতে যাবেন হঠাৎ সুধার গলা শুনে দাঁড়িয়ে গেলেন। বোঝা যাচ্ছিল, হরিনারায়ণের সঙ্গে সে কথা বলছে।

আড়ি পেতে অন্যের কথা শোনার অভ্যেস নেই অজিতেশের। এটাকে তিনি নোংরামিই মনে করেন। তবু তিনি না পারছিলেন এগোতে. না পারছিলেন পিছিয়ে যেতে।

সুধা বলছিল, 'বিয়ে তো করেনি। এত বয়েস হয়েছে, ছোঁকছোঁকানি যায় না। রোজ বেড়ালের মতো আমাদের বাড়ি ঘুরঘুর করতে আসে। আমি সব বুঝি।'

হরিনারায়ণ বলল, 'তোমাদের বাড়ি যখন পড়াশোনা করত তখন দুজনে প্রেমের সাগরে ভেসে বেড়াতে, তাই না?'

'তোমার বুঝি তাই মনে হয়! আরে বাবা, আমি ছিলাম নাম-করা পয়সাওলা উকিলের মেয়ে আর অজিতেশদা গেঁয়ো স্কুলমাস্টারের ছেলে। দয়া করে আমার বাবা ওকে বাড়িতে রেখে পড়িয়েছিলেন। যাকে দয়া করা হয় তার সঙ্গে কেউ প্রেম করে না। বুঝলে?'

'বুঝলাম।'

'আমি কোনওদিন ওর দিকে তাকাতামও না। তবে অজিতেশদা ড্যাব ড্যাব করে গোরুর মতো আমার দিকে তাকিয়ে থাকত। কিন্তু আমি ছিলাম অনেক উঁচু ডালের ফল, ওর হাত সেখানে কখনও পৌঁছায়নি।'

'যাক গে, এবার একটা কাজ করতে পারবে?'

'কী ?'

'তিরিশ বছর তো ব্যাঙ্কের কেরানি হয়েই রইলাম। অজিতেশবাবুকে ধরে আমার একটা প্রোমোশানের ব্যবস্থা করে দাও। উনি রেকমেন্ড করলে হয়ে যাবে।'

'তুমি ভেবো না, ওর নাকে বঁড়শি আটকানো আছে। আমি যা বলব ও তাই করবে, যেদিকে ঘোরাব সেদিকে ঘুরবে। তোমাকে কথা দিলাম, প্রোমোশন পেয়ে যাবে।'

শুনতে শুনতে স্তম্ভিতের মতো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন অজিতেশ। এই সুধাই কি একদিন বলেছিল তাঁকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না?

অজিতেশ আর ওদের ডাকলেন না, ক্লান্ত এলোমেলো পা ফেলে ফিরে যেতে লাগলেন।



কেশবতী

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

সব স্মৃতিই প্রিয়নাথের ক্রমে ধূসর হয়ে আসছে, তবু কিছু মুখ ও মানুষ আকাশ-বাতাসের মতোই সজীব, নদীর জলধারার মতো স্বচ্ছ। রাতে ঘুম না এলে, কিংবা ব্যালকনিতে সাঁঝবেলায় একা বসে থাকলে, কখনও সন্ধ্যা হয়ে যায়, কেউ আলো জ্বেলে দেয়, তবু তিনি তাঁর সেই সন্ধ্যাতারা কেশবতীকে আর খুঁজে পান না। কেমন ছিল তার মুখ, মুখের অবয়ব খুঁজে খুঁজে সহসা বিদ্যুৎলতার মতো জেগে ওঠেন — 'বাবু!'

'কে?'

'আমি কেশব।'

কোনও এক দুপুরে কেশব তার মেয়ে কেশবতীকে নিয়ে বোধ হয় হাজির হয়েছিল।

হাতে একখানা চিঠি কেশবের। একতলার বসার ঘরে, বোধহয় ছুটির দিন ছিল, ছেলে স্কুলে যায়নি। নিরুপমা আর ঠিকা কাজের মেয়ে হেঁসেলের কাজে ব্যস্ত — চিঠিটি খুলে পড়তে পড়তে কেশবতীকে মাঝে মাঝে দেখছিলেন। মেয়েটি বড়ই কৌতূহল নিয়ে তাঁকে দেখছে। কেশবের আড়ালে সে বাড়িটার চারপাশ উঁকিঝুঁকি মেরে দেখারও চেষ্টা করছে। কেশব বুঝি প্রবোধ দিচ্ছে, 'থাক এখানে, বাবু ভালো মানুষ, আমাদের গাঁয়ের মানুষ, থাক। বাড়ির জন্য মন খারাপ করিস না।'

প্রিয়নাথ চিঠিটি পড়ে বুঝল, তার পিতৃদেবই কেশবকে পাঠিয়েছেন। চব্বিশ ঘণ্টার একটি কাজের মেয়ে বাড়িতে খুবই দরকার, তবে এই মেয়ে কি পারবে! কিশোরী কেশবতীর গায়ে ফ্রক, বগলে পুঁটুলি।

'তুমি বোসো কেশব। ও কি থাকতে পারবে! ছেলেমানুষ, বাবা যে কী করেন!'

'বাবু, পারবে। কর্তাবাবু যে বললেন, বাড়িতে কাজকামের চাপ বিশেষ নেই, বউমার ফুট-ফরমাসের জন্যই দরকার। রান্নার লোক, ঠিকা কাজের লোক আছে, ভালো লাগলে বাড়ির মেয়ের মতো থেকে যাবে।'

তিনি কেন যে কেশবতীর দুটো সুন্দর চোখের মায়ায় জড়িয়ে গেলেন, তবু বলেছিলেন, 'কী রে, থাকতে পারবি তো?' ভাগু অর্থাৎ ভাগীরথীর কথাও মনে হয়। সেই মেয়েটা বছর তিন-চার এই বাড়িতেই কাটিয়ে গেছে, তারপর বিয়ের নাম করে নিয়ে গেল। যাবার সময় নিরুপমা ফুঁপিয়ে কেঁদেছে, কিছু করার নেই। ভাগুর তো বিয়ের বয়সও হয়নি, তবু নিয়ে গেল। গরিব পরিবারগুলো মেয়ে বড় হলে যে বিক্রি করেও দেয় এমন খবরও ছিল তাঁর কাছে।

তাঁর মনে হল, কেশবতীকে ফ্রকে মানায় না। মেয়েটা বয়সে না বাড়ুক, বাতাসে বাড়ছে।

কেশবকে বলেছিলেন, 'দু-একদিন থেকে যাও। কেশবতীর মন বসতে নাও পারে। ও তো ভিতরে ঢুকতেই চাইছে না। তোমাকেও ছাড়তে চাইছে না।'

কিন্তু কেশব রাজি নয়। সে না গেলে গানের আসর খালি, সাধুবাবার কেত্তনের আসর জমে না, সে থাকে কী করে।

কেশবতীও বলল, 'বাবা থেকে যাও। একটা দিন তো!'

কিন্তু রাজি নয়। কেশব কি এই মেয়েটাকে গছিয়ে দিতে এসেছে! পিতৃদেবের কাছ থেকে চিঠি লিখিয়ে এনেছে। একটা পেটের খোরাক বেঁচে যাবে, এমনও ভাবতে পারে কেশব।

তখনই নিরুপমা এসে হাজির।

কেশব বলল, 'বউদিমণি। প্রণাম কর।'

কেশবতীকে নিরুপমারও খুব পছন্দ হয়ে গেল।

নিরুপমার এই একটা দোষ আছে, সে কোনও প্রশ্ন করে না। প্রিয়নাথ বাধ্য হয়ে বললেন, 'যা ভিতরে যা। ভয় কী।'

আর বিকেলবেলায় কেশব চলে গেলে নিরুপমা কেশবতীকে নিয়ে দোকানে গেল। শাড়ি সায়া ব্লাউজ কিনে দিল। আর সেই মুহূর্তে কেশবতীর আনন্দ দেখে কে। বাড়িতে শাড়ি পরবার শখ থাকলে কী হবে, তার বাবার কিনে দেবার মুরোদ নেই — তবু কেন যে বনজঙ্গল ও নদীর পার তার সব দুঃখ ভুলিয়ে দেয়!

দোকান থেকে টিপও কিনে দেওয়া হল। পাউডার-স্নো, কাচের চুড়ি, সব। তার যে আলতা পরার শখ, একবার কোথায় বেড়াতে গিয়ে পায়ে আলতা পরেছিল, তার কথা বলতেই নিরুপমা একটা আলতার শিশিও কিনে দিল। ঠিক থাকল মাসের মাইনে কেশব এসে নিতে পারবে না, মানি-অর্ডারে পাঠিয়ে দিতে হবে।

কেশবতী যে খুব চঞ্চল, বাড়ির ভেতর ঢুকতেই সেটা টের পাওয়া গেল। বাড়িটা সে সেজেগুজে বিকেলবেলায় ঘুরে দেখল। এবং এই বাড়ির এখানে-সেখানে কিছু বনজঙ্গলও আছে দেখতে পেয়ে বলল, 'আমি কোথাও আর যাব না। তোমরা আমাকে রাখবে তো?'

এর আগেও কলকাতার বাবুদের বাড়িতে কেশবতী যে কাজ না করেছে তা নয়। তবে তার বেশিক্ষণ মন টেকে না। দু-দিন যেতে না যেতেই বাড়ির জন্য মন খারাপ। বাড়ি বলতে খালপাড়—ভিটেমাটি বলতে কাঠা দুই জমি, সরকারের খাস থেকে পাওয়া। ভাই-বোনগুলির জন্য মন পোড়ে। খড়ের চাল, মাটির দেয়াল আর যেদিকে চোখ যায় বনজঙ্গল গাছপালা। খালের জল নদীতে গিয়ে পড়ে—নদী থেকে সমুদ্রে।

নদীর পাড়ে গেলেই ঝোড়ো হাওয়া, চুল ওড়ে, সে দৌড়োয়। বন-জঙ্গল পার হয়ে নদীর ধারে চলে যায়। ও-পাড় দেখা যায় না। নদীর ঢেউ, ভটভটির শব্দ, নীল খোলামেলা আকাশের নীচে সে যেন সন্ধ্যাতারা। কিংবা দূরের বটগাছ, বটগাছের নীচে সাধুবাবার আশ্রম। মেলার সময় কী ভিড় কী ভিড়!

প্রিয়নাথ ক-দিনের মধ্যেই টের পেয়েছিলেন, মেয়েটার মধ্যে আছে প্রকৃতির সুষমা। ছেলেরা স্কুলে, নিরুপমা অফিসে। তাঁর অফিস তিনটেয়। মেলা কাগজ আর তার কাটিং কেশবতী পায়ের কাছে বসে জড়ো করত। খবরের অফিসের কাজ, সারা সকাল রাজ্যের খবর তাঁকে পড়তে হয়, কোনও খবর যদি বাদ যায়। আর কেশবতী, পায়ের কাছে বসে নাছোড়বান্দার মতো তার দেশের গল্প বলে যেত।

'এই কেশবতী, চা দিতে বল।'

'আবার চা! চা বেশি খেও না বাবু। চা খেলে খিদে মরে যায়। পেটে চরা পড়ে যায়।'

'ইস্, কী শুরু করলি।'

'আবার সিগারেট খাচ্ছ, বউদিমণি এলে বলে দেব।'

'দিস। সকালে কী খেলি?'

'ভাত, নুচি ভালো লাগে না। জানো বাবু, ফসলের দিনে সবুজ গন্ধে আমাদের বাড়িটা ডুবে থাকে। যতদূর চোখ যায়, ধানের জমি সবুজ হয়ে থাকে। নদী থেকে পাখিরা উড়ে আসে। সাধুবাবার আশ্রম থেকে কাঁসর-ঘন্টা বাজলেই বুঝি সাঁঝ লেগে গেছে।'

কত কথা যে বলতে পারে মেয়েটা।

'জানো বাবু, তোমাদের শহরে দু-দুবার কাজ নিয়েছিনু। টিকতে পারিনি। একাই একবার দেশে পালিয়েছিলাম। দেশ তো কাছে না! রাস্তাঘাট তো সোজা লম্বা না! শ্যামবাজার থেকে বাস। বাসে বারাসাত, আবার বাস। বাসে মহেশখালি। মহেশখালি থেকে ভটভটিতে পাক্কা দু-ঘন্টা, তারপর ঘাট।

কেশবতীর কথার শেষ থাকে না—'জানো তো বাবু, আমাদের দিকটা বড়ই দুর্গম। শাকপাতা, বনআলু, খালেবিলে মাছ আর নদী ভরে যায় হাঁড়ি-পাতিলের নৌকো। আমার ওই একটা নেশা, নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে হাঁড়ি-পাতিলের নৌকো দেখা।'

তবে কেশব তার মেয়েকে রেখে যাওয়ার সময় প্রিয়নাথকে সতর্ক করে দিয়ে গেছে — কেশবতী কারও কাঠকুটো সরায় না, তবে বদভ্যাস আছে।

'বদভ্যাস মানে?'

'মানে নেশা।'

প্রিয়নাথ ভেবেছিলেন, মেয়েটি কি বিড়ি-টিড়ি খায়? গাঁয়ের মেয়ে, খোলামেলা পরিবেশে মানুষ।

'কীসের নেশা!'

'বনজঙ্গলের, নদীর পাড়ের। খোলা আকাশের।'

'নেশা বলছ কেন?'

'ওই তো যেখানে যে গাছ পায়, বাড়িতে তুলে এনে লাগিয়ে দেয়। পেয়ারা গাছের চারা, কুমড়োর চারা, দোপাটি ফুলের গাছ, লঙ্কা গাছ, যা পায় তা লাগায়। কার গাছ কার বাড়ি থেকে চুরি করা গাছ, কোনওই প্রশ্ন করা যাবে না।'

তিনি এক দিন প্রশ্ন না করে পারেননি।

'তুই গাছ চুরি করিস?'

'চুরি করব কেন। গাছের চারা কি কারও বাপের? যে লাগায়, যে বড় করে, তারই গাছ।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

মেয়েটির সঙ্গে কখনও তিনি কথায় পেরে উঠতেন না।

'আমার বাবার অবস্থান দ্যাখো বাবু, শহরে তার মন টেকে না।'

বাপের তো এক কথা, কেশবতীর দোষ দিয়ে কী হবে । বাপের স্বভাবখানা দেখতে হবে না! সেও কি শহরে থাকতে পেরেছে? কেত্তনের গলাখানাই তার মত —

'তার মত কী?'

'কেস্তনের গলাখানা তারে খেয়েছে।'

'তা বাপ খোলে চাপড় মেরে যখন গায়, ও রাই নিশি যে পোহায়, শহরে কে বোঝে তার মর্ম!'

নিশি যে পোহায়!

খুবই দামি কথা। প্রিয়নাথ তখন ঝিম মেরে থাকতেন। কথা বলতেন না, শুধু মাথা ঝাঁকাতেন—নিশি যে পোহায়।

সে দিন সকালে উঠেই দেখেন প্রিয়নাথ, কেশবতীর ঘর খালি। কেশবতী বিছানায় নেই। গেল কোথায়। আজ তাঁর একটু বেলা হয়ে গেছে উঠতে। আকাশ ফর্সা। রোদ উঠে গেছে।

প্রিয়নাথ দেখলেন সদর দরজা খোলা।

কেশবতীর মন না টিকলে পালায়। সে কি পালাল।

শত হলেও পরের মেয়ে, চিন্তা হয়। নিরুপমাকে ডেকে বললেন, 'শুনছ, কেশবতী দরজা খেলো রেখে কোথায় পালিয়েছে।

পালাবে কোথায়! দ্যাখো খুঁজে এ দিক-ওদিক কোথাও গেছে।

সদর ধরে বাইরে বের হয়ে এলেন।

প্রিয়নাথ—বুক ধড়াসধড়াস করছে। আর তখনই দেখলেন পাঁচিলের ঝোপ-জঙ্গল কেশবতী উঁকি দিয়ে কী দেখছ।

.'এই কেশবতী, দরজা খোলা রেখে বের হয়ে এলি! তুই কী রে!'

কেশবতীর কোনও হুঁশ নেই।

'একটা কলমিলতায় কলমিফুল। এসো না বাবু, দেখবে এসো। কলমিফুলের কী সুন্দর না?'

বাড়িটার চারপাশে কিছু ঝোপজঙ্গল আছে, সামান্য এক খণ্ড জলাও আছে। সেখানে কলমিফুল আবিষ্কার করে কেশবতীর আনন্দের সীমা নেই।

কলমিলতায় ফুল এসেছে। কেশবতী ফুল দেখে কী খুশি।

কেশবতীই বটে। সারা পিঠ ছড়িয়ে কোঁকড়া চুল কোমরে নেমে গেছে। সে দিন ছাদে উঠে অবাক প্রিয়নাথ। ছাদে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে, নৈঋত কোণে, মেঘ জমেছিল। চুলের খোঁপায় কলমিফুল গুঁজে দিলে মেয়েটা তার কাছে মেঘবতী হয়ে গেল। ঝড় উঠে গেছে, কিন্তু কিছুতেই ছাদ থেকে নেমে আসছে না।

'এই ছাদে দাঁড়াবি না। নেমে আয়।' কে কার কথা শোনে।

'কী হাওয়া গো, নদী থেকে উঠে আসছে হাওয়া, বোঝে না। নদী তার গন্ধ নিয়ে হাওয়ায় হাজির। নদীরও মায়া আছে জানো ! আমি যাই কী করে। ও নদীর ঘেরানই আলাদা। তুমি দাঁড়াও, ঠিক টের পাবে। আমি না থাকলে নদী যে বড় একা হয়ে যায়।'

কলমিফুলের তো কোনও গন্ধ নেই, মেয়েটা হাওয়ায় তার নদীর খোঁজ পেয়ে গেল!

'কেশবতী কই রে?'

'যাই দাদাবাবু।' কেশবতী থাকতে থাকতে তিনি তার দাদাবাবু হয়ে গেলেন, আর

নিরুপমা বউদিমণি।

মেয়েটা দুপুরে ঘুমোয় না। বাড়ির চারপাশে পাঁচিল তোলা, ঝোপজঙ্গলেরও শেষ নেই, সে ঘাসে-জঙ্গলে বসে থাকলে বোধ হয় আরাম পায়।

'তুই কোথায়?'

'কলপাড়ে, যাই দাদাবাবু।'

'কলপাড়ে কী করছিস, তোর বউদিমণিকে চা দিলি না।'

কেশবতী দৌড়য়।

কলপাড়টা কী হয়ে আছে। বর্ষাকাল। ঝুপঝাপ বৃষ্টি নামে। ঝমঝম করে আকাশ মেঘলা হয়ে যায়। ঘোর অন্ধকার কেশবতী জানলায় দাঁড়িয়ে থাকে। আর, কেন যে মনে হয় তার, জমি পরিষ্কার করে দুটো কুমড়োর চারা পুঁতে দিলে হয়? তার চোখ পাঁচিলের আনাচে-কানাচে ঘোরে। সে দেখে এঁটোকাটা ফেলার জায়গায় দুটো কুমড়োর চারা বর্ষার জলে লক লক করছে। সে ফাঁকা খুঁজছিল —দাদাবাবু অফিসে, অরুণ বরুণ স্কুলে, বউদিমণি দিবানিদ্রা দিচ্ছে।

এই সুযোগ। সে চুপি চুপি খুরপি হাতে বের হয়ে আসছে।

আর দাদাবাবু এত সকাল সকাল বাড়ি ফিরবেন বুঝতে পারেনি। জিভ কেটে সে দৌড়ল। সে আঁচলে হাত মুছে এক লাফে রান্নাঘরে ঢুকে বাসন সরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। না হলে দাদাবাবু যে বকবেন, ঘরে তোর মন টেঁকে না, টো-টো করে ঘুরে বেড়াতে পারলে আর কিছু চাস না। এত ডাকলাম, কোনও সাড়া নেই তোর!

এই ফাঁকে কুমড়োর চারা পুঁতে দিয়েছে। মাটিতে লেগে গেলেই ডগা মেলাতে শুরু করবে। বাড়ির কেউ টেরই পেল না।

সে বাজার করে আনে।

লোকজনের সঙ্গে মিশতে শিখে গেছে।

'ও মাসি, আমাকে দুটো লঙ্কার চারা দেবে?'

'কী করবি?'

বা রে! কত জমি আমাদের বাড়িতে। গাছ হলে লঙ্কা হয় তাও বুঝি জান না!

দাদাবাবুর এক অভিযোগ, 'তুই একদম ঘরে থাকতে চাস না বেশি। তোর যে কী হবে রে! তুই যে আর ছোট নেই রে কেশি, ঘরে না থাকলে চলবে! বাড়াবাড়ি করলে ঠ্যাং ভেঙে ফেলে রাখব, তখন বুঝবি।'

থাকবে কী, খোলামেলা আকাশ যে তার প্রিয়। ঘরের মধ্যে কাঁহাতক বন্দি থাকা যায়।

'ও মাসি, আমাকে দুটো লঙ্কার চারা দেবে?'

'কী করবি? রোজ ঘ্যানরঘ্যানর করিস।'

'বা রে! গাছ হলে লঙ্কা হয়, তাও জানো না?' গাছ হলে লঙ্কা হয় খবরটা সে ছাড়া আর কেউ যেন জানে না।

'—এই কেশি', নিরুপমা ডাকছে। সাড়া নেই, নিরুপমা বাইরে বের হয়ে দেখল, পাঁচিল বরাবর ফাঁকা জায়গায় আবার একটা কী গাছ লাগাচ্ছে।

'কী করছিস?'

'এই হয়ে গেল, যাচ্ছি।'

'কটা বাজে জানিস?'

তা অনেক বেলা। তার তো জমির আগাছা দেখতে ভাল লাগে না। সে যে বাড়িটায় নিজের মেলা জমি পেয়ে গেছে। কুমড়ো গাছ, লঙ্কা গাছ, কটা বেগুনের চারা পর্যন্ত পুঁতে দিয়েছে সে, তাও হাতের গুণ আছে। কে যে মাথার দিব্যি দিয়েছে সে তাও জানে না। তবে দাদাবাবু খেতে বসে এক দিন খুবই প্রশংসা করেছে তার।

'তোর হাতে গুণ আছে রে, কেশি।' কুমড়াফুলের বড়া খেতে দাদাবাবু এখন বলেছেন। তার পর বড় বড় কুমড়ো ধরল, গাছে লঙ্কা হল— দাদাবাবু দেখেন আর অবাক হন। সে কোত্থেকে দোপাটি ফুলের চারা নিয়ে এল একদিন। কিছু রজনীগন্ধার মূল। এবং বছর শেষ না হতেই ফাঁকা জায়গাগুলি গাছে গাছে ভরে গেল। পেঁপে গাছ, আম-জামের চারা, লেবু গাছ, একটা আমলকির চারাও পুঁতে দিয়েছে, সঙ্গে দুটো আমের আঁটি, এখন কিছুটা গাছ হয়ে গেছে। এত ফাঁকা জমিন, শুধু আগাছা থাকবে, হয়!

হঠাৎ একদিন বিকেলে সেই কেশবতী উধাও। গেল কোথায়! না বলে তো কোথাও যায় না। বড় রাস্তা, বাজার, ওদিকে হানাপাড়া পর্যন্ত চেনে, তার বেশি না।

সে বাজারের পয়সা বাঁচিয়ে একবার একটা কাগজি লেবুর কলম কিনে এনেছিল। লোকটা তাকে চেনে। প্রিয়নাথবাবুর কাজের মেয়ে। কাজের মেয়ে কাগজি লেবুর কলম দিয়ে কী করবে? মনে তার সংশয় হতেই পারে।

এত বেলা হল, মেয়েটা ফিরছে না, দাদাবাবুর মাথা গরম।

কেশবতীর গায়ে কি শহরের জল লেগে গেল! সে যদি পালায়! তা কেশবতীর মিষ্টি মুখখানি উঠতি ছোকরাদের মাথা ঘুরিয়ে যে দিতে পারে। আর বুদ্ধির দৌড়ে সে কম যায় না, তাকে জব্দ করা সহজ না, এই বিশ্বাসও আছে দাদাবাবুর।

'জানো দাদাবাবু, লোকটা ভাল না। লোকটাই তো দেরি করিয়ে দিল, কিছুতেই ছাড়ে না। কোন বাড়িতে থাকিস, কার বাড়ি, গন্ধরাজ ফুলের কলম দিয়ে কী হবে? আমিও ছেড়ে কথা কলুম না। আমার গাছ কোথায় লাগাব তাতে তোমার কী গো! জায়গা না থাকলে গাছ কেউ কেনে! গাছ না থাকলে বাড়ি হয়?'

'জানো দাদাবাবু, লোকটা ভাল নয়।' ফের সেই অভিযোগ।

'ভাল নয় কেন, তোকে কিছু বলেছে?' তার পরই দাদাবাবু কেমন মাথা গরম হয়ে যায়।

'কোন লোকটা, চল তো। কী বলেছে, দেখি।'

'ওই যে গাছের চারা নিয়ে বসে থাকে বাজারে।'

'ওতো আমাদের সুজন। তিন নম্বর ক্যাম্পে থাকে। ওর মা আমাদের বাড়ি কাজ করত। লোকটা হবে কেন, ও তো সেদিনের ছেলে!'

'তোমার কাছে ছেলে হতে পারে, আমার কাছে লোকটাই। লোকটা ভাল না।'

'তোকে কী বলেছে, বলবি তো?'

'কী বলবে, ও আমাদের দেশে গেছে, নদী-নালা চেনে। ভটভটিতে যেতে হয় তাও

জানে। সুধাবাবুর আশ্রমেও গেছে।'

'দেশের খবর পেয়ে লেপ্‌টে গেলি, এত দেরি, আমাদের চিন্তা হয় না।'

'লেপ্‌টে গ্যালাম কী গো, দেশের খবর পেলে কার না মন খারাপ হয় বল?'

দাদাবাবু ছাড়বার পাত্র নন। — 'বল, লোকটা ভাল না কেন ? তোকে কিছু বলেছে?'

'লল গো।'

'কী বলল।'

'তোমাকে বলা যাবে না।' এরপর কী ভেবে মাথা নি্‌ করে বলল, নদী দেখতে চায়।

'কোথায়?'

জানি না। বলে ছুটে ভিতরে ঢুকে গেল সে।

নদীর কথায় মেয়েটা লজ্জায় শরমে মরে যাচ্ছিল। আ-র আশ্চর্য এক মাধুরীতে মুখ তার উদ্‌ভাসিত। পলকে দেখা মুখটি সম্পূর্ণ এক নারীর।

শেষে সেই নদীর টানে মেয়েটা ভেসে গেল —এক সকালে প্রিয়নাথ দেখলেন, কেশবতীর ঘর খালি। তার শখের আলমারি, আয়না, স্নো, পাউডার, কাচের চুড়ি সব পড়ে আছে। বাইরে থেকে তালা দিয়ে চাবিটা ভেতরে ফেলে রেখে গেছে।

তবু একবার খুঁজে দেখা দরকার। সুজনের খোঁজও পেলে-

না, তাকে আর পাওয়া গেল না। সুজনের বয়সি এক ছোকরা পাড়ার চায়ের দোকানে বসে তাঁকে খবরটা দিল। সুজনকে কেশবতী নদী দেখাতে নিয়ে গেছে। তারা আর ফিরবে না। অচেনা এক নদীতীরে সন্ধ্যাতারার মতো কেশবতীকে বড় রহস্যময়ী মনে হয়েছিল প্রিয়নাথের। কারও দোষ নেই বয়সের দোষ। নদীর খোঁজেই তো সারা জীবন মানুষ ঘোরাফেরা করে। পালায়। বেঁচে থাকে। যার নদী নেই সে বেঁচেও নেই।

তাঁর মন খারাপ। নিরুপমার মন আরও খারাপ।

মেয়েটা যে নিরুপমাকে বলেছিল, জানো বউদিমণি, গাছ না থাকলে বাড়ি, বাড়ি হয় না। তোমরা বাড়িটাকে ভালবাস, গাছ লাগালে বাড়িটাও তোমাদের ভালবাসবে। তার লাগানো গাছগুলোর দিকে তাকালে মন আরও খারাপ হয়ে যায়। গাছগুলি কত বড় হয়ে গেছে, অথচ মেয়েটা নেই, পালিয়েছে।

প্রিয়নাথ রাতে অফিস থেকে ফিরলে নিরুপমা কেমন জোর দিয়ে বলত, 'তুমি মন খারাপ করে বসে থেকো না। সে কোথাও থাকতে পারবে না। গাছের মায়ায় ঠিক চলে আসবে।'

এলও ঠিক। অন্ধকার রাতে কড়া নাড়ল।

'তুই!'

কেশবতীর কোলে একটি বাচ্চা। কেমন জরাজীর্ণ অবস্থা। আবছা অন্ধকারে দেখলেন। চোখ থেকে তার অশ্রুপাত হচ্ছে। অসহায় মেয়েটাকে একলা ফেলে সুজন কোথাও বোধ হয় পালিয়েছে। জীবন পরীক্ষিত না হলে সত্য প্রকাশ হয় না। বললেন, 'তোর কী দোষ। ভিতরে যা। কাঁদবার সময় মেলা পাবি। চানটান করে কিছু আগে মুখে দে।'

সাদা ঘুড়ি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ওই যে কালো ঘুড়িটা লাট খেয়ে বেড়ে আসছে, তার মানে হচ্ছে ওটা লড়বে। কালো রঙের মাঝখানে একটা লালচে ছোপ—তাতে ঘুড়িটাকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। আমার ছাদে রেলিং নেই। বাড়িটা এখনও শেষ হয়নি—এটার নানা জায়গায় বহু কাজ বাকি রয়ে গেছে। অফিস থেকে ধার তুলে একটু একটু করে করছি। যতই করছি ততই কেবল মনে হয়, একটা বাড়ি আসলে কখনওই শেষ হয় না—যতই করা যায় ততই বাকি থেকে যায়। অনন্তকাল লেগে যায়। ওই রেলিংহীন ছাদে আমার একগুঁয়ে ছোট ছেলেটা, হাবু—তার সাদা ঘুড়ি বহুদূরে বাড়িয়ে লাটাই ঘোরাচ্ছে। লড়বে। হাবুর ঘুড়ির দিকে ছোঁ মেরে মেরে সরে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর কালো ফাইটার ঘুড়িটা। রেলিংহীন ছাদে দাঁড়িয়ে হাবু পিছু হাঁটছে।

বেশিক্ষণ দেখার সময় নেই। ছাদে রেলিং নেই—ভগবান হাবুকে দেখবেন বোধহয়। আমি গরিব মানুষ, ছাদে রেলিং দিতে পারিনি এখনও। ভগবান গরিবকে দেখবেন। এখন আমার সময় নেই, সারা রাত শীতে কষ্ট পেয়েছে আমার দুটো গোরু। মশা রক্ত খেয়েছে কত! বাছুরটার পায়ে বাত, পেছনের ঠ্যাং দুটো একটার সঙ্গে আরেকটা লেগে থাকে। আমার দুটো গোরুই হারামি। সাদাটার বিয়ানোর বালাই নেই, সারাবছর খড়-খোলের শ্রাদ্ধ করছে। এবছর ভাবছি আমার শ্বশুরবাড়ির দেশ অভয়গ্রামে পাঠিয়ে দেব। আমার কালোটা প্রায় বছর-বিয়ানি। তার বাঁকা শিং, বাঁকা মেজাজ। মাসখানেক আগে আমাকে মাটিতে ফেলে হিঁচড়ে দশ গজ রাস্তা নিয়ে গিয়েছিল। তার ফলে আমাকে টিটেনাসের ইঞ্জেকশন নিতে হয়। কোমরে সেই থেকে একটা ব্যথা বোধহয় পাকাপাকি বাসা নিয়েছে। বুড়ো বয়সের চোট তো! আমার কালোটা প্রায়ই খোঁটা উপড়ে পালাতে চায়। কোথায় পালাতে চায় কে জানে!

সাঁই করে কালো ঘুড়িটা নেমে এল ওই। হাবু সিঁড়িঘরের দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে। খুব জোর সুতো গোটাচ্ছে, ওর ঘুড়িটা সূর্যের আলোর মধ্যে, তাই ঠিক দেখতে পেলাম না। কালোটা অনেক বেড়ে এসেছে, হাবুর ঘুড়ি পালাচ্ছে। ছাদে রেলিং নেই। ভগবান হাবুকে দেখবেন।

বীণাপাণি ক্লাবের পশ্চিম কোণে একটা ভাঙা টিউবওয়েল। এই কলটার সঙ্গে আমি রোজ সাদাটাকে বেঁধে রাখি। একটু মাঠ মতন আছে, কিন্তু রাতে ব্যাডমিন্টন খেলা হয় বলে ঘাস মরে মাটি বেরিয়ে গেছে। দু-চারখানা ঘাসের মরা ডগা দাঁতের আগায় সারাদিন খোঁটে গোরুটা। কালোটাকে বাঁধি দত্তদের জমিতে। জমিটা ছাড়া পড়ে আছে বহুকাল। বাড়ির ভিত গাঁথা হয়েছিল বহুদিন আগে। চারটে ঘর, একটা বারান্দা, পিছন দিকে একটা কুয়ো—এই হচ্ছে বাড়িটার ছক। ভিত সেইভাবেই গাঁথা আছে, তার ওপর বাড়িটা আর হয়ে ওঠেনি।

কুয়োটা মজে এল—রাজ্যের কুটোকাটা শ্যাওলা আর ব্যাঙের আস্তানা। বাড়ির ভিতর জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। বছরে একবার দত্তবাবু এসে দূরে দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত চোখে দৃশ্যটা দেখে চলে যান দূর এক স্টিমারঘাটায় তার কেরানিগিরিতে। আমার কালো গোরুটা এইখানে চরে। এখানে গাছগাছালির ছায়ায় কিছু ঘাস জন্মায়। গোরুটা সারাদিন খায় আর খায় আর খায়। গোরুদের কখনও পেট ভরে না।

এবার শীতটা পড়েছে খুব। আলুখেতের মাটি উসকে দিয়ে বেগুন চারাগুলোর কাছে এসে বসি। বেগুনের বাড় নেই এবছর। পোকা লেগেছে। ফুলকপির ফুলগুলোও কেন জানি ছড়িয়ে গেছে, দুধের মতো সাদা হয়ে জমাট বাঁধেনি। কলার ঝাড়ে কেঁচো লেগেছে। বাগান থেকে আকাশ স্পষ্ট দেখা যায় না, তবু গাছপাতার ফাঁকে এক ঝলক একটা সাদা ঘুড়ি দেখতে পাই। যাক বাবা এখনও কাটেনি হাবুরটা। কালো ঘুড়িটা কি এখনও ছোঁ মারছে? কে জানে!

কতকাল ধরে পৃথিবীর রস শুষছে গাছপালা। শুষতে শুষতে মাটি ছিবড়ে হয়ে গেছে। ছেলেবেলায় যেমন স্বাদ পেতাম তরিতরকারিতে, এখন আর তেমন স্বাদ পাই না। আমার নাকের দোষ কি না কে জানে, আজকাল শাকপাতায় কেমিক্যাল সারের গন্ধ পাই। পায় আমার গিন্নিও। কেবল ছেলেপুলেরা কিছু টের পায় না।

সামনে ছায়া পড়তেই চোখ তুলে দেখি, দুজন মানুষ বেড়ার ওধারে দাঁড়িয়ে।

'কাকে চাইছেন?'

'শ্যামাপদ ঘোষালের বাড়ি কি এটা?'

'আজ্ঞে, আমিই।'

তারা বিনীতভাবে নমস্কার করে। তাদের মধ্যে লম্বা জন বলে, 'আমরা কলকাতা থেকে আসছি, এ বাড়িতে একটা ঘর খালি আছে শুনলাম।'

'আছে। দেখবেন?'

'দেখি একটু।'

চাবি আনতে যেতে যেতে একবার মুখ তুলি। হাবু একেবারে রেলিংহীন ছাদের ধারে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে। যদি বে-খেয়ালে এক পা পিছু হটে! হাবু-উ, সরে যা, সরে যা, মরে যাবি.....পড়ে যাবি! কিন্তু কিছুই বলি না। বললেও হাবু কখনও শোনে না। থাক, যা করবার করুক। ভগবান ওকে দেখবেন।

'ঘরটা তো ছোটই দেখছি। দক্ষিণটা একেবারে বন্ধ। ভিতরের বারান্দা তো কমন, না?'

'হ্যাঁ, বাথরুমও তাই।'

'ইস্! রান্নাঘর উঠোনের ওপাশে। জল বলতে পাতকো—না? উঠোনে তো রোদ আসে না, মনে হয়—জামাকাপড় শুকোবে কোথায়? আর পায়খানা....?'

'দুটো। একটা আপনাদের ছেড়ে দেব।'

'ভাড়া বলেছেন পঞ্চাশ টাকা! কলকাতা থেকে দশ কিলোমিটার দূর, রেল স্টেশন থেকে সাত-আট মিনিটের হাঁটাপথ—তবু পঞ্চাশ টাকা! ওর মধ্যে কি ইলেকট্রিক চার্জ ধরা আছে?'

'না, ইলেকট্রিক আলাদা। মাসে দশ টাকা ফিকস্‌ড।'

'দশ টাকা। মাত্র চারটে পয়েন্টের জন্য দশ টাকা।'

'গরমকালে পাখা চলবে তো।'

'আমাদের পাখাটাখা নেই।'

'তা হলেও কলকাতার চেয়ে এখানকার ইউনিটের দর দ্বিগুণ।'

লোক দুজন বিতৃষ্ণ চোখে ঘরটা দেখে। পছন্দ হয় না বোধ হয়। গত এক বছর ধরে এরকম বহু লোক এসে ফিরে গেছে। আমি নিস্পৃহভাবে তাকিয়ে থাকি।

লম্বা লোকটা বলে, 'আমি এখন যে বাড়িতে আছি—সন্তোষপুরে—সেটার ভাড়া পঁয়তাল্লিশ, দুখানা ঘর সামনে-পিছনে বারান্দা, দক্ষিণের হাওয়া আসে হুড় হুড় করে। তার ওপর সেটা কলকাতা—এরকম গ্রামগঞ্জ নয়—'

'ছেড়ে দিচ্ছেন কেন?'

'আমার সামনের বারান্দায় বসে পাড়ার ছোকরারা বোম বাঁধে মশাই।'

অপেক্ষাকৃত বেঁটে লোকটি লম্বা লোকটির শালা। খুব বিনীত হাসি তার মুখে। সসঙ্কোচে বলে, 'এ ঘরটায় কে থাকে? চৌকিতে বিছানা দেখছি। আঠার শিশি, পোস্টারের কাগজ, তুলি, রাজনীতির বই—এসব কী ব্যাপার।'

'আমার মেজো ছেলে পটল।'

'পলিটিক্স করে?'

'না, পলিটিকসের বোঝে কী? এ সি ই পাস করে বেকার বসে আছে। ওইসব করে সময় কাটায়। ওটা একটা শখ।'

লম্বা লোকটাকে চিন্তিত দেখায়! —'এসব এলাকা কেমন? ঝঞ্ঝাট-টঞ্ঝাট আছে কিছু?'

'আজ্ঞে না, খুব নিরিবিলি।'

'কিন্তু খবরের কাগজে যেন দেখেছি এই এলাকাতেও—'

'ও, সে ওই অভয়নগর-বেলাবাগান রিফিউজি এলাকায়। এদিকটায় কিছু নেই।'

লোক দুজনকে তবু চিন্তিত দেখায়।

আমি তাদের কিছুদূর এগিয়ে দিই। বুঝতে পারি, তারা আর আসবে না।

গত এক বছর ঘরটা ভাড়া হচ্ছে না। আগের ভাড়াটেরা তিরিশ টাকা দিত, ইলেকট্রিক চার্জ দিত তিন টাকা। তারা ছাড়ার পর আমি ভাড়া বাড়িয়েছি। টাকাটা জমিয়ে বাড়িটাতেই লাগাব। ভাড়া হচ্ছে না বটে, কিন্তু হবে। কলকাতার গণ্ডগোলটা যদি জোর লেগে যায়। লম্বা লোকটার সামনে বারান্দায় যদি ছোকরাদের বাঁধা বোমা একটাও একদিন ফাটে—

হাবু এখন ছাদের মাঝখানে আবার সুতো ছেড়েছে। কালো ঘুড়িটা কোথায়? কেটে গেছে নাকি? না, সুতো গুটিয়ে একটু সরেছে পুবদিকে। কিন্তু লড়বে! এগোচ্ছে। হাবু ছাদের মাঝখানে দাঁতে ঠোঁট টিপে হাসছে।

বাছুরটা রোদে গা এলিয়ে শুয়ে। পায়ে বাত, ল্যাজের দিকটায় পাতলা গোবরে মাখামাখি। মাথার কাছে একটা কাক বসে মন দিয়ে ওর মুখ দেখছে।

কুয়োর পাড়ে হাত-পা ধুচ্ছি, রান্নাঘর থেকে হাবুর মা চেঁচিয়ে বলে, 'ওরা কী বলে গেল?'

'নেবে না বোধহয়। ভাড়া বেশি।'

'না নিক। তুমি কমিও না। কলকাতা থেকে লোক চলে আসছে এখন। ধরদের বাড়ি কুষ্ঠরোগীর বাড়ি বলে ভাড়া হচ্ছিল না, গত শুক্রবারে সেটাও আশি টাকায় ভাড়া হয়েছে। তুমি চেপে বসে থাকো।'

রোদে দেওয়া তোশক বালিশের ওপর তপুর বেড়ালটা ডন মারছে। বেড়ালটাকে তাড়িয়ে রোদে একটু বসি। একটা সিগারেট টানি। আকাশে সাদা-কালো দুটো ঘুড়িই সমান সমান বেড়েছে। এইবার লাগবে, ছাদে হাবুর পা দাপানোর শব্দ হচ্ছে। ঘুড়ির লড়াইটা কি দেখে যাব? থাকগে। এখন আর সে বয়স নেই। সপ্তাহে এই একটাই তো মাত্র ছুটির দিন। সময় নষ্ট করা ঠিক না।

উঠোনটায় গত বর্ষা থেকে জল জমছে। আগে জমত না। পশ্চিমে একটা মজা পুকুর ছিল, সেখানে নাবালে গড়িয়ে নেমে যেত। গত বছর থেকে এক বড়লোক পুকুরটা কিনে উঁচু করে মাটি ফেলেছে। উঁচু ভিতের বাড়ি গাঁথছে, জলটা এখন উলটো দিকে গড়িয়ে আসে। গরিবের উঠোন ভেসে যায়। কী করব ভেবে পাই না। চিন্তিতভাবে ঘরে আসি। পরশুদিন সন্ধেবেলায় কারেন্ট ছিল না, অসাবধানে মোমবাতি জ্বেলেছিল তপু। দেয়ালে কালো দাগ। সাবান জলে সেই দাগ তুলি। ক্যালেন্ডারের পেরেক পুঁততে গিয়ে দেওয়ালের চলটা উঠিয়েছে পটল। ভ্রূ কুঁচকে দৃশ্যটি একটু দেখি। দোতলা উঠবে, সেই আশায় সিঁড়িঘরটা পোক্ত করে করা হয়নি, বর্ষার জল সেইখান দিয়ে চুঁইয়ে এসে নষ্ট করছে ইলেকট্রিকের তার। দাঁড়িয়ে সমস্যাটা একটু ভাবি। ছাদের ওপর জমানো আছে লোহার শিক—তাতে জং পড়েছে, বাইরে এক গাড়ি বালি ক্রমে মাটি হয়ে যাচ্ছে, পাথরকুচিগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে নষ্ট করছে পাড়ার ছেলেরা। সারা বাড়ি ঘুরে আমি এই সব দেখি। বাড়িটা শেষ হতে অনন্তকাল লেগে যাবে মনে হয়। কুয়োতলায় মাথায় সাবান দিতে বসেছে তপু—আমার কালো মেয়েটা। গত জ্যৈষ্ঠে চব্বিশ পার হয়ে গেল। তপুর বিয়ে হলে আমার তিনটে মেয়েই পার হত। কিন্তু কালো বলে তপুই কেমন আটকে গেছে। গতকাল জি টি রোডে তিনটে মড়া পড়েছিল। পটল চারদিন বাড়ি নেই। আমার বেতো বাছুরটা কি বাঁচবে? ফুলকপিগুলো আঁট বাঁধল না, বেগুনে পোকা। ওই লম্বা লোকটা আর আসবে বলে মনে হচ্ছে না। এক বছর একটা ফালতু ঘর পড়ে আছে। কোমরের ব্যথাটা আঁট হয়ে বসেছে। আমার দুটো গোরুই হারামি। ভগবান কি সত্যিই হাবুকে দেখবেন? দেখবেন হয়তো। কিন্তু ওই কালো ঘুড়িটা নিশ্চয়ই হাবুর সাদা ঘুড়িটাকে ভোকাট্টা করে দেবে।

যদি দোতলাটা তুলতে পারতাম তবে পুরো একতলাটা ভাড়া দিতাম। দেড়-দুশো টাকা নিশ্চিন্ত আয়। দক্ষিণ দিকে দোতলায় আমার নিজস্ব ছোট্ট বারান্দা করতাম। রেলিং ঘেঁষে বসাতাম মোরগফুলের টব। ঝোলাতাম অর্কিড। ছেলেবেলায় সাহেববাড়িতে ওরকম বারান্দা দেখে আমার বড় শখ রয়ে গেছে। চাকরির আর মাত্র আট মাস বাকি। তারপর অখণ্ড অবসর, দক্ষিণের বারান্দায় বসতাম ইজিচেয়ারে, হাতে খবরের কাগজ, মাঝে মাঝে এক পেয়ালা চা, পায়ের কাছে পড়ে থাকা রোদ... এইসব খুব একটা বেশি কিছু নয়। যে কেউ এইসব চাইতে পারে।

একটা বাচ্চা ছেলে দৌড়ে এসে চেঁচিয়ে খবর দেয়—'মেসোমশাই, আপনার কেলে

গোরু খোঁটা উপড়েছে দেখুনগে....'

সত্যিই তাই। হারামি গোরুটা ছাড়া জমি পার হয়ে রেলরাস্তার ঢালু বেয়ে উঠছে। চিৎকার করে ডাকি। গলা শুনে একবার পিছনে ফিরে দেখে তারপর জোর কদমে ভারি শরীর টেনে উঠে পড়ে রেলরাস্তায়। পাথরে কাঠের খোঁটার খটখট শব্দ হয়। আপ-ডাউন দুটো লাইন পাশাপাশি। আপ লাইনটা পার হওয়ার চেষ্টা করছে আমার কালো গোরু। এইখানে রেল লাইনে একটা গভীর বাঁক। গাড়ি এলে দূর থেকে ড্রাইভার গোরুটাকে দেখতেও পাবে না....

হারামির বাচ্চা। আমি ছুটতে থাকি। গোরুটা টের পায়। লাইনটা আর পার হওয়ার চেষ্টা না করে লাইন ধরে ছোটে। আমার কোমর ভেঙে আসে। মেরুদণ্ড দিয়ে একটা ছুরির ফলা লক্ লক্ করে চমকে ওঠে। ঢাল বেয়ে উঠতে আমার দম বেরিয়ে যায়। পাথর, খোয়া, রেলের স্লিপারে হোঁচট খাই। গোরুটা 'বা-হা' বলে ডাক দেয়, ছুটতে থাকে। রেললাইনের গভীর বাঁক এখানে—আমার অবোধ দুধেল গাইটা বুঝতেও পারে না।

চনচনে রোদ, খালি পায়ে কোমরের সেই ব্যথা নিয়ে আমি প্রাণপণে খানিকটা তাড়া করি। তারপর দাঁড়াই, হঠাৎ মনে হল ভগবান ওকে দেখবেন।

অবাধ্য গোরুটাকে যেতে দিয়ে রেলরাস্তা থেকে নামবার আগে আমি সংসারের দৃশ্যটা ভাল করে দেখি। পিছনে বহুদূরে ওই জি. টি. রোড, যেখানে কাল তিনটে মৃতদেহ পড়ে ছিল। পটল চারদিন বাড়িতে নেই। ডানধারে রেললাইনের গভীর বাঁক ধরে হেঁটে যাচ্ছে আমার দুধেল গাই। কোথায় সে যাবে কে জানে! সামনে কলাঝোপের আড়ালে দেখা যাচ্ছে আমার পলেস্তারাহীন অসম্পূর্ণ বাড়িটা। ওটা কোনওদিনই শেষ হবে না। রেলিংহীন ছাদে ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তারপর দ্রুত সুতো গুটিয়ে নিচ্ছে হাবু। ওই অনেকটা সুতো নিয়ে তার সাদা কাটা ঘুড়িটা টাল খেয়ে খেয়ে ভেসে যাচ্ছে। আনন্দে গোঁত্তা খেয়ে ওপরে উঠে ঘুরপাক খাচ্ছে কালো ঘুড়িটা।

কয়েক পলক স্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে আমি সংসারের অসম্পূর্ণতাকে দেখে নিই, অনুভব করি ব্যর্থতাগুলো। সাদা কাটা ঘুড়িটা আমার মাথার ওপর দিয়ে ভেসে যায়।

হঠাৎ তড়িৎস্পর্শের মতো আমার হাত ছোঁয় সুতোর হালকা স্পর্শ, মাঞ্জার কড়া ধার। আমি সংসারের দৃশ্য থেকে মুখ ফেরাতেই নীল আকাশের সাদা হাসিটির মতো দোল খাওয়া ঘুড়িটাকে দেখি। সুতোটা আমার হাত ছুঁয়ে আবার সরে যাচ্ছে। আমার পিছনে রাজ্যের পায়ের শব্দ আর চিৎকার শুনি। তারাা ঘুড়িটার দিকে ছুটে আসছে।

সুতোটা আমার মাথার একটু ওপরে দোল খায়। আমি সংসারের সব ভুলে গিয়ে আনন্দে হাসি। লাফ দিয়ে উঠি। সুতোটা সরে যায়। অল্প দূরেই আবার স্থির হয়ে বাতাসে দোল খায়। আমি এগোই। সূতোটা সরে যায়। সুতোটা সরে যায়। আমি এগোই। আমি এগোতে থকি। ক্রমে সংসারের কোলাহল দূরে যায়। নিস্তব্ধ হয়ে যায় পৃথিবী। ঘুড়িটা টলতে টলতে এগোয়। সুতোটা আমার হাতের নাগালে নাগালে থাকে। ধরা দেয় না।

ক্রমে আমরা আশ্চর্য এক অচেনা পৃথিবীতে চলে যেতে থাকি।

P.A.

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

উচ্চতায় মাঝারি।

বর্ণে শ্যাম।

মুখশ্রী, কখনও ভয়াবহ, কখনও অম্লমধুর, কখনও প্রেম প্রোজ্জ্বল।

আচরণে, নেকড়ে বাঘ সদৃশ।

এবম্বিধ গুণসম্পন্ন মানুষটি মন্ত্রী না হয়ে অন্য কিছু হলে, বেমনান হত। বিধাতার আশীর্বাদে ইনিই মন্ত্রীই। এবং চুনোপুঁটি নয় বেশ ভারী মন্ত্রী। দপ্তর এঁর কটুকাটব্যে তটস্থ। ইনি স্বভাবে ব্লটিং পেপার সদৃশ। যে কোনও মুখের হাসি সহসা মুছে দিতে পারেন যেমন, তেমনি যে কোনও সংসারের ভিটেয় জোড়া ঘুঘু চরিয়ে দিতে পারেন। ইনি কখনও ঝরা কখনও খরা।

'আমায় ভয় পায়।' —এই ভেবেই তাঁর আনন্দ। 'আমি টেরিব্‌ল'। এই প্রসাদগুণেই ইনি সুখ্যাত। এ হেন একজন দুরন্ত মন্ত্রীর দপ্তরে শ্যামাচরণ পি এ হবার সৌভাগ্য নিয়ে আদি সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিল উনিশশো ছত্রিশ সালের কোনও এক মাসে। তখন সে জানত না তার ভাগ্যে কী লেখা আছে। যখন জানল তখন আর পালাবার পথ নেই। বঙ্কিমবাবু বি. এ. পাশ করে ডেপুটি হয়েছিলেন। শ্যামাচরণ বিশ্ববিদ্যালয় গুলে খেয়ে এ দপ্তরে হাত ফেরতা হতে হতে খোদ মন্ত্রীর দপ্তরে পি. এ. হয়ে বসেছে। সিনিয়ররা বললেন, বরাত তোমার ভাল হে শ্যামাচরণ। হলে খুব হবে, না হলে হেজে পড়বে। জিনিসটা বেশ ভালই। ট্যাক্‌ল করতে পারলেই টাকা না পারলেই ফাঁকা। সার্কাসের সেই তন্বী মহিলাটিকে স্মরণ কর, যে বীরাঙ্গনা সিংহের গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। এও সেই একই পদ্ধতি— টেমিং এ লিও।

সার্কাসের সিংহ আফিমের মৌতাতে থাকে। মন্ত্রী থাকেন ক্ষমতার টাটে। বিলিতি কোম্পানির ঘূর্ণায়মান ক্যাঁচোর ক্যাঁচোর চেয়ারে। গদির ওপর গদি। (পশ্চাদ্দেশ বড়ই স্পর্শকাতর)। সামনে অশ্বক্ষুরাকৃতি ডবল ডেকার টেবিল। ঝকঝকে, চকচকে। ব্রাসো দিয়ে মাজা পেতলের পেপারওয়েট, মুগুতোলা, সারি সারি। যেন ক্ষমতার বোতাম। মেজাজের মুরগি ঘড়ি। ঠকাস ঠকাস করে ঠুকে কাগজে চাপা দিলে অর্ডারলি পিওন বুঝতে পারে মালিক কাপুরের মেজাজ চড়ে আছে। টুকুস টুকুস করে নাড়াচাড়া করলে বুঝতে পারে মন্ত্রী মহোদয় এখন খেলোয়াড়ি মেজাজে আছেন। ঘরজোড়া নরম কার্পেট। পা ডুবে যায়। প্রিয়দর্শিনী টেলিফোনের সারি।

কখনও একটা বাজে, কখনও সবকটা কোলের শিশুর মতো কঁকিয়ে ওঠে। ফোন বাজার দাপট দেখলে দেশের পরিস্থিতি বোঝা যায়। যখন মৃদু মৃদু একটি বা দুটি রিরিরিং, রিরিরিং করে, তখন বুঝতে হবে বিরোধীরা শান্ত, লাশটাশ তেমন পড়ছে না, ঝাণ্ডা তেমন উড়ছে না, মিছিল রাজপথে তেমন পাক মেরে মেরে ঘরমুখো অফিসযাত্রীদের পাকদণ্ডীতে বেঁধে ফেলছে না, বিধানসভায় জুতো, ঝ্যাঁটা, লাথি চলছে না। শিবিরে শিবিরে বিরাজ করছে সমঝোতার শান্তি। ফোন তখন প্যানের প্রেমের বুলি। কিন্তু লাল, গোলাপি, নীল সবকটাই যখন তেড়েফুঁড়ে বাজতে থাকে, যখন এ কানে একটা, ও কানে একটা, দু কাঁধে দুটো সরব সপ্তগ্রামে, তখন বুঝতে হবে গেল গেল অবস্থা। গদি করে টলটল পাসরাতে ওঠে জল।

আজ সেইরকম একটা দিন। মন্ত্রীর কানে লাল টেলিফোন। তিনি খ্যাসখ্যাসে গলায় ও প্রান্তের মানুষটিকে বেজায় ধমকাচ্ছেন। কথায় সামান্য গ্রাম্য টান। সেই টানটাকে সযত্নে ধরে রেখেছেন কারণ তিনি মনে করেন—তিনি জনতার প্রতিনিধি। ঠাণ্ডা ঘরে কাচ মোড়া টেবিল টাট সাজিয়ে বসে থাকলেও তিনি আছেন মৃত্তিকার কাছাকাছি তাঁদের সেবক, দাসানুদাস হয়ে।

মন্ত্রী বলছেন, 'দাঁত মেলছ মনে হচ্ছে। (ও প্রান্তে যিনি, তিনি বোধহয় হেঁ হেঁ হাসির ভাব এনেছিলেন কথায়। ডাক্তারি ভাষায় এ ব্যাধিকে বলে গ্রেট ম্যান প্রকসিমিটি রিফ্লেকস। অনেকের যেমন বাইরে যাবার নাম শুনলেই নিম্নবেগ আসে। বড় মানুষের সামনা সামনি হলেই অনেকে অজান্তেই হাত কচলাতে থাকেন আর গলা দিয়ে হেঁ হেঁ করে বিচিত্র শব্দ ক্ষেপণ করতে থাকেন। মুখের চেহারা হয়, কুমোরের তৈরি কাঁচা মুখ মাটিতে জোর করে থেবড়ে বসিয়ে দিলে যেরকম হবে সেই রকম) ওই দাঁত আমি একটা করে খুলে স্যাপারেট পার্সেল করে তোমার বউয়ের কাছে পাঠিয়ে দেব হারামজাদা! মালা করে পরবে। মানকে! মানকে বড় না আমি বড় শুয়োর?' মন্ত্রী সেই ভদ্রসন্তানকে শুয়োর বলে ঝপাং করে ফোন ফেলে দিয়ে পায়ের কাছে বোতামে চাপ দিলেন।

শ্যামাচরণের মাথার ওপর লাল আলো দুরুদুরু করে জ্বলে উঠল। শ্যামাচরণ স্টেনোর সঙ্গে সঙ্গে হেসে কথা বলছিল। হাসি ফিউজ হয়ে গেল। পেটে মৌরলা মাছের ঝোল পাক খেয়ে উঠল, অ্যাকোরিয়ামের মাছের মতো। (শ্যামাচরণ হালে বিয়ে করেছে। নতুন বউ স্মৃতি বাড়াবার জন্যে ইদানীং এই বঙ্গসন্তানটিকে মৌরলা মাছের ঝোল সেবন করাচ্ছেন। মন্ত্রীর পি.এ.। ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে স্মৃতি আর শ্রুতির ওপর। মন্ত্রীর নেকনজরে হয় প্রোমোশন না হয় লিকুইডেশান। এখন স্বামী আমার রং চটা পতপতে তেরপল ঢাকা জিপে চেপে অফিস যায়। মই বেয়ে আর একটু উঠতে পারলেই মোটরগাড়ি। ফোন হবে, ফ্রিজ হবে, ট্যুর হবে, টি.এ. হবে।)

শ্যামাচরণ হিলহিলে ঠাণ্ডা ঘরে ঢুকল। মন্ত্রী তখন দু-দাঁতের মাঝে একটা টুথপিক ধরে তিরতির করে নাচাচ্ছেন। টেবিলের ওপর হাতের চেটো আঙুল নিয়ে খেলছে। শ্যামাচরণ ঢুকতেই মন্ত্রী টেনে টেনে বললেন, 'শুয়োরের বাচ্চা।'

শ্যামাচরণ বলল, 'ইয়েস স্যার।' (কেরিয়ার গাইড বলছে— ডোন্ট প্রোটেস্ট এ মিনিস্টার। অ্যাকসেন্ট এভরিথিং অ্যাজ অমৃতং বাল/ মন্ত্রী ভাষিতং)

মন্ত্রী বললেন, 'বাঁশ দেব। আছোলা বাঁশ।'

শ্যামাচরণ: 'ইয়েস স্যার।'

মন্ত্রী : 'দিল্লি থেকে বাঁশ আনব।'

শ্যামাচরণ : 'ইয়েস স্যার।'

মন্ত্রী: 'ইউ আর এ ফুল।'

শ্যামাচরণ : 'ইয়েস স্যার।'

মন্ত্রী : 'আজই আমি দিল্লি যাব।'

শ্যামাচরণ : 'ইয়েস স্যার।' (কেরিয়ার গাইড বলছে, ট্যাকল এ মিনিস্টার উইথ লিমিটেড ভোকাব্যুলারি। প্লে ক্লেভারলি উইথ টু ওয়ার্ডস —ইয়েস অ্যান্ড স্যার। প্লেস ইট বিফোর প্লেস ইট আফটার, পাঞ্চ ইট দেয়ার, অ্যাজ অফন ইউ গেট ইওর চানস। হোয়েন ইউ লিভ দেয়ার শুড রিমেন নাথিং বাট ইয়েস অ্যান্ড স্যার।)

মন্ত্রী : 'কীসে যাব?'

শ্যামাচরণ : 'প্লেন নয় স্যার ট্রেনে।'

মন্ত্রী : 'কেন ট্রেনে।'

শ্যামাচরণ : 'অ্যাস্ট্রলজার অ্যাডভাইস করেছেন স্যার, প্লেনে স্যার গেলে স্যার অ্যাকসিডেন্ট হবে স্যার।'

মন্ত্রী : 'রাজধানীর টিকেট চাই। দাঁড়িয়ে আছ কেন? যাও, এখুনি জোগাড় করো (সুর করে)। ইডিয়েট।'

শ্যামচরণ : 'ইয়েস স্যার।'

প্যান্টটাকে ভুঁড়িতে বেলট ধরে টাইট করে শ্যামাচরণ চু কিত কিত করে ছুটল রাজধানীর টিকিট জোগাড়ে। ভি.আই. পি. কোটা বললেই তো হল না, ভি. আই. পি-র সংখ্যা কম নাকি? একটা ট্রেন অনেক ভি.আই. পি। শ্যামাচরণের মন্ত্রী, অন্যের তো তিনি মন্ত্রী নন। হুঁ কেয়ারস হুম? তোমার মন্ত্রী। তুমি মাথায় করে দিল্লি নিয়ে যাও। এ যেন তোমার বউ তুমি ম্যাও সামলাও। শ্যামাচরণ অতি কষ্টে, কান ধরে ওঠ বোস করে পাঁচটা সিমেন্টের টোপ ফেলে একটা টিকিট ম্যানেজ কর। কেরিয়ার গাইড বলছে, স্ত্রীকে এবং মন্ত্রীকে জীবন দিয়েও সন্তুষ্ট রাখবে। আর প্রমিস? প্রমিস ইজ এ থিং হুইচ ইও আর নেভার একসপেকটেড টু ফুলফিল। মন্ত্রীদের কেরিয়ার তো অঙ্গীকারের শত শত মৃত স্তূপের ওপরেই হাসছে, খেলছে, ভাঙছে, জুড়ছে।

মন্ত্রী বললেন, 'টিকিট পেয়েছ?'

শ্যামাচরণ : 'পেয়েছি স্যার।'

মন্ত্রী : 'সিকিউরিটিকে জানিয়ে রাখো। আমার ব্যাগেজ রেডি করো।'

(জনতার সেবক হলেও, জনতা মন্ত্রীর, সেবক নাও হতে পারেন। হাতের কাছে হ্যান্ডি কিছু পেয়ে ছুঁড়ে মেরে দিতেও পারে। ক্ষতি তো দেশেরই হবে। মন্ত্রীর আর কী? তিনি মরে ভূত হবেন। কে বলে, মন্ত্রীর উপদ্রবের চেয়ে ভূতের উপদ্রব ভাল। তাদের কোনও ধারণা নেই।) শ্যামাচরণের আছে। সে দেখেছে কোনও মন্ত্রী তাঁর পি.এ-কে মনে মনে অথবা

সশব্দে একশো আট বার মনুষ্যেতের প্রাণীতে সম্বোধন করলেই একটি প্রোমোশান। তার অর্থ কী তা হলে, দুধ মেরে যেমন ক্ষীর, পশুত্ব ঘন হলেই একচি উচ্চপদ। শ্যামাচরণ চা খেয়ে চেয়ারে চিতিয়ে পড়ল। ভুঁড়িটা এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

এদিকে বেলা বাড়ছে। আকাশে ঘন মেঘ। এল বুঝি বৃষ্টি। লাঞ্চের সময় শুরু হল শহর ভাসানো বৃষ্টি। মন্ত্রী আর পি. এ. যখন রাস্তায় নামলেন তখন রাজপথের যা অবস্থা তাতে আর মোটর নয় স্পিডবোট চলতে পারে।

মন্ত্রী তাল ঠুকে বললেন, 'তোমাদের ষড়যন্ত্র।'

শ্যামাচরণ ইয়েস স্যার বলতে গিয়েও সামলে নিল, 'নো স্যার।'

মন্ত্রী : 'তোমরা জানতে আমি আজ দিল্লি যাব।'

শ্যামাচরণ : 'ইয়েস স্যার।'

মন্ত্রী : 'তবে নো স্যার বললে কোনও আক্কেলে। অ্যাঁ! খোদার খাসি।'

শ্যামাচরণ : 'ইয়েস স্যার।'

মন্ত্রী : 'তোমরা আমাকে স্টেশনে পৌঁছে দেবে। যেভাবেই হোক। আই মাস্ট ক্যাচ দি ট্রেন।'

মন্ত্রী উঠলেন গাড়িতে। পেছনে আসনে তিনি। সামনে সিকিউরিটি আর পি.এ, শ্যামাচরণ। গাড়ি চলেছে স্টেশনের দিকে। মন্ত্রী ড্রাইভারকে ধমকেছেন, 'ট্রেন যদি ধরাতে না পারিস তোকে আমি বিরোধী বলে বরখাস্ত করব। ষড়যন্ত্র। আই নো হু আর বিহাইন্ড দিস। এর পিছনে আমার দলের ফ্যাকসান আছে আর আছে অপোজিশান।'

ড্রাইভার মনে মনে বললে, 'সব করবি শ্লা। আজ আছিস কাল নেই।'

শ্যামাচরণ বললে, 'অপোজিশান হল ঈশ্বর স্যার।'

মন্ত্রী শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা জপ কবতে করতে পুরমন্ত্রীর মুণ্ডুপাত করতে লাগলেন। জপাৎ সিদ্ধি। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর মনে হল সারা শহরে এক হাঁটু নোংরা জলে থইথই করছে পালপাল শূকর। একটা দাড়িওলা শূকর একটা লবি চালিয়ে তার সামনে তার গাড়ির সামনে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে।

মন্ত্রী ড্রাইভারকে বললেন, 'সাইরেন লাগাও।' হঠাৎ তাঁর মনে হল, গাড়ির সামনে পতাকা লাগানো হয়নি। হোয়াই। ষড়যন্ত্র। শ্যামাচরণ! গো। গেট দি ফ্ল্যাগ। রাসকেল।

ভগবান বাঁচালেন। ফ্ল্যাগ গাড়িতেই ছিল। এক কোমর জলে নেমে শ্যামাচরণ পতাকা দণ্ডে পতাকা পরালেন। ঘন ঘন সাইরেন, দণ্ডে জলে ভেজা পতাকা, মন্ত্রীর শূকোরোক্তি, সিকিউরিটির চড়চাপড় কোনও কিছুতেই জ্যাম খুলল না। মন্ত্রী মনে মনে তিনজন ব্যক্তিকে বরখাস্ত করে ফেললেন। তার মধ্যে সাদা বর্ষাতি মোড়া ট্র্যাফিক পুলিশটিও পড়ল। পুরমন্ত্রী যে তাঁর অ্যান্টি গ্রুপে সে সত্যটিও জলমগ্ন রাস্তায় গাড়িতে বসে তাঁর খেয়াল হল। মনে মনে বললেন, আই উইল সি। সি শব্দটি মনে আসতেই হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন। আর মাত্র পঁচিশ মিনিট। 'শ্যামাচরণ?'

'ইয়েস স্যার।'

'নেমে পড়ো।'

শ্যামাচরণ জলে নামল। নেমেই বুঝল চাকরির জল কত ঘোলা।

'মন্ত্রী— দৌড়োও। তুমি দৌড়ে গিয়ে ট্রেন ধরে রাখো। গার্ডকে বলো মিনিস্টার আসছেন। গো ও।'

শ্যামাচরণ সেই হাঁটু জলে হাঁচর-পাঁচর করে দৌড়তে শুরু করল। উঃ, ভুঁড়িটাই এখন দেখছি কাল হল। লরির ফাঁক গলে, ট্রামের পাশ দিয়ে, রিকশার ফাল গলে, খানাখন্দ পেরিয়ে পি. এ. ছুটছে।

হাওড়া স্টেশন। গার্ড সায়েব বাঁশি মেরেছেন। পতাকা পটাপট করছে। ট্রেন ছাড়ল বলে। কাকভেজা একটি লোক ইঞ্জিনের চেয়েও বেশি হাঁপাতে হাঁপাতে সটান তাঁর পায়ে এসে পড়ল।

শ্যামাচরণ : 'স্টপ স্টপ, মিনিস্টার ইজ কামিং।'

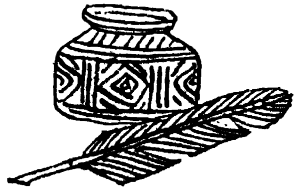
গার্ডসায়েব তলায় পড়ে থাকা মানুষটিও দেখলেন। প্ল্যাটফর্মেও পুলিশের আয়োজন ছিল যেহেতু মন্ত্রী যাবেন। শ্যামাচরণ জ্ঞান হারাবার আগে পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'বাঁচান, গাড়ি থামান, মন্ত্রী আসছেন আমি তাঁর পি.এ.।'

গাড়ি লেগেই রইল। পুলিশ তৎপর হলেন। আসছেন তিনি আসছেন। কামরায় কামরায় অসন্তুষ্ট যাত্রী। কে হরিদাস পাল। অবশ্য তাঁরা জানতেই পারলেন না, কেন ট্রেন ছাড়ছে না। গার্ড সাহেব বললেন, 'টেকনিক্যাল প্রবেলম।'

হঠাৎ পুলিশবাহিনী সজাগ হয়ে অ্যাটেনশানের ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন। একটি মাঝারি উচ্চতার পাজামা-পাঞ্জাবি পরা মানুষ গটগট করে এগিয়ে এসে প্ল্যাটফর্মে ঢুকলেন। পি.এ. শ্যামাচরণ সবে তখন জ্ঞান ফিরে পেয়েছেন। শীতে কাঁপতে কাঁপতে ফাইলে নোট লেখার ভাষায় বললে, 'ডান স্যার অ্যাজ ডাইরেকটেড।'

মন্ত্রী চলমান গাড়ির জানালা থেকে স্নেহের গলায় বললেন, 'আই উইল সি।'

উপসংহার : সত্যিই তিনি দেখেছিলেন। শ্যামাচরণ মাছের মতো জল কাটতে পারে। হ্যাজ প্রুভড ইট। শ্যামাচরণকে মৎস্য বিভাগের উচ্চপদে রেখে মন্ত্রী 'উইল সি' করলেন। শ্যামাচরণ দম্পতি সেই প্রবাদবাক্যের বিপরীত উদাহরণের মতো, লেখাপড়া শিখেও মৎস্য ধরিতে লাগিলেন এবং সুখে খাইতে লাগিলেন দীর্ঘকাল। আর মন্ত্রীমহোদয় নির্বাচনে গভীর জলে তলাইয়া গেলেন।



কাঁঠালকাঠের পিঁড়ি

তারাপদ রায়

আমাদের গ্রামের বাড়ির সামনে দিয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের, মানে তৎকালীন পঞ্চায়েতের রাস্তাটা ছিল খুব নিচু। সেটা ছিল ইংরেজরা যাকে বলে ফেয়ার ওয়েদার রোড। অর্থাৎ, ভালো আবহাওয়ায় ব্যবহার করা যায়। অন্য সময়ে জল-কাদার জন্যে যাতায়াত কঠিন। তবে, বর্ষাকালে ধলেশ্বরীর জল ওই রাস্তা দিয়ে ঢুকে যেত। রীতিমতো স্রোত। নৌকো চলে যেত ওই রাস্তা ধরে। তখন আমাদের গ্রাম হয়ে উঠত ভেনিস শহরের মতো। প্রত্যেক বাড়ির উঠোনে একটি করে নৌকো। এ বাড়িও বাড়ি যাতায়াত হত নৌকোয়। বাজারে, ইস্কুলে যেতে হলে নৌকো ছাড়া গতি নেই।

আমাদের বাড়ির সদরে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার পাশ ঘেঁষে একটা প্রাচীন কাঁঠালগাছ ছিল। বর্ষাকালে যখন খাল দিয়ে নৌকো চলাচল শুরু হত, ওই কাঁঠালগাছটার গুঁড়ির সঙ্গে নৌকো এসে বাঁধত। আমাদের বাইরের বাড়ির সামনের অংশটুকুর নামই হয়ে গিয়েছিল কাঁঠালঘাট। কেউ কেউ বলত, মান্ধাইঘাট।

আমাদের টাঙাইল জেলার উত্তরে মধুপুরগড়ে আদিবাসী মান্ধাইদের বাস। মকাই, রাঙাআলু, কাঠ, টিয়াপাখি আর কাঁঠাল নিয়ে আসত মান্ধাইরা আমাদের এলাকায়। এইরকমই একটা কাঁঠালের বিচি থেকে আমাদের কাঁঠালঘাটের গাছটা জন্মেছিল অনেককাল আগে। সাধারণত পাহাড়ি অঞ্চলের গাছ সমতলে জন্মাতে বা বাড়তে চায় না। কিন্তু এই গাছটা জন্মেছিল এবং মহীরূহের চেহারা নিয়েছিল। খুব উঁচু নয়, কিন্তু বিশাল চওড়া। ঘন কালো পাতায় ছাওয়া গাছটিকে দেখলে মনে হত ওর নীচে দু-দণ্ড বিশ্রাম করি। বিশাল গোল গুঁড়ি, ডালে ডালে নানা জাতের পাখির বাসা। একসঙ্গে কাঁঠাল হত তা অন্তত হাজার খানেক। একেবারে গাছের গোড়া থেকে গুঁড়ি ঘিরে ছোট ছোট খাজা কাঁঠাল।

আমরা তো সারা বছরই শহরের বাড়িতে থাকতাম। গ্রামের বাড়িতে থাকতেন ঠাকুরদার বিধবা খুড়িমা। তিনি মন্দির-বিগ্রহ জমি-জিরেত ইত্যাদি প্রবল প্রতাপে দেখাশুনো করতেন। তাঁর কথা অমান্য করার লোক আমাদের সংসারে বা আশেপাশে কেউ ছিল না।

সে-বছর খুব বর্ষা হয়েছিল। আমরা শহর থেকে রথের মেলায় গিয়েছিলাম। আমি দাদা আর মা। ঠাকুরদা আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন। সঙ্গে সহায়িকা ছিলেন আন্নামা নামে আমাদের এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়া, বিধবা, আমাদের বাড়িতেই থাকতেন, কাজকর্ম করতেন।

সেবার রথ পড়েছিল সপ্তাহের শেষে। ঠাকুরদা ঠিক করেছিলেন আমাদের সবাইকে নিয়ে রথের মেলার পরে গ্রামের বাড়িতে রাত্রিবাস করে পরের দিন থেকে, সন্ধেবেলা ফিরবেন। আমাদের বাড়ি থেকে রথের জায়গাটা ছিল মাইল পাঁচ-ছয় দূরে। আর, সেখান থেকে আমাদের গ্রাম ছিল আরও ছয় মাইল দূরে।

রথের মেলা থেকে প্রচুর ফজলি আম, ধামাভর্তি বিন্নি ধানের খই আর চিনির মঠ, কিছু গৃহস্থালির জিনিস, বঁটি, দা, বেতের ধামা — এইসব কিনে আমরা সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় মান্ধাইঘাটে পৌঁছলাম। জলে টইটুম্বুর গ্রামে মান্ধাইঘাট ও তার পিছনের মন্দির-উঠোন, বাসাবাড়ি— এগুলিই যা একটু কচ্ছপের পিঠের মতো উঁচু হয়ে রয়েছে। ঘাটে নৌকোর গাদাগাদি ভিড়।

আমরা পৌঁছতেই মালিকের নৌকো দেখে সবাই নিজেদের নৌকোগুলো একটু একটু সরিয়ে ঘাট পর্যন্ত আসার জায়গা করে দিল। আমরা ঠিক সময়ে এসেছিলাম। আমরা নামতে নামতে প্রচণ্ড বেগে ঝড় এল। মন্দিরের চাতালে দু-এক জন লোক প্রসাদ খাচ্ছিল। তারা দৌড়ে ছুটে গিয়ে মন্দিরের মধ্যে আশ্রয় নিল। আমরাও তাড়াতাড়ি উঠোনটুকু পেরিয়ে আমাদের কোঠাবাড়ির বারান্দায় উঠলাম। খুড়িঠাকুমা লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভেতরের বড় ঘরটায় একটা ছোট হ্যাজাক জ্বলছে।

এ বাড়িতে এক সময় পঁচিশ-তিরিশ জন লোক থাকত। বড় বড় তক্তাপোশ, এক-একটায় চার-পাঁচজন শুতে পারে। ঘরে ঢোকার পর মা ঠাকুরদাকে বললেন, 'রথের মেলার জিনিসপত্র সবই তো নৌকোয় রয়ে গেল।'

ঠাকুরদা বললেন, 'নৌকো দড়ি ছিঁড়ে যদি ভেসে না যায়, তবে এই ঝড়ে কিছু হবে না; তা ছাড়া, নৌকোয় মাঝিরা তো আছে।'

সাধারণত, ভরা বর্ষায় কখনও তেমন ঝড় হয় না। কিন্তু আমাদের ওখানে আষাঢ়-শ্রাবণে কখনও কখনও হঠাৎ প্রবল ঝড় হত।

সেদিন সেই ঝড় গভীর রাত পর্যন্ত ছিল সব চেয়ে আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে ঝড় থামার পরে। তখনও বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি থেমে থেমে পড়ছিল। রাতে মা খুড়ি ঠাকুমার সঙ্গে পাশের ঘরে শুল। আমি, দাদা আর ঠাকুবদা বড় ঘরটায় শুলাম। তার আগে আমি আর দাদা গাছপাকা মর্তমান কলা আর ফজলি আম দিয়ে দুধভাত খেয়েছি। দুধভাত অবশ্য আমাদের নিয়মিত নৈশ খাদ্য ছিল। অন্যেরা তাজা ইলিশমাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেয়েছিল।

তখন ধলেশ্বরীতে প্রচুর ইলিশ। আমার মা খুব ইলিশ ভালোবাসতেন। ঠাকুরদা তো সন্ধ্যার পর প্রায় কিছুই খেতেন না। বাতাসা কিংবা হাল্কা দুধ খই দিয়ে খেতেন।

বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ মাঝরাতে প্রচণ্ড শব্দে আর একটা ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙল। মান্ধাইঘাটে মানুষদের আর্ত চিৎকার। কয়েকশো পাখির সমবেত কলরব। গ্রাম্য কুকুরের গর্জন। ঘটনাটা কী, আমরা বুঝবার আগে ঠাকুরদা বললেন, 'ভূমিকম্প'।

একটু পরে ঘাটের মাঝিমাল্লারা কোঠাবাড়ির বারান্দায় উঠে এল। আমরা বেরোতে গিয়ে

দেখি সামনের দরজা খোলা যাচ্ছে না। পিছনের দরজা খুলে উঠোন ঘুরে বাইরে আসতে দেখি বিশাল কাঁঠাল গাছটা মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

তাড়াতাড়ি হাত-দা এনে সামনের ঘরের দরজার মুখের ডালপালাগুলো কেটে সরিয়ে দিয়ে বেরোনোর রাস্তা করা হল। খুড়ি ঠাকুমা কিন্তু নির্বিকার। মার কাছে শুনেছি, প্রথম শব্দটা হওয়ার পরে তিনি নির্বিকারভাবে মালা জপা শুরু করেন অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। এবং মাকে ইশারায় তাঁর পাশে বসতে বলেন।

গ্রামসুদ্ধ লোক ওই গভীর রাতে ভিড় করে দেখতে এল এই সাংঘাতিক কাণ্ড। মান্ধাইঘাট থেকে আস্তে আস্তে নৌকোগুলো অন্যত্র নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে রওয়ানা হল। একটা নৌকোরও কোনও ক্ষতি হয়নি, কারণ গাছটা সামনের দিকে শুকনো ঘাট আর মন্দিরের চাতালের ওপর পড়েছিল। অল্পের জন্য মন্দির আর কোঠাবাড়ি বেঁচে গেছে। গ্রামের সবাই বলাবলি করছিল এই কাঁঠাল গাছটা তারা সবাই জন্ম থেকে দেখছে। কথাটা হয়তো পুরোপুরি সত্য নয়। কিন্তু লোকে এ রকম ভাবতে ভালোবাসে।

পর দিন লোকজন লাগিয়ে গাছের ডালপালা ছেঁটে পরিষ্কার করা হল। গ্রামের লোকেরা এসে একটা দুটো করে কাঁচা কাঁঠাল নিয়ে গেল।

ছাগল খুব কাঁঠালপাতা খেতে ভালোবাসে। এই বর্ষার মধ্যে বেলা হতে না হতে কোথা থেকে দু-তিনটে ছাগলও চলে এল কাঁঠালপাতা খাওয়ার জন্যে। শেষরাতে বৃষ্টি থেমে গেছে। ঠাকুরদা আমাকে আর দাদাকে নিয়ে একটা ডিঙিতে করে গ্রামের কিনারে গিয়ে মাঝিদের কাছ থেকে বড় বড় কয়েকটা ইলিশমাছ কিনে আনলেন। সে দিন দুপুরেও ইলিশমাছ।

ইলিশমাছের তেল দিয়ে ইলিশমাছের গাদা ভাজা, হালকা সরষে দিয়ে ভাপা ইলিশমাছের পেটি, ইলিশ পাতুরি, ইলিশমাছের ঝোলভাত, শোলাকচু দিয়ে ইলিশমাছের মাথা আর পাকা তেঁতুল দিয়ে ইলিশমাছের ল্যাজার টক—কিশোর রসনার সেই পরিতৃপ্তির স্বাদ আজও জিভে লেগে রয়েছে।

পর দিন ঠাকুরদার কাছারি খোলা। সুতরাং সন্ধ্যাবেলা রওয়ানা হতেই হল। আমরাও সঙ্গে ফিরলাম। তবে, আসার আগে একটা ব্যাপার ঘটল।

খুড়ি ঠাকুমা একটা গোলমাল পাকালেন। এ রকম তিনি প্রায়ই করতেন। তিনি ঠাকুরদাকে বললেন, 'ফলবান প্রাচীন বৃক্ষ সমূলে বাস্তুভিটায় উৎপাটিত হয়েছে। একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করতেই হবে। না হলে গৃহস্থের অমঙ্গল হবে।' খুড়ি ঠাকুমা পণ্ডিত বংশের কন্যা, দু-এক বার মৃদু প্রতিবাদ করার পর ঠাকুরদা অবশেষে রাজি হলেন। ঠিক হল, আশ্বিন মাসে পুজোর আগে আগে তিনি বাড়ির সবাইকে নিয়ে আসবেন। শান্তি-স্বস্ত্যয়নের আচার-আয়োজন, পুরোহিত এ সব যেন ঠিক করা থাকে।

আমাদের সেরেস্তার নায়েবমশাইকে ডেকে ঠাকুরদা টাকা-পয়সার কথা বলে দিলেন। আর এটাও ঠিক হল, ভাদ্রের শেষে গ্রামের হাটে ঢোল শহরত করে এই কাঁঠাল গাছটা নিলামে বেচা হবে। এটা দেবোত্তর সম্পত্তি। সব আইন মেনে চলতে হবে।

ঠাকুরদাই আশ্বিন মাসে শান্তি-স্বস্ত্যয়নের সময় এসে মন্দির-চাতালে নিলাম ডাকাবেন।

আমরা সেদিন সন্ধ্যার মধ্যে শহরের বাড়িতে ফিরে এলাম। আমি আর দাদা ফিরে

আসার পর প্রত্যহই দিন গুনতাম শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, নিলাম এ সব দেখতে যাওয়ার জন্যে। সেপ্টেম্বরের শেষে এক সপ্তাহ ধরে সেকেন্ড টার্মিনাল পরীক্ষা। তার কয়েকদিন পরে মহালয়া। মহালয়ার সময়েই আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই আবার চললাম গ্রামের বাড়িতে। এ বার আর নৌকোয় করে যাওয়া যাবে না। মান্ধাইঘাট গাছচাপা পড়ে আছে। তা ছাড়া, রাস্তা থেকে জল নেমে গেছে।

এবার বাবা, ঠাকুমা সবাই একসঙ্গে। তাছাড়া, কাজের লোক, রান্নার লোক, চারটে ঘোড়ার গাড়ি করে আমরা চারাবাড়িঘাটে গিয়ে সেখান থেকে স্টিমারে আমাদের গ্রাম এলাসিনে গেলাম। সেখান থেকে আমরা ছেলেরা পায়ে হেঁটে আর মা ও ঠাকুমা আর আন্নামা একটা পাল্‌কিতে করে বাড়িতে পৌঁছলাম।

আমাদের বাড়িতে অবশ্য দুর্গাপুজো হত না। মহালয়াও বিশেষ ভাবে কিছু হয় না। তবে বাড়িতে পৌঁছে দেখলাম সেখানে এলাহি কাণ্ড চলছে। মান্ধাইঘাটের কাঁঠালগাছের পারলৌকিক ক্রিয়া, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন এই সব নিয়ে।

পরদিন থেকে দেবীপক্ষ শুরু হবে। দেবীপক্ষের প্রথম দিনই কাঁঠালের আত্মার শান্তির জন্য যথাযথ শেষকৃত্যাদি করা হবে।

'কাঁঠালের আত্মা' কথাটায় বাবা ও ঠাকুরদা দু-জনেই কেমন ঘাবড়িয়ে গেলেন। কিন্তু খুড়ি ঠাকুমা সাধারণ লোক ছিলেন না। তাঁর নির্দেশ অমান্য করার সাহস কারও নেই। একটা প্রশ্ন উঠেছিল মান্ধাই কাঁঠালগাছের বয়স নিয়ে। প্রশ্নটা জরুরি, কারণ যত বয়স হয়েছিল তত পোয়া কাঁচা দুধ ওই গাছের গোড়ায় দিতে হবে।

গ্রামের কোনও লোক গাছটির সঠিক বয়স বলতে পারেনি। তাদের এক কথা, 'জন্মইস্তক দেখছি'।

অবশেষে অশীতিপর হাজি সামসুদ্দিন বললেন, ওই মান্ধাইঘাটে আগে একটা বাদামগাছ ছিল। ছোটবেলায় ওই গাছের নীচে অনেক হা-ডু-ডু খেলেছেন। তাঁর কথা মান্য করে ধরে নেওয়া হল গাছটির বয়স সত্তর। তার মানে সত্তর পোয়া বা সাড়ে সতেরো সের দুধ, এখনকার ষোলো লিটার সেই গাছের ভাঙা গুঁড়িতে ঢালা হল।

পরদিন শান্তি-স্বস্ত্যয়ন মিটতে বেলা তিনটে হয়ে গেল। বোঁটাসুদ্ধ বেগুনভাজা, বড় বোয়াল মাছের লাল ঝোল, খেঁসারির ডাল আর লাল চাল দিয়ে খিচুড়ি, শেষপাতে পোড়াবাড়ি থেকে নিয়ে আসা ছোট মৌচাকের মতো একটা করে চমচম দিয়ে মন্দিরের চাতালে কাঙালি ভোজন হল। সেই কাঙালি ভোজনের একপ্রান্তে লুকিয়ে-চুরিয়ে আমি আর দাদাও সব কিছু খেয়েছিলাম। এখনও বলি, সে অমৃত। দেশে-বিদেশে চিনে, মোগলাই, জাপানি, ইংলিশ, ফরাসি কত রকম হোটেল-রেস্তোরাঁয় কত রকম অখাদ্য, কুখাদ্য, সুখাদ্য খেলাম। জীবন্ত কেঁচো থেকে উটপাখির ডিমের ওমলেট, কিন্তু মান্ধাই কাঁঠালের শ্রাদ্ধের সেই ভোজ, তার স্বাদ এ জীবনে ভোলা যাবে না।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ নিলাম ডাকা শুরু হল। কাঁঠাল গাছের কাঠ, বিশেষ করে প্রাচীন গাছের, অতি মূল্যবান। খাট, পালঙ্ক, দরজা, জানলা, নৌকো, সাঁকো—সবকিছুতেই এর ব্যবহার। অত্যন্ত শক্ত কাঠ। টেকসইও বটে।

হাটে ঘোষণা করা হয়েছিল বলে নিলামের সময় বেশ ভিড় হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এরা সবাই কিনতে আসেনি। তারা নিলামের মজা দেখতে এসেছিল।

নিলাম পরিচালনা করেছিলেন ঠাকুরদা নিজে। বাবার ওখানকার গোমস্তাবাবু এ ধরনের কাজে অভিজ্ঞ বলে ঠাকুরদা তাঁরই সাহায্য নিয়েছিলেন।

আমরা, বাড়ির সবাই মন্দিরের বারান্দায় বসে নিলামের মজা দেখছিলাম। অত বড় কাঁঠাল গাছটির সর্বনিম্ন ডাক ধরা হয়েছিল দশ টাকা। সেখান থেকে ডাক শুরু; শেষ পর্যন্ত সাতাশ না আঠাশ টাকায় নদীর ওপারের এক ধনী কাঠ মিস্ত্রি গাছটা কিনে নেয়। তাদের কাজ ছিল তক্তাপোশ বানিয়ে নৌকোয় করে নদীর ধারে ধারে গিয়ে গ্রামের হাটের কাছে কয়েকটা তক্তাপোশ নামিয়ে বিক্রি করা। তারা লোকজন সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। দাম মিটিয়ে দেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই কুড়ুল দিয়ে গাছের গোড়া থেকে কেটে এবং ওপরের ডালপালাগুলো ছেঁটে রেখে দিল। ঠাকুরদা বলল, 'আমাদের লোক পাহারায় থাকবে। দু-এক দিন পরে মান্ধাইঘাটে একটা করাতকল বসিয়ে কাঠ চেরাই করে তারপর নৌকোয় করে কারখানায় নিয়ে যাব।'

'কোনও আপত্তির কারণ নেই', ঠাকুরদা বললেন, 'মান্ধাইঘাট তো খালি পড়ে আছে। শুধু যাওয়ার সময় ঘাটটা পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে।'

আমরা তো শহরের বাড়িতে চলে এলাম। যথাসময়ে কাঠ মিস্ত্রিরা কাঠ চেরাই করে নিয়ে গিয়েছিল।

বড়দিনের ছুটিতে গ্রামের বাড়িতে বাড়ি গিয়ে দেখছি, ওই যেখানে মান্ধাই কাঁঠাল গাছটি ছিল সেই জায়গাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা। তবে গাছের গুঁড়ি যেখানে কেটেছিল সেখানে ছোট ছোট কচি কাঁঠালপাতা গজিয়েছে। এই সময় খুড়ি ঠাকুমার মাথায় একটা খেয়াল চাপে। গাছের গুঁড়িতে শিকড়ের ওপরে বেশ আঙুল দুই-তিনেক কাঠ রয়েছে যেটা কাঠমিস্ত্রিরা নিয়ে যায়নি। খুড়ি ঠাকুমার মাথায় খেয়াল চাপল এই কাঠের চাকাটা বার করে চৌকো করে কেটে একটা বিশাল পিঁড়ি বানাবেন। যে-পিঁড়িতে বড় খোকন আর ছোট খোকন অর্থাৎ আমি আর দাদা, পাশাপাশি বসে খেতে পারি।

খুড়ি ঠাকুমার হাতে বেশ কিছু নিজের টাকা সব সময় থাকত। সেটা তাঁর বাপের বাড়ির টাকা। সেখানে একটা আমবন তাঁর বাবা বিধবা মেয়ের নামে লিখে দিয়েছিলেন। প্রত্যেক বছর পুজোর সময় সেই আম বিক্রির টাকা তাঁর কাছে পৌঁছত। সে টাকা সবটাই তিনি জমাতেন, আর আমাদের বাড়ির টাকা খুব টিপে টিপে খরচ করে সব সময় তাঁর হাতে কিছু থাকত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য খামখেয়ালি করে প্রায় সব সময়ই এই সমস্ত টাকা উড়িয়ে দিতেন।

মান্ধাই কাঁঠালের কাঠ দিয়ে পিঁড়ি বানানোর বুদ্ধি খুড়ি ঠাকুমার মাথায় খেলে যাওয়ার পরে তিনি ছুতোর মিস্ত্রি আনলেন। তারা চৌকো ছিমছাম করে পিঁড়িটিকে দাঁড় করাল। সে এক বিশাল ব্যাপার। তিন ফুট বাই আড়াই ফুট। দেখলে মনে হয় ঘরের ছাদ।

এর পর খুড়ি ঠাকুমা নিজে গিয়ে কাগমারিতে সূত্রধরপাড়ায় পিঁড়িটা নিয়ে গিয়ে একটা বিখ্যাত কাঠের কারিগরকে তাঁর মনোমতো নির্দেশ দিলেন, — চার ধারে বর্ডার হবে,

মধ্যিখানে বিরাট একটা পদ্মফুল, তার দু-পাশে দুটো পাতা।

এক সপ্তাহের মধ্যে দু-বার তদারকি করে গেছেন খুড়ি ঠাকুমা। তৈরি হওয়ার পরে তিনি আবার নির্দেশ দিয়ে দুটি পাতার দু-পাশে বড় খোকন আর ছোট খোকন লিখিয়ে নিয়েছিলেন। কাঠ কেটে কেটে লেখা। কাঠ কেটে কেটে ফুল, পাতা, বর্ডার। অসামান্য কারুকাজ। লোকগুলোর যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা ছিল। এক পুরুষ আগে সন্তোষের রাজবাড়ি তৈরি হওয়ার সময় তাদের দিয়ে আসা হয়েছিল। সেই থেকে আমাদের পাশের গ্রাম কাগমারিতে থেকে গেছে ওরা।

এর পর মহোৎসব, যাকে বলে মোচ্ছব হল মকর সংক্রান্তির দিনে। আমাকে আর দাদাকে পিঁড়ির ওপর পাশাপাশি বসিয়ে খুড়ি ঠাকুমা ভাইফোঁটার মতো করে কপালে চন্দনের ফোঁটা দিলেন। প্রদীপ জ্বালিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে আমাদের অভিষেক হল।

পিঁড়িটা আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে শহরের টাঙ্গাইলের বাড়িতে চলে এল। আমি আর দাদা দুজনে অবশ্য একসঙ্গে কখনওই বসিনি। তবে গয়না-বাড়ি, আমসত্ত্ব বানাবার কাজে ওই কাঠের ফুলপাতা খুব কাজে লাগাত। ছাদে রোদ্দুরে শুকিয়ে নিলেই সুন্দর ফুটে উঠত ফুলকাটা ডালের বড়ি, পাতাকাটা আমসত্ত্ব।

বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়ে আমাদের টাঙ্গাইলের বাড়ি লুঠ হল। তখন আমরা অবশ্য কলকাতায়। বাবা-মা, দাদাও যুদ্ধের সময়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। বড় বড় আলমারি, খাট সব লুঠেরারা নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পিঁড়িটা ছাদে ছিল বলেই হয়তো তাদের নজর এড়িয়ে গিয়েছিল।

যুদ্ধের পর বাড়িতে ফিরে গিয়ে বাবা মা সামান্য যা কিছু পেয়েছিলেন তার মধ্যে পিঁড়িটাই মূল্যবান। দাদা পিঁড়িটা ফেরত পেয়ে এত খুশি হয়েছিল যে, শোয়ার ঘরে ওর মাথার কাছে পিঁড়িটা রাখত।

বছর চারেক পরে বাবার কাছ থেকে খুব জরুরি খবর পেয়ে আমি, আমার ছেলে তাতাইকে নিয়ে টাঙ্গাইলের বাড়িতে গেলাম। দাদার শেষ অবস্থা, মৃত্যুশয্যায়। পাগলের ছন্নছাড়া জীবন, চল্লিশ বছর বয়েসেই আশি বছরের চেহারা হয়েছে। আমাদের দেখে খুশি হল। তাতাইকে বলল, 'আয়, নিজের বাড়িঘর, জমি-জমা ভালো করে চিনে নে।'

এগুলো অবশ্য অবান্তর কথা। এর পরে দাদা একটা পুরনো মোক্ষম রসিকতা করল তাতাইয়ের সঙ্গে। বলল, 'আমার তো কিছু নেই তোকে দেওয়ার জন্য, কিন্তু তোকে একটা জিনিস দেব, সাতপুরুষ বসে খেতে পারবে।'

রসিকতাটা অনেকেই জানেন। বহুকালের পুরনো। একালে অবশ্য চলে না। একালে তো সকলেই চেয়ার-টেবিলে ভাত খায়। সেই যে কালে মানুষ কাঠের পিঁড়িতে বসে ভাত খেত, এ রসিকতা সেই সময়কার।

এক বৃদ্ধ তাঁর প্রত্যেক আত্মীয়কে বলেছিলেন, 'তোকে এমন একটা জিনিস দেব, সাত পুরুষ বসে খাবে।'

জিনিসটা আর কিছুই নয়, পিঁড়ি। মেঝেতে বসে খাওয়ার পিঁড়ি, ঠিকমতো রাখলে সাত পুরুষ বসে খেতে পারবে।

তাতাইকে গল্পটা বুঝিয়ে বলায় তাতাই খুব হাসল। দু-দিন পরে দাদা মারা গেল। শ্রাদ্ধ-শান্তি হয়ে যাওয়ার পর আমরা কলকাতায় ফিরলাম। আসার সময় তাতাই পিঁড়িটা সঙ্গে নিয়ে নিল। আমরা ঢাকা হয়ে এক ক্ষমতাবান বন্ধুর গাড়িতে সড়কপথে সীমান্ত পর্যন্ত এসেছিলাম। শুল্ক দপ্তর বা পুলিশ আটকায়নি, শুধু বনগাঁয়ে রিকশাওয়ালা পিঁড়িটার জন্য পাঁচ টাকা বেশি নিয়েছিল।

কলকাতার বাড়িতেও পিঁড়িটা তেমন ব্যবহার হয়নি। তাতাইয়ের ঘরে বইয়ের আলমারির পাশে পিঁড়িটা কাত করে রাখা আছে।

বহুদিন হয়ে গেল তাতাই বিদেশ গেছে, সেও প্রায় দুই দশক হয়ে গেল। বৎসরান্তে এক-আধবার আসে, পারলে আমরাও যাই। বছর দুয়েক আগে সে একটি ইতালি দেশীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করেছে। দুটি যমজ কন্যা হয়েছে। আমরা তাদের গিয়ে দেখে এসেছি।

ফিরে আসার পর আমার দুই সুন্দরী পৌত্রী আমার শয়নে-স্বপনে সব সময় অবস্থান করছে। অথচ, তাদের বিহনে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

এর মধ্যে একটা নিমন্ত্রণ পেলাম আমেরিকা থেকে। অল্প দিন আগেই সে দেশ থেকে ফিরেছি, তবু নাতনিদের টানেই বোধহয় আবার গেলাম।

আমেরিকায় দুটো বত্রিশ কেজি ওজনের লাগেজ নেওয়া যায়। আমার একার আর কত লাগেজ লাগবে। একটা সুটকেসে আমার জামা-কাপড়, কিছু খাবার-দাবার, চিঁড়ের মুড়ির মোয়া, কড়াপাকের সন্দেশ, নাতনিদের জন্যে পোশাক এইসব নিলাম। আর দ্বিতীয় লাগেজটার জায়গায় নিলাম মান্ধাই পিঁড়িটা।

ভেবেছিলাম বিমানবন্দরে আপত্তি করবে, কিন্তু শুল্ক বা অভিবাসন, এমন কী বিমান কোম্পানি কোনও আপত্তি করল না, জিনিসটা আমার সঙ্গেই প্লেনে তুলে দিল। কিন্তু সানফ্রান্সিসকো গিয়ে পিঁড়িটা খুঁজে পেলাম না। আমার ব্যাগ এল, আরও সকলের জিনিসপত্র এল, কিন্তু আমার সেই মান্ধাই পিঁড়ি, সেটা কোথাও নেই।

বিরাট বিমানবন্দর, কোথায় কাকে কী বলি, শেষে এক মেমসাহেবকে ধরে কথাটা বললাম। তাকে বোঝাতে রীতিমতো কষ্ট হল জিনিসটা ঠিক কী। সাহেব-মেমরা কোনওদিন পিঁড়িতে বসেনি। তারা সাদামাটা মেঝেতে বসেছে, চেয়ারে বসেছে, টুলে বসেছে, বক্সে বসেছে, সোফায় বসেছে কিন্তু পিঁড়ির ব্যাপার সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই।

কিছু বুঝতে না পেরে মেমসাহেব আরও দু-চার জনকে সংগ্রহ করল। সবাই মিলে মাল আসবার কনভেয়র বেল্ট এমন ভাবে অত বড় জিনিসটাকে খুঁজতে লাগল যেন আলপিন খুঁজছে। কিন্তু অত তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কিছু হল না। আমার মান্ধাই পিঁড়ি সানফ্রান্সিসকো অবধি পৌঁছয়নি, কিংবা পৌঁছলেও বিমানের পেটে থেকে গেছে। অবশেষে সবাই মিলে আমাকে সান্ত্বনা দিল, হয়তো সিঙ্গাপুরে বিমান বদলের সময় এ দিক-ও দিক হয়ে গেছে, দু-এক দিনের মধ্যে এসে যাবে।

আমি ছেলের বাড়ির ঠিকানা রেখে গেলাম। এবং প্রতি দিন দু-বেলা ফোনে খবর নিতে লাগলাম। কিন্তু কাঁঠাল কাঠের পিঁড়িটা উদ্ধার হল না। মহাশূন্যে কোথায় কোন বিমানে পৃথিবীর কোন দূর দেশে এক গ্রাম্য কারিগর-অলঙ্কৃত মান্ধাই কাঁঠাল কাঠের সেই পিঁড়িটা

এখন কোথায় মনে মনে ভাবি। ছেলে আর ছেলের বউকে আমার মনের দুঃখ বোঝাতে পারি না। নাতনিদের বোঝার বয়স হয়নি। ওই পিঁড়িটা যে তাদের বসার জন্য এনেছিলাম সেটা তাদের বোঝাতে পারি না। শুধু তাতাই এক দিন আনমনে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা এটা কি সেই পিঁড়িটা?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ'।

ইতিমধ্যে পুত্রবধূ এয়ারলাইন্সকে ধমকে পিঁড়িটার জন্য পঁচাত্তর ডলার ক্ষতিপূরণ আদায় করে এনে আমাকে দিয়েছে। টাকাটা দুই নাতনির জন্য বউমার হাতে দিয়ে বললাম, 'ওদের দুটো বসবার আসন কিনে দিও।'

সামান্য পঁচাত্তর ডলারে আমেরিকায় কী করে দুটো আসন হবে? কোনও পিঁড়ি জাতীয় জিনিস পাওয়া যাবে কি না কে জানে। বউমা বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে কিছু না বলে টাকাটা রেখে দিল।

আমি কিন্তু কাঠের পিঁড়িটাকে ভুলতে পারছি না। কলকাতায় ফিরে এসেছি। কখনও স্বপ্ন দেখি আমাদের সেই খুড়ি ঠাকুমার মান্ধাই কাঠের পিঁড়ি প্রশান্ত মহাসাগরের ঢেউয়ের চূড়ায় ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে। কখনও দেখি আশ্বিন মাসের সাদা মেঘের ভেলায় চড়ে সেই পিঁড়ি দিগন্ত পাড়ি দিচ্ছে। কখনও মনে হয় পিঁড়িটা একটা বিরাট সিংহদরজা, সেই দরজার ও পাশে এলা আর লীলা, আমার দুই নাতনি খেলা করছে।



পঁচিশে বৈশাখ

মণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

নদী এখন একটু দূরে সরে গিয়েছে। হলুদ স্রোতের এধারে সমতল চর। সেখানে কচি ধানের সবুজ প্রবাহ। বাতাসে খেলা করে, গান গায়। সারাদিন কত পাখির কত বিচিত্র কাকলি। গৌতম তো কোনও পাখির নাম জানে না। শুধু তাদের গানে গানে প্রাণ জুড়িয়ে নেয়। বনে আছে আম-কাঁঠাল-বকুল-পলাশ-কৃষ্ণচূড়ার আলোছায়া। দূর চরের কোলে কাশবন, হোগলা আর শনের খেত। গুরু গৌতমের অনুজ্ঞায় সেইসব বয়ে আনে গ্রাম-বালকেরা। গ্রামবাসীগণ নিজ নিজ বাগান থেকে বাঁশ এনে দেয়। মুনিশেরা খাটে শুধু গ্রামের গৌরবে। সামান্য কয়েকদিনেই গড়ে ওঠে পাঠশালা ঘর। সকালবেলায় বালকেরা, সন্ধ্যায় বয়স্করা লেখা ও পড়া শেখে।

গুরু গৌতমের আশ্রম।

গৌতম এখানে পালিয়ে আসেনি। কারণ এখন আর তার কাছে জীবন শুধু জয় বা পরাজয় নয়। পরাজয় না মানলে পলায়নের প্রশ্ন আসে না। কথা ছিল পার্টিশান হয়ে ওরা মানুষের মুক্তি আনবে। দেখা গেল সে-পথে শুধুই রক্ত। কথা ছিল ওরা মানুষের শত ফুল বিকশিত করবে। দেখা গেল মানুষ আতঙ্কে ও বিকারে কুঁকড়ে বিবরে যায় এখনও। ওদের মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবন এখনও গর্জে ওঠে না। বোঝা গেল অযথা মৃত্যু ও কারাযন্ত্রণার আগে অন্য কিছু করণীয় আছে। পথের দুধারে অনেক আপনজনের শব ও স্মৃতি সরিয়ে সরিয়ে গৌতম এখন এইখানে। এইখানে তাই গড়ে ওঠে পাঠশালা। এখনও এদেশের অনশনক্লিষ্ট বালক গুরুর জীবিকা ও যজ্ঞের জন্য সমিধ ভার বয়ে আনে। সকালবেলায় বালক আর সন্ধ্যাবেলায় বয়স্করা লেখা ও পড়া শেখে। আপাতত শুধু বর্ণমালা। বিনিময়ে গৌতম শেখে কত কিছু।

এখন বৈশাখ। এ সময় কৃষ্ণচূড়া-বকুল-পলাশ ও মাদারফুল কত ফোটে। গাছে গাছে কচি পাতার সমারোহ। ছেলেরা পাঠশালার বেদি ভরে দেয় লাল আর সোনালি ফুলে। আপন আপন মণিবন্ধে জড়ায় বকুল ফুলের মালা। সেই সঙ্গে নাম না জানা অগুনতি পাখির কত না কলতান।

করমচা কাঁটায় হোগলা গেঁথে ফ্রেম করা হয়। বিদায়ের দিন অপর্ণা সঙ্গে দিয়েছিল ওই ছবি আর এই বই। ছবিখানি ফ্রেমে আঁটা হয়। বেঁধে রাখা হয় বেদির পরে। কে জানত একদিন এমন চমৎকারভাবে সার্থক হবে ফেলে আসা অপর্ণার স্মরণচিহ্ন। অপর্ণার সঙ্গে আবার কবে কোথায় দেখা হবে, এই বৈশাখে বহতা নদীর দিকে তাকিয়ে সেকথা যে মনে আসবেই।

যথাসময়ে গ্রাম থেকে বনপথে সভাপতিকে বরণ করে আনা হল। আনা হল তাঁর আসন। সভাপতি শ্রীদীননাথ ঘোষ। এ তল্লাটে আর কে আছে সভাপতি হবার মতো। বছরে দুবার নামকীর্তন হয় ঘোষের বাড়িতে। মোচ্ছব হয়। দশ মন চাল খরচ হয় কম করে। নবদ্বীপ থেকে আসে পালা কীর্তনের দল। বারো বিঘায় আলু আর সত্তর বিঘায় ধান। এবারের মতো এমন ফসল আর কখনও হয়নি। গঞ্জের ঠাণ্ডা ঘরে তিনখানা সিলেট বাঁধা আছে শুধু তার আলুর জন্য। লেভির দুর্দিনে কিভাবে কোথায় অত ধান রাখা হবে সে দুশ্চিন্তার এখনও আসান হল না। বহু কাঠখড় পুড়িয়ে এবারই প্রথম এক ছেলেকে স্কুল থেকে পাশ করানো গেল। কলেজে পড়বে বলে তাকে শহরে রাখা হয়েছে বোর্ডিংয়ে। এহেন দীননাথ ঘোষ ছাড়া এ অনুষ্ঠানে আর কে হবেন সভাপতি। গৌতমের অবাক হবার অনুভূতি নেই এখন আর। তার ফেলে আসা জগতে সকল উঁচু আসনেই এহেন ঘোষেরা সমাসীন।

ছবির দিকে তাকিয়ে দীননাথ বিগলিত হন। এমন বাবাজির নাম কেন তিনি আগে শোনেন নি। খোকা ছুটিতে বাড়িতে এলে ওর কাছে জানতে হবে সবকিছু। কত টাকা লাগবে ওর লেখা বই কিনতে। একটা পাকা আশ্রম আগেই করে দেওয়া যেত।

'গৌতম মাস্টার আগে কেন বলে না সব কথাগুলো। মাস্টারটা তো কুথা থিকে কী মতলবে ই গায়ে এসেছে। দেখা যাক। খোকা ইবার ঘরকে আসুক। খোকার আমার দিনে দিনে বুদ্ধিখানা যেন কাঁইচি হঁইছে।'

এবার আলুর দর চড়ছে ভালোই। ধানের তো কথাই নাই। দীননাথ তখনই বাবাজির উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকান।

আর তখনই তার নজর চলে যায় পাঠশালা ঘরের ডানদিকে। প্রাঙ্গণে ঘাসের গালিচায় ওরাও এসে বসে। এহেন পুণ্যপুরুষের জন্মদিনে ওরা কেন এখানে। সবার ছোঁয়া বাঁচিয়ে এক ধারে বসে অবলা। অবলার দিকে চোখ না পড়লে ঘোষের শরীরের ভেতর এমন শিরশির করে উঠত না। ছবির ওই মহাপুরুষ কি মানুষের ভেতরটাও দেখেন। ওঁর নামে একটা আশ্রম বা মন্দির না করলেই নয়। ঘোষের গুরু, গঞ্জের ঠাণ্ডা ঘরের মালিক, হরদয়াল গড়াই, কত বড় মন্দির করেছে গঞ্জে। মন্দির করার কথা মনে হলে ঘোষের শরীরের শিরশিরানি যেন একটু কমতে থাকে।

সেবার প্রথম আলু তোলা সারা হল ঠাণ্ডা ঘরে। তারপরেই আকাল। এ রাজ্যে এখনও আকাল হয় ফি-সন। একদিকে শুকিয়ে কাঠ হয়ে মানুষ পড়ে থাকে পাকা সড়কের ধারে। অন্য দিকে ঠাণ্ডা ঘরে জায়গা হয় না, আলু ধরে না। গোলায় গুদামে ধান পচে যায়। সিন্দুকে টাকা ধরে না। দীননাথের কেমন নেশার ঘোর লেগে গিয়েছিল। অবলা সারাদিন খাটে, তবু পেট পুরে ভাত পায় না। দীননাথের মনে লেগেছিল খুব। সারাদিন খেটে যা পায়,

বাপ-মাকে খাইয়ে নিজে কী খাবে। দীননাথ বললেন, 'অবলা রে তু রেতের বেলাও এখানে রইবি। এখেনেই খাবি। এখেনে যা লগদ হাতে পাবি সবটো ঘরে পাঠাই দিবি। বুইলি? ই লিয়ে যা আজ।'

অতগুলো টাকা একসঙ্গে দেখে অবলার আর কিছু বলা হল না। ঘরে উপোসী মা-বাবা। নিজের গতরও আর চলতে চায় না দিনের পর দিন উনোভাবে। বছর না ঘুরতে ঘুরতেই একদিন কান্নাকাটি শুরু করে দেয় অবলা। দীননাথও দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ওঠেন। ওকে নিয়ে অনেক রাতে চাঁড়াল পাড়ায় চলে যান। অবলার বাপের হাতে কী যেন গুঁজে দেন। চলে যেতে যেতে আর একবার পিছন ফিরে অবলাকে ঝাঁঝিয়ে ওঠেন, তবে এবার অস্ফুটে, 'যা ঘর যা, আমার ঘর আর যেতে হবেনি তুখে।'

এখন আর গ্রামেও ওতে জাত ধরম যায় না। শহরে তো কথাই নেই। বেঁচে থাকার চেয়ে বড় নয় কিছু। বিশেষত ওরা তো নিচু জাত। নিচু হয়েই গ্রামের প্রান্তে পৃথক থাকে। কখনও বা নদীর চরে, কাশ বনের ধারে।

বুড়ো অথর্ব বাপ-মা তো আছেই। উপরন্তু আরও একটা এল। অন্য গাঁয়ে এবং গঞ্জেও অবলাকে যেতে হয়। বাবুদের হয়ে গতর খাটাতে হয়। তবু হয় না। যা হয় তাতে পেট ভরে না। গতর দিতেও হয়।

ছেলেটা বসেছিল অবলার গায়ে ঠেস দিয়ে। কখনও ড্যাব ড্যাব করে এদিকে তাকায়। কখনও মায়ের কোলে গড়িয়ে পড়ে ককায়, 'হেই মা কখুন খেত্যে দিবি?'

ছেলেটা ড্যাব ড্যাব করে এদিকেও দ্যাখে। ও কি রবীন্দ্রনাথের ছবিটাও দ্যাখে। ও কি দীননাথ ঘোষের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঘোষের বড় অস্বস্তি হয়। ঈশ্বরের মতো ওই ছবিটার দিকে তাকিয়ে তিনি মনে মনে প্রার্থনা জানান, 'হে ঈশ্বর, তোমার পৃথিবীতে এত পাপ রাখ কেন? গতি কর।' তারপর সমবেত গ্রামবাসী ও গৌতমের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, 'কই হে মাস্টার, কখুন শুরু হবে তোমাদের?'

আয়োজন সম্পূর্ণ। গৌতম উঠে দাঁড়ায়। বলতে গেলে এটা তার একক অনুষ্ঠান হয়ে যাবে। কোথায় অন্য রাবীন্দ্রিক বন্ধুরা। অথচ এ তো ছেলেখেলা নয়। এখানেও তো মানুষ। বরং এখানেই মানুষ। গৌতম উঠে সভাপতি বরণ করে। সভাপতির গলায় মালা দেওয়া নিয়ে একটু অসুবিধা দেখা দেয়। একটি শিশুর হাত দিয়ে দেওয়া গেলে ভালো হত। গৌতমের দৃষ্টি আড়ে আড়ে ঘুরে ফিরে অবলার দিকে যায়। কিন্তু তেমন তৈরি শিশু একটিও পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে গৌতমই মালা দেয় গলায়। তারপর কবি-প্রতিকৃতি মাল্যভূষিত করেন স্বয়ং সভাপতি। গৌতম বারবার আঁতকে ওঠে।

কিন্তু এখনও প্রায় সর্বত্র এই তো ঘটনা। পশুপতির গলায় সভাপতির বরমাল্য। গৌতমরা তাই এখনও অনেক দূরে।

গৌতম নদীর দিকে তাকিয়ে মুক্ত কণ্ঠে একটি গান ধরে। তারপর কবির কথা বলে। সারাজীবন ধরে সকল মানুষের মুখে কথা আর গলায় গান ফোটাতে চেয়েছিলেন তিনি। তিনি চেয়েছিলেন শিশুরা ক্ষুধায় না মরে ফুলের সঙ্গে খেলা করুক।

সভাপতি চোখ বুজে মাথা দুলিয়ে বলে ওঠেন, 'আ-হা!'

তারপর গৌতম নিজেই একটি কবিতা পড়ে। অনেক চেষ্টা করেও অন্য কোনও বালককে কবিতা বলাবার মতো করা যায়নি। নিশ্চয় আগামী বছর হবে। ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আজকের দীন সূচনা তাকে পরম আত্মবিশ্বাস দেয়। সে পড়তে থাকে।

. নদীতীরে তপোবনে ঋষি গৌতম বালকদের বিদ্যাদান করেন। সেদিন অন্য এক বালক এসে আত্মনিবেদন করে। গৌতম জানতে চাইলেন, 'বৎস তোমার গোত্র কী? অব্রাহ্মণের তো অধিকার নেই এ বিদ্যায়।' বালক ম্লান হয়, 'আজ্ঞে গোত্র তো জানি না। মার কাছ থেকে জেনে আসি।

নদীর ধারে কুটিরের দুয়ার ধরে অভাগিনী জবালা দাঁড়িয়েছিল। শঙ্কিতা জননীকে বালক জিজ্ঞাসা করে। জননী জবালা নতমুখে জবাব দেয়, 'যৌবনে দারিদ্র্য দুখে বহু পরিচর্যা করি পেয়েছিনু তোরে, জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে। গোত্র তব নাহি জানি।' বালক তখনই ছুটে যায় ঋষি গৌতমের আশ্রমে। নিষ্কলুষ সরল বালক মায়ের কথাই হুবহু বলে ঋষির কাছে। তা শুনে অন্য বালকেরা গুঞ্জন তোলে। ধিক্কার দেয়। তখনই ঋষি আশ্রম ছেড়ে ওঠেন। বালককে আলিঙ্গন করে বলেন, 'অব্রাহ্মণ নহ তুমি, সত্যকুল জাত।'

কখনও মূল পাঠ, কখনও সহজ আলাপে শুধু কাহিনি বলে যায় গৌতম। কাহিনি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দীননাথ ঘোষের মুখবিকৃতি বাড়তে থাকে। তবু তিনি ভরসা রাখেন, পরিণামে নিশ্চয়ই ধর্মের জয় হবে। এ তো আর যে-সে বাবাজি নয়।

সহসা অপ্রত্যাশিত সমাপ্তিতে তিনি তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন, 'অ্যাঁঃ, তবে উটো বাবাজি লয়? তবে কি পীর ফকির কিছু? মেলেচ্ছ? চেহারাটো দেখ্যে আমার পথমেই মন লইছিল। হুঁ। মাস্টর, তুমার মতলবটো সুবিধার লয়!'

যে হাতে ওই প্রতিকৃতি মাল্যভূষিত করেছিলেন সেই হাত দর্পণের মতো নিজের বিকৃত মুখের সামনে ধরে তিনি চললেন, 'আর এস্থানে থাকা যেছে না হে।' ওই হাতের প্রায়শ্চিত্তের কী বিধান হয় কে জানে। গোঁসাইকে খবর দিতে হবে, তবে তো। এ কুসংসর্গে আর থাকা ঘোরতর পাপ।

কিন্তু যেতে যেতেও একবার অবলার ছেলের দিকে আড়চোখে তাকালেন ঘোষ। অবিকল ছোটবেলার বড়খোকার মতো ছেলেটা। আর এখানে দাঁড়ানো নয়। কয়েকজন মোসায়েব তখন, 'কত্তা, চইল্যেন কুথাকে? এখনও শেষ হয় লাই আইজ্ঞে।' বলতে বলতে দীননাথকে থামাবার ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। নির্বিশেষের সঙ্গে বিশেষের এই আকস্মিক মিল এসে পড়ায় গৌতম একটু অস্বস্তিতে পড়লেও বাইরে সে নির্বিকার থাকে।

বনপথের অন্ধকারে অপস্রিয়মাণ দীননাথ। হাতখানা তখনও মুখের সামনে ধরা। ওরা সবাই সেইদিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর প্রাঙ্গণের ঘাসপাতা হাওয়ায় ঘরে উঠে আসে। সঙ্গে অবলা আর তার ক্ষুধার্ত সন্তান। অবলার অথর্ব বাপকেও তোলা হয়েছে ধরাধরি করে। হাঁপানিতে দুলে দুলে বুড়ো বলে ওঠে, 'হুঁই পালাটো ফের একবার শুনাইন দাও মাস্টর। বহোত দরদ দিয়ে লিকেচেন আমাদের লবিন্দর নাথ ঠাকুরমশা।'

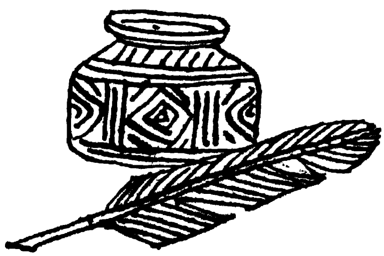
জীবনের এক অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাদে গৌতম আবার শুরু করে, 'অন্ধকার বনচ্ছায়ে সরস্বতী তীরে অস্ত গেছে সন্ধ্যাসূর্য.....'

সবার তন্ময়তার সুযোগে একসময় অবলার ছেলে উঠে দাঁড়ায়। শূন্য চেয়ারে ছিল সভাপতির পরিত্যক্ত বরণমালা। বালক পায়ে পায়ে সেখানে গিয়ে সে মালা তুলে নেয়। কী যেন ভাবে। নিজের গলায় গলিয়ে দেয় সে মালা। সে দৃশ্য প্রথমেই গৌতমের নজরে পড়ে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে 'হাই দে-খ-গ' বলে হাত তোলে অবলা। আপনা থেকে প্রসারিত হয় গৌতমের বাধার হাত। সহসা আত্মসংবরণ করতে না পারায় অবলার চপেটাঘাত গৌতমের বাহুতে পড়ে। গৌতমের করতল তার ফলে বালকের মাথা স্পর্শ করে। ছোঁয়া লেগে যাওয়ায়, উপরন্তু আঘাত করে ফেলার অনুশোচনায় সঙ্কোচে অবলা তার মলিন আঁচল নিজের মুখে চাপা দেয়। বুড়ো চেঁচিয়ে ওঠে, 'অবলারে, তু কী কইল্লি ইটা, অ্যাঁ? মাস্টারকেও ছুঁয়ে দিলি?'

গৌতম কোনওরকম বিনয় প্রকাশ করে না। চঞ্চল হয় না। সে যেন কেমন হয়ে যায়। কতদিন আগের প্রথম ছোঁয়ায় সঙ্কুচিতা অপর্ণাকে মনে পড়ে তার। সেদিন যদিওবা উভয়েরই আত্মরতি কিছু থেকে থাকত, আজ এ দুজনের কারও এমন কি জীবনের প্রান্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলা গৌতমেরও, তার লেশমাত্র নেই।

পরম আবেগে গৌতম তার অসমাপ্ত পাঠ সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়। বিহঙ্গ কাকলি গান, মধুপ-গুঞ্জন গীতি, জল কলতান.....সবার মন সব তুচ্ছ থেকে মুক্তি পায় কয়েক নিমেষে।

নদীর অপর পাড়ে সন্ধ্যাসূর্য তখন অস্ত যায় যায়। সূর্য যেন তখনও এদিকেই তাকিয়েছিলেন। তাঁর শেষ রশ্মিতে মাল্যভূষিত প্রতিকৃতি, গৌতম মাস্টার। সমবেত বালক ও গ্রামবাসীদের মূর্তি সকল বদলে যেতে থাকে। বহমান নদী চরের সবুজ খেত আর কাশবনের সাঁ সাঁ ধ্বনির সঙ্গে পাখিদের গান আর বনের গন্ধবহ বাতাস বয়েই চলে সেদিন।



কিছুদিন

বুদ্ধদেব গুহ

একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বর্ষার জল-পাওয়া ধানগাছগুলো জোলো ভিজে হাওয়ায় জলের উপর টলটল করছে। জলে-ভেজা ধানখেত পেরিয়ে দূরের বাঁশঝাড়ের আর নানারকম ফলের গাছের জটলার ওপর দিয়ে ঝাঁকি মেরে মেরে এক ঝাঁক পায়রা উড়ে বেড়াচ্ছে।

লালগোলা প্যাসেঞ্জার দু-পাশের জলে আর বাদামি শরীরের ছায়া ফেলে ছুটে চলেছে রানাঘাটের দিকে। জানলার পাশে বসে ঋজুর অনেক কিছু ভাবতে ভাল লাগছে। সারা দিন মাথার কাজ করার পর যখনি একটু সময় পায় ও, বাসের রড ধরে ভিড়ের গন্ধের মধ্যে দুলতে দুলতে ঝুলতে ঝুলতে অথবা এক-একটা ট্রেনের জানলায় —ও শুধু নয়নার কথা ভাবে। তার শীতের রোদের মতো নরম পেলব ত্বকের কথা, তার ঠোঁটের দারুণ মিষ্টি বুনো বুনো গন্ধের কথা। তার কথা ভাবতে ভাবতে ঋজুর মন শান্তিতে ভরে আসে। যখন নয়নার কথা ভাবে ও, তখন ওর চারদিকের সব গোলমাল, সব চিৎকার সব কিছু ভুলে গিয়ে নিজেকে ও নিজের ভাবনার পশমের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে কেবলি তার কথাই ভাবতে চায়। শুধুই যার জন্যে ও বেঁচে আছে, যার জন্য ও ওর শরীর ও মনকে প্রতিমুহূর্তে এক দারুণ আনন্দের জানলার দিকে প্রতিনিয়ত ঠেলে দিচ্ছে। ওর স্বপ্নময় কবোষ্ণ জগতে, ওর শান্তির সুগন্ধী সামিয়ানার নীচে ও প্রতিদিন নিরুচ্চারে সুরেলা গান গায়। যা ও নিজে শোনে আর ও ছাড়া একমাত্র অন্য আর একজন শুনেত পায় শ ও বিশ্বাস করে।

নদীটা পেরোল গমগম আওয়াজ করে ট্রেনটা । কিছুক্ষণের মধ্যেই রানাঘাট স্টেশনে ডিস্ট্যান্ট সিগন্যালটা দেখা দিল। গাড়িটার বেগ কমে এল। তারপর লালগোলা প্যাসেঞ্জার রানাঘাট স্টেশনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

ফার্স্ট ক্লাস চেয়ারকারের অ্যাটেন্ড্যান্ট বেলডাঙা স্টেশনে একটি বড় পাকা কুমড়ো কিনেছিলেন। কুমড়োটার গায়ে একবার সস্নেহে হাত বুলিয়ে প্যাসেঞ্জারদের দিকে চেয়ে বললেন, 'কেউ চা খাবেন স্যার?'

চায়ের তেষ্টা পেয়েছিল ঋজুর। ও চায়ের অর্ডার দিল।

রেলওয়ে কেটারিং-এর বেয়ারা এসে এক পট চা দিয়ে গেল। চা-টা বেশ আরাম করে খেল ঋজু। চা খেতে খেতে ঋজুর গতকালের কথা মনে পড়ে গেল। কাল নয়না কেমন সুন্দর ভঙ্গিতে শাড়িটা বুকের উপর ফেলে বাঁকা হয়ে বসেছিল ঋজুর সামনে, ও কেমন চা ঢালতে ঢালতে সুবীরের মুখের দিকে তাকাচ্ছিল। ও কোনও কথা বলছিল না। ওরা কোনও কথা বলছিল না। অথচ সেই নীরবতা, ওর সুন্দর আঙুলের চামচ-নাড়ার টুংটাং শব্দে আর চোখের চাউনিতে কেমন সরব হয়ে উঠেছিল। ঋজু চায়ের পেয়ালাটা শেষ করে নামিয়ে রাখতে রাখতে ভাবছিল, কিছু না বলেও কত কথা বলা যায়, আশ্চর্য। ভাগ্যিস মানুষের চোখ ছিল। তাই তো ও চোখ মেলে নয়নার চোখে এমন করে তাকাতে পারে। বেয়ারা এসে চায়ের দাম নিয়ে ট্রে নামিয়ে নিয়ে চলে গেল।

এমন সময় একদল বাচ্চা বাচ্চা ছেলে, এই দশ থেকে পনেরো বছরের মধ্যে বয়স হবে, ফুটবল খেলে কাদামাখা শরীর ও পোশাক নিয়ে কামরার দরজায় এসে দাঁড়াল। ওরা ইতস্তত করছিল। সকলে মিলে উঠে পড়ে চেয়ার-কারের পরিষ্কার সিটগুলোকে নোংরা করবে কিনা ভাবছিল, এমন সময় ওদের মধ্যে থেকে একটা দশ বছরের ছেলে দরজায় দাঁড়ানো অ্যাটেন্ড্যান্টকে বলল, 'কী রে শালা, দেখছিস কী ? দরজা খোল।'

অ্যাটেন্ড্যান্ট একবার মুখ ফিরিয়ে গাড়ির ভিতর দেখে নিল। যাত্রীদের মুখের দিকে। ঋজুও তাকাল একবার মুখ ফিরিয়ে। চেয়ার-কারের এ-দিকটাতে দুজন দারোগাবাবু এবং আরও জনা আটেক ভদ্রলোক ছিলেন। সকলকে পোশাকে-আশাকে ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছিল। দারোগাবাবুদের চেহারা হালুইকরের দোকানের জোগানদারের মতো। তফাত এই যে গামছা না পরে ইউনিফর্ম পরেছেন। দুদিকে দু-পা ছড়িয়ে তাঁর কোলা ব্যাঙের মতো বসেছিলেন। দুজনেরই হাতের কাছে মেঝেতে শোয়ানো প্রায় দু-কেজি সাইজের একটি করে মুখ-হাঁ করে কালো কাতলা মাছ। দারোগাবাবুদের কোমরে চামড়ার বেল্টে রিভলবার।

যখন কোনও যাত্রী কোনও কথা বললেন না, তখন অ্যাটেন্ড্যান্ট দরজায় দাঁড়ানো ছেলেটিকে বললেন, 'কী হচ্ছে ভাই? টিকিট কাটোনি, কিছু না, লক্ষ্মী সোনা, এখানে গোলমাল করো না।'

নেতা-গোছের ছেলেটি ধমকে উঠল, বলল, 'চোপ। আমি কি তোর সাঁটুলি , যে সোনা সোনা করছিস?'

তারপর ব্যাপারটা যে কী হল বোঝা গেল না।

কামরাসুদ্ধ ভদ্রলোকদের ভাবলেশহীন মুখগুলির দিকে তাকিয়ে কোনও সাহায্য পাবার আশা না দেখে অ্যাটেন্ড্যান্ট দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দিলেন। দরজাটা সঙ্গে সঙ্গে লক করে দিলেন ভিতর থেকে। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনের হুইসেলও বাজাল।

ছেলেগুলো একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, 'ওরে শালা রেলের চাকর, চল পায়রাডাঙা। তোর টেংরি খুলে নেবো। বলেই, ছেলেগুলো ঝপাঝপ আশেপাশের কামরায় উঠে পড়ল।

ট্রেনটা ছেড়ে দিতেই এতক্ষণ যে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী চুপ করে বসে ছিলেন তাঁরা সবাই যুগপৎ নড়েচড়ে বসলেন। দুজনের মধ্যে যে দারোগাবাবু পান খাচ্ছিলেন, তিনি বললেন. 'কী করন যায় কয়েন তো?'

পরক্ষণেই পেছনের সিট থেকে একজন বলে উঠলেন, 'পরের স্টেশনই পায়রাডাঙা — জানলা-দরজা বন্ধ করে চুপ করে বসে থাকুন মশাই — নইলে সর্বনাশ হবে।'

ঋজুর মাথার মধ্যে একটা পোকা নড়ে উঠল। ও বলল, 'এ আপনারা কী বলছেন? অতটুকু দশ ৫'রো বছরের ছেলেদের ভয়ে দরজা-জানলা বন্ধ করে বসে থাকতে হবে?'

ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ মশাই, অনেক হয়েছে। বীরত্ব দেখাতে চান আপনাকে একা একা প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে দিচ্ছি, বীরত্ব দেখান গিয়ে সেখানে। আপনার মতো বীরত্ব দেখাতে গিয়ে আমাদের ইজ্জত খোয়াতে রাজি নই আমরা। ইঁট-পাটকেল ছুঁড়লে মাথা যখন ফেটে যাবে তখন কি আপনি বাঁচাবেন? আমরা সকলেই শান্তিপ্রিয় মশাই। অশান্তির মধ্যে আমরা নেই। যাবও না কখনও।'

দারোগাবাবু ততক্ষণে জানলা বন্ধ করে ফেলেছেন। জানলাটা একটু তুলে থুক্ করে পানের ছিবড়ে ফেলে বললেন, 'মশায়ের কী বক্তব্য?'

ঋজু বলল, 'আমরা কি চুরি করেছি যে দরজা-জানলা বন্ধ করে অন্ধকূপে বসে থাকতে হবে?

ঋজুর পাশের স্যুট-পরা ভদ্রলোক পকেট থেকে দামি রুমাল বের করে সশব্দে একবার নাক ঝাড়লেন, তারপর একগাদা থকথকে কফ রুমালে মুড়ে রুমালটি আবার পকেটে রেখে বললেন, 'ইজ্জত আগে, না আপনার গোঁয়ার্তুমি আগে?' আপনার জন্যে কি মান-ইজ্জত খোয়াব মশাই?'

এত লোকের বিরুদ্ধাচারণ করতে একা একা পেরে উঠবে না দেখে ঋজু চুপ করে থাকল।

দেখতে দেখতে তার দু-পাশের সব জানলা—কাচ-কাঠ-জাল-সব ঝপাং ঝপাং করে সবাই বন্ধ করে ফেললেন। গাড়িটা অন্ধকার হয়ে গেল। অ্যাটেন্ড্যান্ট আলো জ্বেলে দিলেন গাড়ির। সম্মানিত ভদ্রলোকেরা গম্ভীর মুখে বসে খবরের কাগজের জ্বালাময়ী সম্পাদকীয় পড়তে লাগলেন।

একজন হঠাৎ বললেন, 'এ দেশের আর কিছু হবে না।'

দ্বিতীয় দারোগাবাবু বললেন, 'তাড়াতাড়িতে ভাল সোনামুগ পাওয়া গেল না কৃষ্ণনগরে।' পাওয়া গেলে কাতলা মাছের মুড়ো দিয়ে ভাল ডাল খাওয়া যেত।'

দেখতে দেখতে ট্রেনটা পায়রাডাঙা স্টেশানে এসে গেল।

ট্রেনটা থামতেই কতগুলো নিষ্পাপ কচি গলার স্বর শোনা গেল বাইরে, প্ল্যাটফর্মে।

একজন বলল, 'দ্যাখ রে শালারা সব ভয়ে পেয়ে জানলার খড়খড়ি আটকে বসে আছে।' বলতেই ওরা সমস্বরে হো হো করে হাসতে লাগল। কে যেন বলল, 'শালারা কুকুরের বাচ্চা রে।' তারপর আর একজন বলল, 'মার শালাদের।' এ কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা সকলে মজা পেয়ে গেল। বন্ধ দরজা-জানলায় দমাদ্দম কিল-ঘুষি মারতে লাগল। দু-একটা ইটও পড়ল। গাড়ির মধ্যে ভদ্রলোকেরা সবাই দরজার বন্ধ লকের দিকে চেয়ে তাঁদের ইজ্জত যে এ যাত্রা নির্বিঘ্নে রক্ষা পেল এটা জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে

খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন অ্যতন্ত মনোনিবেশ সহকারে।

এমন সময় ঋজুর মাথার সেই পোকাটা আবার নড়েচড়ে উঠল। ঋজু এক দৌড়ে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল। দরজা খুলেই দরজায় দাঁড়িয়ে ছেলেগুলোকে ধমক দিয়ে বলল, 'তোমরা কী করছ কী?'

ছেলেগুলো অতবড় গাড়ির রুদ্ধ দরজা-জানলার মধ্যে থেকে একমাত্র রোগা-পাতলা একজন লোককে ওরকম সাহসের সঙ্গে বেরিয়ে আসতে দেখে ওদের উল্লাস থামিয়ে একটু থমকে দাঁড়াল।

পুরো ব্যাপারটা ওরা প্রথমে শুধু মজা করবার জন্যেই শুরু করেছিল রানাঘাট স্টেশনে — কিন্তু গাড়িসুদ্ধ ধেড়েগুলো যে এমন কেঁচোর মতো কুঁকড়ে যাবে তা ওরা ভাবতেও পারেনি। এটা দেখে ওদের মজাটা অনেক গুণ বেড়ে গেছিল। ঋজুকে দেখে ওদের সম্মান করতে ইচ্ছে করল প্রথমে। কিন্তু পরক্ষণেই ওরা বুঝতে পারল যে, ওকে সম্মান করার মানে নিজেদের অপমান করা। তা ছাড়া ওদের মজার নাটকটা যখন প্রায় জমে উঠেছিল তখন কেউ তাতে বিঘ্ন ঘটাক এ ওরা চায়নি। একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'উরেঃ শ্‌শ্‌লা — এ তো দেখি বাঘের বাচ্চা।' আর একর্জন টিপ্পনী কাটল, 'কুকুরের বাচ্চার দুলে বাঘের বাচ্চা।'

ঋজু বলল, 'তোমাদের হয়েছে কী? তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে?' ছেলেগুলো নিঃশব্দে ও নীরবে একবার সব কটা বন্ধ জানলার দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। ওরা বুঝতে পারল, একপাল কুকুরের বাচ্চার মধ্যে একটা বাঘের বাচ্চাকে একেবারেই মানায় না।

একটি ছোট ছেলে আচমকা একটা আধলা ইট ছুঁড়ে মারল ঋজুর দিকে। ইটটা ঋজুর চোখে গিয়ে লাগল। চশমাটা ভেঙে দিয়ে ডান চোখটা একেবারে থেঁতেল দিল ইটটা। ঋজু চিৎকার করে উঠে চোখে দু-হাত চাপা দিয়ে প্ল্যাটফর্মের ওপরে পড়ে গেল। বাঁ চোখটা খুলে দেখল, ওর ডান চোখের রক্তমাখা থেঁতলানো মণিতে ওর ডান হাতের আঁজলা ভরে গেছে।

ঋজু পড়ে যেতেই পান-খাওয়া দারোগাবাবু দৌড়ে এসে দরজাটা ভেতর থেকে লক করে দিলেন।

ছেলেগুলো সবাই ওদের হারানো মজা ফিরে পেয়ে অন্ধ ঋজুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এক গাড়ি কুকুরের বাচ্চার সামনে ওরা মনের আনন্দে একটা দলভ্রষ্ট বাঘের বাচ্চাকে পেয়ে হাতের সুখ, পায়ের সুখ, ওদের অপ্রতিহত ইচ্ছের সুখ করে নিতে লাগল। কতক্ষণ ওকে মাটিতে ফেলে ছেলেগুলো সমানে মারতে লাগল তা ঋজুর মনে নেই, ঋজু ওর ঘোরের মধ্যেই শুনতে পেল হুইসেল বাজিয়ে রুদ্ধ জানলার ইজ্জতের গাড়িটা ধীরে ধীরে, ওর সব সহযাত্রীর কালো কফের মতো সম্মান নিয়ে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে গেল।

জ্বরের মধ্যে বিড় বিড় করে ঋজু বলল, 'নয়না, আমার মানুষের চোখ এরা উপড়ে নিয়েছে। এই রক্তাক্ত কোটরে আমি একটি বাঘের চোখ বসিয়ে নেব। কিছুদিন আমার মানুষের চোখ, ভালবাসার চোখ বিশ্রাম নিক। এখন বাঘের চোখের দিন; কিছুদিন।'

এক্সপ্রেস

নবনীতা দেব

'এক্সপ্রেস, এক্সপ্রেস, উঠবেন না' —হাঁকতে হাঁকতে উর্ধ্বশ্বাসে বাসটি বেরিয়ে গেল। আর অপেক্ষমাণ জনতার একাংশ, আশ্চর্য কসরতে, চুম্বকের শরীরে ছিটকে লেগে যাওয়া পেরেকের মতো সেই বেগবান দৈত্যের অঙ্গলগ্ন হয়ে অদৃশ্য হলেন। তাদের আত্মপ্রসাদে উদ্ভাসিত মুখ কল্পনা করে, আমরা অকৃতকর্মরা, পরস্পরের দৃষ্টি এড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস গোপন করলাম। ঘড়িটা সম্ভবত স্লো। নটা কুড়িরটা মিস করলে কেলেঙ্কারি। আটের-বি। পাঁচ নম্বর। রোদ্দুর এর মধ্যেই কী চড়া হয়ে উঠেছে! আবার আটের-বি। তারপর গোটা রাস্তাটা বেলা দুটোর লেকের মতো ফাঁকা। নিস্তব্ধ। কে বলবে আজ সোমবার, সকাল নটা কুড়ি, এটা রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কবি হলে বলতুম, বয়স্কা কুমারীর শূন্য সিঁথির মতো ব্যর্থ প্রতীক্ষায় মাধুর্যলুপ্ত পথ। আপাতত মনে হচ্ছে, পিতৃদেব যথেষ্ট পয়সা না জমিয়ে বিশেষ ভুল করেছেন। গাড়ি না থাক, নিদেনপক্ষে একটা ট্যাক্সি করেও যদি—আসছে, আসছে। অপেক্ষা করতে করতে প্রায় শ্মশানবৈরাগ্য উপস্থিত হয়েছিল যাঁদের, তাঁরা স্টেশনে ট্রেন ইন করার সময়ে কুলিদের মতো প্রাণচঞ্চল হলেন। দু নম্বর পাইকপাড়া, ভায়া ওয়েলেসলি । কতক উঠলেন। কতক রইলেন। তাঁদের মুখের দিকে তাকানো যায় না। একজন পানের দোকানের দড়ি থেকে সিগারেট ধরালেন। হতাশা সুলক্ষণ। বাস এবার আসবেই। অন্তত ভদ্রলোকের সিগারেটটা ফেলিয়ে দেওয়ার জন্যও আসবে।

এলও। 'এক্সপ্রেস, এক্সপ্রেস, লেডিজ উঠবেন না'—ধুত্তোর উঠবেন না। কয়েকজন যাক-প্রাণ থাক-মান থিয়োরিতে বাসের সামনে বুক পেতে দিলেন, বাস থামল। দুধের ঘটিতে উথলে-ওঠা ফেনার মতো বাসের মুখে থরে থরে মানুষ জমে আছে। সর্বশরীরে সাহস সংহত করে তারই মধ্যে মিলিয়ে গেলাম সকলে, আমিও। অমনি মন্তব্য।—'কলকাতায় এত বাস থাকতে এঁরা যে কেন এক্সপ্রেসে ওঠেন— 'আরে ভাই, বাসের একতলাটা তো ওঁদের জন্যেই'—'লেডিজ স্পেশাল করে দিয়েও রক্ষে নেই' —যেন লেডিস স্পেশাল প্রচলনের কর্মকর্তা উনিই। 'একেই গরম, তায় আপিসের ভিড়, এর ভেতরে লেডিজ উঠলে—'

কখন যেন ভিতরে এসেছি, বসতেও পেয়েছি। এক পাশে ঘটি-পুঁটলি নিয়ে এক বৃদ্ধা,

মনে হয় কালীঘাটযাত্রিণী। নামতে পারবেন তো? কালীঘাটে নামা কল্পনাতীত। অন্যপাশে ডালহৌসিগামিণী। কোলের ওপর লাইব্রেরির কোনা-মোড়া বই খোলা। সস্তা প্রেমের গল্প। চামড়ার ব্যাগটার পেট ফোলা। হয়তো টিফিন আছে।

একটু দূরে রড-ধারী এক মাদ্রাজি ভদ্রলোক উটের কথা মতো মাথা বাড়িয়ে জানলা দিয়ে বহির্দৃশ্যে মন দেবার কষ্টসাধ্য প্রয়াস করছেন। প্রায়ই দেখা হয়। এ-বাসের একাধিক মুখের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে। 'দাদু টিকিট হয়েছে?' 'পালিয়ে যাচ্ছি না দাদু, পায়ের ব্যালান্সটা রাখতে দিন আগে, প্রথমেই পকেটের দিকে নজর?'

'তিন আনা? ভাঙানি পরে দিচ্ছি, টিকিট ধরুন —' দু আঙুলের ফাঁকে বিচিত্র কায়দায় নোটটি ধরে কন্ডাক্টর টিকিট বাড়ালেন। তারপরেই হাঁক — 'পার্টনার, এক টাকার চেঞ্জ হবে?' 'পুরনো হবে না, নয়া হবে—' সিঁড়ি থেকে জবাব এল। নয়া শুনলেই গা শিরশিরিয়ে ওঠে। রোজ বিতণ্ডা। রোজ গলাবাজি। শেষ পর্যন্ত সরকারের আদ্যশ্রাদ্ধে কন্ডাক্টর-প্যাসেঞ্জারের পুনর্মিলন।

চোখ পড়ল ওপাশের ডবলসিটে। বইপত্র সামলে চশমাচোখে ছেলেটি কোনওরকমে দাঁড়িয়েছে। মাথা ছাদে ঠেকে যাচ্ছে। কচি গোঁফের রেখায় মুখখানা আরও কচি লাগে। ছেলেটি চোখ নামাল সামনে বসা মেয়েটির চোখে। ওরা হাসল।

বাসটা এতক্ষণে হাজরায় বেঁকে হরিশ মুখার্জিতে ঢুকেছে। পাশের বৃদ্ধা হঠাৎ উঠে পড়লেন। 'এই — আমি নামব। চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে। এটা কোথায় যাচ্ছে?' বাসসুদ্ধ হাঁক ছাড়ল —'রোখো, রোখো, ' বাস রুখল না। কন্ডাক্টর গর্জে ওঠেন, 'কেন উঠছিলেন? একশোবার বারণ করি, এটা এক্সপ্রেস। বসে থাকুন আপনি, ডালহৌসিতে নামবেন।'

'বুড়োমানুষ পথ চিনিনি বাছা।'

'পথ চেনেন না তো পথে বেরোন কেন?' সকলে এবার বৃদ্ধার ওপর চড়াও। টিং টিং ঘণ্টা, বাস থামাও। তবু থামে না। বৃদ্ধা প্রায় কেঁদে ফেলেছেন, অনেকে চঞ্চল হন—'সত্যি তো, আহা বুড়ো মানুষ।' বাস হঠাৎ থেমে এল। বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হন। সামনের লোকেরা যথাসাধ্য সরেও গেলেন। কিন্তু মাত্র দু-তিন পা এগোন গেল। দরজা হনজ দূর অস্ত্। বাস কিন্তু চলতেই থাকল। বৃদ্ধার জন্য নয়, থেমে আসার কারণ, ভবানীপুরের গোপালরা শয়ে শয়ে গোরু নিয়ে চরাতে চলেছেন গড়ের মাঠ অভিমুখে। গোরুর মিছিলে পথ বন্ধ। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা। 'ওঃ এই এক ন্যুইসেন্স হয়েছে!' —'এটা কি এক্সপ্রেস, না, গোরুর গাড়ি?' 'এক্সট্রা পয়সাটা ফেরত দেবেন দাদা। লেট করে দেওয়ার দরুন' অতিরসিকতা কারোর। 'ও নীলশার্ট, ত্রিভঙ্গমুরারি পোজে দাঁড়ানো প্র্যাকটিস করছেন, রাসপূর্ণিমার এখনও ঢের দেরি।' নীলশার্টদাদা বিরক্তমুখে, একটা অস্ফুট ইংরেজি মন্তব্য করে এগিয়ে গেলেন। কন্ডাক্টর বললেন, 'গেটে ভিড় করবেন না, সামনের দিকে এগিয়ে যান।' চশমাচোখে ছেলেটি বিচলিত হয়ে গেটের দিকে তাকাল। তারপর মেয়েটির দিকে। আমি জানি ও এগিয়ে যাবে না। সবার চোখ বিদ্রুপ, কিছুটা ঈর্ষা সহ্য করে, ঘাড় গুঁজে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। দুজনের চোখে তাকিয়ে ওরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, বাস, ভিড়, অফিসটাইম, ধাক্কা-টিপ্পনী, গোরু, গরম, নয়াপয়সা, তাবৎ জগৎসংসার ভুলে যাবে। তারপর জি পি ও-তে মেয়েটির

পার্শ্ববর্তিনী ছাতা সামলে নেমে গেলে, মেয়েটি বৃষ্টির পরের আকাশের মতো ধবধবে হেসে সরে যাবে এবং ঘড়ির দিকে আর দরজার দিকে তাকিয়ে নিয়ে ছেলেটি ওর সবুজ শাড়ি ঘেঁষে বসবে।

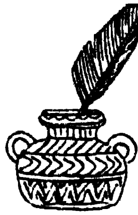
'এই যে পরিমল , হয়ে গেছে কাজটা?' 'নাঃ, আবার ইন্টারভিউ আছে আজ।' 'একশো পঁচিশটা টাকার জন্য ঘুরিয়েই মারবে তোকে—' নাইলন-হাওয়াই শার্ট-পরা ছেলেটি মন্তব্য করল। অদৃশ্য পরিমলের প্রতিক্রিয়া বোঝা গেল না। পাশের সিটে দুটি ডালহৌসিগামিণী আলাপ করেছেন—'মায়ের অপারেশনে প্রচুর টাকা গেল, ব্যাঙ্কে কিছুই প্রায় নেই।' দুই ভদ্রলোক রীতিমতো উত্তেজিত—'স্বীকার করি তোমাদের নেহরুর পরে কেউ নেই, কিন্তু সেখানেই তো নেহরু ফেলিয়োর।'

পিজি হাসপাতাল থেকে একটি শবযাত্রা বেরোচ্ছে, হিন্দুস্থানীদের। 'রামনাম সাচ হ্যায়—' আবীর ছড়িয়ে ওরা প্রিয়জনকে নিয়ে চলেছে প্রিয়-অভিসারে। খানিকটা উড়ন্ত আবীরে জানলার মোটা বিলিতি কাচ রঙিন হয়ে গেল।

'বড়দা স্পিড দিন, এগারো এসে পড়েছে, বত্রিশও বেরিয়ে যাচ্ছে চৌরঙ্গী দিয়ে—' পিছনের নীল দৈত্যের দিকে তাকিয়ে কন্ডাক্টর সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন। নিকেলের চশমাপরা গেঞ্জি গায়ে, চল্লিশোর্ধ্ব সারথি সদম্ভে জবাব দিলেন, —'আসুক গিয়া— আমারে ধরনের সাইধ্যা নাই, পঙ্খীরাজের মতো উইড়্যা যামু, বিশ মিনিটে নিয়া ফেলুম অনে।'

অফিসযাত্রীদের আশ্বস্ত করে, এক্সপ্রেস এবার সত্যি স্পিড দিয়েছে। রেসকোর্সের সমুখে এসেছে কি না। অলসচোখে চেয়ে দেখি সর্টস পরিহিতরা চুল উড়িয়ে গল্‌ফ প্র্যাকটিস করছেন। গোরু-ছাগল চরছে। দু-ধারে ছড়ানো সবুজ কড়া রোদে ঝকঝকে সোনালি — বরং ওই মেয়েটির শাড়ির সবুজ অনেক সত্য, অনেক বেশি ঘাসের মতো, পাতার মতো —ওর চুল চওড়া লালফিতে। চেয়ে চেয়ে হঠাৎ বালিগঞ্জ সারকুলার রোড মনে পড়ল। —কৃষ্ণচূড়ায় কৃষ্ণচূড়ায় রাস্তাটা অসহ্য সুচিত্র হয়ে আছে এখনও। যদিও বসন্ত গত।





প্রতিনায়ক

দিব্যেন্দু পালিত

খবরের কাগজটা একপাশে সরিয়ে রেখে এক মুহূর্ত চুপ করে রইল সোমনাথ। তারপর সামনের দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে বলল, 'একঘণ্টা যে হয়ে গেল। তোমার সাজগোজ কি আজ আর শেষ হবে না!'

চোখের পলকে কাজল আঁকছিল নমিতা। স্বামীর দিকে তাকাবার সামান্য চেষ্টা না করেই বলল, 'এক ঘণ্টা আগে তুমি কি নিউ আলিপুরে ছিলে; নাকি বালিগঞ্জে লেকের হাওয়া খাচ্ছিলে!'

কথা শেষ করে খোঁপায় কাঁটাগুলো সাজাবার জন্য সরু সাদা আঙুলগুলো ব্যস্ত হল নমিতার।

এক চোখ বন্ধ করে ক-পলক স্ত্রীকে দেখল সোমনাথ। ভুরু কোঁচকালো একবার। তারপর পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে, রবারের স্লিপারটা পায়ে গলিয়ে উঠে দাঁড়াল।

'বেলা দশটার এই কটকটে রোদ্দুরে একমাত্র পাগল আর বেকার ছাড়া আর কেউ যে লেকের পথ মাড়ায়, আমার বিশ্বাস হয় না। তা ছাড়া....' অল্প একটু থেমে বলল সোমনাথ, 'একা একা হাওয়া খেয়ে বেড়াতে কি আর সব সময় ভালো লাগে!'

'দোকা যখন জুটছে না, তখন একা একা চেষ্টা করাই ভালো নয় কি!' প্রসাধন শেষ হয়েছিল। ছিটের ব্লাউজের ওপর সাদা খোলের আঁচলটা গোছাতে গোছাতে নমিতা বলল।

নমিতার কথার কোনও জবাব না দিয়ে জানালার পর্দার পাশ দিয়ে বাইরে তাকাল সোমনাথ। ভাদ্রের মাঝামাঝি। কচি সবুজ ঘাসের উপর শরতের রোদ চকচক করছে। জানালার গা ছুঁয়ে ছোট্ট রঙিন একটা প্রজাপতি উড়ছিল।

সিগারেটে মৃদু টান দিয়ে কেমন নির্লিপ্ত সুরেই বললে সোমনাথ, 'ক্লাস তো তোমার এগারোটার পর শুরু হয়। কদিন দেখছি দশটাতেই বেরোচ্ছ!'

সোমনাথের কথায় কি কোনও ইঙ্গিত ছিল। কে জানে। থাকলেও নমিতার তা স্পর্শ করেছে বলে মনে হল না। পাউডারের বাড়তি গুঁড়োগুলো হাতের রুমালে মুছে ফেলতে ফেলতে অত্যন্ত সহজ স্বরে বললে, 'বাঃ রে! নিউ আলিপুর থেকে কোথায় সেই ইউনিভার্সিটি! যেতে বুঝি সময় লাগে না!'

'তা লাগে', সোমনাথের হাসিটা এবার ঠোঁটের ভাঁজেই মরে যায়, 'তবে আগে বোধহয় আরও কম লাগত।'

'কী জানি! এত ঘড়ি ধরে পা ফেলতে আমি পারি না।' জুতোর স্ট্র্যাপ বাঁধতে বাঁধতে নমিতা বলললে, 'তাছাড়া এই অফিস-টাইমের ভিড়ে কটা বাস মিস করতে হয়, তার ঠিক কী!'

নমিতা বোধহয় বেরোবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। দশটা সাত হয়েছে। সোমনাথ একটা আপস-রফা করবার জন্য তৈরি হল। পিছন ঘুরে বললে, 'শোনো। আজ তাহলে কখন ফিরছ তুমি?'

নমিতা বলল, 'যখন রোজ ফিরি। চারটে, সাড়ে চারটে।'

'পারলে একটু তাড়াতাড়ি ফিরো। আজ ভাবছি সিনেমা যাব।'

পর্দা ঠেলে বেরোতে বেরোতে নমিতা বলল, 'দেখি। চেষ্টা করব।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিল নমিতা। পেট্রোল-পাম্পের সামনে বাস-টার্মিনাস। এখান থেকে তিন মিনিট। তবু, এই তিনটি মুহূর্তকেই কখনও কখনও দশ মিনিটের সমান মনে হয়। দ্রুত পেরোতে গিয়ে হাঁপ ধরে যায় বুকে।

কী ভেবে নিজের দিকে একবার তাকাল নমিতা। চোখ নিচু করে দেখল নিজেকে। এ কদিনে কি একটু রোগা হয়ে গিয়েছি; মনে মনে যেন নিজের সঙ্গেই কথা বলছিল নমিতা। আচ্ছা, আমি দেখতে কেমন! রং আমার কালো নয়; মাঝারি রকমের কিছু একটাও নয়। বরং ফর্সা। হ্যাঁ, নাক, চোখ, কপাল কী ভুরু আমার একেবারে নিখুঁত না হলেও খুব খারাপ হয়তো নয়। আর চশমার জন্য আমাকে আরও সুন্দর দেখায়। এ কথা না-হোক হাজার বার বলেছে সোমনাথ। ইউনিভার্সিটির সহপাঠিনী বন্ধুরাও বলেছে। সোমনাথের স্তুতি আমার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বন্ধুদের কথা একেবারে অবিশ্বাস করতে পারি না। ....

ভাবতে ভাবতে টার্মিনাসে এসে পৌঁছুল নমিতা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছিল একটা বাস। দ্রুত উঠে পড়ল সে। পিছনের দরজার গা-ঘেঁষে লেডিজ সিটটা খালিই ছিল। আগে ছাতাটা রাখল নমিতা, তারপর নিজে বসল।

মেঘ-মেঘ করেছে আকাশটা। মেঘের কোল ঘেঁষে রূপালি রোদ যেন সরু পাড় বুনে দিয়েছে। তাকিয়ে দেখছিল নমিতা। আরও একটা বাস বোধহয় যাত্রা শেষ করে টার্মিনাসে এসে থামল। লোকজন, ছুটোছুটি। বেহালাগামী চোদ্দো নম্বর বাসটাও এই সময় এসে থেমেছে। দু-একজন করে এই বাসেও উঠল কয়েকজন। বেশ ঠাসাঠাসি ভিড়। দশটা পনেরো এখন। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে এইবার ছাড়বে বাসটা। নড়েচড়ে বসল নমিতা।

তারপর.... হঠাৎ চোখে পড়ল।

ছেলেটা আসছে: সাদা ধুতি, হাত গোটানো ফুল শার্ট। মাথার কোঁকড়া চুলগুলো অযত্নে পরিপাটি। ঈষৎ পুরু ঠোঁট আর চাপা চিবুকে সেই রমক দুষ্টুমি-ভরা হাসি। অপলকে দেখল নমিতা। বাসটা ছাড়ব ছাড়ব করছে। ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আরও যারা ছিল, তারাও এবার উঠে পড়ল। কারোর মুখের সামনে হাত বাড়িয়ে কন্ডাকটর হাঁক দিল, 'টিকিট!'

ছেলেটা তবু দাঁড়িয়ে। আজ কি এই উঠবে না। দশটা কুড়ি তো হল। অবশ্য এখন

ও অনেকটা কাছে, বাসের প্রায় গা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ ফিরিয়ে নেহাত অন্যমনস্কের মতো তাকাচ্ছে এদিক ওদিক। মাটি দেখছে ; দার্শনিকের মতো ভুরু টান করে আকাশ। মুঠোয়-ধরা সিঁদুর-গোলা-রং মলাটের বইটা চোখে পড়ছে। দেখাচ্ছিল নমিতা।

বাস ছাড়ল। টুক্ করে উঠে পড়ল ও। পাশ ফিরে গলা বাড়িয়ে দেখল নমিতা। হ্যাঁ, উঠেছে; পাশ কাটিয়ে জায়গা খুঁজছে। কোথায় দাঁড়াবে ও! নিশ্চয় আমার সামনে। দাঁড়াল। এমনভাবে দাঁড়াল, যেন ও আমাকে আগলে, পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হাঁটুর কাছে শাড়ির উপরে শার্টের প্রান্ত ছড়িয়ে পড়েছে। ভিড়ের চাপে শরীরটা ঝুঁকে পড়েছে নীচে। মাথার উপর রডটা এক হাতে ধরে টাল সামলাচ্ছে কোনওরকমে । চোখ তুলে একবার মুখের দিকে তাকাল নমিতা। না, বাইরে পথের দিকে দৃষ্টি, তাকে দেখছে না। চোখ ফিরিয়ে আবার অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করল নমিতা।

হু হু করে ছুটে চলেছে বাসটা। খাল পেরিয়ে, দুর্গাপুর ব্রিজ পেরিয়ে বাঁক ঘুরল। দম-চাপা ভিড়ে কেমন একটা অস্বস্তির গুমোট। যেন হাঁপাচ্ছে। দুহাতে দূরের মানুষটাকে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। উষ্ণ দীর্ঘ একটা নিশ্বাস কপাল ছুঁয়ে ঠোঁটের ওপর পড়তেই নমিতা চমকে উঠল। হাতের ইংরিজি বইটা হাত বদল করল ছেলেটা। ভিড়ের চাপে আরও ঘন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু স্থির, নিষ্কম্প, অবিচল। যেন প্রচণ্ড ভিড়ের আক্রমণ থেকে সাবধানে নমিতাকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলেছে ও।

কী বই ওটা। আড়চোখে পড়বার চেষ্টা করল নমিতা। সহসা সঙ্কুচিত হল। ছেলেটা তাকে দেখছে। অন্যমনস্ক হবার ব্যর্থ চেষ্টায় মনের মধ্যে চিন্তার সুতোগুলোকে আর জট পাকাল নমিতা। এই জটিলতার চেয়ে ভয়াবহ আর কিছুই বুঝি নেই।

আমার নাম নমিতা, মনে মনেই সুতো ছিঁড়ছিল ও, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের ছাত্রী। আজ পাঁচমাস হল আমার বিয়ে হয়েছে; বি এ পরীক্ষা আর রেজাল্ট বেরনোর মাঝামাঝি সময়ে। বিয়ে জিনিসটা সত্যি কী এবং কেমন, তা এখন আমার চোখে তেমন স্পষ্ট নয়। সোমনাথ বহরমপুরে ভাল চাকরি করে; ছুটিতে কলকাতায় বেড়াতে এসেছে। সব মিলিয়ে — মুহূর্ত, ক্ষণ, সময় কী দিনের টুকরো অংশগুলোকে একসঙ্গে জোড়া দিলে সোমনাথকে সবসুদ্ধ এক মাস দেখেছি আমি। বয়সের তুলনায় ওকে কেমন একটু বেশি বুড়ো বলে মনে হয়। বন্ধুরা ওর সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করলে আমি চুপ করে থাকি; কিছু বলতে পারি না। যার সম্বন্ধে বেশি জানি না, কিংবা হয়তো কিছুই জানি না, তার বিষয় নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই কিছুক্ষণ আগে, বেরোবার সময়, ওর কথা শুনতে বিশ্রী লাগছিল আমার।

হঠাৎ একটা খোঁচা খেয়ে চোখ ফেরাল নমিতা। ভিড়ের চাপে কালো কালো অসংখ্য মাথা যেন ছটফট করছে। ছেলেটার হাতের বইটা নমিতার হাতের উপর পড়ে ছুঁচের মতো বিঁধছে। নমিতা ভাবল হাতটা সরিয়ে নেয়; কিন্তু সরাল না।

ছেলেটা হাসছে। কেন কে জানে। যেন এই ভীড়, এত লোকজন, ঠেলাঠেলি আর ঘাম কোনও কিছুই তাকে স্পর্শ করছে না। বোকার মতো চোখ করে দেখতে লাগল নমিতা।

আজ কদিন ধরে — বারো-তেরো দিন হবে; এমনি করে একই জায়গায় ছেলেটাকে

দেখছে ও। হ্যাঁ, রোজই প্রায়। মধ্যে হয়ত একদিন কি দুদিন বাদ পড়েছে। এই রুটের বাসযাত্রীদের অনেকেরই মুখ তার পরিচিত। কোনওদিন এর সঙ্গে, কোনওদিন ওর সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু এমন নিয়মিত নয়। শুধু তাই নয়; বসবার সুযোগ পেয়েও যেন ও বসতে চায় না; দু-পা এগিয়ে কী বাসের-অন্য কোনও দিকে ফাঁকা জায়গা পেয়েও সরে দাঁড়াতে চায় না। যেন নমিতার সামনে, নমিতাকে আগলে না দাঁড়ালে ওর চলে না! প্রতিদিনই লক্ষ করতে নমিতা।

কত বয়স হবে ছেলেটার! নিজেকে প্রশ্ন করছিল নমিতা। একুশ বাইশ কি? আমার বয়স একুশ। শরীরের গঠন মজবুত হলেও খুব লম্বা-চওড়া নয় ছেলেটা। তার আমার চেয়ে লম্বা নিশ্চয়। নমিতা ভাবছিল।

কোথায় যায় ও? কোনও কাজ টাজ করে, নাকি পড়াশোনা করে! কাজটাজ করে বলেই মনে হয়। আমি ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত যাই। কিন্তু ও তো অত দূর যায় না। থিয়েটার রোড আর পার্ক স্ট্রিটের মাঝামাঝি একটা স্টপে নেমে পড়ে। নামবার আগে একবার আমার মুখের দিকে তাকায়। স্টপ ছেড়ে হুশ্ করে বাসটা এগিয়ে যাবার পরও কিছুক্ষণ পর্যন্ত।

এর মধ্যে একদিন ও আমার পাশে বসেছে। অবশ্য আগেই আমার অনুমতি চেয়ে নিয়েছিল। অদ্ভুত শান্ত, নিরুত্তাপ সে-কণ্ঠ! আমি দ্বিধা করিনি, ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়েছিলুম। ও বসেছিল, একটা ইংরাজি ম্যাগাজিন খুলে পড়েছিল । আমার হাতে ওর হাতে ছুঁয়েছিল, কাঁধে কাঁধ । আর সমস্ত বাসসুদ্ধ লোক যেন জ্বলন্ত চোখ গিলছিল আমাদের; এবং তারপর আরও একজন মহিলা উঠতেই একসঙ্গে অনেকগুলো কণ্ঠ ওকে জায়গা ছেড়ে দিতে বলল। ও উঠল; বেশ হাসি-হাসি মুখেই উঠে দাঁড়াল। সেই সময় বেচারার জন্যে সত্যি দুঃখ হচ্ছিল আমার।

এমনি রোজ। ওর বইয়ে আমার হাত ঠেকে যায়; শাড়িতে শার্ট, জুতোয় জুতো; এবং এই কদিনের মধ্যেই কোনও কোনও দিন আঙুলে আঙুল। মধ্যে মধ্যে নিশ্বাস ফেলে ও; শুনতে পাই আমি। তার দু-একটা উষ্ণ হাওয়া কখনও বা ছুঁয়ে যায় আমাকে।

সার্কুলার রোডে কাছাকাছি আসতেই একটা আকস্মিক শিহরনে চমকে উঠল নমিতা। ভিড়ের চাপে তার একেবারে মাথার কাছে ঝুঁকে পড়েছে ছেলেটা; হাঁটুতে হাঁটু ঠেকছে, কাঁপছে; আর —সহসা একটা তীব্র যন্ত্রণার মধ্যে অনুভব করল, তার পায়ের আঙুলগুলো প্রবল চাপে যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ গা জ্বালা করল নমিতার। কানের পাশে, গালে, কপালে যেন আগুন ছুটতে লাগল। নিজেকে সংযত করে কুঁকড়ে জড়োসড়ো হয়ে বসল নমিতা। অসহিষ্ণু বিক্ষোভে গলা জ্বালা করতে লাগল। চশমার কাচটা বার বার ঝাপসা হয়ে আসছিল।

মুহূর্তে আত্মদর্শন হল নমিতার। হঠাৎ মনে পড়ল, কলকাতা শহরে এমন বদ শয়তান অনেক আছে। পথে-ঘাটে এমন শয়তানির গল্প প্রায়ই শুনতে পায়। এমনও হতে পারে, অন্তত হওয়া আশ্চর্য নয় যে, ছেলেটা কোনও খারাপ মতলবে তার পিছু নিয়েছে; তার ওপর নজর রাখছে; অনুসরণ করছে রোজ।

পার্ক স্ট্রিটে বাস থামতেই ছেলেটি নামবার জন্য ব্যস্ত হল। তেমনি বোকা-বোকা, হাসি-হাসি মুখ; যেন নমিতার জ্বালার এতটুকু তাকে স্পর্শ করেনি।

বাস ছেড়ে দেবার পরও বাকি পথটুকু আনমনার মতো ভাবতে লাগল নমিতা। বাসের ভিড়ে অবশ্য এমন পা চিপে যাওয়া, কি গা ছোঁয়াছুঁয়ি হয়েই থাকে। এই ভিড়ের মধ্যে যখন কেউ কারও দিকে ভ্রুক্ষেপ করবার সুযোগ পায় না; সময়ও নয়; তখন এই রকম দু-একটা অতি সাধারণ ত্রুটি হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। হতে পারে, ছেলেটির মনে সত্যিই কোনও দুরভিসন্ধি নেই। কিন্তু সত্যিই যদি কিছু লোক থেকে থাকে; কু মতলব বা আরও কিছু, তা হলে? মুহূর্তে আত্মবোধ উষ্ণ হয়ে উঠল নমিতা। না, এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। তাছাড়া মেয়েছেলে হিসাবে আমার একটা নিজস্ব মর্যাদা রয়েছে! যখন যার ইচ্ছে খুশি এসে সেই মর্যাদার আঘাত করতে চাইবে, তাই বা কেমন করে হয়।

না, হয় না।

শুনে কিছুক্ষণ গম্ভীর থাকল সোমনাথ। শাড়ির আঁচল আঙুল জড়িয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল নমিতা; তাকিয়ে দেখছিল সোমনাথ। কিছু ভাবছিল যেন। তারপর চাপা স্বরে বলল, 'আগে বলোনি কেন? কদিনই তো হল।'

শুকনো হেসে নমিতা বলল, 'দেখছিলুম কদূর যায়।'

'খুব মজা পাচ্ছিলে না?'

'ছিঃ!' ক্ষুব্ধ চোখে এক মুহূর্তে সোমনাথকে লক্ষ করে চোখ নিচু করল নমিতা : 'তোমাকে বলাই আমার অন্যায় হয়েছে।'

চোখ ছোটো করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে স্ত্রীকে দেখল সোমনাথ। তারপর হেসে বলল, 'ঠাট্টা ইয়ার্কি বোঝো না! তুমি সেই পাঁচ মাস আগে যেমন ছিলে তেমনই থেকে গেছ।'

নমিতা সাড়া দিল না।

সোমনাথ বলল, 'কাল আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি। নিজের চোখে দেখে নেওয়া ভাল। বিশেষ কিছু দেখলে ইডিয়টটাকে হাতে-নাতে ফল পেতে হবে।'

হয়তো সোমনাথকে বলা ঠিক হল না, ভাবছিল নমিতা সোমনাথ চলে যাবার পর; তবু এই ভেবেও মনে মনে খুশি হচ্ছিল যে, লোকটার মনে সত্যিই যদি কোনও খারাপ মতলব থাকে, অন্যায় এবং আপত্তিকর কিছু, তবে তার ফল তাকে পেতে বই কি। পথে-ঘাটে এইভাবে নিঃসঙ্গ মেয়েদের অসহায়তার সুযোগ নেওয়ার পিছনেই বা আর কী অর্থ থাকতে পারে!

নটার সময় সোমনাথ এসে সামনে দাঁড়াল। নমিতা তখন জানলায়; হয়তো রোদ দেখছে। ক-মুহূর্ত দেখে একটু কাশবে কিনা ভেবে সোমনাথ বলল, 'এ কী, তুমি এখনও দাঁড়িয়ে! প্রোগ্রাম ভুলে গেলে?'

চোখ ফিরিয়ে শুষ্ক হাসল নমিতা : 'এত তাড়াতাড়ির কী আছে!'

'তাড়াতাড়ি!' সোমনাথ বিস্মিত। 'অন্যদিনে তো এতক্ষণে তোমার অর্ধেক সাজ হয়ে যায়!'

'আজ আর সাজব না।' অদ্ভুত হাসছিল নমিতা।

'সে কী !' সোমনাথ বলল, 'না সাজলে তার নজরে পড়বে কেমন করে!'

'থাক ।' দাঁত ঠোঁট কামড়ে নমিতা বলল, 'ঠিক দশটায় আমি তৈরি থাকব।'

আরও কিছু বলবার জন্য তৈরি হচ্ছিল সোমনাথ। কিন্তু নমিতার ইচ্ছে তাকে বলতে দিল না। আরো কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে , অন্যমনস্ক নমিতার দিকে আরও একবার তাকিয়ে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল সোমনাথ।

ফিরল একটু পরে। অন্তত নমিতার তাই মনে হয়েছিল। চুলের ফিতের একটা দিক দাঁতে চেপে ধরে ব্যস্ত হাতে বিনুনি বুনতে বুনতে সোমনাথের দিকে না তাকিয়েই বলল, 'দশটা কি এর মধ্যে বেজে গেল?'

'আর ছ-মিনিট মাত্র দেরি।' সোমনাথ বলল, 'ছ মিনিটে কি তুমি তৈরি হতে পারবে?'

তোয়ালেয় মুখ মুছে চশমা পরতে পরতে নমিতা বলল, 'চলো, আমি তৈরি।'

'সে কী! এই বিধবার সাজে বেরোবে নাকি!' শান্ত বিস্ময়ে সোমনাথ বলল।

মনের বিরক্তি কোনওরকমে চেপে আস্তে আস্তে নমিতা বলল, ' সাজ দেখবার জন্যে তো বেরোচ্ছি না। তা ছাড়া বিধবার সাজে সাজলেই কেউ বিধবা হয়ে যায় না।'

অস্বস্তির আভাস পেয়ে চুপ করে গেল সোমনাথ।

টার্মিনাসে এসে পৌঁছল দুজনে। দশটা পাঁচ। একটা বাস দাঁড়িয়ে ছিল। ফুটবোর্ড পর্যন্ত ভিড়ে ভারী; লেডিজ সিটগুলো পর্যন্ত খালি নেই। বুকের মধ্যে একটা নিশ্বাস চাপল নমিতা। তারপর চোখ চঞ্চল হল।

চতুর শিকারীর মতো তীক্ষ্ণ চোখে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঠোঁট চেটে সোমনাথ শুধোল, 'কই এসেছে নাকি? দেখতে পেয়েছে?'

নমিতা জবাব দিল না। ও তখন খুঁজছিল । বাসের ভিতরে যতদূর দৃষ্টি যায় এবং বাইরে, পেল না। নমিতা নিজে অবশ্য এই সময়ের বাসটায় কোনওদিন যায় না। সে-ও নয়। অন্তত যাচ্ছিল না।

বাসটা ছেড়ে গেল। পরের বাসটাও হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছিল। এই বাসটায় গেলে ঠিক সময় ইউনিভার্সিটি পৌঁছানো যায়। ছোটো মতন একটা ভিড় এর মধ্যেই জমে উঠেছিল বাসের ভিতরে, বাইরে আশেপাশে। হয়ত এবার ও আসবে; যেমন অন্যদিন আসে। তেমনি হাসতে হাসতে, চাপা চিবুকে হাসি ফুটিয়ে, অযত্ন পরিপাটি চেহারায়, হাতে বই , উদাস দার্শনিকের মতো মাটি এবং আকাশ দেখতে দেখতে। ভেবে ছটফট করেছিল নমিতা। কেমন এক ধরনের নতুন অস্বস্তিতে ঝিমঝিম করেছিল সমস্ত স্নায়ু।

সোমনাথ বলল, 'তুমি ঠিক লক্ষ করেছ তো?'

কথাগুলো বিশ্রী, বিরক্তিকর মনে হল নমিতার। সোমনাথের মুখের দিকে তাকাল; কিন্তু কোনও জবাব দিল না।

এই বাসটাও বুঝি ছেড়ে যায়। ব্যস্ত চোখে খুঁজল নমিতা। না, এল না এখনও। আগেই কিছু আভাস পায় নি তো। নমিতা ভাবছিল।

'চলো বাসে ওঠো,' সোমনাথ বলল, 'আর দেরি করলে ক্লাসের দেরি হয়ে যাবে।'

কী ভেবে নমিতা বলল, 'আর একটু দাঁড়াও। একটা ব্যবস্থা তো হওয়া দরকার। আর ক্লাস আমার কাজ একটু দেরিতেই।

কিন্তু এল না। এই বাসটাও ছেড়ে গেল। পরেরটা এল ; এগারোটা বাজতে পঁচিশ তখন। কেমন একটু চিন্তিত দেখাচ্ছিল নমিতাকে। সোমনাথও যেন কেমন হতাশ হয়েছে।

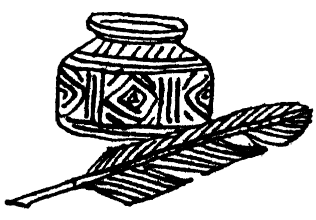
ও আমার পিছু নেয়, আমাকে অনুসরণ করে; সুতরাং না এসে পারবে না। নমিতা ভাবল, দূরের দিকে তাকিয়ে। ব্রিজের স্টপে উঠবে না তো ! ইদানীং টার্মিনাসে এসে দাঁড়ালেও, গোড়ার দিকে ব্রিজ থেকেই বাস ধরত ও। হতে পারে।

আচমকা নমিতা বলল, 'চলো।'

বাসে উঠল দুজনে। নমিতা এবং সোমনাথ। নমিতা বসবার জায়গা পেলেও সোমনাথ পেল না। অন্যদিন ছেলেটি যেমনভাবে ও যেখানে দাঁড়ায়, ঠিক তেমনিভাবে এবং সেখানে দাঁড়াল সোমনাথ। স্পষ্ট, যেন নমিতাকে আগলে, পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। জানলার বাইরে তাকিয়ে উদ্‌বিগ্ন হল নমিতা।

ব্রিজ-স্টপও পার হয়ে গেল। দ্রুত বাঁক ঘুরল বাস। সে এল না; উঠল না; জায়গা খুঁজে নিল না, নমিতার বুকে একটা অবুঝ বেদনা ক্রমশ ঘন হচ্ছিল।

ভিড়ের চাপে সামনে ঝুঁকে পড়েছিল সোমনাথ। নিশ্বাস ফেলল একটা। নমিতার মনে হল কিলবিলে একটা সাপ যেন পিছলে গেল তার মুখের ওপর দিয়ে। মুখ সরিয়ে নিল নমিতা। তার হাঁটুতে সোমনাথের হাঁটু ঠেকছিল; কখনও হাতে হাত বা আঙুলের আঙুল। তীব্র অস্বস্তিতে নিজেকে সঙ্কুচিত করে নিচ্ছিল নমিতা। যেন এ স্পর্শ সে চায়নি; যেন সোমনাথ তাকে অনধিকার স্পর্শ করছে। যেন এ-স্পর্শে অন্য দিনগুলির সেই অসাবধান মাধুর্য আর মাদকতা নেই। পাশের সিট খালি হলেও ও সোমনাথকে বসতে বলল না। একটার পর একটা হতাশার স্টপ পার করে দিতে দিতে ছাড়া-ছাড়া অসংলগ্নভাবে কত কী যে ভাবছিল। এবং সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে একথাও ভাবছিল; আজকের এই অবসন্ন যাত্রার জন্য সে কি আগেই সবকিছু জেনেশুনে প্রস্তুত হয়েছিল। নইলে হঠাৎ তার নিজেকে এমন বিধবা-বিধবা মনে হচ্ছে কেন!



মুরগি

বাণী বসু

মহাত্মা চন্টিক্লিয়ার, অর্থাৎ যিনি পরিষ্কার সুরে গেয়ে থাকেন, সেই মোরগপতি মারাঠাওয়াড়ার তেলিয়া গাঁওয়ের বর্ধিষ্ণু খামার খোন্দকার্স ফার্মের মুরগিঘরের ঢালু ছাদে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে মোরগকোশ রাগের তারসপ্তকে আলাপ ধরলেন— কোঁকর কোঁ, কঁক্ কঁ কঁ কঁ কঁ-অ -অ-অ। আকাশ-বাতাস চমকে উঠল। সুজ্জিবাবু বললেন, 'আরে যাই যাই, একটু সবুর করো। কাছাকোঁচাটা সামলে নিই।' পুঁচকে রোগা খাল, খালের ধারের ঢালু জমি, খামারের আর সব পোষ্য, আকাশের নীল, বাতাসের হররা, সবার মুখে প্রশ্নচিহ্ন। ব্যাপার কী! ব্যাপারখানা কী! মহিষেরা গলা উঁচু করে বলল, 'গাঁ -আঁ-আঁ.... তার আগে জানা চাই ব্যাপারটা -আ।' ভেড়ার দলে ভ্যাঁ ভ্যাঁ কান্নার রব উঠল। এ নিশ্চয়ই একটা প্রলয়ংকর ব্যাপার হতে যাচ্ছে। সব ডুবে যাবে, ভেসে যাবে সেই সুনামির মতো, সেই ভূমিকম্পের মতো —নির্ঘাত মরণ! কেউ একবার ভেবে দেখলে না, মরণের জন্য প্রলয়ের দরকার কেন হবে তাদের? প্রতি দিনই তো ভেড়ারা ল্যামচপ হয়ে যাচ্ছে, সিজনে সিজনে ন্যাড়াবোঁচা হয়ে যাওয়া তো তুশ্চু কথা! গরুরা ভিল, রিফ হয়ে যাচ্ছে। শুয়োরেরা বেকন, হ্যাম, পর্ক, নানান রকম হচ্ছে। আর মুরগিদের তো কথাই নেই। মিনিটে মিনিটে গোটা মুরগি, কাটা মুরগি চালান যাচ্ছে বড় বড় ভ্যানে করে। বিজ্ঞানসম্মত দুধ-দোয়াখানাতে দুগ্ধপাত হচ্ছে চমৎকার, মারখানাতে জবাই হয়ে যাচ্ছে যাবতীয় ভক্ষ্য প্রজাতি। প্রলয় এর চেয়ে খারাপ কী করবে?

মহাত্মার গিন্নি আছে অজস্র। হারেম ভর্তি। জনা কয়েক মহাত্মা মিলে এই পাখি-খামারের প্রজনক। কিন্তু বেশিরভাগই ডিম পাড়া গিন্নি। বাছা বাছা কিছু গিন্নি আছে, যারা জেনারেশনেটের জন্ম দেবে। খামারে তাদের খাতির আলাদা। সব গিন্নির বড় গিন্নি পাটরানি ঘরের ফোকর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল— 'কঁক কঁ কী কী? হঠাৎ উদাত্ত গীতি?'

চন্টিক্লিয়ার দুপায়ে ভর দিয়ে আরও লম্বা হয়ে, গলা বাড়িয়ে গাল ফুলিয়ে রাগের আরোহ-অবরোহটি সাধলেন। কোঁকর কোঁ-ও-ও করে উর্ধ্বে চলে যাচ্ছে, আবার কঁৎ করে গোত্তা খেয়ে কঁক্ কঁক্ করে পুনরায় উর্ধ্বগতি। গলার ঘন ব্রাউন রঙের সঙ্গে নীল মিশে

ব্রাহ্ম মুহূর্তের গায়েই বুঝি রং ধরে গেল! আকাশ বলে — এমন রং ধার দেবে দাদা? গাছপালা বলে— আমরা আরও নিকটজন, পেতে হলে আমরাই পাব, কেমন কি না! লাল লতপতে ঝুঁটিটি জবাগুচ্ছের মতো ফুটে উঠেছে। গলার তলার বিউটি ঝালরটি দুলছে — চন্টিক্লিয়ার ঘাড় এ-দিক ও-দিক করে সুড়ুৎ করে মুখ নিচু করে বললেন, 'সুদিন আসছে।'

'সুদিন?'

মুরগিরা সরু গলায় বলল, 'আমাদের কি উইচিংড়ি ভাজা খেতে দেবে?'

ভেড়ারা ভ্যা ভ্যা করে বলল, 'বোধহয় কাবলি ছোলা।'

গোরু-মোষেরা বলল, 'টাটকা ঘাসের সঙ্গে আখের গুড় মিশিয়ে দেবে, সোনালি খড়ের কুচি দিয়ে সাজানো। যা খেতে না!' শুয়োরেরা ঘোঁত ঘোঁত করে কী বলতে গিয়েছিল, অন্যরা থামিয়ে দিল— 'তোরা আর বকসিনি। যা টেস্ট তোদের! চুপ কর চুপ কর, চুপ কর!'

ছুঁচলো মুখ গোমড়া করে শুয়োরেরা চুপ করে গেল। সুদিন এলে নিশ্চয়ই তাদেরও আসবে। কী, কেন, কেমন, এ সব জিজ্ঞেস করে মিছিমিছি দাবড়ানি খাওয়া কেন?

দেশে দেশে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, সব, সব। সব দেশেই কোনও না কোনও মদনমোহন রতিকান্ত মোরগকর্তা গাল-গলা ফুলিয়ে গান করেন আর জানান দেন—'সুদিন আসছে।'

কেমন সুদিন? মোরগকর্তা জানেন না। প্রকৃতি তাঁকে সুদিন দুর্দিনের আঁচটুকু পাওয়ার ক্ষমতা দিয়েছে, তার চেয়ে এক কড়া বেশি নয়। তবে চালাক কর্তা সে কথা বললেন আর কী! সমবেত জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি গেরেম্ভারি চালে বললেন, 'কেমন সুদিন চাস তোরা?'

শাদা শাদা ব্রয়লাররা গাদাগাদি খাঁচাখুঁচির ভেতর থেকে কোনও মতে জবাব দিল— 'এই খাঁচা থেকে বেরোতে চাই, ঘুরবে-ফিরব, দেখব-শুনব। তবে জবাই হতে নয়।' অন্যরাও সব একবাক্যে বলল, 'পৃথিবীটা ভেজ হয়ে যাক না! আমরা কেউই জবাই হতে চাই না।'

চন্টিক্লিয়ার বললেন, 'তবে তাই হোক। তথাস্তু।' বলে তিনি ঘুমোতে লাগলেন। প্রশ্নোত্তর পর্ব বেশিক্ষণ চলতে দিলে সমূহ বিপদ। কেননা, তিনি কিছুই জানেন না, খালি একটা আঁচ পান।'

তবে, মহাত্মার কথা ফলতে দেরি হল না। হঠাৎ কথা নেই, বার্তা নেই, মুরগি চালান বন্ধ হয়ে গেল, রফতানি তো বটেই। দেশেও ভ্যান ভ্যান মুরগি-গাড়ি আর দেখা যায় না। মহাত্মা ঘাড় নিচু করে বললেন, 'কী? কী বলেছিলুম্‌ম্‌ম্‌।'

ব্যাপারটা শুরু হল ইন্দোনেশিয়ার মস্ত খামারু সুধন্যপুত্রর লট-কে-লট বাছা বাছা মুরগি ইয়োরোপ থেকে ফেরত আসা দিয়ে। বললে, 'রুগণ্ পাখি দিয়েছ। সব চোখ লাল, ঘুষঘুষে জ্বর। তোমাদের সঙ্গে পাখি রফতানির চুক্তি খতম।' অবাক কাণ্ড —পাঠালুম তাজা পদ্মের কলি! কোনও কালো ঝড় আসিল রে, পড়িয়াছে ঢলি? সেই একই বৃত্তান্ত

সব রফতানিকারকদের। কোনও ভেট ধরতে পারে না। শেষে সব দাদার দাদা বড়দারা বলে পাঠালেন, এ হল গিয়ে বার্ড রোজিওলা। এক রকমের মারাত্মক মিজ্‌ল্‌স, যাকে বাংলায় বলে হাম। খুব সম্ভব যাযাবর পাখি থেকে এসেছে। বন্য প্রাণী থেকে গৃহপালিততে? আসে না তো কখনও! হাঁ করে থাকে খামারুগণ। বড়দা ধমকে বলেন, 'এসেছে, আবার আসে না কী? আফ্রিকা থেকে এড্‌স আসেনি? ইন্ডিয়া থেকে ম্যালেরিয়া আসেনি? দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্লু আসেনি? মানুষের ছোঁয়াচ লাগবে। আটচল্লিশ থেকে বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে মানুষ মারা যেতে পারে বাপ! ফুসফাস জ্বর, চোখ দুটি লাল, খিঁচুনি। ভাইরাস এইচ এন আর-থার্টিন এর নাম।'

রাতভর ল্যাবরেটারিতে জেগে যুক্তরাষ্ট্রের সেজ ওষুধ কোম্পানির মেজ কেমিস্ট সদ্য-ভোরে বাইরে এসে আড়মোড়া ভেঙে একটা মস্ত হাই তুললেন। কাছেপিঠে কেউ নেই, তবু তিনি অর্থাৎ মিঃ পিটারসন শূন্যের দিকে মুখ তুলে কাকে যেন বললেন 'এক্সকিউজ মি প্লিজ।' কী অর্থে বললেন, কিছুই বোঝা গেল না। তবে, পিটারসনের মুখে একটি জয়মাল্য হাসি, সেই সঙ্গে কেমন একটা অদ্ভুতুড়ে ছায়া। সব মিলিয়ে তাঁকে ঠিক বোঝা গেল না।

কাঁটায় কাঁটায় এগারোটায় জরুরি মিটিং। মেজ কেমিস্ট লক্ষণীয়ভাবে অনুপস্থিত। 'কী ব্যাপার, পিটারসন আসেনি কেন?' ম্যানেজিং ডিরেক্টর জিজ্ঞেস করলেন চিফ কেমিস্টকে। তিনি সেলফোনে যোগাযোগ করলেন। কিছুক্ষণ 'উই শ্যাল ওভারকাম' বাজার পর ঘোঁত করে পিটারসন বললেন, 'ডান।' তার পরে তাঁর নাসিকাগর্জন এবং সেলফোন অফ। চিফ কেমিস্ট বললেন এম ডি-কে। এম ডি বললেন, মার্কেটিং ম্যানেজারকে। তিনি বললেন আর সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে।—ডান। একটা চাপা আহ্লাদ ঘুরতে লাগল মুখ থেকে মুখে।

ব্যবসা মানেই লাভ লোকসান। হয় কাঁটা ওপরে, নয় নীচে। কাঁটাটা একটা সভ্যভব্য জায়গায় স্থির দাঁড়িয়ে থাকলে ব্যবসাদার খুশি। স্টেডি প্রফিট। কিন্তু, দিন বদলায়, এখন ঠ্যালার নাম বাবাজীবন। বাজার আনুভূমিক যাচ্ছে, আনুভূমিক যাচ্ছে অমনি সব নতুন কায়দা, নতুন আইডিয়া আঁক কষা শুরু হয়ে গেল। আইডিয়া এসেছে, এবার লাভ উল্লম্ব হবে। যাক। এখন ইন্টারন্যাশানাল ড্রাগ অ্যান্ড মেডিসিন কন্ট্রোল বোর্ডের কাজটুকু ভালয় ভালয় হয়ে গেলেই সব দিক থাকে।

দীনবন্ধু পাখিরা শুনে অবাক। তার আপিসে আন্তর্জাতীক ওষুধ কোম্পানির এক সাহেব নিজে এসেছেন, সঙ্গে ভেটেরিনারি, ইন্সপেকশন করবেন। নালিশ এসেছে; রুগ্‌ণ পাখি পাঠাচ্ছে তৃতীয় দুনিয়া, সেল বন্ধ করে দিচ্ছে। রফতানি বন্ধ। সবে রফতানিটা ধরেছিল দীনবন্ধু। তার কাজ-কারবার যাকে বলে নিয়মমাফিক। সে ঘাবড়ায় না। করো বাবা, ইনিসপেকশন করো। এ অঞ্চলের সব চেয়ে বড় পোলট্রি পাখিরার, তার দেখাদেখি আরও কত ছেলে ছোকরা সেল্‌ফ এমপ্লয় করছে ব্যাংক লোন নিয়ে।

সাহেব একটা পাখিকে প্যাখনা ধরে তুলে বলল, 'এই তো।'

ভোট বললে, 'শিওর!'

'কী শিওর? কীসের শিওর?' দীনবন্ধু শুধোয়।

'যা সন্দেহ করেছিলুম। বার্ড রোজিওলা। বিপজ্জনক পাখি-মড়ক। পাখি ছেড়ে মানুষকেও ধরবে.... বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে ফুসফাস জ্বর, চক্ষু লাল। একেবারে ফেটাল।'

'বলেন কী? এ তো সব আলাদা করে রেখেছি ! একে আমরা বলি, রানিখেত রোগ। ঝিমোয়, চোখ লাল, চুনের মতো পায়খানা করে। ওই যে চিমনি দেখছেন, ওইখানে ওগুলি পুড়িয়ে দিই।'

'উঁহু, এ সব বার্ড রোজিওলা। ম্যাড কাউ ডিজিজ শুনেছেন তো? ইংল্যান্ডে দেখা দিয়েছিল, মানুষের মধ্যেও ছড়ায়। ওরা অমন গো-খোর জাত —বিফ ছাড়া অচল। এক ধার থেকে সব জাবাই করে ফেলেছে —বিফ স্টেক যাদের স্টেপল ফুড্ সেই তারা। এও তাই। ডেঞ্জারাস।'

পাখিরার মাথায় হাত। তার কারবার ফলাও। চেন আছে মুরগির দোকানের। কেনটাকি ফ্রায়েড চিকেন আসছে। পাখিরা লড়াইয়ে রাজি, প্রস্তুত একেবারে। আপামর জনসাধারণের ঘরে এখন চিকেন বেশ চিকণ ভাবে ঢুকে গেছে। প্রাণীজ প্রোটিন সম্পর্কে লোক এখন দারুণ সচেতন। পাঁঠাকে বলছে রেড মিট। সে ভেগে গেছে। বাজার ধরেছে মুরগি। যখন-তখন দেখবে, মুঠো করে ঠ্যাং বেঁধে মুণ্ডু নীচে করে , সাইকেলের রডে মুরগি বেঁধে ছেলে-ছোকরারা যাচ্ছে। মোড়ে মোড়ে খপাত্ করে হাত বাড়িয়ে খাঁচার থেকে চাকবাঁধা এক ঝাঁক পাখি থেকে একটা তুলে নিয়ে খ্যাঁশ করে গলাটা কেটে পালক ছাড়াতে শুরু করে দিচ্ছে মুরগিঅলা। রক্ত ছিটকোচ্ছে, বাবুরা বিবিরা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খোশগল্প করতে করতে কিনছেন। মুরগির মূলধন নিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠেছে সেল্ফ-এমপ্লয়ের ছেলেরা।

সাহেবের ভেট বলে, 'জানেনা না! অন্য অন্য প্রদেশের মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটকে সব রুগ্ণ পাখি মেরে ফেলেছে। রোগ এ বার এসে গেছে পুবের দেশে। তবে হ্যাঁ, যাদের খুব রোগ ধরেছে তাদের মারুন, আর অন্যদের জন্য ভ্যাকসিন বেরিয়েছে।' ওষুধও রেডি। খসখস করে প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন— 'এই নিন। ভ্যাকসিন .... ওষুধ....'

প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে পাখিরা বলে, 'আমরা তো এমনিই ভ্যাকসিন দিই আজ্ঞে। আর ওষুধ তো....'

'না, না, এ স্পেশাল ভ্যাকসিন। স্পেশাল ওষুধ। মার্কিন কোম্পানি থেকে সদ্য বেরিয়েছে। কিনে নিন, লোককে বলে দিন। আর.... অনেক পাখি মারতে হবে তো, কোম্পানি ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে।'

সাহেব একখাম টাকা গুঁজে দিল পাখিরার হাতে। দীনবন্ধু পাখিরা হাঁ করে থাকে। মুরগি মরবে আমার, কমপেনসেট দেবে ওষুধ কোম্পানি? তাজ্জব বটে! এমন বদান্যতা তো ইদানীং -এর মধ্যে.... তার পরেই দীনবন্ধু বোঝে! সেও ব্যবসাদারক কিনা! ওহ্! এই! দীনবন্ধু নিজের রানিখেত মুরগিগুলো যেমন রুটিন মেরে ফেলার, মেরে ফেলে অন্যদের বলে, 'রোজিওলা—নতুন রোগ এসেছে, সব সাবধান ভাইরা! মুরগি মেরে ফ্যালো, ভ্যাকসিন, কোনও, ওষুধ কোনও মুরগি বাঁচাও।'

মুরগির দর হু হু করে-পড়তে লাগল। শেয়ার বাজারের চেয়েও বড় ধস। সব

কাগজ খবরটি ধরে নিয়েছে। তৃতীয় দুনিয়ার বেশ পায়া-ভারী মতো হল। তোদের যদি ম্যাড কাউ থাকে, আমাদের ও তা হলে বার্ড-রোজিওলা আছে! কম যাই না কিছু, আমরাও স্বাস্থ্য-সচেতন, মডুক পাখি খাই না। আমাদের ব্যবসাদারগণও গণস্বাস্থ্যের কথা ভাবেন —মুরগিনিধন যজ্ঞ করেন। তাঁরাও ভ্যাকসিন কেনেন চটপট। ওষুধ কেনেন পটপট। সে সব কিনা রোগ ধরা পড়বার সঙ্গে সঙ্গে উদ্‌ভাবিত হয়ে উন্নত দুনিয়া থেকে এসে গেছে!

বোকারাম জিজ্ঞেস করে, 'রোগ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভ্যাকসিন এসে গেল?'

হাঁদারাম জিজ্ঞেস করে, 'হিসেব করে তো দেখা যাচ্ছে, রোগের আগেই ওষুধটি বেরিয়েছে। দোকনে দোকানে বোঝাই স্টক।'

তাদের বোকামিতে হাঁদামিতে লোক হা- হা ঠা- ঠা করে হাসল। সরকার দিনরাত ঘোষণা করেছে—ভয় নেই, মুরগি সত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াসে কুড়ি মিনিট ফুটিয়ে নিয়ে খান। কিচ্ছু হবে না। কে কার কথা শোনে! ৯০ টাকা থেকে ৭০ টাকা, ৭০ টাকা থেকে ৩০ টাকা। চতুর্দিকে মুরগি নিধন হচ্ছে। ছোট ব্যবসাদাররা অল্প দামে ছেড়ে দিচ্ছে। বড় ব্যবসাদাররা কেউ শ-য়ে শ-য়ে হাজারে হাজারে মেরে ফেলছে। কেউ সত্যি সত্যি মারছে, কেউ বলছে কিন্তু মারছে না। সে এক ভজকট কাণ্ড। মহা-মুরগি ভোজ আয়োজিত হল দিকে দিকে। মিনি-মাগনা ভোজ, লোকে কবজি ডুবিয়ে খেল। মরি মরব, খেয়ে মরব বাবা! সরকারি লোকেরা তদারকি করলেন, কিন্তু কেউ খেলেন না। কেউ বললেন, 'রাত থেকে চোঁয়া ঢেকুর উঠছে, সুদ্ধু গ্লুকোজের জল খাচ্ছি ভাই।' কেউ বললেন, 'ফুরিয়ে গেছে, খাব কী? জনগণেশ খেলেই আমাদের খাওয়া হল।' কেউ আবার মুচকি হেসে বললেন, 'ভেজ হয়ে গেছি, জানেন না?'

তেলিয়া গাঁওয়ের খোন্দকার্সে মহাত্মা চন্টিক্লিয়ার বললেন, 'কেমন, বলেছিলুম্‌ম্‌ না?' সবাই সায় দেয়।

তার পর এক যজ্ঞি শুরু হল বটে। জবাই-যজ্ঞি। যে মুরগি বিক্রি হচ্ছে না, তার খাতির-যত্ন, খাবারদাবার দিনের পর দিন জুগিয়ে যাওয়াও তো লোকসান! তারাও মারা পড়ছে।

দেখেশুনে ঠোঁটটি বুক-পালকের মধ্যে আরও গুঁজড়ে চন্টিবাবু ঘুমিয়ে থাকেন। সরকারি লোকও এখন টহল দিচ্ছে, ডব্লিউ এইচ ও থেকে নাকি সার্কুলার এসে গেছে, আর তো উপেক্ষা করা যায় না।

আরে, এ মোরগটা যে ঝিমোচ্ছে দেখি!

খোন্দকার্সের খোন্দকার হাঁ-হাঁ করে ছুটে আসে— 'ওটি আমার রাজ-মোরগ, মশাই! মাস্টার ব্রিডার। ও সাটিনের বিছানায় ঘুমোয়।' .... বলতে না বলতেই মহাত্মার ছেঁড়া মুন্ডুটি লুটিয়ে পড়ে।

সরকারি লোকের পাশে পাশেই রয়েছে সেজ ওষুধ কোম্পানির ভেট। খোন্দকারের হাতে একটি খাম ধরিয়ে দেয়। বলে, 'মডুকে পাখি রাখা ঠিক না। তবু আপনার মাস্টার ব্রিডার বলছেন— কোম্পানি বাহাদুর ক্ষতিপূরণ চালু করেছেন।'

খোন্দকারের হাহাকার থামে না—'আহা হা হা, আমার অমন মরদ-মস্তান গো!' সে মাথা

চাপড়াতেই থাকে। চাপড়াতেই থাকে। এবং রোজ্জিওলা যেমন হঠাৎ উদয় হয়েছিল, তেমনই হঠাৎ উবে যায়।

সেজ ওষুধ কোম্পানির মাল্টি-বিলিয়ন ডলার ব্যবসা হয়েছে। উপরন্তু দেশের পোলট্রি লাল হয়ে গেছে। রফতানি মালের সঙ্গে আর পাল্লা দিতে হয়নি। খামারুরা, খুশি, জনগণ খুশি, ওষুধ কোম্পানি খুশি, সেনেটের খুশি, প্রেসিডেন্ট খুশি। তাই কোম্পানি মেজ কেমিস্ট পিটারসনকে উপযুক্ত লভ্যাংশ কমিশন দিয়েছে। তাই দিয়ে তিনি এক মস্ত সেলুন-কার কিনেছেন। ফিল্মস্টারদের গাড়ির মতো। ন্যাশনাল হাইওয়ে দিয়ে হু-হু করে গাড়ি ছোটান পিটারসন। এইটিই তাঁর নেশা। লং ড্রাইভ! গান চালিয়ে দিয়েছেন, বিশেষ করে ক্লাসিক্যাল তাঁর আর এক নেশা। বাজছিল মুনলাইট সোনাটা। হঠাৎ রেকর্ডার পিলে চমকানো চিৎকার করে উঠল, 'কঁক কঁ কঁ কঁ —'

পিটারসন এমন চমকে উঠলেন যে, হাত থেকে স্টিয়ারিং পিছলে গেল। সামনে পিছনে ছিল দুটি ট্রাক। মোক্ষম ধাক্কা। ঘটনা-শেষে চ্যাপটা পিটারসনকে আর চেনা যায় না। অবাক কান্ড—ওস্তাদ ড্রাইভার, পেটে অ্যালকোহল নেই, খামোকা এত অ্যান্টি-অ্যাকসিডেন্ট ব্যবস্থা থাকা গাড়ির এমন দশা! এ যে দ্বিতীয় টাইটনিক! শুকনো ডাঙায় আছাড়!

পাখির পরলোক আর মানুষের পরলোক যে এক, তা তো সাহেবের জানা ছিল না! কোটি কোটি মুরগির প্রেতাত্মার সামনে যতই পিটারসনের প্রেতাত্মা জোড়হাত করে, মুরগি-ভূতেরা তাকে ঠুকরে ঠুকরে মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিচ্ছে। বলছে— 'ব্যাটা, আমাদের মুরগি করলি কেন? কেন? বল্‌লল্‌ল্‌!'

পিটারসন তখন বুঝিয়ে বলে, 'আহা, তোমাদের তো ঈশ্বরই মুরগি করে পাঠিয়েছেন, ভাইবোনেরা। আমি করব কী? মুরগি করেছি ওই ওদের, দ্যাখো!'

চন্টিক্লিয়ার-সহ তাবৎ মুরগিকুল গলা নিচু করে দেখলে, পুরো তৃতীয় দুনিয়া ঝুঁটি ফোলানো ঝালর-দোলানো প্রথম দুনিয়ার পেছন পেছন কঁক কঁক করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।



তিন পবিত্র আত্মা এবং চোরাপথে অপ্সরা

সমরেশ মজুমদার

সরকারি হাসপাতাল হলেও ঘরে এককুচি নোংরা পড়ে নেই। বিছানাও ধবধবে। চিকিৎসকরাও ফাঁকি দেওয়া কাকে বলে জানেন না। নার্সরা নিবেদিতপ্রাণ সেবায়। এই রকম এক হাসপাতালের বড় কেবিনে তিনটে বিছানায় শুয়ে আছেন যে তিন জন মানুষ তাঁদের আজই আই সি ইউ থেকে বের করে আনা হয়েছে। তিন জনেরই স্যালাইন এবং অক্সিজেন চলছে। এঁদের বয়স পঁচাশি থেকে ছিয়াশির মধ্যে। কাকতালীয়ভাবে এঁদের একটি মিল আছে। প্রত্যেকের নামের আদ্যক্ষর হল 'ম'। মতিন, মনোরঞ্জন এবং ম্যাকডোনাল্ড। চিকিৎসকরা খুবই চেষ্টা করেছেন এঁদের সুস্থ করে তুলতে, কিন্তু তাঁরা জেনে গেছেন প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে কোনও লড়াইয়ে মানুষ হার স্বীকার করতে বাধ্য। তবু আজ সকালে পরীক্ষার পর একটু আশার আলো দেখা পাওয়ার তিন জনরেই অক্সিজেন মাস্ক খুলে দেওয়া হল। তিন জনেই হেসে বলল, 'ধন্যবাদ ডাক্তার।'

একটু বেলা হলে বালিশে হেলান দিয়ে মতিন বললেন, 'ভাইরা , আমি মতিন। আল্লার অনুগত সেবকমাত্র। সারা জীবন কোরান মেনে চলেছি, আমার সতর্ক দৃষ্টি ছিল যেন কোনও মানুষকে আঘাত না দিই। এমনকী পশুদের ওপরও অত্যাচার করতাম না। ডাক্তার যতই চেষ্টা করুন, আমায় অন্তিম দিন এসে গিয়েছে। আজ আমি মানুষ হিসেবে শেষ নিশ্বাস ফেলব, আপনারা আমার জন্য প্রার্থনা করবেন।'

মতিন চুপ করলে ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'আপনার সঙ্গ পেয়ে আমার খুব ভাল লাগছে। আমিও সারাজীবন বাইবেলের নির্দেশ মান্য করেছি। প্রতিবেশী তো বটেই, অচেনা মানুষকেও সাধ্যমত সাহায্য করেছি। হ্যাঁ আমি এই জীবনে কোনও পাপ করিনি। বন্ধু, আমিও অনুভব করছি, আজই আমার শেষ দিন।'

মনোরঞ্জন একটু কেশে নিয়ে বললেন, 'অদ্ভুত কাণ্ড! খুব ভোরে কেউ যেন আমায় বলল, আজই তোর শেষ দিন। তৈরি হয়ে থাক—আমিও তৈরি। এই পৃথিবীতে অনেক দিন বাঁচলাম। না, আপনাদের মতো কোরান বা বাইবেল আমাদের নেই। বেদ, উপনিষদ, গীতা সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয়েছিল। বাংলাতেও পাওয়া যাবে। কিন্তু ওগুলো পড়ে মনে

হয়েছে এ আমার জন্য নয়। শেষ পর্যন্ত ঠিক করেছিলাম ভাল কাজ কাকে বলে জানি না, কিন্তু কখনওই খারাপ কাজ করব না। আজ অবধি তাই মেনে চলছি। রোজ রাত্রে ঘুমোবার সময় নিজেকে প্রশ্ন করেছি কোনও খারাপ কাজ করিনি তো? যদি মনে হত কোনও কাজে একটু ধন্দ আছে, তা হলে পরের দিনই ছুটে যেতাম সেই মানুষটার কাছে যাকে জড়িয়ে কাজটা করেছি। আন্তরিক ক্ষমা চেয়ে নিতাম। আর,এসব করেছি বলেই আজ, জীবনের শেষ দিনে আপনাদের সঙ্গ পেলাম। ভগবান!'

শেষ শব্দটি স্বগতোক্তির মতো উচ্চারিত হল। মতিন বললেন, 'আমি আল্লাকে স্মরণ করি সব সময়। তিনি নিরাকার। এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই সৃষ্টি। আপনার ভগবানের কোনও সঠিক রূপ আপনি এই মুহূর্তে কল্পনা করবেন?'

মনোরঞ্জন বললেন, 'ভগবানেরও কোনও রূপ নেই, তিনিও নিরাকার , আমরাও বলি এই জগৎ তাঁরই সৃষ্টি। তাঁর রূপ কল্পনা করা অসম্ভব।'

ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'বাঃ! আমার গডেরও কোনও অবয়ব নেই। তিনিও নিরাকার, এই জল-স্থল -আকাশ তাঁরই সৃষ্টি। তিনি বলেছিলেন, আলো জ্বলুক, তাই আলো জ্বলে উঠেছিল। কিন্তু বন্ধুগণ, গড কী রকম দেখতে তা কল্পনাই করতে পারি না। আমি বিশ্বাস করি, এই দেহ ত্যাগ করার পর তিনি নিশ্চয়ই আমাকে হেভেনে নিয়ে যাবেন। জানি না সেখানে তাঁকে দেখতে পাব কি না। তবে নিশ্চয়ই যিশু আর মাদারকে দেখতে পাব। আমি এখনই রোমাঞ্চিত বোধ করছি।'

মতিন বললেন, 'আল্লা নিশ্চয়ই আমাকে বেহেশ্‌তে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। সেখানে অনন্ত শান্তি স্থির হয়ে আছে। সমস্ত ধর্মপ্রাণ যাঁরা পৃথিবীর মানুষের উপকার করে গিয়েছেন তাঁরা কোরান পাঠ করেছেন, নামাজ পড়েছেন, আল্লার দয়ায় শান্তিতে বিরাজ করছেন। আমি তাঁদের পেছনে যদি একটু জায়গা পাই তাহলে ধন্য হয়ে যাব।'

মনোরঞ্জন চুপচাপ শুনছিলেন। এ বার শ্বাস ফেললেন। ম্যাকডোনাল্ড তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার অভিপ্রায় জানতে পারি কি?'

'আপনারা পবিত্র মানুষ। সারা জীবন কত ভাল কাজ করে এসেছেন। আমি ভাল কাজ করেছি কি না জানি না, কিন্তু কোনও খারাপ কাজ করিনি। শুধু এইটুকু সম্বল নিয়ে কেউ স্বর্গে যেতে পারে কি না তাও জানি না। ভগবান যা চাইবেন তাই হবে। স্বর্গে গিয়ে কী করব তা কল্পনা করতে চাই না', মনোরঞ্জন মাথা নাড়লেন।

ম্যাকডোন্যাল্ড বললেন, 'আপনিও কারও খারাপ করেননি, এর চেয়ে ভালো কাজ আর কী হতে পারে। আপনার ভগবান নিশ্চয়ই আপনাকে স্বর্গে যাবার অনুমতি দেবেন। আচ্ছা, আপনার স্বর্গের চেহারা কী রকম?'

মনোরঞ্জন বললেন, 'সাধু-সন্ন্যাসীদের মুখে শুনেছি, বইয়ে পড়েছি, স্বর্গ মানে অপার শান্তির জায়গা। সেখানে কোনও জাগতিক দুঃখকষ্ট নেই। সেখানকার ফুলের নাম পারিজাত। একশো আটজন দেব-দেবী সেখানে অবস্থান করেন। স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের রাজসভায় অপরূপ অপ্সরীরা নৃত্যগীত করেন। এই স্বর্গ দখল করার জন্য অসুররা চেষ্টা করেছে, কিন্তু সক্ষম হয়নি।'

মতিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'বন্ধু, আপনি বললেন না, স্বর্গে ধর্মালোচনা হয় কি না। সেখানে আপনাদের ভগবান থাকেন কি না!'

'এই ব্যাপারটা আমি ঠিক জানি না। পুরাণ বা অন্য বইতে যা পড়েছি তাতে দেখেছি দেবতারা ধর্ম নিয়ে তেমন মাথা ঘামাননি। আমার অনুমান তাঁরা সংস্কৃত কথা বলেন। আমি আবার সংস্কৃত জানি না। যদি সেখানে যাই তাহলে ভাষার সমস্যা হবে। তবে নিশ্চয়ই ইন্টারপ্রেটার পাব। থাকতে থাকতে শিখেও নিতে পারব ভাষাটা। সংস্কৃতকে দেবভাষা বলে এই কারণে। ওখানে গেলে দেবতাদের দেখা পাবই। কিন্তু ভগবান তো জগৎ সৃষ্টি করেছেন। নরক-মর্ত্য-স্বর্গ নিয়ে জগৎ। তাছাড়া মহাকাশে অনেক গ্রহ-নক্ষত্র আছে। সবই তাঁকে দেখতে হয়। শুধু স্বর্গে থাকলে তাঁর পক্ষে সামাল দেওয়া সম্ভব নয়।'

ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'একই সমস্যা আমাদের গডের। তিনিও হেভেনে থাকতে পারেন না। যিশু-সেন্টরা ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টানরা তাঁর মহান সান্নিধ্য পেয়ে প্রতি মুহূর্তে আনন্দিত। আপনাদের স্বর্গের দেবতারা বিবাহিত বলে দেবীরা আছেন, কিন্তু অপ্সরা কেন? তাঁরা তো কোর্ট-ড্যান্সার।'

মনোরঞ্জন বললেন, 'ওঁরা আছেন যাতে দেবতারা বিনোদিত হন। তাঁদের আনন্দ দেওয়ার জন্যই ওঁরা নৃত্যগীত করেন।'

'কিন্তু কোনও কারণে ওঁরা যদি সমস্যা তৈরি করেন?'

'না। এ ব্যাপারে ওঁরা খুব সতর্ক। তবে মন দুর্বল হলে ওঁরা লুকিয়ে চুরিয়ে পৃথিবীতে যে আসেননি তা নয়। এসে কেউ কেউ মা হয়েছেন, কিন্তু সন্তানকে জন্ম দিয়েই ফিরে গেছেন স্বর্গে। তবে ধরাও পড়েছেন কেউ কেউ। তখন শাস্তি হয়েছে। মর্ত্যে থাকতে হয়েছে হাজার বছর। কিন্তু যেহেতু ওঁদের বয়স বাড়ে না, রূপ একই থাকে, তাই মর্ত্যের স্বামী মারা যাবার পর ছেলের বয়সিরা যুবক হয়েই তাদের প্রেম নিবেদন করত। অনেক কান্নাকাটির পর তাঁরা শাপমুক্ত হয়েছেন। অবশ্য এসব বহুকাল আগের ঘটনা। ইদানিং পৃথিবীতে সুন্দরী মেয়েদের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে যে ওঁরা হালে পানি পাবেন না জেনে আর স্বর্গ ছেড়ে আসেন না।'

মতিন বললেন, 'যাই বলুন, এই অপ্সরাদের ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না।'

ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'হেভেনেও ওঁরা নেই। শুধু মাদারই হলেন একমাত্র মহিলা।'

মনোরঞ্জন জিজ্ঞাসা করলেন, 'বেহেশ্‌তের মহিলারা কি সব সময় ধর্মপাঠ করেন?'

মতিন হাসলেন, 'আপনি কোনও খারাপ কাজ করেননি ঠিকই, তবে ভাল কাজ যে করেন নি তা বুঝতে পারছি। আপনার প্রতিবেশীর ধর্ম সম্পর্কে তাই উদাসীন। বেহেশ্‌তে নারী বলতে আছেন হুরিরা। তাঁরা সেবিকা। সেবাই তাঁদের কাজ।'

'সর্বনাশ'! মনোরঞ্জনের মুখ থেকে বেরিয়ে এল শব্দটা।

'তার মানে'? মতিন তাকালেন।

'ওখানে আনন্দিত হওয়ার কোনও উপাদান নেই বলে মনে হচ্ছে?'

বন্ধু আনন্দিত হওয়া বলতে আপনি কী বোঝেন জানি না। আল্লার আশীর্বাদে যে আনন্দ, তা আর কিছুতেই পাওয়া সম্ভব নয়। তাই সর্বনাশ নয়, সর্বময় বলুন। এই পৃথিবীতে বেঁচে

থাকার জন্য যে সব সমস্যার মুখোমুখি আমাদের হতে হয়, তা থেকে মুক্ত হয়ে যাব বেহেশ্‌তে গেলে। তখন আরও নিবিড় করে নিজেকে আল্লার কাছে সমর্পণ করতে পারব। সেটাই প্রকৃত আনন্দ।' মতিন চোখ বন্ধ করলেন।

ম্যাকডোনাল্ড বললেন, 'ঠিক কথা। আপনাদের ওই অপ্সরাদের নৃত্যগীত ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না। শুনেছি যেখানেই ও সব হয় সেখানেই গোলমাল ঘটে যায়। এর জন্য কোনও হাইকোর্ট বারড্যান্সারদের নাচ বাতিল করে দিয়েছেন। অবশ্য এ আপনাদের ব্যাপার।'

মনোরঞ্জন চুপ করে গেলেন। তিনি কোনও খারাপ কাজ করবেন না তাই কোনও খারাপ কথাও বলতে পারেন না।

সেদিন বিকেল পাঁচটা তিন মিনিটে ম্যাকডোনাল্ডের শরীর সাদা কাপড়ে ঢেকে দেওয়া হল। মতিন বা মনোরঞ্জন দৃশ্যটি দেখতে পেলেন না কারণ তখন তাঁরা সংজ্ঞাহীন। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই তাঁদের শরীরের অবস্থা এক হয়ে গেল। চিকিৎসকেরা বললেন, 'তিনজন মানুষ প্রায় একই সময়ে একই ঘরে মারা গেলেন, এটা কাকতালীয় হলেও এই হাসপাতালের রেকর্ড হয়ে রইল।'

তিন জনের আত্মা আগুপিছু পৃথিবী ছেড়ে উর্ধ্বলোকে উঠে যেতে লাগল। যেতে যেতে তাঁরা অনেক স্তর দেখতে পেলেন। বিভিন্ন সেই স্তরে অনেক আত্মা কাতর হয়ে রয়েছেন প্রতীক্ষায়। তাদের আবার পৃথিবীতে গিয়ে জন্মাতে হবে। কবে কখন কোন মায়ের গর্ভে জন্মাবেন তা জানেন না। কিন্তু এই তিন আত্মাকে কেউ থামাল না। সব স্তর অতিক্রম করে যখন তাঁরা স্থির হলেন তখন মতিন বললেন, 'বন্ধুরা, এবার আমাকে যেতে হবে।'

ম্যাকডোনাল্ড জিজ্ঞাসা করলেন, 'নিশ্চয়ই আপনি বেহেশ্‌তে যাচ্ছেন?'

'সেখানে যাওয়ার যোগ্যতা আছে কি না সেটা জানা যাবে একটা পরীক্ষার পর। একটা সরু পুলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে। যদি আমি অযোগ্য হই তাহলে পুলের নীচে পড়ে যাব, জায়গা হবে দোজখে। আচ্ছা, আদাব।'

মতিনের আত্মা সেই পুলের সামনে এসে দাঁড়ালে আল্লাকে স্মরণ করে তিনি ধীরে ধীরে পুল পার হয়ে আস্তে আস্তে আজানের মধুর ধ্বনি শুনতে পেলেন।

ম্যাকডোনাল্ডকে হেভেনে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হল। বলা হল এখন থেকে তুমি শুধু একটি সমর্পিত প্রাণ যার স্ত্রী-বা পুরুষ পরিচয় নেই। পৃথিবীর সেন্ট অ্যাগনেস বা জোয়ান অব আর্ক এখানে রসাস্বাদন করেন ওই সমর্পিত প্রাণ হিসেবে। ম্যাকডোনাল্ড বিড়বিড় করলেন, 'তাহলে আমি যে জানতাম হেভেনে মাদার ছাড়া কোনও মহিলা নেই, সেটা ভুল?' উত্তরে জানলেন, 'অনেক মহিলা সেন্ট তাদের অর্জিত 'পুণ্যের' জন্য হেভেনে এসেছেন যোগ্যতা দেখিয়ে। কিন্তু আসার পর কেউ পৃথিবীর পরিচয়ে নারী বা পুরুষ নন, তাঁরা সবই এক। ম্যাকডোনাল্ডের ধন্দ তবু যাচ্ছিল না। তবে যে পড়েছি হেভেনে সাধুরাই থাকেন। সাধ্বীদের কথা কোথাও লেখা হয়নি। উত্তরে বুঝলেন, প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টারের মতো সাধু শব্দটি লিঙ্গমুক্ত পবিত্র আত্মার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত। ম্যাকডোনাল্ড নত মস্তকে হেভেনে প্রবেশ করলেন।'

স্বর্গের দরজায় পৌঁছলে মনোরঞ্জনকে চিত্রগুপ্তের সামনে নিয়ে যাওয়া হল। নাম-ধাম

জানার পর চিত্রগুপ্তের সহকারী কম্পিউটারের বোতাম টিপলেন আগত আত্মা পৃথিবীতে কী কী ভাল কাজ করেছেন তার তালিকা দিতে পারল না কম্পিউটার। উলটে জানিয়ে দিল কোনও ভাল কাজ করেননি। এরকম আত্মাকে সোজা নরকে চালান দেওয়াই নিয়ম। কিন্তু কোন নরকে পাঠানো হবে জানতে, খারাপ কাজের তালিকা জানতে চাইলেন চিত্রগুপ্ত। আশ্চর্য হয়ে জানলেন, মর্ত্যে থাকার সময়ে এই আত্মা একটিও খারাপ কাজ করেনি।

মনোরঞ্জনকে নিয়ে গভীর সমস্যায় পড়লেন তিনি। যে খারাপ কাজ করেনি তাকে তো নরকে পাঠানো যায় না। আবার পুণ্য অর্জন না করে এলে স্বর্গে ঢুকতে দেন কী করে। এই আত্মা যখন সব স্তর পেরিয়ে এসেছে তখন আবার জন্মানোর জন্য পৃথিবীতে পাঠানো যায় না।

এই সময়ে কম্পিউটার ঘোষণা করল, স্বর্গে আপাতত কোনও নবাগতের জায়গা নেই। স্বর্গ তৈরি হওয়ার পর তার আয়তন বাড়েনি। ফলে স্বর্গে এখন প্রচণ্ড স্থানাভাব দেখা দিয়েছে। চিত্রগুপ্ত স্বস্তি পেলেন। বললেন, 'তোমাকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। যখন কোনও প্রাচীন পুণ্যাত্মা মহাকাশে বিলীন হয়ে স্বর্গে নতুন জায়গা তৈরি করে দেবেন তখনই তুমি স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে।'

'তাহলে আমি এখন কোথায় যাব?' হকচকিয়ে গেলেন মনোরঞ্জনের আত্মা।

'স্বর্গের চারপাশে ঘুরে বেড়াও।'

'কিছু মনে করবেন না, এরকম কি প্রায়ই হয়?'

'হয়, তবে খুব কম। আশঙ্কা হচ্ছে, এবার ঘন ঘন হবে।'

'একটা কথা আপনি সংস্কৃত না বলে বাংলা বলছেন কেন?'

'হিন্দুরা যতগুলো ভাষায় কথা বলে তার সবগুলোই আমি বলতে পারি। কিন্তু ভেতরে ঢুকলেই সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষা বলা নিষেধ।'

মনোরঞ্জন বিষণ্ণ হলেন। এত দূরে এসেও তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। একবার বেড়াতে গিয়ে শুনলেন যে ঘর তাঁর নামে বুক করা আছে সেখানে আগের অতিথি এখনও আছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই চেক আউট করবেন। মনোরঞ্জনকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। অবশ্য তার জন্য একটুও রাগ করেননি।

আজও করতেন না। দেখলেন আকাশ-ছোঁয়া প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আছে স্বর্গ রাজ্য। ভেতরে কী হচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন না। স্বর্গাশ্রিত আত্মারা এই প্রাচীরের বাইরে কখনই আসেন না। হঠাৎ তার কানে সুমধুর সঙ্গীত ভেসে এল। ভক্তিগীতি। কে গাইছেন? রম্ভা না মেনকা? নিশ্চয়ই মেনকা। অল্প বয়সে বিশ্বামিত্র নামে একটি ফিল্ম দেখেছিলেন তিনি। সেখানে মেনকার গলায় একটি গান ছিল। গান শেষ হলে নূপুরের আওয়াজ কানে এল। ওই প্রাচীরের কাছাকাছি বোধহয় ইন্দ্রের সভা।

মনোরঞ্জন হাঁটছিলেন। কিন্তু তাঁর আত্মা ভেসে যাচ্ছিল। স্বর্গের প্রাচীর শেষ হওয়ার পর তিনি আরেকটি প্রাচীর দেখতে পেলেন। সেই প্রাচীরের ভেতর থেকে ভয়ঙ্কর আর্তনাদ ভেসে আসছে। অর্থাৎ ওটি নরক। স্বর্গের এত কাছাকাছি নরকের অবস্থান জানা ছিল না মনোরঞ্জনের। ওদিকে না যাওয়াই ভালো ভেবে ফিরে আসছিলেন তিনি। হঠাৎ চোখে পড়ল,

নরকের প্রাচীরের নীচেটা নড়ছে। কৌতূহলী হয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতেই দেখতে পেলেন প্রাচীরের নিচে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে বেরিয়ে এল চারটি কালো আত্মা। বেরিয়েই তারা ছুটে গেল স্বর্গের প্রাচীরের দিকে। একজন বলল, 'এইখানে খোঁড়, গতবার এইখানেই সুড়ঙ্গ খুঁড়েছিলাম।'

মনোরঞ্জন এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনারা কারা?'

লোকগুলো একটু ঘাবড়ে গেল, 'তুমি কে হে?'

'আমি নবাগত। স্বর্গে যাব। স্থানাভাব বলে অপেক্ষা করছি।'

একজন আরেকজনকে বলল, 'নতুন এসেছে, ঠিক চুকলি কাটবে। এখনই তড়পে দে, নইলে বিপদ হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে একজন এগিয়ে এল, 'যা দেখেছ, তা কাউকে বললে মুণ্ডু ছিঁড়ে আমাদের ওখানে নিয়ে যাব। বুঝলে?'

'ঠিক আছে। কিন্তু কী করছ তোমরা?'

'আজ আমাদের ওখানে অ্যানুয়াল ফাংশান। এখান দিয়ে সুড়ঙ্গ কাটব। ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে এসে আমাদের সুড়ঙ্গ দিয়ে নরকে ঢুকে সেই ফাংশান মাতাবে অপ্সরারা। বোম্বাই নাচ, ব্যান্ডের গান সব করবে ওরা। শেষে মুক্তবস্ত্র হবে। তারপর রাত শেষ হওয়ার আগেই যেমন এসেছিল তেমন সুড়ঙ্গে সুড়ঙ্গে ফিরে যাবে স্বর্গে। তখন সুড়ঙ্গ এমনভাবে বুজিয়ে দেব যে, ভগবান টের পাবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ।'

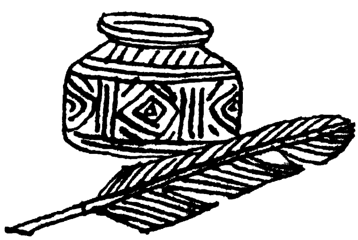
'কিন্তু অপ্সরা আসবেন কেন?'

'ওই সব ভক্তিগীতি গেয়ে কারও মন ভরে? খ্যামটা চাই খ্যামটা। হট ব্যাপার।'

'তা তোমরাও তো ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে স্বর্গে ঢুকে যেতে পার।'

'পাগল। চরিত্র বলে কিছু থাকবে না ওখানে গেলে। ভদ্দরলোকে যায়। ছ্যা!'

তিনটে কালো আত্মা মহানন্দে স্বর্গে ঢোকার সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে। মনোরঞ্জনের মনে হল স্বর্গে বি এস এফ নেই। অবশ্য থাকলেই বা কী? রোজ তো লোকে সীমান্ত পেরোচ্ছে। কিন্তু অপ্সরাদের রুচি এত নেমে গেছে! না। ভুলেও ইন্দ্রসভায় যাবেন না মনোরঞ্জন।



ঘর নেই

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

কথাটা প্রথম যেদিন আমি বলেছিলাম, শুনে খুব কষ্ট পেয়েছিল শ্যামল, বলেছিল 'এ আবার কী বলছ! বিয়ের পর আমাদের বাড়িটাই কি তোমাদের বাড়ি হবে না? আমাদের একটা নিজস্ব ঘর থাকবে না—তোমার-আমার!'

থাকবে, নিশ্চয় থাকবে, কিন্তু সেই ঘরে আমাকে থাকতে হবে তোমার মর্জি অনুযায়ী। না, কথাটা তখন বলতে পারিনি শ্যামলের মন খারাপ ছিল বলে। তবে সেটাই ছিল খাঁটি কথা। আজকের যে শ্যামল আমায় মাথায় করে রেখেছে, কোনও কথা মুখ থেকে বেরোলেই পরম সম্পদ বলে মনে হচ্ছে, ঠিক এইরকম অবস্থাই কী থাকবে বিয়ের দু-এক বছর পরে! জিজ্ঞেস করলে শ্যামল কখনওই সে-কথা স্বীকার করবে না, হয়তো এই মুহূর্তে ওর নিজের বিশ্বাসও তাই, কিন্তু এই কুড়ি-একুশ বছর বয়েসেই যে পৃথিবীটাকে ওর চেয়ে অনেক বেশি চিনেছি আমি —চিনেছি মানে চিনতে বাধ্য হয়েছি, তাই আমার অভিজ্ঞতা বলে একটু অন্যরকম। বউয়ের ওপর একটা প্রভুত্বের দাবি চাপিয়ে দিতে না পারলে পুরুষমানুষ বড় কষ্ট পায়, সে বাপ-মায়ের পছন্দের বিয়ে করুক আর নিজে ভালবেসেই করুক।

রাঙাকাকু কিন্তু কথাটা বুঝেছিল ঠিক। কষ্ট পেয়েছিল নিঃসন্দেহে, শ্যামলের চেয়ে বেশিই পেয়েছিল, কারণ যন্ত্রণাটা যে রাঙাকাকুর ভেতরে গিয়ে ধাক্কা মেরেছিল, সেটা বুঝতে পেরেছিলাম। আমার হাতের ওপর একটা আলতো চাপ দিয়ে বলেছিল, 'ঠিক বলেছিস বুড়ি, মেয়েদের সত্যিই কোনও ঘর নেই এখানে, তার নিজের ঘর। কিন্তু হঠাৎ এই পোকাটা আজ ঢুকল কেন মাথায়?'

'এমনি। মনে হচ্ছিল সারাদিন ধরে, শ্যামলকে বললাম বিকেলে, বুঝতেই চাইলে না।'

'বাইরে থেকে বোঝা যে ভারী শক্ত বুড়ি। দিব্যি মৌরসি পাট্টা জমিয়ে বসে আছিস—রাতদিন নিজের ঘর সাজাচ্ছিস, গোছাচ্ছিস, এখানকার জিনিস ওখানে রাখছিস, ওখানকার জিনিস, এখানে — কে বলবে বল এ ঘরকে গুডবাই করে চলে যাবে কদিন পরেই।'

'বুড়োদের মতো কথা বলো না তো, তোমার মুখে এসব একদম মানায় না।'

'ওমা, সে কী রে! পঞ্চাশ পেরোলে তো লোকে বুড়োদের দলেই পড়ে। মাথার চুল দেখ।'

'হোক। আমি নিশ্চয়ই বিয়ের পর এই ঘর ছাড়তে হবে বলে ওকথা বলিনি, আর তুমি সেটা খুব ভাল করেই জানো।'

'সে তো জানি, কিন্তু ব্যাপারটা কী? ঝগড়া হয়েছে বাপির সঙ্গে!'

'ভাব আর থাকে কবে! তা নয় রাঙাকাকু, ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা করো তুমি! আজ বাপির বন্ধু এগারোটা পর্যন্ত গল্প করবে, তুমি অন্য ঘরে যাও। ভায়ের পড়ার চাপ, এক সপ্তাহ তাকে এ ঘরে একদম বিরক্ত করবে না, এটাই নিরিবিলি ঘর। বাড়িতে লোক এসেছে, ঘর ছেড়ে দাও—তোমার শোবার জায়গা অনেক আছে। অথচ এরাই কিন্তু তেরো-চোদ্দো বছর বয়সে আমাকে ঠেলে দিয়েছিল এই ঘরে, মেয়েটা একা কী করে থাকবে, কী নিয়ে থাকবে, সে কথা কেউ ভাবেনি।'

'কলি! যাক ওসব কথা। তুই তো একা থাকতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছিস, তোর অসংখ্য গানের ভাণ্ডার থাকতে তোর ভাবনা কী?'

'তাহলে সেটা নিয়েই আমায় থাকতে দাও। বাড়িতে লোক এলে তোমরা কেউ নিজেদের জায়গা ছাড়বে না, ভাইকে দেখো—একটা ষোলো-সতেরো বছরের দামাল ছেলে তার পর্যন্ত কী দাম এ সংসারে, অথচ আমি—'

'আহা! বলিস না, ছেলেমানুষ!'

'তাই?'—কথা বলতে গিয়ে গলায় কীসের একটা ডেলা আটকাচ্ছিল, সরিয়ে নিয়ে বললাম, 'আমি কিন্তু সতেরোয় ছেলেমানুষ ছিলাম না রাঙাকাকু, আমায় কেউ থাকতে দেয়নি।'

এরপর আর কোনও কথা হয় না, ভাল করেই জানতাম। রাঙাকাকু সেটা ঠিক আমার মতোই বোঝে তাই একটু সান্ত্বনা দিয়ে আমার একটা হাত টেনে নিয়েছিল নিজের দু-হাতের মধ্যে। রাঙাকাকুর মনের উষ্ণতা ছড়িয়ে যাচ্ছিল আমার সমস্ত চেতনায়। আমি অনুভব করছিলাম রাঙাকাকু আমার অত্যন্ত কাছে আছে।

এইজন্যেই রাঙাকাকু এত ভালোবাসি আমি, এত শ্রদ্ধা করি। অথচ এ কথাটা ভাবতে গিয়েই এখন আমার হাসি পায় যে রাঙাকাকু আমাদের কেউ নয়, মানে রক্তের সম্পর্কে কেউ হয় না আমাদের। ছোটকাকার সঙ্গে বি. এসসি পড়েছিল একসঙ্গে, তারপর তো দুজনেরই আলাদা লাইন —ছোটকাকা ইলেক্ট্রনিকসের কীসব খটোমটো ব্যাপার নিয়ে পড়াশুনা করেছিল, আর রাঙাকাকু হয়েছিল ডাক্তার। রাঙাকাকু নয়, ছোটকাকা পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল 'কোরক মুখুজ্যে, মাই বুজুম ফ্রেন্ড' বলে। রাঙাকাকুই বলেছিল, 'কাকুর বন্ধু কিন্তু কাকুই হয়। বাড়িতে আমি রাঙাদা, সুতরাং এখানেও রাঙাকাকুই চলতে পারে' — তারপর একটু হেসে, 'মানে রংটং তো সব জ্বলে গেছে, যেটুকু আছে ওই নামের মধ্যেই থাক।' সেই থেকে রাঙাকাকু।

ভাবতে অবাক লাগে, এসব মাত্র বছরদেড়েক আগেকার ঘটনা, কি আর একটু বেশি। এর মধ্যে মানুষটা কী করে আমার এমন প্রিয় হয়ে উঠল, আমি নিজেই ভেবে পাই না। প্রিয় নয়, আমার দোস্ত। এরকম দোস্ত আমার বেশ কয়েকটি আছে। পড়ার ঘরে ছোট একটা শ্বেতপাথরের শিবমূর্তি, রাস্তার মোড়ে হাসিমুখে জিভ বারকরা সেই কালো মেয়ে, দেশের

বাড়িতে আমার অতিবৃদ্ধ দাদুভাই। সেই সঙ্গে এই রাঙাকাকু —কেমন করে যেন বড্ডো কাছাকাছি এসে গেল আমার। মানুষকে দেখে ভয় করতে শিখেছিলাম আমি, ভাবতে শিখেছিলাম পুরুষমানুষের ছোট-বড় নেই, তাদের চোখে আমরা সবাই লালসার বস্তু। রাঙাকাকুকে দেখে শিখলাম পৃথিবীতে পুরুষ ও নারীর আরও একটা সম্পর্ক আছে, বাবা আর মেয়ে— জন্মসূত্রে নয়, অবারিত অপত্য স্নেহের সূত্রে। রাঙাকাকুকে পেয়ে আমি বেঁচে গেলাম। আমার অন্য দোস্তদের ধন্যবাদ রাঙাকাকুকে আমি পেয়েছিলাম তলিয়ে যাবার ঠিক আগে, ভাগ্যি পেয়েছিলাম।

রাঙাকাকুর হাতের উষ্ণতায় আমার মনের গ্লানি কাটাতে শুরু করেছিল, কিন্তু সেইসঙ্গে এও মনে পড়েছিল যে রাঙাকাকুকে এখন এ বাড়ির অনেকেই ঠিক পছন্দ করে না, ওর বন্ধু ছোটকাকা তো নয়ই। প্রথম যেদিন এ বাড়িতে এল, একটু ঘন ঘন এসে এ বাড়ির ঘনিষ্ঠ হল, বাপি খুব খুশি হয়ে গল্পটল্প করত, মাকে বলত, 'বেশ ভাল হল, কী বল! একটা ডাক্তার যদি বাড়িতে আসা-যাওয়া করে —'

সেই বাবাই মাসছয়েক পরে গজগজ করছিল মায়ের কাছে, 'এ আবার কীরকম ডাক্তার! খোকা বলেছিল ভাল প্র্যাকটিস আছে, কোথায় দু-হাতে টাকা কামাবে তা না সন্ধেটা কলির সঙ্গে উৎপটাং গল্প করে কাটিয়ে দেয়!'

কথাটা রাঙাকাকুর কানে একবার তুলেছিলাম, শুনে যেমন করে হাসে, তেমনি করে হেসে বলেছিল —'সকালের খুব দুর্ভাবনা হচ্ছে এই নিয়ে, তাই না রে? আসলে সকালে প্র্যাকটিস করি, দুপুরে চাকরি করি হাসপাতালে —রাতে একটা নার্সিংহোমেও যেতে হয় সপ্তাহে দুদিন। এরপরেও কাজ করতে গেলে মনের দরজা-জানলাগুলো যে সব বন্ধ হয়ে যাবে! সন্ধেটা আমার খোলা আকাশের কলি, সেটাকে কাজ দিয়ে মুড়ে ফেললে কাজকে আমি ভালবাসব কী করে?' চিনি।'

এমনিতরো কথা। লোকে মনে করতে 'মানে?' পারে, রাঙাকাকু বানিয়ে কথা বলে। আমি জানি তা নয়, বানানো কথা যে আমি খুব ভাল করে চিনি। স্তুতির দস্তানার আড়ালে মানুষের ধারাল নখ আর হিংস্র থাবা কেমন করে লুকিয়ে থাকে আমি যে জেনে গেছি। আমায় কী প্রচণ্ড ভালবাসে রাঙাকাকু আমি অত্যন্ত ভালভাবে জানি, অথচ সামনে আমার প্রশংসা একদিনও করেনি রাঙাকাকু। বলতে গেলে বরং বলেছে, 'একেবারে ব্লান্ডার হয়ে গেছে রে! চারদিকে এত সবগুণের মেয়ে থাকতে কোথাকার টিপসি এক পচা মেয়েকে মেয়ে বানিয়ে ফেললুম। এমন ভাল মানুষ করে!' বলেই সেই প্রশান্ত হাসি সারা মুখে ছড়িয়ে গলাটা হঠাৎ নামিয়ে বলেছে, 'ভগবান সুযোগ দিলে, এমন ভুল আমি সাতজন্ম করতে রাজি আছি।'

কী যে হয়ে যায় তখন বুকের মধ্যে, বলতে পারি না। এ অনুভূতিটার সঙ্গেই যে আমি বিশেষ পরিচিত নই! ছোটবেলায় অসুখ-বিসুখ করলে কখনও বাপি এসে বসত পাশে, মাথায় হাতটা রাখত। কিন্তু সে আর কদিন! ভগবানকে বলতুম, ভগবান আমার খুব করে অসুখ করে না কেন! খুব ক্ষীণ হলেও সেই অনুভূতির সঙ্গে পাশে বসে থাকার একটা মিল যেন আছে কোথাও।

অনেকক্ষণ হাতটা নিয়ে খেলা করেছিল সেদিন রাঙাকাকু, তারপর আপনমনেই বলেছিল

'ছিঃ এত কষ্ট, এত কষ্ট পেতে নেই।'

'থামলে কেন! বলো, এটা আমার বানানো দুঃখ।'

'না'— আস্তে করে ঘাড় ঝাঁকিয়েছিল রাঙাকাকু, ' তোর এই দুঃখটাকে যে আমি চিনি।'

'মানে?'

'মার কাছে গল্প শুনেছি দাদু কী ভীষণ ভালবাসতেন মাকে। রোদ্দুরে গাল লাল হয়ে যা বলে উঁচু ক্লাসে উঠতেই পড়া ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য বিয়েই তো হয়েছিল মার পনেরো বছরে বয়সে। বাবার নিন্দে করছি না কলি, নিন্দে করার মতো মানুষও বাবা ছিল না, কিন্তু সমস্ত কর্তৃত্ব রেখেছিল একেবারে নিজের হাতে। একটা টাকার দরকার হলে মাকে বাবার কাছেই আর্জি পেশ করতে হত। বাড়িতে কে আসবে না আসবে—সব ঠিক হবে বাবার মতো, বাবার কাজের সমালোচনা করার অধিকার কিন্তু আমাদের ছিল না।'

আমি অবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম রাঙাকাকুর দিকে, ভাবছিলাম এ কার কথা বলছে রাঙাকাকু! কার বাবার কথা! রাঙাকাকু তখনও ওইরকম ভাবেই বলেছিল —'বাবা মারা যাবার পর সে বাড়ি হল আমাদের, মানে বাবার ছেলেদের, মায়ের নয়। তখন মাকে তোয়াজ করতে হত দাদা-বউদির মেজাজকে। প্রয়োজন মায়ের খুবই অল্প ছিল। কিন্তু সেটুকু মেটাবার জন্যেও মাকে চেয়ে থাকতে হত দাদা-বউদির অনুগ্রহের ওপর। বলতে পারিস কলি, আমি কেন মাকে নিজের কাছে এনে রাখিনি। কিন্তু আমার তো বদলির চাকরি— আজ বাঁকুড়া, কাল বর্ধমান, তারপর হয়তো উত্তরবঙ্গ। এইরকম বাউণ্ডুলে চাকরিতে তো আর মাকে নিয়ে ঘোরা যায় না। তোর কাকিমাই যায়নি কতো জায়গায়। তাছাড়া আর একটা প্রবেলম অবশ্য ছিল। দাদার বাড়িটা ছেড়ে মা নড়তে চাইত না বিশেষ। ওইখানে আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন তো, মাও চাইত আমি ওই বাড়িতেই যেন মার—'

চোখে কখনও জল দেখিনি রাঙাকাকুর, কিন্তু কথা বলবার সময় কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে এমন আর্দ্র হয়ে উঠত যে মনে হত এর চেয়ে একটু কাঁদতে পারলে বোধহয় শান্তি পেত রাঙাকাকু। আর একটা ব্যাপার প্রায়ই মনে হত। আমাকে দেখলেই অত মায়ের কথা মনে পড়ে কেন? ওর? চোখের দৃষ্টিতে শিশুর সারল্যই বা তখন আসে কোথা থেকে! কুড়ি-একুশ বছরের এই অভিশপ্ত সৌন্দর্য দেখে খুব নিকট আত্মীয়ের চোখেও তো কুৎসিত লোভ উসকে উঠতে দেখেছি — নিজের ওপর তখন ঘেন্না ধরে যেত আমার। ভাগ্যি আমার সঙ্গে দেখে হয়েছিল রাঙাকাকুর। এ কথা আমি শ্যামলকে বলেছি,আমার দোস্তদের বলেছি, নিজেকে নিজে বলেছি হাজার বার, লক্ষ বার।

আমি যে ভালবাসতে পারি, আমাকেও যে ভালবাসা যায়— মায়ের মতো, মেয়ের মতো, এ কথাটা জানা আমার ভীষণ দরকার ছিল। পৃথিবীটা তা নইলে শ্বাপদের আখড়া হয়ে উঠত এবং আমি তাদের সংখ্যা বাড়াতাম।

মাথা তুলতে পারছিলাম না আমি। চিলেকোঠায় ওঠবার সিঁড়িতে বসেছিলাম দুহাতে মুখ ঢেকে। অথচ ছাদে থাকলে এটা আমার সবচেয়ে প্রিয় সময়। দিনকে আলতো আদরে ঘুম পাড়িয়ে সন্ধে আঁচল বিছিয়ে দিচ্ছে আকাশে। কত রকমের হালকা গাঢ় রং তার আঁচলে, মুহুর্মুহু পালটে যায় আবার সেই রঙের নকশা। হঠাৎ কখনও আকাশের ছোট্ট একটি অংশ

উজ্জ্বল— দস্যি ছেলের এক চোখ কুঁচকে ঘুমের ভান থেকে উঠে পড়া যায় কিনা দেখা।

কিন্তু এ সমস্ত দেখার মতো মনের অবস্থা এখন ছিল না আমার। সারা রাত বলতে গেলে একটুও ঘুমোয়নি আমি। সারাটা দুপুর শ্যামলের সঙ্গে উদ্দেশ্যহীন হেঁটেছি, ওর যন্ত্রণাক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকাতে পারিনি একবারও ভাল করে। হাজার বার জিজ্ঞেস করেছে, 'কী হয়েছে তোমার?' একটা উত্তর দিতে পারিনি সে কথার। মুখ শুধু একবারই খুলতে পেরেছিলাম, গতকাল সন্ধের পর রাঙাকাকুর কাছে—এইভাবে ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই।

ব্যাপারটা যে কেমন করে এতদূর গড়িয়ে গেল বলতে পারব না। মনের মধ্যে বহুদিনের উষ্মা জমা থাকলে এমনি করেই বোধহয় বেরিয়ে আসে একদিন। বিশেষ করে বাপি যখন বলেছিল, 'বুঝতে পেরেছি, খোকার ওই বন্ধুর আসকারাতেই এরকম আদুরি হয়ে উঠেছ তুমি। রাঙাকাকুর ওই ন্যাকামি শুনে শুনেই'—

'চুপ করো।' কে যেন আমার ভেতর থেকে কথা বলে উঠেছিল, নইলে বাপির সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করার কথা আমি চিন্তা করতে পারি না, বলেছিলাম, 'রাঙাকাকুর নাম উচ্চারণ করতে গেলেও আর একটু ভালো হওয়া দরকার।'

'মানে! আমি খারাপ!' বাপিকে এখন হিংস্র দেখাচ্ছিল, আক্রমণের ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে এসে বলেছিল, ' কেন, কেন! কী করিনি আমি তোর জন্য ? বাবা হিসেবে কোন কর্তব্যটা আমি অবহেলা করেছি?'

'কর্তব্যের কথাই তো আসছে না। আমাদের সম্পর্কটা ভালবাসার—আমাকে সেই জিনিসটা তুমি কতটুকু দিয়েছ? বলো, উত্তর দাও।'

'থাম, থাম, গলাবাজি করিসনি!' একটা বিশ্রী শব্দ উচ্চারণ করে এমন করে তাকাচ্ছিল বাপি আমার দিকে, মা ভয় পেয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বাপির হাত ধরে বলেছিল, 'চলো তো তুমি ও ঘরে চলো। মাথাগরুমে মেয়ে, কখন কী বলে ফেলে—'

'ওই তোমার জন্যেই তো এরকম হয়েছে! নইলে বাপের মুখের ওপর এভাবে কথা বলতে পারে!'

'সে একটু মনে দুঃখ হয়েছিল, তাই —'

'থামো! দুঃখু! আমি যা করেছি কটা বাপ তা করবে মেয়ের জন্যে? ওর যা জিনিস আছে। ঘুরে দেখে আসুক তো -- কটা মেয়ের তা আছে।'

'আমার তো এত দরকার ছিল না!' বাধা দিয়ে বলে ফেলেছি আমি— 'কে তোমায় বলেছিল এত দিতে! তার চেয়ে যেটা না পেয়ে ছোটবেলা থেকে আমি শুকিয়ে উঠেছি সেটা যদি দিতে—'

'ব্যাস ব্যাস, অনেক হয়েছে। ওসব চেকনাই মারা কথা আমি ঢের শুনেছি। হাতের কাছে রাজার ঐশ্বর্য পাচ্ছ তো, বুঝতে পারছ না। দুটো দিন থাকো না অন্য কোথাও গিয়ে, বুঝতে পারবে কত ধানে কত চাল —'

এর বেশি শুনতে আমার প্রবৃত্তি হয়নি, ওপরে পাড়ার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। মুখের বন্ধ আগল খুলছিল আরও দু-ঘন্টা পরে, ছাদে রাঙাকাকুকে পেয়ে। রাঙাকাকু অবশ্য প্রথমে ব্যাপারটা খুব হালকা চালেই নিতে চেয়েছিল। আমি যখন বলেছিলাম,

'আমি আর এ বাড়িতে থাকব না রাঙাকাকু', সঙ্গে সঙ্গে কাকু বলেছিল —'ওমা সেকি! এক্ষুনি তো কোথাও যেতে নেই!'

'মানে?

'মানে শ্যামলের কাছে যখন যাবার সময় হবে, আমরা তো ঢাকঢোল পিটিয়ে নিয়ে যাব। কিন্তু এক্ষুনি সেখানে যাওয়াটা কি ভাল দেখায়!'

'বাজে বোকো না! যাবার জায়গা কি আর কোথাও নেই আমার!'

রাঙাকাকুর হাসিটা এবার মুখ থেকে সরে গিয়েছিল। যাবেই , আমি জানি। আমার কথা রাঙাকাকু বুঝবে না এও কি কখনও হয়। একটু চুপ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল, 'দুর পাগলি, আমার তো একটা থাকার জায়গা আছে, নাকি ? সেখানে আমার এই মেয়েটার একটু জায়গা হবে না?'

'যদি না হয়? কেউ কিছু বলে?'

'তাহলে জানব সেখানে আমারও জায়গা নেই। বাপ-বেটিতে তখন নতুন করে একটা আশ্রয়ের সন্ধান করতে হবে।'.

ঘাড় টনটন করছিল। মাথা তুললাম। আকাশের রঙ এখন পাঁশুটে। মেঘলা আকাশ বলেই বোধহয় তারা ফোটেনি এখনও, কিন্তু তারা ফোটার সময় হয়ে গেছে।

ঘাড় ঘোরালাম। পায়ের শব্দ, আমার চেনা শব্দ। কিন্তু এক পলক তাকিয়েই চমকে উঠেছি আমি।

কে দাঁড়িয়ে আছে আমার পেছনে! রাঙাকাকু? আশ্চর্য, রাঙাকাকুকে আমি চিনতে পারছি না কেন!

দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলাম রাঙাকাকুর কাছে। আর কাছে গিয়েই সমস্ত শরীরটা আমার থর থর করে কেঁপে উঠল।

কাঁদছে, রাঙাকাকু কাঁদছে। জীবনে যে মানুষটাকে আমি কখনও কাঁদতে দেখিনি, তার সমস্ত শরীর এখন কান্নার দমকে ফুলে ফুলে উঠছে। উদ্গত অশ্রু ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বন্ধ চোখের পাতা ঠেলে।

কোনওরকমে ধরে ধরে নিয়ে এলাম রাঙাকাকুকে, প্রায় জোর করেই বসিয়ে দিলাম সিঁড়ির ওপর। অনেকক্ষণ কথা বলতে পারছিল না রাঙাকাকু, আমি জিজ্ঞেসও করতে পারছিলাম না কিছু। কেবল নিচু হয়ে ওর পায়ে হাত বোলাচ্ছিলাম। হঠাৎ আমার হাতটা পায়ের ওপর চেপে ধরে রাঙাকাকু বললে, 'তোকে ভুল বলেছিলাম রে কলি, আমার কোনও থাকার জায়গা নেই, অনেক দিন ধরেই নেই — অথচ সেটা আমি জনাতাম না।'

'রাঙাকাকু!' আমি ককিয়ে উঠছি —'কী হয়েছে তোমার? কেউ কিছু বলেছে তোমাকে? আমার কথা তুমি বলেছ কাকিমাকে?'

'বলেছি। বলেছি বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তুই থাকবি আমাদের কাছে।'

'ইস্?' যন্ত্রণায় শিউরে উঠেছি আমি—' কেন তুমি একথা বলতে গেলে, কেন?

'কেন বলব না! এ কথা বলার আমার কোনও জোর নেই?'

'জোরের কথা হচ্ছে না, তুমি তো জানতে আমি দুদিনের বেশি থাকতে পারব না। রাগ

পড়ে গেলেই আমি চলে আসব বাড়ি। বাপি নিজেই হয়তো গিয়ে ডেকে নিয়ে আসত আমায়।'

'দিয়ে দিতুম তখন। কিন্তু তাই বলে আমি কেন তোকে আমার কাছে রাখতে পারব না?' কাকিমা কেন তোকে নিজের মেয়ে মনে করবে না?'

'সেটাই স্বাভাবিক রাঙাকাকু' —কাকিমা কী বলেছেন সেটা জানতে না চেয়েই আমি বললাম, 'যে কোনও সুস্থ স্বাভাবিক লোকই কাকিমার মতো ভাববে। তোমার মতো পাগল তো আর সবাই নয়।'

'কিন্তু আমার ইচ্ছাটা? সেটার ও কোনও মূল্য নেই তার কাছে — মানে যাকে আমি আমার সবচেয়ে কাছের লোক বলে জানি?'

'রাঙাকাকু! চুপ করো।'

'কী করে চুপ করব? আমার আশ্রয় যে ভেসে গিয়েছে রে! আমি তো বুঝতে পারছি ওখানে থাকতে গেলে আমাকে একজনের অনুগ্রহ ভিক্ষা করে থাকতে হবে। তার মেজাজমর্জি অনুসারে না চলতে পারলে সেখানে আমার থাকার —'

'আঃ, রাঙাকাকু! চুপ করো তুমি।'

'কলি রে — তুই নিজেও সেদিন একটা ভুল কথা বলছিলি, না বুঝে আমি সায় দিয়েছিলাম তাতে।'

'কী বলো তো?'

'ঘর কি শুধু মেয়েদেরই নেই রে! তাহলে আমি আজ এই কষ্ট পাচ্ছি কেন?'

'রাঙাকাকু! ওরকম করে বোলো না তুমি!'

'কিন্তু কথাটা যে সত্যি রে! এতদিন ধরে ভালবেসে যে ঘর আমি তৈরি করলাম, সে কি আমার! তাহলে আজ আমি সেখানে দাঁড়াবার জায়গা পাচ্ছি না কেন বল?' উত্তেজিত ভঙ্গিটা কষ্ট করেই বোধহয় সামলে নিল রাঙাকাকু, পা থেকে সরিয়ে আমার হাতটা এবার নিজের মুঠোর ভেতর ভরে নিল। তারপর ফিস ফিস করে বলল, 'একটা দারুণ সত্যিকথা আজ বুঝতে পারছি রে কলি।'

'কী গো?'

'মেয়ে আর ছেলে বলে কোনও কথা নেই, ঘর থাকে আসলে প্রতিষ্ঠিত কিছু সামাজিক সম্পর্কের, যার খোপের মধ্যে মানুষ মাপমতো এঁটে যায়। কিন্তু তার চেয়ে অনেক বড় যেসব সম্পর্ক, ইচ্ছে দিয়ে মানুষ ভালবাসার যে সম্পর্ক তৈরি করে, হিসেবি লোকের পৃথিবীতে তার কোনও জায়গা নেই।' যেন ভেসে যাবে এক্ষুনি, এমনি আকুলভাবে আমার হাতটাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে রাঙাকাকু বললে, 'আসলে সত্যিকারের ভালবাসারই কোনও ঘর নেই।'

আমি রাঙাকাকুর দিকে তাকালাম। রাঙাকাকুর চোখ এখন ওপরে। আকাশের দিকে চাইলাম। অন্তহীন পাঁশুটে আকাশে। একটাও তারা নেই সেখানে। না থাক, আমার মন কিন্তু বলছে দেরি নেই— আমাদের ইচ্ছে এখন সেখানে তারা ফোটাবে, একটি-দুটি করে।

১০নং মিন্টো লেন

শঙ্করলাল ভট্টাচার্য

১০ নং মিন্টো লেন কপালের ওপর ঝুলে থাকা চুলের গোছের মতো। হাত দিয়ে সরিয়ে দিলেও হঠাৎ কখন জায়গা মতন নেমে আসবে। ভুরু ঠেলে ওপরে চাইবার প্রয়োজন নেই, কপালই জানান দেয় সেখানে চুল পড়েছে।

১০ নং মিন্টো লেন গলির মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে আছে। পাঁচতলার এক পুরনো, লাল-ইটের ম্যানসন। কয়েক যুগ ধরে এজমালি সম্পত্তি। পাঁচতলা জুড়ে পনেরোটা ফ্ল্যাটেই ভাড়া বসনো। কিন্তু কে কাকে ভাড়া দেয় কেউ জানে না,ভাড়াটেরাই জানে না পাশের ফ্ল্যাটের মালিকানা কার। তাদের অনেকেরই মনে নেই শেষ কবে ভাড়া গুণেছে।

১০ নং মিন্টো লেনের পাঁচ তলার ছোট্ট, গোল, ফুলদানি রেলিঙের বারান্দাটাই কপালের ওপর ঝুলে থাকা চুলের গোছার মতো। ওই বারান্দার পাশে আরও যে কতকগুলো একই চেহারার বারান্দা আছে, তার নীচে যে আরও চার-চারটে তলা আছে তা চোখে ধরা দেয় না।

১০ নং মিন্টো লেনের সমস্ত সত্তা মুছে গিয়ে একটা ছোট্ট, গোল, ফুলদানি রেলিঙের বারান্দা হয়ে আছে। সাত-সাতটা বছর।

যবে থেকে ডিকির বউ হয়ে এসে দুপুরে, সন্ধেয় বারান্দায় এসে দাঁড়ানো শুরু করল শীলা। লাল কিংবা তুঁতে শাড়িতে জড়ানো এক ঝলক সূর্যরশ্মিই যেন। কখনও পান, কখনও লিপস্টিকে এমন লাল ঠোঁট যেন স্টেজে দাঁড়ানো নায়িকা। এক রত্তি গোল, ফুলদানি রেলিঙের বারান্দার স্টেজে দাঁড়ানো নায়িকা।

আর পাড়ার সমস্ত উঠতি যুবক যার দর্শক, যার ফ্যান।

গত সাত-সাতটা বছর নীতিন গলির রাস্তাটুকু হেঁটে পার করতে পারেনি একবার অন্তত ওই কপালের ওপর ঝুলে থাকা চুলের মতো ওই বারান্দার দিকে এক ঝলক না তাকিয়ে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কতবারই না মনে হয়েছে পাড়ায় আর একটিও বাড়ি, একটিও দরজা, একটি জানলা নেই। আছে শুধু একটা বারান্দা, আর তার ওপর একটা থির বিজুরি রক্তমাংসে বাঁধা।

সাত বছর আগে ইসকুলে যাওয়ার পথে নীতিন প্রথম দেখে দৃশ্যটা। হয়তো সেদিন পরীক্ষা ছিল, তাই বেশ হড়বড়িয়েই হাঁটছিল নীতিন ট্রামরাস্তার দিকে। খান তিনেক ফাউন্টেন পেনের ভরে বাঁ দিকের বুক পকেট হেলে পড়েছে; ডান হাতে খান চারেক মোটাসোটা বই। একটা মুখস্থ করা উত্তরের শুরুর বাক্যটাই হয়তো মনে মনে রগড়াচ্ছিল, ফলে চোখ ছিল চিন্তার ভারে মাটির দিকেই। যখন কোত্থেকে এক ফোঁটা জল এসে পড়ল চশমার কাচে।

কাচের ওপর ঝাপসা ফোঁটাটা যে জল তা প্রথমে বুঝতেই পারেনি নীতিন। ও দেখল বাঁ চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেছে। নাকি ডান চোখের? না দু-চোখেরই? ও কী হয়েছে বুঝতে মাটির থেকে চোখ তুলে আকাশের দিকে চাইল। অমনি আরও কয়েকটা ফোঁটা হাওয়ায় উড়ে এসে চশমার দুই কাচে পড়ল। আর তখন নীতিনের প্রথম খেয়াল হল যে আকাশে মেঘ করেছে, নীলচে অন্ধকার একটা ছড়িয়ে পড়েছে আশেপাশে, বেশ জোরে হাওয়া বইছে আর বৃষ্টির উড়ো ফোঁটাও ঝরছে এখানে-ওখানে।

আর ওই আকাশের দিকে তাকিয়ে ঝাপসা চশমা দিয়েই নীতিন দেখে ফেলল ১০ নং মিন্টো লেনের ছোট্ট, গোল বারান্দায় লাল শাড়ি বিদ্যুৎটিকে।

পাড়ার সব ছেলের মতো নীতিনেরও হিসেব আছে পাড়ার কোন বাড়ির কোন বারান্দার কোন মেয়ে দাঁড়ায়। আর সকলের মতো নীতিনেরও ছকা আছে কোন্ বারান্দায় কার দাঁড়াবার সময়টা কী। ১০ নং মিন্টো লেনের ওই বারান্দায় কোনও মেয়ে দাঁড়ায়নি কোনওদিন। ওটা মস্তান ডিকি গোমেসের বারান্দা, যেখান থেকে ক্বচিৎ কখনও মাঝরাত্তিরে মাতালের হুঙ্কার শোনা যায়। কখনও সখনও মাতালদের কোরাস গান। যখন সারা পাড়া টের পায় জাহাজের মশালচি ডিকি গোমেস মোটা কামিয়ে মাস দুয়েকের মতন ডাঙার বাসিন্দা হল।

নীতিন ভাবল, মেয়েটি কি তাহলে ডিকিদার বউ? ভেবেই চমকে উঠল ভেতর ভেতর। ডিকিদা ডাঙায় থাকে গড়ে চার মাস, যার দু-মাস যায় পার্টি করে, ফুর্তি করে, পয়সা উড়িয়ে। বাকি দু-মাস যত্রতত্র ধারকর্য করে। দু-মাস স্যুট-বুটে দুরস্ত ভাবে, দু-মাস নোংরা, আকাচা জামায় মদো-মাতাল চেহারায়। দু-মাসে ডিকি মস্তান পাড়া শাসন করে উঠতি রুস্তমদের চড়-চাপ্টা টিকটাক মেরে শিব করে রেখে, অন্য দুমাস ওদেরই পয়সায় বাংলা চোলাই, কাঁচি-ক্যাপস্টান খেয়ে। গলাগলি করে রোয়াকে বসে।

'ধুর্! ও লোকের ও বউ হয় না—' নিজের মনে জোরে জোরে বলতে বলতে নীতিন অনেকখানি এগিয়ে গিয়েও ফের তাকাল পাঁচতলার ওই বারান্দার দিকে। রক্তমাংসে বাঁধা বিদ্যুৎটিও কখন জানি গোল বারান্দার গোল রেলিং ধরে ঘুরে গেছে ট্রামরাস্তার দিকে। আর, ঝাপ্সা কাচেও নীতিন আবছাভাবে দেখল শাড়িজড়ানো বিদ্যুৎ নীচে তাকিয়ে ওর দিকেই।

এরপর হয় বৃষ্টির আশঙ্কায়, নয়তো জীবনের প্রথম এরকম সঙ্কোচ নীতিন প্রায় দৌড়াতে থাকল ট্রামের জন্য।

সন্ধেবেলায় পাড়ার রোয়াকে বসতেই ভুল শুধরে গেল নীতিনের। লাল-শাড়ি বিদ্যুৎ

বাস্তবিকই ডিকির নবপরিণিতা স্ত্রী। 'মাইরি' বলে আঁতকে উঠেছিল নীতিন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে কিছুটা নিশ্চিন্তও হয়েছিল। মহিলাকে তাহলে মাঝেমাঝেই আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখা যাবে। পাড়ার একটা প্রকৃত কালেকশান হল তাহলে।

পরদিন স্কুলের পথে ফের ওপরে তাকাল নীতিন। কিন্তু বারান্দা খালি। যাচ্চলে! এর কি বারান্দায় দাঁড়ানোর কোনও নিয়মকানুন নেই। কিছুটা পথ পেরিয়ে ফের মাথা ঘোরাল নীতিন। শুধু থমথমে মেঘ দেখল আকাশে। আকাশে বা বারান্দার কোথাও কোনও বিদ্যুৎ নেই।

সাত-সাতটা বছর কিন্তু খুব কম সময় না—ভাবল নীতিন। এর মধ্যে চার-চারটে বছর ডাক্তারি পড়া হয়েছে। নারী ও পুরুষের অ্যানাটমি সম্পর্ক কত জ্ঞান বেড়েছে নীতিনের। সহপাঠিনী কুমকুমের ঠোঁটের চুম্বন পেয়েছে, শরীরের ঘ্রাণ পেয়েছে, স্পর্শ করেছে ওর নরম সাদা ত্বক। চোখের সামনে দেখেছে ডিকি জাহাজের ডিউটিতে জয়েন করলে বন্ধু সুবিমল, কাতু, রঞ্জিত, সুজয়, টমি, অ্যান্থনি, রবিন নিয়মিত যাতায়াত করছে পাঁচতলার ওই রোমাঞ্চকর ফ্ল্যাটে। হয়তো রবিনই প্রথম বলেছিল চার্মিনার ধরিয়ে ইডেনের ঘাসে শুয়ে, 'অসাধারণ মেয়েছেলে রে! তুলনা হয় না। একেবারে পার্ফেক্ট নিম্‌ফোমনিয়াক।'

কড়াৎ করে বাজের মতো কথাটা এসে বুকে আছড়ে শিরা, রক্তনালী ফুঁড়ে পেটের মধ্যিখানে কোথাও এসে দাপাতে লাগল। নীতিন বুঝল ওর পেটের মাঝখানটা লাফাচ্ছে। ভয়ে, লজ্জায়, সম্পূর্ণ হতাশায়। ওর গলার আওয়াজ ধরে গেল। ও বলতে চাইল 'সত্যি?' কিন্তু গলা ভেঙে গেল। মেয়েটা নয়, ওর ঘৃণা হল রবিনের প্রতি। কাঁপা কাঁপা হাতে চার্মিনার ধরাতে গিয়ে চোখে একটু যেন ঝাপসাই দেখল। আকাশের দিকে মুখ তুলে বুঝতে গেল কাচে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল কি না। কিন্তু কোথাও বৃষ্টির চিহ্নই দেখল না।

এরপর কোনও একদিন হয়তো অ্যান্থনি বলছিল, কিংবা সুবিমল, কিংবা সুজয়, কিংবা ... কী এসে যায় কে সেটা? কিন্তু কেউ একজন ছবি বর্ণনা করার মতো করে বর্ণনা করেছিল শীলার শরীর। সোনালি তামাকের রঙের টানটান, চাবুক শরীর। কিছুটা রোমশও আবার তো সত্ত্বেও মসৃণ। বড় উষ্ণ শরীরও, একটা পর্যায় নদীর মতো ঘামে। তখন চোখ দুটো এত বড় হয় যেন তা মানুষের চোখের কোটরে বাঘিনীর আইবল্। তখন কপালের টিপটাও যেন শুক্লপক্ষের চাঁদের মতো ফড়ফড় করে বাড়তে থাকে। আর বুকের....

নীতিন আর শুনে উঠতে পারেনি বাকিটুকু। হঠাৎ বাথরুম করতে যাওয়ার বাহানায় উঠে গেছে। তারপর পাড়ার বারোয়ারি টয়লেট ফণীদের গ্যারেজ পাশের দেওয়ালের সামনে অকারণ থুম্ হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল এই মাত্র শোনা কথাগুলোর মানে নিয়ে। আসলে নিজের মনে দেখতে লাগল সোনালি তামাকের রঙের শরীরটাকে। যার সঙ্গে ছোট্ট, গোল, ফুলদানি রেলিঙের বারান্দায় দাঁড়ানো শরীরটাকে মেলানো বেশ কঠিন। একই শরীর, অথচ পরিবেশে ও স্থানবিশেষে কত আলাদা। বহুক্ষণ এভাবে

দেওয়ালমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে শেষে বাড়ি চলে গেল নীতিন।

আর সে রাতেই প্রথম আধা-ঘুম, আধা-জাগরণে শীলাকে দেখল নীতিন। ওর মনে হল ওর বন্ধুরা শুধু ডিকি গোমেসকেই নয়, ওকেও ঠকিয়েছে। এক মূর্খের পায়ের তলায় তো হামেশাই কোনও জমি নেই, শুধু জল; আরেক মূর্খের মাথার ওপর কোনও ছাদ নেই, মেঘ নেই, আকাশ নেই শুধু একটা বারান্দা।

মেডিকেলের ছাত্র হবার প্রথম দিনগুলোর উত্তেজনায় বন্ধুদের মনে মনে ক্ষমা করে দিল নীতিন। ওর তখন বেশ কিছু সহপাঠিনী। কারও শাড়ি, কারও সালোয়ার কামিজ, কারও লং স্কার্ট ওর ভাল লাগে; কারও হাসি, কারও রাগী, গোমড়া মুখ, কারও ফ্যাল ফ্যালে চাউনি ওর চোখ টানে। কিন্তু সন্ধেকালে রোয়াকে বসে ওর শোনা চাই রবিন নয়তো সুজয় নয়তো টমির মুখে শীলার কথা, শীলার বর্ণনা। কোনওদিন দুপুরে কাকে ভুনা কারি রেঁধে খাইয়েছে, কাকে পর্ক বিন্ধালু খাওয়ানোর কথা দিয়েছে, কাকে চুরি করে খাইয়েছে ডিকির আনা স্কচের বোতল থেকে এক পেগ জনি ওয়াকার। এরা সবাই এখন ডিকির ন্যাওটা। মস্তান ডিকি এখন ঘুষোঘুষি কমিয়ে পাড়ার এই সব কলেজ-করা ছেলেদের সঙ্গে সময় কাটায়। জাহাজ থেকে ফিরে পার্টি জমায় এদের সঙ্গে। মাল টেনে বারোদুয়ারিতে বেহুঁশ হয়ে পড়লে এরাই কাঁধে করে তুলে দিয়ে যায় পাঁচতলার আস্তানায়। টানটান করে শুইয়ে দেয় বিছানায়। তখন চোখবোজা ডিকি টিপিকাল সাহেবি অ্যাকসেন্টে বলে দেয়, 'থ্যাংক ইউ ব্রাদার, থ্যাংক ইউ।'

নীতিন বুঝেছিল জাহাজি ডিকির পক্ষে শীলার ওপর বারোমাসি দখল রাখা অসম্ভব। ডিকি নিজেও জানত যে ও আসলে একজন পার্টটাইম স্বামী। খোলসা করে বলতে গেলে —একজন সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান পার্টটাইম স্বামী।

এই ডিকিদা কাল বলতে গেলে জোর করে নীতিনকে টেনে নিয়ে এসেছিল ওর রোমাঞ্চকর ফ্ল্যাটে। সদ্য জাপান ট্যুর করে ফিরেছে জাহাজ। ডিকিদার পকেটভর্তি লাকি স্ট্রাইক সিগারেট। গায়ের র‍্যাংলার জ্যাকেট উগ্র সেন্টের গন্ধ। মুখে হুইস্কির সোঁদা ঘ্রাণ। বোঝাই যায় ট্রিপের টাকা এখন উথলে উঠেছে পকেটে। তবু শেষ বারের মতো মিনতি করল নীতিন, 'ডিকিদা' থাক না! অরেক দিন হবেখন।

হাত ছাড়েনি ডিকি। কবজিতে এখনও দেদার জোর। চুলে আঙুল চালিয়ে বলল, 'আর কবে হবে নীতু? দেখছ না কত পাক ধরেছে চুলে? দাড়িও পেকেছে। একদিনও তো বউদির সঙ্গে দেখা করতে এলে না। জানি ডাক্তার হচ্ছ শিগগির, তা বলে মুখ্যু দাদাদের ভুলে যাবে? তোমাকে লাটাই ধরে ঘুড়ি ওড়াতে শিখিয়েছিল কে?'

হে ভগবান, তাই তো! নীতিনের মনে পড়ল কবেকার সেই দিনগুলো। লাহাদের বড় ছাদে লাটাই ধরে ঘুড়ি ওড়ানোর হাতে-খড়ি হয়েছিল এই ডিকিদার কাছেই। তখন চশমা হয়নি নীতিনের, কাচে জল লাগার সম্ভবনা ছিল না। কিন্তু ঘুড়ি উড়িয়ে একাগ্র চিত্তে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকার অভ্যাসেরও শুরু সেই। তার অনেক দিন পর একবার চশমায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে ওপর চেয়ে এক নতুন খেলা শিখল নীতিন। গত সাত বছরে ফলে আর বিশেষ একটা বারান্দার দিকে নজর না তুলে ওর কিছুতেই মিন্টো লেন পার

হওয়া হয় না।

সেই থেকে কপালের ওপর একগোছা চুলের মতো ঝুলে আছে একটা বারান্দা।

নীতিন ডিকির পিছন পিছন উঠে গিয়েছিল ১০ নং মিন্টো লেনের পাঁচতলার ওই ফ্ল্যাটে।

গতকাল খুব দূরের ঘটনা নয় —নীতিন ভাবল একবার মনে মনে। খুব স্কচ খাইয়েছিল ডিকিদা, কিন্তু সন্ধেটা মন থেকে মুছে যায়নি। ওর গেলাসে মদ দিতে দিতে বলেছিল ডিকি, দিস ইজ জনি ওয়াকার ব্ল্যাক লেবেল নট রেড। এর জাতই আলাদা।

মদে চোঁক দিতে দিতে এক নজরে নীতিন দেখছিল শীলাকে। কে বলবে সাত-সাতটা বছর কেটে গেছে এর মধ্যে! তিন-তিনটে মিসক্যারেজ হয়েছে। ফলে মহিলা এখনও মা হননি। তার বেদনা কি কোথাও বাসা বেঁধেছে মুখে? নীতিনের ডাক্তারি চোখ কিছুই খুঁজে পেল না।

হঠাৎ নীতিনের প্লেটে কাবাব ঢালতে ঢালতে ডিকি বলল, 'জানো নীতু, আজ আমার বউয়ের জন্মদিন! শি ইজ থার্টি টুডে। কিন্তু আমি শালা তোমাদের বন্ধুদের কাউকে ইনভাইট করিনি। ওরা সবাই বিট্রেয়ার। কেউ আমার পাশে দাঁড়ায়নি কখনও। শুধু পার্টি করতে এসেছে যখন আমি মোটা মোটা ক্যাশ নিয়ে এসেছি। যখন ফের জাহাজে গেছি সব শালা সুখের পায়রা উড়ে গেছে যার যেখানে খুশি। তোমার বউদির কোনও সুবিধে-অসুবিধে কেউ আসেনি দেখতে। শালা....'

একটা কাবাবের টুকরো গোটা গোটাই সেঁধিয়ে যাচ্ছিল নীতিনের কণ্ঠনালীতে। ডিকিদার অনুপস্থিতিতে কেউ আসেনি মানে! তখনই তো আসল মোচ্ছব চলত এ বাড়িতে। নীতিন প্লেট থেকে চোখ তুলে চাইল শীলার দিকে। দেখল শীলাও সেই কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখে যাচ্ছে ওকে। ওর যে দৃষ্টি প্রথম দেখেছিল সাত বছর আগের মেঘলা সকালে।

শীলার হাতে স্কচের গেলাস। কিন্তু আসল মদটা ওর চোখে। নীতিন চোখ নামিয়ে দিল। ডিকি ফের ওর গেলাসে মদ ঢালতে ঢালতে বলল, 'তুমি বড্ড স্লো যাচ্ছ ব্রাদার। কুইক! কুইক! শীলার জন্মদিনে আজ, আজ বটম্‌জ আপ হতেই হবে।'

বটম্‌জ আপই হল। কিন্তু মেঝেতেই ফ্ল্যাট হয়ে পড়ল ডিকি। বোতলের সত্তর ভাগ একাই ধ্বংস করার সাক্ষাৎ প্রতিফল। ওকে ধরাধরি করে বিছানায় নিয়ে ফেলল শীলা আর নীতিন। স্বামীকে শোয়ানোর পর কী ভেবেই যেন ছোট্ট, গোল, ফুলদানি রেলিঙের বারান্দাটায় গিয়ে দাঁড়াল শীলা। বোধহয় রাতের আকাশের তারা দেখতে!

একটু পর ওর পিছনে গিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়াল নীতিন। শুনল ওপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়েই বলছে শীলা, 'কাল দুপুরে একবারটি আসবে এখানে? অসুবিধা হবে?'

অনেক দিন পর ফের গলা ভেঙে গেল নীতিনের ছোট্ট বাক্যটা বলতে, 'না, না, আসব। কোনও অসুবিধে নেই।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সাতটা বছরকে মাত্র সাতটা দিনের মতো ধরে ফেলতে পারছে নীতিন। আবার সবই ফসকে ফসকে ও যাচ্ছে। আসল বস্তুটি যত কাছে আসছে

স্মৃতিগুলো চশমার কাচে বৃষ্টির ফোঁটার মতো হয়ে পড়ছে। নীতিন কড়া নাড়ার আগেই দরজা খুলে গেল। নিশ্চয়ই ওর আসার ওপর বারান্দা থেকে নজর রেখেছে শীলা। হে ভগবান, শেষে এই দিনটাতেই ও চোখ তুলে এই কপালের ওপর চুলের গোছার মতো ঝুলে থাকা বারান্দাটাকে দেখতে ভুলে গেল।

শীলার পরনে কি সেই প্রথম দিনের লাল শাড়ি? অতশত বুঝতে পারল না নীতিন। শাড়ি নিয়ে কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল। শীলা বলল, 'সকালে মাথাটাথা ধরেনি তো?'

নীতিন লজ্জায় হেসে ফেলল, 'না ওরকম আমার হয়টয় না।

শীলা সম্ভবত ঠাট্টার ছলেই বলল, 'কী হয়টয় তোমার?

বেশ ঝাঁঝের মাথায় নীতিন উত্তর করল, 'আমার কিছুই হয়না।'

সবজান্তা ভাব করে শীলা বলল, 'তা আমি জানি। সাত-সাতটা বছর দেখছি তো।'

'তার মানে? তুমি আবার কী দেখলে?'

'কেন, রাস্তা থেকে চোখ তুলে তুমিই শুধু দেখো। বারান্দা থেকে নীচে চেয়ে আমি কিছু দেখতে পাই না বুঝি?'

'ও তাই! তা কী দেখতে পাও?'

'গুমোর! বাবুর গুমোর!'

গুমোর। নীতিন আকাশপাতাল হাতড়ে হদিশ পেল না ওর কোথায় কী গুমোর। কেনই বা। শীলার সঙ্গে ওর কী টক্কর। ও আস্তে আস্তে গিয়ে বসল একটা মচমচে বেতের সোফায়। আর বলল, 'তাহলে ডেকে এনে কেন একথা বলোনি আগে?'

ফোঁস করে উঠল সেই আদি অকৃত্রিম থির বিজুরি, 'কী বলিনি? রবিন, সুজয় টমি তোমায় বলেনি আমি ডেকেছি?'

মাথায় ওই গোল বারান্দাটাই ভেঙে পড়েছে বোধ হয় নীতিনের। এতজনকে ডেকে খবর দিয়েছে, কিন্তু হারামিরা কেউ একটা জানায়নি ওকে। এত নীচ ওই তথাকথিত ভদ্রলোকের ছেলেগুলো? ওর তথাকথিত বন্ধুগুলো?

কিন্তু মুখ দিয়ে নীতিনের বেরোলো, 'হ্যাঁ, তা বলেছিল।' পরাস্ত কণ্ঠে শীলা বলল, 'তাই না শেষে দাদাকে দিয়ে পাকড়াও করে আনতে হল।'

একটা হালকা রোমাঞ্চ বোধ করল নীতিন। ভেতরে ভেতরে কৃতজ্ঞ বোধ করল বন্ধুদের প্রতি। নাই বা খবর দিয়েছে। না হলে এইভাবে, এই সমাদরে হয়তো আসা হত না সোনালি তামাকের রঙের.....নীতিন মনে মনে শীলার গোটা শরীরটাই দেখতে শুরু করেছে। হোক না পরের বর্ণনায় জানা, কল্পনাটা তো নিজের। চাইলেই তো এখন মিলিয়ে দেখা যায় বাস্তব আর কল্পনাকে। নীতিন বেতের সোফা ছেড়ে উঠে এসে বসল শীলার পাশের খাটে। একটা মৃদু চাপ দিল হাতে। চাপটা ফিরিয়ে দিতে দিতে শীলা বলল. 'তুমি তো ডাক্তার। একটা উপকার করবে?'

'কী উপকার বলো?'

'কটা ইঞ্জেকশন দিয়ে যাবে এসে কদিন?'

ইঞ্জেকশন! কেন? কী হয়েছে শীলার? প্রশ্ন তো নয়, কতগুলো চাপা উৎকণ্ঠা। যা মুখ গলে বেরোয় না।

শীলাই ফের বলল, 'তোমার দাদাই ধরে আনে রোগটা বাইরে বাইরে থেকে। আর আমায় দেয়। এই নিয়ে তিনবার হল। আমার আর ডাক্তারের কাছে যাবার মুখ নেই গো। গতবারই ওয়ার্নিং দিয়েছে এভাবে চললে বিশ্রী কিছু ঘটে যেতে পারে। কিন্তু ফের ধরেছে, লজ্জার কথা আমি কাকে বলব বলো তো?'

নীতিন শীলার হাত থেকে হাত তুলে নিয়ে খাট থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'কেন, বলেছ তো একজনকে অন্তত। আমি কাল ওষুধ আর সিরিঞ্জ এনে ইঞ্জেকশন দিয়ে যাব তোমাকে। তবে তোমার আগের প্রেসক্রিপশনটা পেলে ভালো হয়।'

শীলা বলল, 'আছে। এই নাও।' —বলে ব্লাউজের হাত গলিয়ে বুকের ভেতর থেকে বার করে আনল একটা দলা পাকানো কাগজ। নীতিন বুঝল রবিন হোক সুজয় হোক টমি হোক বা সুবিমল ভুল বলেনি। যদিও কোনওটাই প্রমাণ নেই যে তারা বানিয়েও বলেনি। সুডোল কুমারী স্তন শীলার, সোনালি তামাক রঙের ত্বকও কুমারীর মতো অবয়সি, আপন উষ্ণতায় ও স্বেদে ভিজিয়ে ফেলেছে কাগজের টুকরোটাকে।



সাক্ষাৎকার

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

গাড়িতে উঠে জায়গা পাওয়া গেল। রবিবার। ভিড় কম। তাছাড়া এ গাড়ি চলেছে কলকাতা থেকে উল্টোদিকে। রাজধানী থেকে দূরে যেতে চায় এমন লোক কম—এটা সাহেবদের বহুদিনের অভিজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা।

জানলার পাশে মুখোমুখি দুটি সিট পাওয়া গেল, পাশে একটি। বাসে সিগারেট ধরাল তিনজনে। সহদেব উইল্‌স, বাকিরা চারমিনার। বার কয়েক ধোঁয়া ছেড়ে হিমাংশু বলল, 'সহদেব পাঁচ ফর্মা ডবল ডিমাই স্মলপাইকা ছাপতে কত নেবে রে?'

সহদেব কিছুক্ষণ ভেবে বলল, 'তা ভালো প্রেস হলে তিনশো সাড়ে-তিনশো তো বটেই—আর মনে কর, এগারোশো ইম্‌প্রেশনের কাগজ। কভার বাঁধাই — এসব?'

'আরও চারশো—'

তাহলে সাড়ে -সাতশো। আচ্ছা, আটশোই ধর। গ্রামে আমার একটু জমি আছে, সেটা বিক্রি করে একটা পাঁচ ফর্মার কবিতার বই বার করব, বুঝলি?

সহদেব বলল, 'বুঝলাম। কিন্তু তারপর।'

হিমাংশু বলল, 'তারপর সুইসাইড করব।'

পবিত্র একবার তাকাল হিমাংশুর দিকে, তারপর বলল, 'শালা পাগল।'

'খামোখা গালাগাল দিচ্ছিস কেন?'

সহদেব হেসে বলল, 'রাগ করিস না, পবিত্রর মুখ একটু খারাপ। তুইও একটু ভেবে দেখ, একবার মার খেলে তুই আর কখনও জমি বিক্রি করার সুযোগ পাবি না। বরং বেঁচে থাকলে পরে সুবিধেমতো সুইসাইড করলেই হবে।'

'বেঁচে থাকা এখন ঘোর মুশকিল। কলকাতার একটা চাকরির ঠিক হয়েছিল, তার ভরসায় গ্রামে স্কুলের মাস্টারি ছেড়ে দিয়ে এলাম। এখন সেখানে আর নিতে চাইছে না। আমার নৌকো নদীর ঠিক মাঝখানে — এপারেও না, ওপারেও না। আর কিছুদিন গেলে এমনিতে মরে যাব। তার চেয়ে বরং বই ছাপিয়ে আত্মহত্যা করলে অমর হয়ে যাওয়ার চান্স আছে।'

পবিত্র বলল, 'দ্যাখ, মেয়ে দেখতে যাওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে আবার ওসব কুকথা কেন? বরং একটা গান গা দেখি —'

দ্বিতীয় বার অনুরোধ করার আগেই হিমাংশু কামরাসুদ্ধ লোককে চমকে দিয়ে হেঁড়ে গলায় গেয়ে উঠল — 'চল নাতি জীব কলিকতাকু/বন্ধা রাখিনুআ জুতা ছতাকু/ কলিকতা বড় শহর/ ঠাউঠাউ পকা অফিস ঘর/ঘরে বসি বসি কঁড় করিব —'

সহদেব ধমক দিলে, 'এই কী হচ্ছে? সবাই দেখছে তোকে —'

হিমাংশু গলার জোর বাড়াল — 'ফিরিনু কলকাতারু/কিনিবা হলে গোরু—' পুরো গানটি গেয়ে থামল হিমাংশু। পবিত্র পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছে বলল, 'ওফ্।'

নৈহাটিতে গাড়ি বেশ ফাঁকা হয়ে গেল। কল্যাণী ছাড়িয়ে দু-পাশে বড় বড় মাঠ। অনেকদিন বাদে এত সবুজ একসঙ্গে দেখছে সহদেব। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মনটা তার ভারি ভাল হয়ে গেল। দেখতে দেখতে চলছে। চাকদা, পায়রাডাঙা, রানাঘাট। রানাঘাটে চা কিনল সহদেব। সবাইকে দিল। ট্রেন বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রয়েছে কী কারণে।

চা খেয়ে হিমাংশুর মুড এল। নতুন সিগারেট ধরিয়ে একটা কায়দা করে জিজ্ঞাসা করল, 'মেয়েটির নাম কি বন্ধু?'

'শিউলি।'

'শিউলি! একটুও ঊনবিংশ শতাব্দীর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না?'

সহদেব সংক্ষেপে বলল, 'আমার তাই ভাল।'

বেশিক্ষণ তর্ক করার সুযোগ না পেয়ে দুঃখিত মুখে হিমাংশু সিগারেটে মন দিল।

তাহেরপুর থেকে উঠেছে এক চাষি পরিবার। সঙ্গে টিনের বাক্স, একটা মরচে ধরা পাখির খাঁচা, গুড়ের নাগরি, হাতপাখা, দুটো পেটমোটা চটের বস্তা এবং একটা ফাটা চিমনিওয়ালা হ্যারিকেন। গাড়ির মেঝেয় বাবা-মা কালো কালো দুটো বাচ্চার একেকটিকে কোলে নিয়ে বসে।

দেখতে দেখতে চলছে সহদেব। হিমাংশু বেশিক্ষণ চুপ করে থাকতে পারে না। একটু উসখুস করে বলল, 'কী খাওয়াবে রে?'

সহদেব অন্যমনস্ক ছিল, শুনতে পেল না।

'অ্যাই?'

'অ্যাঁ?'

'কী খাওয়াবে রে ওরা?'

'তা আমি কী করে জানব? আমার সঙ্গে পরামর্শ করে তো আর আয়োজন করেনি।'

কথাটার যথার্থ উপলব্ধি করে হিমাংশু আবার বিমর্ষ হয়ে পড়ল। একটু ভেবে সহদেবের দিকে তাকাল।

'সহদেব —'

'বল্ —'

'দুপুরে খেতে বলেছে যখন, মাংস করবেই বোধহয় না?'

'তা করতে পারে।'

'বহুদিন মাংস খাইনি। শালা চাকরিটা গিয়ে অবধি —'

পবিত্র শুনছিল। এবার বলল, 'মাঝে মাঝে এমন আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। হপ্তাখানেক আগে

একদিন কলকাতায় গেছি, পকেটে ছিল শুধু যাবার ট্রেনের ভাড়াটা। ব্যারাকপুর থেকে শিয়ালদা — পঁয়ষট্টি পয়সা। একজনের কাছে দশ টাকা পেতাম। বলেছিল বারোটার সময় কফি হাউসের নীচে দাঁড়াবি, টাকাটা দেব। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের গাঁট ফুলে গেল, ছেলেটা এল না। সারাদিন খাওয়া দাওয়া নেই, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরলাম। একটা পয়সা নেই পকেটে, কী খাব? একেবারে না খেয়ে কখনও থাকিনি, কাজেই দিনটা মনে ছিল। গতকাল দেখলাম প্রেসিডেন্সি কলেজের গেটের পাশে একটা লোক ভুট্টা পোড়াচ্ছে। পকেটে পয়সা ছিল দাঁড়ালাম। পর পর তিনটে ভুট্টাপোড়া খেয়ে লোকটাকে একটাকা পাঁচ পয়সা গুনে দিতে গিয়ে হাসি পেল। সাতদিন আগে ভাত জোটেনি — এককাপ চা খেতে পারি নে পয়সা অভাবে! আর আজ একটাকার ভুট্টা খেয়ে দাম দিচ্ছি।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপ। তারপর হিমাংশু বলল, 'বিয়ে এখানেই হবে মনে হয়, না?'

সহদেব বলল, 'আশা করা যায়। মা এসে মেয়ে পছন্দ করে গেছেন। মায়ের পছন্দে আমার বিশ্বাস আছে। মায়ের নাকি পান পাতার মতো মুখ, গলায় তিনটে খাঁজ। তা ছাড়া গান গায় আর ছবি আঁকে।'

পবিত্র আবার পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছে বলল, 'উফ্।'

কৃষ্ণনগরে নেমে রিকশা ভাড়া করল ওরা। একটায় সহদেব আর পবিত্র, একটায় হিমাংশু একা।

'কোথায় যাবেন বাবু?'

'ডি.এন.রায় রোড চেন?'

রিকশাওয়ালা ঘাড়টা একবার চুলকে অমায়িকভাবে হেসে বলল, 'কৃষ্ণনগরে দশ বছর রিকশা চালাচ্ছি আজ্ঞে —'

ডি.এন.রায় রোড, পাশে জজকোর্ট, সুদৃশ্য দোতলা বাড়ি মেয়ের বাবার। এমন আদর করে তাদের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল যে সহদেবের নিজেকে ভি.আই .পি বলে মনে হচ্ছিল। বাড়ির আবহাওয়া খুব ভালো লাগছিল সহদেবের। মেয়ের বাবা সুদর্শন ভদ্রলোক — তাঁকে সহদেব আগেই দেখেছে, এবার তিনি একজন সৌম্য মূর্তি মহিলাকে নিয়ে ঘরে এলেন — 'ইনি হচ্ছেন —'

আর কিছু বলবার আগেই সহদেবরা উঠে টকাটক প্রণাম করে ফেলেছে। ফিরে এসে চেয়ারে বসতে বসতে পবিত্র ফিস ফিস করে বলল, 'তোর শাশুড়ি।' সহদেব চাপা গলায় বলল, 'চোপ।'

প্রাথমিক আপ্যায়নের অঙ্গ হিসেবে সরবৎ এল। তাতে প্রথম চুমুক দেওয়া হয়েছে, এমন সময়ে মেয়ের বাবা বললেন, 'এবার তাহলে —'

হিমাংশু ভীষণ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ — ঠিক আছে, এবার আনুন।'

উত্তেজনায় সহদেব সরবতের গ্লাসটা সজোরে চেপে ধরেছে। গলার কাছে একটা শিরা দপ্ দপ্ করছে। সহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, ইউনিভার্সিটির নাম করা ডিবেটার, সারা ক্লাসকে যে

মাতিয়ে রাখতো হাসির গল্প করে আর গান গেয়ে, এখনও অফিসের সহকর্মীরা যাকে টিফিন আওয়ারে ঘিরে বসে মজার গল্প শোনবার জন্য, সে কি না একটা সতেরো বছরের বালিকার সঙ্গে প্রাক্-বৈবাহিক সাক্ষাৎকারে ভয় পেয়ে গেল।

এভাবে মনকে বুঝিয়ে অবশ্য কোনও লাভ হল না। সে গ্লাসটা চেপে ধরেই রইল। গলার শিরাটা দপ্ দপ্ করতেই থাকল।

মেয়ে সত্যিই ছেলেমানুষ। বেগুনি রঙের পিওর সিল্কের শাড়ি পরে ঘরে ঢুকে বসল খাটের এককোণে। সহদেব যেন খুব অন্যমনস্ক, উদাসীন। কেন সে এসেছে চারপাশে কী হচ্ছে, এসব সম্বন্ধে সে আদৌ সচেতন নয়।

হাতের ইঙ্গিতে মেয়ের বাবা বয়স্কদের সরিয়ে দিলেন, তারপর মেয়ের পিসিকে মোতায়েন রেখে বুদ্ধিমান ভদ্রলোক নিজেও কক্ষান্তরে পা চালালেন।

হিমাংশু সামনে ঝুঁকে পড়ে চেহারায় স্মার্টনেস আনতে আনতে জিজ্ঞাসা করল — 'আপনার নামটা —'

পিসিমা বললেন, 'এইটুকু মেয়েকে আবার আপনি কেন?'

থতমত খেয়ে হিমাংশু উইকেট ছেড়ে দেবার উপক্রম করতেই পবিত্র ভীষণ শব্দে কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'তোমার নাম কী?'

সহদেব যেন এসব কথায় কৌতূহলী নয়। মনোযোগ দিয়ে দেখছে দেওয়ালে টাঙানো ক্যালান্ডারের ছবিগুলো। এদিকে শ্রবণেন্দ্রিয় উদ্‌গ্রীব বিশেষ একটি কণ্ঠস্বর শোনবার জন্য, চোখ দুটো বারবার ফিরে যেতে চাইছে খাটের কোনায়। কঠোর প্রচেষ্টায় সে তাদের দেওয়ালের ক্যালেন্ডারে নিবদ্ধ রেখেছে।

সেতারের চিকারির মৃদু শব্দের মতো উত্তর এল—'শিউলি মৌলিক।'

মরিয়া হয়ে সহদেব ঝট্ করে তাকাল মেয়েটির দিকে। ঠিক আছে— গলায় তিনটে খাঁজ, পানপাতার মতো মুখ, আর চিবুকে একটা টোলও আছে। এটা মা পুরো ওভারলুক করে গেছে —মনে মনে ভাবলে সহদেব।

পিসিমা বলল, 'তুমি কিছু জিজ্ঞাসা করবে না বাবা?'

সহদেব সদ্যগ্রামাগত যুবকের মতো ঢোঁক গিলে বলল, 'আমি?'

'হ্যাঁ, কথা বলো দু-একটা।'

অনেক ভেবে সহদেব বলল, 'আপনি তো—মানে তুমি তো গান গাইতে পারো, তাই না?'

একটা অদৃশ্য সেতারের চিকারিতে আবার যেন কার আঙুল একটা ঘা দিল।

'হ্যাঁ—'

হারমোনিয়াম এল। এবার চিকারিতে ঝড়। রবীন্দ্রসঙ্গীত—'দিনের বেলা বাঁশি তোমার বাজিয়েছিলে।'

বেশ গলা। সহদেব মুগ্ধ। আরও পনেরো মিনিট বিভিন্ন একাক্ষরী সংলাপের পর মেয়ের বাবা মেয়েকে ভেতরে নিয়ে গেলেন।

খাওয়ার ডাক এল। ফ্রায়েড রাইস, মাছভাজা, ইলিশের ঝাল, মাংস, সরষে দিয়ে পার্শে

মাছ, দই, মিষ্টি। সহদেব যা খেল তা তার স্বাভাবিক খাওয়ার এক-চতুর্থাংশ। হিমাংশু চেটেপুটে খেয়ে সবাইকে চমকে দিয়ে ঢেঁকুর তুলতে লাগল। পবিত্র পেট ভাল যাচ্ছে না, তার সাধ আছে কিন্তু সাধ্য নেই।

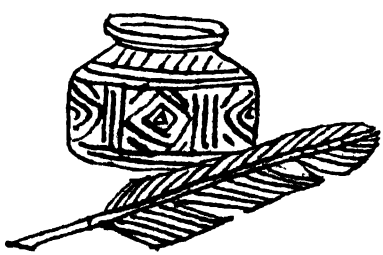
আবার বাড়ির পথ। দিনশেষের ক্লান্ত স্পর্শ রেল-লাইনের দু-পাশের দিগন্তপ্রসারী সবুজ মাঠে। লাইন সারানো হচ্ছে —ঢিকোতে ঢিকোতে চলছে গাড়ি! হিমাংশু উড়িয়া গানে উৎসাহ পাচ্ছে না, পবিত্র মুখখারাপ করছে না। ওরা দুজনে যেন কেমন মিইয়ে গেছে। কণ্ঠিওয়ালা একজন লোক গান গেয়ে ভিক্ষে করছে—ওমা আর কতদিন থাকব বসে ঘাটে।

হিমাংশু ডাকলে—'সহদেব—'

'কী?'

'তুই যদি মেয়েটাকে বিয়ে না করিস, তাহলে আমাকে জানাবি। একটা ভালো চাকরি পেলে আমি বিয়ে করব। জানাবি তো?'

সহদেব চাকরির বাজার কেমন জানে। পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'জানাব।'



বইবৃত্তান্ত

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়

এক বিশাল সমুদ্রের জলরাশির মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে অবগাহন করছিল নবনীত। চারপাশে শুধু জল জল আর জল। নীল জলরাশির ঢেউয়ের চূড়ায় উঠে পরক্ষণে বেলাভূমিতে আছড়ে পড়লে সে আশ্চর্য সাদা ফেনার সৃষ্টি হয়, সেরকম সাদা পৃষ্ঠায় মাখামাখি সমুদ্রের স্বাদ তার সমস্ত সত্তায়। সাদা ফেনা ঘিরে আছে তার সারা শরীর। তার মন। তার পারিপার্শ্বিক।

বহুক্ষণ ধরে সেই স্বাদে-গন্ধে ওতপ্রোত হয়ে নবনীত খুঁজছিল অবিশ্রান্ত। যা খুঁজছে তা কিছুতেই হাতে উঠে আসছে না। মুক্তোটা কোনও ঝিনুকের ভাঁজে চুপটি করে লুকিয়ে আছে, হয়তো আর একটু খুঁজলেই উঠে আসবে করতলে—এই ভেবে সকাল থেকে পাগলের মতো তার এই অনুসন্ধানপর্ব। ছান্দসী অনেকক্ষণ আগে তার কাণ্ডভাণ্ড দেখে বলেছিল, 'তোমার এই এক অসুখ। কোথায় না কোথায় তোমার সাত রাজার ধন এক মানিক রাখবে, তারপর খুঁজে খুঁজে হাল্লা।'

সে বহুক্ষণের কথা। তারপর বহু ঘুরে গেছে ঘড়ির কাঁটা। ছান্দসী কোনও বেলাভূমিতে গিয়ে এলাটিং বেলাটিং কাটিয়ে এল, সহসা বাড়ি ফিরে নবনীতকে একই, কিংবা আরও ঘোরতর অবস্থায় দেখে চেঁচিয়ে উঠল চোখ বিস্ফারিত করে।

'এ কী করছে! সারা ঘরে বই ছড়িয়ে এ কী কাণ্ড করেছ?'

নবনীত এতক্ষণ বুঁদ হয়ে ছিল সমুদ্রের ফেনার মধ্যে। সাদা ফেনায় তার শরীর ততক্ষণে বিপুলভাবে ভরে। ফেনা ঝরে পড়ছে আদুল শরীর থেকে। ফেনা কিংবা ঘাম। মুক্তো খোঁজা তো কম পরিশ্রমের কাজ নয়। ফেনা কিংবা ঘামে মাখামাখি হয়ে সে যখন পরিশ্রান্ত, পর্যুদস্ত, সে সময় ছান্দসী কী অবলীলায় ভেঙে দিল তার স্বপ্নটা। আসলে সে র‍্যাক ঘেঁটে খুঁজছিল অনেকদিন আগে কেনা একটা পুরনো বই। সাড় ফিরল ছান্দসীর রাগী, তেজালো কণ্ঠস্বরে। ছান্দসীর চোখ অনুসরণ করে দেখল সত্যিই তার চারপাশে থইথই সাদা ফেনার রাশ। আসলে সেগুলো বই। তার অজান্তেই তাকে ঘেরাও করেছে অজস্র নতুন-পুরনো বই।

বাইরের ঘরের এক কোনায় তার লেখাপড়া করার টেবিল। বাকি ঘরের প্রায় সব

দেওয়ালে বইয়ের র‍্যাক। অধ্যাপনা করার ফাঁকে কিছু লেখালেখি, পেপার তৈরি ইত্যাদি লেগেই আছে বারো মাস। ছুটির দিনগুলো কেটে যায় সেইসব লেখার উপকরণ সংগ্রহে। কাল গভীর রাতে একটানা লিখতে লিখতে পুরনো কলকাতার প্রসঙ্গ এসে যাওয়ায় বইটা সেই মুহূর্তে খুবই দরকার হয়ে পড়েছিল। কিন্তু র‍্যাকে বারবার চোখ বুলিয়েও তার ঠিকানা খুঁজে পায়নি। বহুদিন অব্যবহারের ফলে বইটা তার অজস্র বইয়ের সমুদ্রের কোনও গহনে লুকিয়ে পড়েছে তা উদ্ধার করাই এখন দুঃসাধ্য। কিন্তু বইটা না হলে তার চলবেই না। অতএব র‍্যাক থেকে একটার পর একটা বই নামিয়ে পাগলের মতো খুঁজে চলছিল অভীষ্ট বইটা। সেই খোঁজার পরিণতিতে সারা ঘরের মেঝেয় এমন থইথই বই পাতিয়ে ফেলেছে, পাতানোর পর ঘরে যে পা ফেলারও জায়গা নেই তা এতক্ষণে খোঁজাখুঁজির মধ্যে খেয়ালই করেনি।

এখন যদি একজন বাইরের লোক আসে, ঘরে কী ভাববে বলো তো?

খবরের কাগজের উড়োজাহাজ বানিয়ে বাতাসে ছুঁড়ে দেওয়ার ভঙ্গিতে নবনীত উড়িয়ে দিতে চাইল অভিযোগটা, কী আবার ভাববেন! অধ্যাপকের বাড়ি, তার উপর সেই অধ্যাপক যদি সারাক্ষণ পেপার তৈরি করায় ব্যস্ত থাকেন, তার বাড়ি যে এরকম হবেই তা বালকেও বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, আমি বইগুলো তুলে নিচ্ছি।

বইটির খোঁজায় ক্ষান্ত দিয়ে আবার সেই ভেঙে পড়া ব্রেকার যথাস্থানে ফিরিয়ে দিতে শুরু করে নবনীত। ছান্দসী অবশ্য তাতে ক্ষান্ত হল না। ঘরের চারপাশে তার টাল দিয়ে রাখা অজস্র বইয়ের দৃশ্যের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল, 'কিন্তু ঘরের কী হাল হচ্ছে দিন দিন তা কখনও দেখেছ চোখ মেলে! সারাদিন বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকো। একবারও ভাবও না, এই বইয়ের রাশির মধ্যে বাস করা কী বিশ্রী লাগে অন্যদের।'

নবনীত তখন প্রাণপণে তুলছে বইয়ের স্তূপ। অন্তত পঞ্চাশ-ষাটখানা বই নামিয়ে ফেলেছে। সেগুলো ঠিকঠিক জায়গায় সাজিয়ে রাখাও এক দুঃসাধ্য ব্যায়াম। র‍্যাকের উপরে ঠেসে রাখা বইগুলোর পিছনেও আর একসার বই। যে বইগুলো তার তেমন দরকার লাগে না, সেগুলো পিছনে গুঁজে রেখে দেয় মাঝেমধ্যে কেন না তার সংগ্রহের বইয়ের সংখ্যা দিন দিন ক্রমবর্ধমান। একটা বইমেলা চলে যাওয়ার পর সংখ্যাটা বহু বেড়ে যায়। তখন আগের কম-দরকারি বই চলে যায় পিছনে। তখন খেয়াল থাকে না সেই বইয়ের কোনটা ক-দিন পরেই আবার প্রয়োজন হতে পারে। ফলে এই বই খোঁজার দুর্ভোগ তার নিত্যদিন।

ছান্দসী তার এই কসরত দেখে আবার মেজাজ হারাল বলল, 'তা এই বই জমিয়ে কী করবে তুমি? কোনও দিন গোটা বাড়িটা চোখ মেলে দেখেছ কী অবস্থা হয়েছে? যেদিকে তাকাও শুধু বই আর বই। সবকটা ঘরেই এত বই ঢুকিয়েছ যে এর পর আমাদের থাকার জায়গাই থাকবে না। এখনই যা অবস্থা তাতেই দম বন্ধ হয়ে আসে।'

বই নিয়ে ছান্দসীর এই অভিযোগ আজ বহু বহু বছরের। বিয়ের পর কিছুদিন মাঝে মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখত বইগুলো। তারপর ক্রমশ তার আয়ত্তের বাইরে চলে যায় বইয়ের সংখ্যা। নবনীতেরও আয়ত্তের মধ্যে নেই বইগুলো। সে চেষ্টা করে সাধ্যমতো গুছিয়ে রাখতে। কিন্তু ভারতবর্ষের জনসংখ্যা যেমন সরকারের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়ে

লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে যাবতীয় প্ল্যানিং, তেমনই নবনীতের বই।

ছান্দসী মাঝে মাঝেই রাগারাগি করে তার এই বই জমানোর দুরারোগ্য বাতিকের জন্য। ছান্দসীর ভাষায় এটা বাতিক, নইলে এমন অনেক বই সে বহুকাল ধরে আলমারিতে বা র‍্যাকে সাজিয়ে রেখেছে যা তার পড়ার সময়ই হয় না। কখনও পড়বে বলে মনেও হয় না। নবনীত বোঝে অভিযোগটা মিথ্যে নয়। বেশ কিছু দামি বই অনেককাল ধরেই একটা একটা করে কিনেছে, কখনও সুবিধেমতো অবসরে পড়বে বলে। কিন্তু সত্যিই সেই বইগুলো পড়ার সময় হয়নি আজও; এখন ঠিক করেছে অবসরের পর যখন সময় তাকে তাড়া করতে চাইবে তখনই পড়বে বইগুলো। আসলে বেশিরভাগ বইই বিয়ের আগে কেনা, যখন সংসার চালানোর চিন্তায় মাথা পাকাতে হত না। তখন মাইনের বেশি টাকাটাই চলে যেত কলেজ স্ট্রিটের গহ্বরে। বিয়ের পর কেনার বহর কমলেও গত কয়েক বছর প্রায়ই উপহার হিসেবে বই পাওয়া যাচ্ছে। অনেক সহকর্মী বই বা থিসিস প্রকাশ করছেন। অনেক চেনা কবি লেখকরাও বই দিয়ে যায় পড়তে। সেগুলোও জমে যাচ্ছে ক্রমশ। সব মিলিয়ে অবস্থাটা এখন গিনিপিগের বংশবৃদ্ধির পর্যায়ে।

বইয়ের রাশির দিকে নবনীত বারবার তাকায় আর ভাবে গোটা দুই-তিন বড় ঘর পেলে তার সমস্ত দেওয়ালে র‍্যাক তৈরি করে একটা পার্সোনাল লাইব্রেরি করে ফেলত। কিন্তু কলকাতা শহরে যারা ফ্ল্যাটবাড়ির ছোট্ট পরিসরে বাস করে তাদের পক্ষে পার্সোনাল লাইব্রেরি করার বাসনা ডিপফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখতে হয়। অতএব দিনে দিনে বই ঝাড়েবংশে বেড়ে চলেছে, সেগুলো এখন ফুটপাথ বাসিন্দাদের চালচুলোহীন কিলবিল করতে থাকা বাচ্চাগুলোর মতো।

গৃহিণীর অভিযোগের উত্তরে নবনীত প্রতিবার যা বলে তাকে এবারও রিপ্লের মতো তাই বলে গেল, 'হ্যাঁ, এইবার একটু ফুরসত পেলেই করব। বুঝলে, এই সামনের মাসের সেমিনারটা হয়ে যাক। তারপর। বুঝতেই পারছ কীরকম চাপের মধ্যে আছি।'

ছান্দসীকে তার হাজারো কাজের চাপের কথা বেশ যুক্তিটুক্তি দিয়ে বলে শান্ত করা যায়, কখনও আবার যায়ও না। ক্লাসে তার ভাল পড়ানোর খ্যাতি আছে। ক্লাসে তার পড়ানো তার ছাত্রছাত্রীরা বেশ বুঝতে পারলেও বাড়িতে তার যুক্তিটুক্তি ছান্দসীর কানের পাশ দিয়ে কিংবা কানের লতি ছুঁয়ে ট্যানজেন্টের মতো বেরিয়ে যায়। তখন আরও অনেক ব্যাখ্যাট্যাখ্যা করে বোঝাতে হয়। কখনও বইগুলো একটু গোছগাছ করার চেষ্টা করে দেখাতে হয় সে ছান্দসীর কথাকে বেশ গুরুত্ব দিয়ে ভাবছে।

এভাবেই চলে আসছে গত কয়েক বছর। মাঝে একবার অনেক ঝাড়াই-বাছাই করে কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিন, পুরনো কাগজপত্র ইত্যাদি অনেক চেষ্টায় বেছেবুছে ফেলতে পেরেছিল। তাতে আসল সমস্যার কোনও সুরাহা হয়নি। তার পরের বছরগুলোয় জমে গেছে আরও অনেক অনেক বই। ছান্দসী সারাদিন ঘরে থাকে, নবনীতের চেয়ে তাকেই বেশি ঝঞ্ঝাটে পড়তে হয় এত বই থাকার কারণে। তাই আজ আর সে থামল না, আমেরিকার মতো বেশ দাপুটে কণ্ঠে বলল, 'তোমার চাপ কবে নেই বলো তো! আজ সেমিনার তো কাল পরীক্ষার খাতা দেখা, পরশু বাইরে যাওয়া। জানো কাল বাড়িতে কী ঘটনা ঘটেছে?'

নবনীত বেশ শঙ্কিত হল ছান্দসীর আক্রমণের ধরনে, জানতে চাইল, 'কী?'

'তোমার টেবিলটায় বই চাপিয়ে যা টইটম্বুর করে রাখো, তা তো চোখে দেখা যায় না। একসঙ্গে এত বই কি তুমি পড়ো? সব একসঙ্গে র‍্যাক থেকে নামিয়ে টাল দিয়ে রাখতে হবে! কাল টেবিলের নীচে যখন সাবিত্রী ঝাঁট দিতে গিয়েছিল, বোধহয় টেবিলটা একটু নড়ে গিয়ে থাকবে, অমনি সব বই হুড়মুড় করে সাবিত্রীর ঘাড়ে। যা ব্যথা পেয়েছে না!'

'তাই নাকি?' নবনীতের কাছে এতক্ষণে খোলসা হয় ছান্দসীর ক্রুদ্ধ হওয়ার কারণ।

'হ্যাঁ। সাবিত্রী বলেছে ও আর এ বাড়িতে কাজ করবে না!'

'সে কি! খুব ব্যথা পেয়েছে! মানে রক্তপাত-টাত!'

'কেন, রক্ত না বেরোলে কি ব্যথা পাওয়া যায় না? পনেরো-কুড়িখানা বই যদি হুড়মুড় করে ঘাড়ে পড়ে তো কী হতে পারে একবার ভাবো দেখি। অত মোটা মোটা বই!'

নবনীত বোঝে আজ দিন খারাপ। সকাল থেকেই ছান্দসীর মেজাজ খারাপ মানে সারাদিনে ঝড় উঠতে পারে। তাছাড়া সাবিত্রীর চোট পাওয়া মানে ছান্দসীরই চোট পাওয়া। সাবিত্রী যদি সত্যিই কাজ ছেড়ে দেয় তাহলে ছান্দসীর দুর্দশার অন্ত থাকবে না। তাতে নবনীতের দুর্দশা চক্রবৃদ্ধিহারে বাড়বে। সংসারের যাবতীয় ঝক্কি এখন ছান্দসীই সামলায়। নবনীত তো মাইনের টাকাটা ছান্দসীর হাতেই তুলে দিয়েই খালাস। তারপর সারা মাসের সাংসারিক দায়ের সবটাই ছান্দসী সারে। নবনীতকে কুটোটি আর নাড়তে হয় না। কিন্তু ঘরের কাজের লোক না থাকলে ছান্দসীর কাজ বেড়ে যাবে, তার রেশ এসে পড়বে নবনীতের কাঁধেই।

নবনীত অসহায়ের চোখে তাকায় ছান্দসীর দিকে, তা হলে এখন কী উপায়?

'তুমি বই সামলাও আগে। সেমিনারটার ছাড়ো। এত বই থাকলে বাড়িতে বাস করা যায় না। সব জিনিসেরই তো একটা সামঞ্জস্য আছে। তোমার যা বাড়ি তাতে যতটুকু বই ধরে রাখো। বাকি বই বেছে ফেলে দাও।'

'ফেলে দেব! বই! নবনীত প্রায় ককিয়ে ওঠে।'

'তা যদি না পারো তাহলে আমরা অন্য কোথাও গিয়ে থাকি। এভাবে আর বাস করা যাচ্ছে না। কত পোকা হয়েছে সারা বাড়িতে তা দেখেছ? বইয়ের পোকা তো আছেই, সেই সঙ্গে আরশোলা, টিকটিকি পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। এভাবে আর থাকা যায় না। তুমি এ সব ভালোবাসো। তোমার এ সব পোষায়। কিন্তু বাড়ির লোকগুলোর কী অবস্থা হচ্ছে তা কি ভেবে দেখেছ? তাহলে আমাদের কোথাও একটা ঘর ভাড়া করে দাও, আমরা সেখানে গিয়ে থাকি।'

নবনীত বুঝল আজ ছান্দসী একেবারে মরিয়া। তাকে কোনও মতেই আর থামানো যাবে না। এরকম পরিস্থিতিতে সে বরাবরই দিশেহারা বোধ করে। ঘরের চারপাশে তাকিয়ে ছান্দসীর অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে চাইল। সত্যিই সবকটা ঘরেই এত এত বই জড়ো করেছে যে, ক-দিন আগেই তার এক পুরনো বন্ধু বেড়াতে এসে বলেছিল 'কী রে, বাড়িটাকে বইয়ের গোডাউন বানিয়ে ফেলেছিস যে!'— তখনও ঠিক গুরুত্ব দেয়নি কথাটায়। এখন মানতে বাধ্য হল তার বইয়ের জন্য বাড়িটা বসবাসের অযোগ্য হওয়ার পথে। এখনই

কিছু ব্যবস্থা না নিলে নয়।

নবনীত বেশ তালগোল পাকিয়ে গেল তার বাড়িটিকে বইয়ের আক্রমণের বাঁচানোর পদ্ধতি ভাবতে গিয়ে। যে বই তার এত প্রিয় সেই বই-ই কিনা তার বাড়ির অশান্তির কারণ। বাড়িটা বসবাসযোগ্য করে তুলতে গেলে বাতিল করার মতো কিছু বই ফেলাটাই সবচেয়ে আগে জরুরি। বেছে ফেললে সেই উদ্বৃত্ত বই কী করবে, তা কোনও লাইব্রেরিকে দিয়ে দেওয়া যাবে, না কি অন্য কিছু করবে তা পরে ভাববে। তার আগে—

নবনীত তার বইসাম্রাজ্যের দিকে পুনর্বার চোখ পাতে। রোজই দেখছে, অসংখ্যবার দেখছে, তবুও আবার নতুনভাবে দেখল, কেননা তাকে এখন ভাবতে হবে কোনও কোনও বই তার বাকি জীবনে না হলেও চলবে। বেশির ভাগ বই-ই তার মাসমাইনের টাকায় কেনা। যে বই কখনও কাজে লাগবে, কিংবা অবসর পেলে বেশ তারিয়ে তারিয়ে পড়বে তা ভেবেই কিনেছিল একটি একটি করে। তার অনেকগুলোই এখন ফেলতে হবে বাতিলের পর্যায়ে। সেই বাতিলযোগ্য বইয়ের অনুসন্ধানেই তাকে নামতে হবে হাতের কাজ সব ফেলে। যে-বইগুলোর সঙ্গে কেটে যায় তার ঘুম ও জাগরণের বেশিটা সময় তাদের মধ্যেই তাকে আরও নিবিড়ভাবে কাটাতে হবে, কিন্তু বইপ্রেমিকের চোখে নয়, বইঘাতকের চোখে। কাজটা কঠিন ভীষণ কঠিন। তবু তাকে এই অপ্রিয় কাজটা করতেই হবে। না করলেই নয়। অতএব সেই বিশাল সমুদ্রে গা ডুবিয়ে কী কী বই বাতিল করবে তার একটা খসড়া করতেই হয়। কোনও র‍্যাকে শুধু ইংরেজি বই।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন শেক্সপিয়র, তলস্তয়, দস্তভয়েস্কি, চেখভ, জেম্স জয়েস, শলোকভ, হেমিংওয়ে, গোগল, পুশকিন, থেকে শুরু করে মার্কেজ, সলমন রুশদি, অরুন্ধতী রায়, অমিতাভ ঘোষ— এরকম কত লেখক যাদের লেখা সে সময় পেলেই পড়ে। অন্য র‍্যাকে বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক থেকে শুরু করে একালের লেখকরা। আছে বেদ, উপনিষদের মতো অবশ্যপাঠ্য বইগুলো। আছে সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভার, কালিদাস রচনাবলী, কালীপ্রসন্নের মহাভারত—এরকম বিশাল তালিকা। আছে বিশ্বকোষ ছাব্বিশ খণ্ডের। আছে........

কোথাও অনেক যত্নে রাখা নানা পত্রপত্রিকার কিছু বিশেষ সংখ্যা। কোথাও বাছাই কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিনের বিশেষ সংকলনগুলি। ত'তে এমন কিছু লেখা আছে যা একবার পড়ার পর মনে হয়েছিল পরে পড়বে আবার। তাছাড়া প্রবন্ধের বহু বই একে একে কিনেছে আর সাজিয়েছে র‍্যাকে। কোথাও আগাথা ক্রিস্টি, কোনান ডয়েল। আরও সব বিখ্যাত বই যা কিনেছে প্রতি মাসে নিয়ম করে। দেখছে আর ভাবছে তার উদ্যোত গিলোটিন সবেগে নেমে আসবে কার কার উপর।

কিছুক্ষণের মধ্যে ঘেমে নেয়ে গেল নবনীত। বইপাগল লোকের পক্ষে বই বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়াই পৃথিবীর সবচেয়ে কঠিন কাজ। এর চেয়ে আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা ঢের সহজ। যে মানুষটা জেগে থাকার প্রতিটি মুহূর্ত বইয়ের সংস্পর্শে থাকে, খাওয়ার টেবিলেও দুটি গ্রাস মুখে তোলার ফাঁকে একটা বইয়ের পৃষ্ঠা পড়ে নেয়, রাতে ঘুমোনোর আগে বিছানায় বই নিয়ে ঢোকে, যতক্ষণ না ঘুম আসে চোখ বুলোতে থাকে কোনও না

কোনও বইয়ের পৃষ্ঠায়, বই হাতে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে কতদিন, কখনও মধ্যরাতে বইয়ের স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভাঙলে আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করেছে তার দু-হাতে ধরা বইয়ের খোলা পৃষ্ঠা, পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লে বইটা হাত থেকে খসে পড়ার কথা, কিন্তু কী অদ্ভুত, খসেনি, যেন সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল, বইয়ের সঙ্গে তার এমনই টান-ভালোবাসা, সে যে কীভাবে.....

তবু কিছু বই না ফেললে বইয়ের সমুদ্রেই তো বাস করতে হবে তাদের। অতএব— অতএব একজন বইখুনির মতোই ভয়ঙ্কর হয়ে চোখ পাতে র‍্যাকের দিকে। কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিনকেই মনে মনে তাক করল প্রথমে। কিছুকাল আগে অনেক ঝাড়াইবাছাই করে বেশ কিছু লিট্‌ল ম্যাগাজিন ফেলেছিল । বাকি পত্রিকাগুলোর মধ্যে আবার কাঁচি চালাতে হবে নির্মমভাবে কিছু গল্প-উপন্যাস যা এ মুহূর্তে এলেবেলে মনে হচ্ছে তাও নিক্ষেপ করতে হবে মহাকালের গর্ভে। প্রবন্ধের বইগুলোর ফেলাই সবচেয়ে দুরূহ কাজ। কিছু পত্রপত্রিকা যা একদা বাঁধিয়েছিল অনেক যত্নে তাও ফেলে দেবে কিনা ভাবতে বসে।

কিন্তু ভাবা যত সহজ, কাজটা ততই কঠিন। র‍্যাকে হাত দিতে গিয়ে অনুভব করল তার হাত কাঁপছে। একটা লিট্‌ল ম্যাগাজিন ওলটাতেই ল্যাটিন আমেরিকার সাহিত্য নিয়ে একটা মননশীল লেখা চোখে পড়ল। নাই, এই সংখ্যাটা কিছুতেই হাতছাড়া করা যাবে না। সেটা র‍্যাকে রেখে দিয়ে টেনে নিল আর একটা পত্রিকা। ইস্‌, এতে তো কত ভাল লেখা! এই প্রত্যেকটা বইয়ের সঙ্গেই তো জড়িয়ে আছে তার বহু স্মৃতি, বহু এপিসোড। কত অদ্ভুত প্রসঙ্গ মনে ভিড় করে আসে। এক একটা বই কেনার পর তার সঙ্গে কিছুদিনের সহবাস। কিছু চমৎকার মুহূর্ত তাদের সঙ্গে। আবার অনেকদিন পর কী কারণে তার কোনও একটা বই হয়তো টেনে নিল অবসরের মুহূর্তে। পুরনো লেখাগুলো আর একবার পড়ল। অনেকদিন পরে পড়তে গিয়ে খুঁজে পেল কিছু নতুন অনুষঙ্গ। আবার রেখে দিল র‍্যাকে। এভাবেই বইগুলোর সঙ্গে তার চেনাজানা চলে আসছে আজ কত বছর।

শুধু তো তাই নয়। পড়া কিংবা না-পড়া বইগুলো চারপাশে ঘিরে থাকলে কেমন একটা আশ্চর্য অনুভূতি হয় তার। ভারী ভারী বইগুলো থেকে এক অদৃশ্য রশ্মি যেন বেরিয়ে আসে সর্বক্ষণ। সেই রশ্মি ক্রমাগত প্রবেশ করতে থাকে তার শরীরে। তাতে তার মগজ আরও সমৃদ্ধ হয়। লিখতে গিয়ে আত্মবিশ্বাস পায় আরও। তার ধারণা ঘরে এত বই না থাকলে তার কলমের অক্ষরগুলো যথেষ্ট ধারালো হত না হয়তো।

অনেকক্ষণ পরে ছান্দসীর ডাকে তার সাড় ফিরল, 'কী হল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পড়ছ কেন?'

সমুদ্র থেকে ভুস করে ভেসে উঠল নবনীত। ছিটানো সাদা ফেনার মধ্যেই দেখল ছান্দসীর হাসি হাসি মুখ, তার কাণ্ড দেখে বলছে, 'ওহ্, যা ডুবে আছ বইয়ের ভেতর, কোনও সময় উলটে পড়বে মেঝেয়। যাই হোক তোমার খেয়াল আছে কিনা কে জানে। কাল তোমার জন্মদিন।'

জন্মদিন! বইয়ের রাশির ভিতর হাবিডুবি খেতে খেতে নবনীত ভুলে গিয়েছিল নিজেকে।

'এবার কী নেবে বলো তো?'

'কী নেব! উপহার নিয়ে কখনও মাথা ঘামায় না নবনীত। প্রতিবারই কিছু না কিছু কিনে আনে ছান্দসী। আজ সকাল থেকে বই-বাতিল নিয়ে এত বিব্রত ছিল যে, ছান্দসীর প্রশ্নে যে উত্তরটা মাথায় এসেছিল তা হল, বই ছাড়া কি আর কিছু ভালোবেসেছি এ জীবনে। স্মরণে আসতে আরও নিমগ্ন হল বইয়ের ভাবনায়। কথাটা বললে হয়তো ছান্দসী এখনই নোটিস ধরিয়ে দেবে ডিভোর্সের। কিছুক্ষণ ভাবনার রাজ্যে টহল দিয়ে উদাসীন, আনমনা কণ্ঠস্বরে বলল, 'যা হোক কিছু কিনে এনো।'

পরক্ষণেই হাজারো কাজের চাপে জন্মদিনের কথাটা তার মাথা থেকে ফসকে গিয়েছিল যথারীতি। মনে পড়ল অনেক রাতে হাসি হাসি মুখে ছান্দসী তার ঘনিষ্ঠ হতে, 'বলো তো তোমার জন্যে কী কিনে এনেছি?'

'কী আবার! নিশ্চয়ই গেঞ্জি।'

'হল না। আরও ভাব।'

'তাহলে—তাহলে পাঞ্জাবী।'

'হয়নি। আরও ভাব।'

ছান্দসীর এই এক খেলা। সে কী কিনে এনেছে তা কি এভাবে ভেবে বলা যায়! নবনীত অনেক ভেবেটেবে বলল, 'তাহলে পেন।'

'উহুঁ। তোমার আরও দরকারি কিছু। ভাবো। ভাবলেই পেয়ে যাবে।'

নবনীত ভাবনার সমদ্র সাঁতার কাটতে থাকে। আর কী হতে পারে যা তার এখনই দরকার! চটিটা ছিঁড়ে গেছে ক-দিন আগেই বলেছিল। কিন্তু জন্মদিনে কি আর চটি কিনে দেবে ছান্দসী! কিন্তু এগুলো ছাড়া তার আর কী পাওয়ার আছে জাগতিক বিষয়ে।

ছান্দসীর হাসি আরও বিস্তৃত হল. 'পারলে না!' বলে তাকে বিস্ময়ের শিখরে তুলে তার ঝুলি থেকে যে-বিড়ালটি বার করল তা দেখে নবনীততার পুরনো বউকে যেন চিনতেই পারল না।

ছান্দসীর মতোই হাসি হাসি মুখে যে কয়েকখণ্ড সমুদ্র বেরোল মোড়কের ভিতর থেকে, ক-দিন ধরেই সেগুলো কিনবে কিনবে ভাবছিল নবনীত। সাদা ফেনা ছিটোতে থাকা বইগুলোর দিকে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে তাতে অবগাহন করতে করতে বলল, 'শুধু প্রাইজই নয় সঙ্গে সারপ্রাইজ।'



ক্ষমাভিক্ষার দিন

ভগীরথ মিশ্র

ঘরটাতে পা দেওয়া মাত্রই গন্ধটা পেলেন অতনু। বেশ পুরনো চেনা গন্ধ। পনেরো বছর আগের দিনগুলোর কথা মনে করিয়ে দেয়। এ ডি এম-এর চেম্বার। পনেরো বছর আগে এই ঘরে সরকার-সাহেব বসতেন। তিনি চলে যাওয়ার পর সান্যাল-সাহেব। আজ অ্যাদ্দিন বাদে এই ঘরেই বসবেন অতনু।

পনেরো বছর আগে অতনু এই শহরে ছিলেন। এই কালেক্টারেটে তাঁর কেটে গিয়েছে তিন-তিনটে বছর। তখন তাঁর বয়স পনেরো বছর কম ছিল। শরীর ও মনে পনেরো বছর কম বয়সের যাবতীয় লাবণ্য, কমনীয়তা, তেজ, লোভ, আকাঙ্ক্ষা ও মাৎসর্য— সব ঠিকঠাক অনুপাতে মজুত ছিল। তখন অতনু জেলা কালেক্টরেটের জবরদস্ত এন ডি সি। ডি এম মিঃ রঘুপতি এবং মিসেস রঘুপতি খুবই নেকনজরে দেখতেন অতনুকে। আর তাই নিয়ে তাঁর কলিগদের মনে ঈর্ষার অন্ত ছিল না। অতনু কখনওই বিচলিত হননি সেজন্য। ভেতর থেকে কেউ একজন গালে টোকা মেরে বলত, অন্যের ঈর্ষাটাও, বুঝলে বেশ উপভোগ্য একটা ব্যাপার। বিশেষত উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষের কাছে। এই যে ধর, কালেক্টরেটে এত এত ডেপুটি থাকা সত্ত্বেও, কেউ কেউ তো তোমার চেয়ে বেশ সিনিয়রও, তা সত্ত্বেও এই যে তোমাকে এন ডি সি-র পদটা দিলেন ডি এম, এতে করে অন্যের গাত্রদাহ হতেই পারে। বাট য়্যু কান্ট হেল্প ইট। তোমার মধ্যে যা আছে, অন্যের মধ্যে হয়তো তা নেই। ডি এম তো আর গাড়ল নন, অনেক ভেবেচিন্তে কাজ করতে হয় তাঁকে। আমরা তো জানি, কালেক্টারেটে ডেপুটির চাকরি করতে এসে কতজনই তো স্রেফ এন ডি সি হওয়ার স্বপ্ন দেখতে-দেখতে বদলি হয়ে যায় অন্যত্র। কী আর করা যাবে! সবার ক্যালি তো সমান নয়। এই দুনিয়ায় সবই সবকিছু পায় না। তবুও মধ্যবিত্তের আর কী ই বা আছে ওই একচিলতে স্বপ্ন ছাড়া, কিনা বড় হব, পাঁচজনার একজন হব.... চারপাশের সমগোত্রীয়দের, নিরক্ষীয় অঞ্চলের মহীরূহদের মতো, ছাড়িয়ে যেতে চাইব উচ্চতায়! বিপুল অর্থ, সম্পদ, বংশগত কৌলিন্য, আভিজাত্য—এসবের কোনও কিছুই তো পুঁজি নেই মধ্যবিত্তের সঞ্চয়ে। পুঁজি বলতে ওই স্বপ্নটা। যার অন্য নাম উচ্চাকাঙ্ক্ষা। তো, কালেক্টরেটের ডেপুটিদের মধ্যে ওই উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা তো থাকবেই, কিনা,

এন ডি সি হব। আর, সেজন্য তাদের দোষও দেওয়া চলে না। পদটার পুরো নাম হল, নেজারত ডেপুটি কালেক্টর। অর্থাৎ কিনা, নেজারত সেকশনের ইন-চার্জ। আর, নেজারত সেকশন হল, কালেক্টারেটের মিউনিসিপ্যালিটি। সারা কালেক্টরেটের যাবতীয় দেখভাল, প্রতিটি সেকশনের যাবতীয় চাহিদা পূরণ করা, সারা অফিসের ঘরে ঘরে ঝাড়পোঁছ, আলোবাতি, পর্দা-কুশন, যাবতীয় গাড়িঘোড়ার বিলিব্যবস্থা, অতিথি আপ্যায়ন, সার্কিট হাউস নামক সরকারি অতিথিশালাটিকে সাজানো গোছানো, অতিথিদের জন্য বরাদ্দ করা, রক্ষণাবেক্ষণ, অলঙ্করণ ও নিয়ন্ত্রণ —এক কথায় সব কিছু। তার ওপর রয়েছে জেলাশাসকের কোষাগারের যাবতীয় দায়দায়িত্ব। এ তো জানা কথাই, যে পদে যত দায়িত্ব, সে পদে ক্ষমতাও তত বেশি। কারওর কারওর কাছে, দায়দায়িত্বটা এতটাই বোঝা হয়ে দাঁড়ায় যে, বেচারা পদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাটাকে উপভোগ করে উঠতেই পারে না। কিন্তু কেউ যদি দায়দায়িত্ব ঠিকঠাক পালন করবার পাশাপাশি ক্ষমতাও উপভোগ করতে পারে, তবে তার চেয়ে সুখী ব্যক্তি আর কেউই নেই। যাবতীয় দায়দায়িত্বের ঝক্কি পোহাবার পাশাপাশি অতনু ক্ষমতাটাকেও উপভোগ করে এসেছেন চিরকাল। তাঁর বাড়িতে, সমপদস্থ সবাইয়ের মধ্যে কেবল তাঁর বাড়িতেই, টেলিফোন বসেছে। একাগাদা গাড়িঘোড়ার গার্জিয়ান হওয়ার সুবাদে তাঁর ক্ষেত্রে যানবাহনের সমস্যা অনেক কম ছিল। বরং তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গাড়ি মিলে যেত সহজেই। কাজেই, রেবা যখন-তখন গাড়ি চড়ে শপিং-টপিংয়ে চলে যেত, তাই দেখে হাউসিংয়ের অন্য মহিলারা যে নিঃশব্দে জ্বলেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এবং যে-বিকেলে গাড়ি চড়ে বাইরে যেত রেবা, ওই সন্ধেয় যে লাগোয়া ফ্ল্যাটের বাসিন্দা ভবতোষদা ও শীলাবউদির মধ্যে আচমকা প্রবল ঝগড়া বেঁধে যেত, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রেবার বাড়তি সুবিধাভোগজনিত কারণে সামান্য সিনিয়র ভবতোষদার স্ত্রী শীলাবউদির হতাশাজনিত বিষ উদ্‌গীরণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটাও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, অতনু অন্যদের ওই হতাশাকেও তারিয়ে-তারিয়ে উপভোগ করবার প্রেরণা পেতেন ভেতর থেকেই। এন ডি সি হওয়ার সুবাদে অতনুর আরও একটি সুবিধেজনক অবস্থান ছিল। ডি এম নামক সর্বোচ্চ পদের মানুষটির খুব কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়ার অঢেল সুযোগ ছিল তাঁর, এমনকি মিসেস ডি এমও তাঁকে মাঝেমধ্যেই ডেকে পাঠিয়ে হাজারো ফরমায়েশ করতেন, যার অনেকগুলোই হয়তো বৈধ নিয়মে প্রাপ্য ছিল না তাঁদের। আর, সেই কারণেই হয়তো বা অতনুকে সামান্য 'গুড হিউমারে' রাখতে চাইতেন ডি এম দম্পতি। সমবয়স্ক সব অফিসারের মধ্যে কেবল অতনুকেই 'তুমি' সম্বোধন করতেন তাঁরা। প্রশাসনের সর্বোচ্চ ব্যক্তিটির নৈকট্য ও পরোক্ষে আস্কারা পেতে-পেতে অতনুর মধ্যে এমন এক ধরনের নাক উঁচু ভাব এসে গিয়েছিল; সমপদস্থ, এমনকি তাঁর চেয়ে বেশ সিনিয়র অফিসারদেরও খুব খাটো নজরে দেখবার প্রবণতা তৈরি হয়ে গিয়েছিল তাঁর মধ্যে।

মনে পড়ে একদিনের কথা। অতনু তখন সবেমাত্র মিসেস ডি এমের বাবা-মায়ের জন্য স্টেশনে গাড়ি পাঠিয়ে এবং তাঁদের বাড়তি আরামের জন্য আরও কিছু ব্যবস্থা নিয়ে সবেমাত্র অফিসে ফিরেছেন। নাজিরবাবু এসে জানালেন, সরকার-সাহেব আসছেন, স্টেশনে গাড়ি পাঠাতে বলেছেন। সার্কিট হাউসে একখানা ঘরও রাখতে বলেছেন। প্রণবেশ সরকার মাস-ছয়েক আগেও এ ডি এম ছিলেন এই জেলায়। ভদ্র, ভালোমানুষ হিসেবে খুব নাম ছিল

তাঁর। কিন্তু তিনি ছিলেন স্টেট সার্ভিসের অফিসার। তার ওপর ডি এমের বড় একটা নেকনজরে ছিলেন না। বরং অতনুর এমনটাই মনে হত, ডি এম সরকার-সাহেবকে খুব একটা পছন্দ করতেন না। মাঝেমধ্যে খুব সামান্য কারণে অপদস্থ করতেন ভদ্রলোককে। এমনকি, অতনুকেও ওই ব্যাপারে খুব সূক্ষ্মভাবে আস্কারা দিতেন। আর, অতনু তো, ডিএমের ভাষায় এমনই ইনটেলিজেন্ট, হাঁ-করবার আগেই বুঝে ফেলতে পারেন সবকিছুই। কাজেই, সরকার-সাহেব সম্পর্কে ডি এম সাহেবের এবং মিসেস সরকার সম্পর্কে মিসেস ডি এমের মনোভাবটি জেনে ফেলামাত্রই ওই বিষয়ে নিজের কর্তব্যটুকু স্থির করে ফেলতে তিলমাত্র দেরি হয়নি তাঁর। ফলে, সরকার-সাহেবের গাড়ির পুরনো তোয়ালে আর কিছুতেই বদলানো হয়ে উঠত না। তাঁর বাংলোর জন্য জিনিসপত্র অনেক কাঠখড় পোড়ানোর পর যেত। তিনি ডেকে পাঠালে অতনু ইচ্ছা করেই দেরিতে যেতেন। কোনওদিন বা দ্বিতীয়বার ডেকে না-পাঠালে যেতেনই না। সব অর্থে ওপরওয়ালা পদবাচ্য একজনকে এমনিতরো অবজ্ঞা করতে পেরে একধরনের সুখ অবশ্যই যে পেতেন অতনু অ্যাদ্দিন বাদে মনে মনে স্বীকারই করে নেন তা। এইসব করতে-করতে, ভাবতে-ভাবতে তাঁর মধ্যে এমনই এক ধরনের 'ডোন্ট কেয়ার' ভাব এসে গিয়েছিল যে, নাজিরবাবুর কথাগুলো যেন শুনতেই পেলেন না তিনি।

বছরটাক এই জেলা থেকে বদলি হয়ে গিয়েছেন সরকার-সাহেব। বর্তমানে রাইটার্সে রয়েছেন। রাইটার্স মানেই সব মিলিয়ে একটা গোয়াল-গোয়াল ফিলিং। ডেপুটি সেক্রেটারি পর্যন্ত একটা ছোট্ট ঘরে তিন-চারজনে গাদাগাদি করে বসা। টিফিন টাইমে স্টিলের চৌকো কৌটো খুলে রুটি আর আলুর চচ্চড়ি খাওয়া। খাওয়ার পর নিজের হাতে কৌটো ধুয়ে নেওয়া। দশবার বেল টিপলেও পিয়ন আসে না। তার ওপর সরকার-সাহেব যা গোবেচারা গোছের মানুষ, পিয়নরা আদপেই আসে কিনা সন্দেহ। অলস চোখে এইসব ভাবতে ভাবতে অতনু খুব তাচ্ছিল্যমাখানো গলায় বলেন, 'ওঁর আবার কী দরকার পড়ল জেলায়? এখন সার্কিট হাউসে যা ভিড়।' নাজিরবাবু জবাব দেন, 'কী এক মামলায় যেন সাক্ষী দিতে আসছেন, স্যার।' অতনুর মুখে বিরক্তিটা গাঢ় হয়েছে ততক্ষণে। বলেন, 'তো, ওঁর আর্স্টহোয়াইল সেকশন করছেটা কী। ওরাই তো এসব ব্যবস্থা করতে পারে।' নাজিরবাবু বলেন, 'ওদের গাড়িতে তো রেড-লাইট নেই স্যার।'

'তো, কী হয়েছে?' অতনু সামান্য বিরক্ত হন, 'রেড লাইট ছাড়া গাড়িতে চড়ে না মানুষ?' বলতে বলতে নাজিরবাবুর দিকে তাকান অতনু, 'সার্কিট হাউসের মেন বিল্ডিংয়ে তো খালি নেই। অ্যানেক্সিতে কী অবস্থা?'

'মেনেই তিন-চারটে ঘর খালি রয়েছে স্যার।'

'রয়েছে, কিন্তু দেওয়া যাবে না। ডি এমের রিলেটিভ কারা যেন আসবেন। ডেফিনিট করে এখনও কিছু বলেননি, কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে এসে পড়লে, তখন?' কপালে হাত বোলাতে-বোলাতে অতনু বলেন, 'এক কাজ করুন। পুল থেকে বারো-তিরাশিটা পাঠিয়ে দিন স্টেশনে। আর সার্কিট হাউসের অ্যানেক্সির পাঁচ নম্বরটা দিয়ে দিন।'

অ্যানেক্সিতে ঢুকতে গিয়ে নাকি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন সরকার-সাহেব। নাজিরবাবুর মুখ থেকেই অতনুর শোনা। নাকি বলেছিলেন, 'মেন বিল্ডিংয়ে খালি নেই?'

আজ সারাদিন খুব ধকল গেছে অতনুর।

সেই কোন সাতসকালে রওনা দিয়েছিলেন। পাক্কা চার ঘণ্টা ট্রেন-জার্নি করে দশটা নাগাদ পৌঁছেছিলেন কালেক্টরেটে। স্টেশনে একটা সাধারণ গাড়ি পাঠিয়েছিল এন ডি সি। তিনি স্টেট ক্যাডারের এ ডি এম বলেই এমনটা পারল, বুঝতে পারেন অতনু। আই এ এস, এ ডি এম হলে নির্ঘাত রেড লাইট লাগানো গাড়ি পাঠাত। চার্জ-টার্জ নেওয়া হলে পর অতনু এলোমেলো কয়েকটা ফাইল দেখলেন কিছুক্ষণ। সেকশনের অফিসারদের মধ্যে পরিচয়পর্ব সারলেন। তারপর গেলেন ডি এমের সঙ্গে দেখা করতে। বেশ ছোকরাগোছের ডি এম। মুখে কপট গাম্ভীর্যের মুখোশ এঁটে বসেছিলেন। মামুলি দু-চারটে কথা বলেই, 'ওক্কে দেন....।' বলেই বুঝিয়ে দিলেন, অতনুর সঙ্গে প্রথম দিনেই আর অধিক বাক্যব্যয় করতে রাজি নন তিনি। অতনু জেনেছেন, এক্ষুনি কোনও কোয়ার্টার পাচ্ছেন না তিনি। যাঁর থেকে চার্জ নিচ্ছেন, কোয়ার্টার খালি করতে কিঞ্চিৎ সময় নাকি ডি এমের থেকে আগাম চেয়ে রেখেছেন তিনি। এ ক-টা দিন অগত্যা সার্কিট হাউসেই থাকতে হবে অতনুকে। অতনু খুব আশা করেছিলেন, ডি এম ওই ব্যাপারে কিছু বলবেন। অন্তত থাকাথাকির কী ব্যবস্থা হল অতনুর, সে ব্যাপারে একটুখানি খোঁজখবর নেবেন। কিন্তু তিনি তার ধারপাশ দিয়েও গেলেন না। বরং খুব ব্যস্ত গোছের মুখ করে বিদেয় করে দিলেন অতনুকে।

প্রায় একটা নাগাদ খুব খিদে পেয়ে গেল অতনুর। আর তখনই তাঁর খেয়াল হল, দুপুরের খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা তো তুলল না কেউ। নিয়মমতো নাজিরবাবুরই তো ঢের আগে জিজ্ঞেস করবার কথা, আপনি দুপুরে কী খাবেন, স্যার? কেউ কী জিজ্ঞেস করতে এসেছিল কথাটা? মনে করবার চেষ্টা করলেন অতনু, কিন্তু মনে পড়ল না তেমনটা। বাধ্য হয়ে নাজিরবাবুকে ডেকে পাঠালেন অতনু। কথাটা তুলতেই কেমন জানি বিব্রত দেখাল নাজিরবাবুকে। বললেন, 'হোটেল থেকে আনিয়ে দেব স্যার?' নাজিরবাবুর গা-ছাড়া জবাব শুনে আচমকা খুব রাগ হয়ে গেল অতনুর। তিনি তো ভালোই জানেন, আই এ এস এ ডি এম হলে তাঁর জন্য এতক্ষণে সব ব্যবস্থা হয়ে যেত। এতক্ষণে নাজিরবাবু যে কতবার এসে কত কিসিমের খোঁজখবর নিয়ে যেতেন। নাজিরবাবু কেন, এতক্ষণে খোদ এন ডি সি এসে....।

'আপনাদের এন ডি সি সাহেব কোথায়?' গলায় সামান্য ক্ষোভ ফুটিয়ে বললেন অতনু।

তিনি একটু ব্যস্ত রয়েছেন স্যার। অমায়িক হাসেন নাজিরবাবু, 'ডি এমের রিলেটিভ আসছেন তো, ওই নিয়ে একটুখানি....।'

'ঠিক আছে, হোটেল থেকেই কিছু আনিয়ে দিন।' খুব অপ্রসন্ন মুখে বলেন অতনু, — 'আর হ্যাঁ...., আমার জিনিসপত্রগুলো গাড়ির ডিকিতে রয়েছে, ওগুলো সার্কিট হাউসে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করুন।'

নাজিরবাবু দাঁড়িয়ে থাকেন। কিছু একটা বলতে চান বুঝি।

অতনু শুধোন, 'কিছু বলবেন?'

উসখুস করতে থাকেন নাজিরবাবু। এক সময় খুব মিনমিনে গলায় বলেন, 'মানে..... স্যার..... ওই নিয়েই হয়েছে সমস্যা।'

কেন? নাজিরবাবুর মুখের দিকে তাকান অতনু, 'কীসের সমস্যা?'

'সমস্যা হল.... মানে.... সার্কিট হাউস আজ একেবারেই প্যাক্‌ড-আপ। কোথায় যে ঢোকাই আপনাকে?'

'সে কী!' অতনুর চোখেমুখে রাগ জমে এবার, 'আপনার এন ডি সি সাহেব এ ব্যাপারে কিছু বলেননি আপনাকে? কোনও ইনস্ট্রাকশন দেননি?'

'ওঁকে আর পাচ্ছি কোথায় স্যার?' নাজিরবাবু খুব অসহায় মুখ করে বলেন, 'তিনি সেই সকাল থেকেই রয়েছেন ডি এমের বাংলোতে।'

'কেন?'

'ওই যে বললাম, ডি এমের রিলেটিভ আসবেন। যাগ্‌গে, আপনার খাবারটা তো আগে আনাই। জগবন্ধু....।' লম্বা হাঁক পাড়েন নাজিরবাবু।

'আর, আমার থাকার ব্যাপারটা?' বলতে গিয়ে বুঝি গলাটা সামান্য কেঁপে যায় অতনুর। এতক্ষণে বুঝি টের পান, থাকবার ব্যাপারটা নিয়ে তাঁর মধ্যে একধরনের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এরা যেমন গা-ছাড়া ভাব দেখাচ্ছে, শেষ অবধি সন্ধে নাগাদ বলে না দেয়, আপনার থাকবার ব্যাপারটা তো কিছু করা গেল না, স্যার....। ভাবতে-ভাবতেই তেমন সম্ভাবনার প্রতি অবিশ্বাস জন্মে অতনুর, ধুস, তাই আবার হয় নাকি? এই জেলার এ ডি এম তিনি, থাকবার একটা জায়গা পাবেন না?

পরমুহূর্তেই অতনুর মুখের কথাগুলো বেরিয়ে এল নাজিরবাবুর মুখ থেকে, 'দেখছি স্যার, একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে আশা করি।' বলতে-বলতে খুব অমায়িক হাসেন তিনি। সেই হাসিতে এক ধরনের আনুকূল্য কিংবা বদান্যতা দেখাবার ইঙ্গিত ফুটে উঠল বলে মনে হয় অতনুর।

এক সময় অতনুর মনে হয়, এই জেলায় তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তির কথাটা তোলেন নাজিরবাবুর সামনে।

বলেন, 'আমিও এককালে এই কালেক্টরেটের এন ডি সি ছিলুম, জানেন তো?'

নাজিরবাবু তিলমাত্র কৌতূহল না দেখিয়ে কেবল নীরস গলায় উচ্চারণ করেন, 'তাই?'

'হ্যাঁ, পাক্কা তিন বছর।' বলতে-বলতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অতনুর চোখ, 'তখন ডি এম ছিলেন রঘুপতিসাহেব। আর নাজিরবাবু ছিলে মণিময় চাকলাদার।'

'ও....।' নাজিরবাবু খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'তিনি বেশ ক-বছর হল রিটায়ার করেছেন। তার আগে বেশ কয়েক বছর সাসপেনশনে ছিলেন।'

'সে কী! কেন?'

'কীসব ডিফালকেশন-টেশন করে.....। আমি এখন যাই স্যার। আপনার খাবার জগবন্ধু দিয়ে যাবে।'

নাজিরবাবুর কথাটা খট্‌ করে বাজল কানে। বললেন, 'এখানেই দিয়ে যাবে নাকি? এই অফিস-চেম্বারে। সার্কিট-হাউসের ডাইনিং হলে.....।'

'ওই যে বললাম স্যার, ডি এমের রিলেটিভরা আসছেন। সার্কিট হাউসে ডাইনিং হল-টল সাফসুতরো করা চলছে। বলতে-বলতে নাজিরবাবু সহসা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 'আমি যাচ্ছি স্যার। কিছু দরকার হলে জগবন্ধুকে বলবেন।'

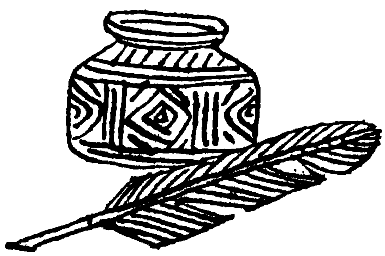
'জগবন্ধু কে?'

'নাজিরখানার পিয়ন। চলি স্যার।'

খুব নোংরা প্লেটে অখাদ্য কিছু খাবার এনে নামিয়ে দিল জগবন্ধু। বলল, 'বাইরে পিয়নদের বলে এসেছি স্যার। কোনও আউট-সাইডারকে ঢুকতে দেবে না। খাওয়া শেষ হলে, ওদেরই বলবেন, প্লেটগুলো টয়লেটে নামিয়ে দেবে। আমি এসে একসময় নিয়ে যাব।' জগবন্ধু আর কথা বাড়াবার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে যায়।

নোংরা প্লেটে খাবারগুলো নাড়াচাড়া করতে-করতে অনেকদিন বাদে অতনুর মনে পড়ল, পনেরো বছর আগের দিনগুলোর কথা। সময় তিরতিরিয়ে বয়ে গেছে অনেকখানি, কিন্তু বদলায়নি একটুও। আর একজন অতনুই রয়েছে এন ডি সি-র পদে। ভাবতে-ভাবতে অতনুর মনে হল, যদি বারেকের তরে ফিরে যেতে পারতেন পনেরো বছর আগের দিনগুলিতে, কিছু ভুল অবশ্যই শুধরে নিতেন।

এতদিন বাদে, সেই প্রথম, সরকার-সাহেবের কাছে মনে-মনে ক্ষমা ভিক্ষা করলেন অতনু।



বাড়ি

সুচিত্রা ভট্টাচার্য

সেদিন অফিস-ফেরতা মার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। যেমন যাই, হপ্তায় এক-দু-বার। বাইরের ঘরে পাতা আদ্যিকালের সোফাটায় সবে বসেছি, নজরে পড়ল মাতৃদেবীর মুখখানি একেবারে তোলো হাঁড়ি। ঠোঁটে কুলুপ, ভুরুতে মোটা মোটা ভাঁজ। অন্য দিন তো চৌকাঠ পেরনো মাত্র মা কলকল করে ওঠে, আজ হলটা কী।

চোখের ইশারায় প্রমিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কেসটা কী রে? শাশুড়ির সঙ্গে ফের লাঠালাঠি।'

প্রমিতা হেসে ফেলল, না গো দিদি। আজ বাংলা-বিহার নয়। ইন্ডিয়া-পাকিস্তান।'

'মানে?'

'দুপুরে আজ কালবৈশাখী হল না.... তখন ঝড়ে-পড়া কয়েকটা আম কুড়িয়েছিল মা। আমাদেরই এলাকা থেকে। দোতলার ওপর থেকে ওরা দেখতে পেয়েই ব্যস্। চিৎকার হল্লা গালিগালাজ।'

মেজাজটা টকে গেল। ওফ্, সেই অনন্ত অশান্তি। প্রায় তিন যুগ আগে সূচনা হয়েছিল বিবাদের, বাড়িওয়ালা উচ্ছেদের মামলা করেছিল বাবার নামে। তার পর কত কোটি কিউসেক জল যে বয়ে গেল গঙ্গা দিয়ে। নদীর দু-পাড়ে ভাঙনও তো কম হল না। গত হলেন সূর্য চাটুজ্যে, ওপরের জেঠিমাও। আমার বাবাও বছর ষোলো আগে পরপারে। আমরা মেয়েরাও বিয়ে-থা হয়ে ছিটকে গেছি যে যার মতো। মৃত্যুও থাবা বসিয়েছে আমাদের জেনারেশানে। সূর্যজ্যাঠার ছোট ছেলে মন্টুদার প্রয়াণ ঘটল অকালে, আমার বড় ভাইটিও অসময়ে মায়া কাটাল পৃথিবীর। কিন্তু সেই মামলাটি এখনও মহাকালের গর্ভে। এবং যুদ্ধ থামারও কোনও লক্ষণ নেই। আদালতে কবজা করতে না পেরে এখন বাঁকা পথ ধরেছে ও পক্ষ। কখনও করপোরেশনের জল বন্ধ করে দেয়, তো কখনও ওপর থেকে আবর্জনা ঢালে দেদার। গোদের ওপর বিষফোঁড়া, বাক্যবাণ তো হানছেই অহরহ।

ধুন্দুমারও বাধে। মাঝে মাঝেই। ঝগড়া বাধানোর কত রকম ফন্দি-ফিকির যে আছে। ভাড়াটের কাজের লোকরা চিরটাকাল বাড়ির পিছন-ভাগের বাথরুমখানা ব্যবহার করে এসেছে, অকস্মাৎ এক সকালে সেটি তালাবন্ধ, মুরোদ থাকে তো ভাঙ, ফৌজদারি ঠুকে দেব। উঠোনের

মাঝবরাবর পাঁচিল উঠে গেল রাতারাতি— ভাড়া তো নিয়েছ একতলার ঘর, উঠোনের জমিদারি ভোগ করবে কেন?'

দু-দু-বারই ঝামেলাটা থানা-পুলিশ পর্যন্ত গড়িয়েছিল। কাজের কাজ অবশ্য কিছুই হয়নি। এ পক্ষের নালিশ শুনে ও পক্ষকে কোমল ধমক দিয়ে, চা সন্দেশ-টন্দেশ সাঁটিয়ে, গোঁফে তা দিতে দিতে যবনিকার অন্তরালে চলে গেছেন দারোগাবাবু। বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের লড়াইয়ে উকিল-পুলিশদেরই তো পোয়াবারো।

কাঁহাতক আর হাঙ্গামা হুজ্জোত ভালো লাগে? তাও আবার তুচ্ছ তুচ্ছ কারণে? আমাদেরও তো বয়স হচ্ছে, না কী?

বেজার মুখে মাকে বললাম, 'কেন যে ওদের আমে হাত দিতে যাও?'

'কোন সুবাদে ওদের আম?' মা ঝেঁঝে উঠল সহসা। 'সমু আম খেয়ে উঠোনের ওপাশটায় আঁটি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলত। তার থেকেই তো চারা গজিয়েছিল।'

'প্রমাণ করতে পারবে? গাছটা যখন পাঁচিলের ওপারে, রাইটও ওদেরই।'

'তা, ডালপালাগুলোও ও দিকে সরিয়ে নিয়ে যাক। সে লক্ষ্মীছাড়ারা এদিক পানে ধেয়ে আসে কেন? আমাদের এদিকে আম পড়লেও ওদের নৈবেদ্য সাজিয়ে দিতে হবে এমন কোনও লেখাজোকা আছে নাকি?'

'ছেলেমানুষের মতো কথা বোলো না। বাড়িতে কি কম আম আসে? রোজই তো বাজার থেকে....'

'বাজারের আম, বাজারের আম। বাড়ির আম, বাড়ির আম। দুটোর স্বাদ কি এক হয়?'

'তা হলে আর মুখ ভেটকে বসে আছ কেন? খিস্তি-খেউড়গুলোও হজম করে নাও।'

'নিচ্ছি তো। কাউকে কি শোনাতে গেছি? তুই-ই তো গায়ে পড়ে....'

এই হল আমার মা। কোনও যুক্তির ধার ধারে না। যারা কুচ্ছিত ভাষায় অপমান করে তাদের সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলে যেচে যেচে। গালাগালির মূল হোতা মন্টুদার বউটা। কিন্তু তার বিরুদ্ধে একটা শব্দ উচ্চারণ করো, ওমনি মা ঝামরে উঠবে—আহা রে, কচি বয়সে স্বামী হারিয়েছে, শোকাতাপা মেয়েটার কথা গায়ে মাখতে আছে! বলতে বলতে আঁচলে চোখও মুছে নেবে টুক করে। আর দোতলার কোনও সুসংবাদ? মা তো একেবারে আহ্লাদে গদগদ। শুনেছিস ঋতু. ঝন্টুর একটা কী ফুটফুটে নাতি হয়েছে! ইস্, সূর্যবাবু গীতাদি বেঁচে থাকলে কী খুশিই না হতেন! গত অঘ্রানে ঝন্টুদার বউ নিজে এসে মাকে মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করে গেল, মার তো আনন্দে পাগলপারা দশা। দুল দেবে, না আংটি, নাকি পিওর সিল্ক, ভেবে ভেবে কূল পায় না। টুকটুকির বিয়ের দিন দিব্যি ড্যাং ড্যাং করে দোতলায় উঠে গেল মা। এ দিকে আমরা ভাইবোনরা তো কাঁটা হয়ে আছি, পাঁচ জনের সামনে মাকে না ছ্যার ছ্যার করে কিছু শুনিয়ে দেয় মন্টুদার বউ। কিংবা মন্টুদার ছেলেরা। অঘটন যদিও কিছু ঘটল না, প্রজাপতির মতো উড়তে উড়তে ফিরে মা জানাল তাকে নাকি বড়ই খাতির-যত্ন করেছে সবাই।

মাস তিনেকের মধ্যেই অবশ্য নমুনা মিলল খাতির-যত্নের। দোতলা থেকে মাছের আঁশ পড়ছে ঝুরঝুর, নেমে আসছে আনাজের খোসা, খাবারে উচ্ছিষ্ট। সঙ্গে নোংরা স্যানিটারি

ন্যাপকিনও। মার দৃষ্টি তো প্রায় গেছে, সেই ন্যাপকিন আবার আঙুলে তুলে প্রশ্ন করছে, এটা কী ফেলল দ্যাখো তো প্রমিতা! ওপরের বারান্দায় তখন যুবতী বউদের খিলখিল হাসি, যেন আচ্ছা জব্দ করেছে শ্বশুরবাড়ির ভাড়াটে বুড়িটাকে।

মানছি, আমরা কম ভাড়ায় থাকি। মামলার কারণে সে টাকাও জমা পড়ে রেন্ট কন্ট্রোলে। আমাদের ওপর বাড়িওয়ালার রাগ থাকতেই পারে। তা বলে ওই স্তরের অসভ্যতা? এ পাড়ায় তো আরও অনেক পুরনো ভাড়াটে আছে, বাড়িওয়ালাকে তারাও কিছু পাঁচ দশ হাজার ঠেকায় না, আজ তারা বাড়ি ছাড়লে গৃহস্বামীরা কালিঘাটে পুজো দিয়ে আসবে। কিন্তু ভাড়াটের সঙ্গে এ ধরনের লাগাতার নোংরামি করে চলে কোন বাড়িওয়ালা? নেহাৎ জেদাজেদির পর্যায়ে চলে গেছে, নইলে মা বউদি ভাইঝিকে নিয়ে রমু তো কবেই উঠে যেত।

প্রমিতা চা বানাতে গেছে ভেতর বারান্দায়। গলা উঁচিয়ে ডাকল, 'দিদি, একবারটি শুনে যাও।'

পায়ে পায়ে কাছে গেলাম, 'কী রে?'

'জানো তো, পরশু দুপুরে ওপরে নগেন দত্ত এসেছিল।'

'সে আবার কে?'

'ওই যে গো, মোড়ের রাঘববাবুদের বাড়িটা ভেঙে যে ফ্ল্যাট বানাচ্ছে।' প্রমিতা গলা নামাল— 'লোকটা অনেকক্ষণ ছিল দোতলায়। নামার সময় আমাদের পোরশানটা টেরিয়ে টেরিয়ে খুব দেখছিল।'

দক্ষিণ কলকাতার এ অঞ্চলটায় জমি-ফ্ল্যাটের এখন বিস্তর দাম, প্রোমোটাররাও তাই পুরনো বাড়ি ভেঙে অ্যাপার্টমেন্ট বানানোর জন্য ছোঁকছোঁক করছে সর্বক্ষণ। এ বাড়ির ওপরও নজর পড়েছে তা হলে? স্বাভাবিক, এ বাড়িরও বয়স তো কম নয়। সূর্যজ্যাঠার বাবা বাড়িটা বানিয়েছিলেন সেই উনিশশো আঠাশ সালে। আর আমার বাবা-জ্যাঠারা ভাড়া নিয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। যখন লোকজন দুদ্দাড়িয়ে কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে। তারপর তো বাবা-জ্যাঠাদের সংসার হল, সংসার বড় হল, চাকরি সূত্রে জ্যাঠারা একে একে চলেও গেল অন্যত্র, একমাত্র বাবাই যা সপরিবারে রয়ে গেল পাকাপাকি। এর পর এ বাড়ি হয়তো মুছেও যাবে কালের নিয়মে।

প্রমিতা কাপে চা ঢেলেছে। চিনি নাড়তে নাড়তে জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের ফ্লোর এরিয়া কত আছে গো দিদি? হাজার দেড়েক স্কোয়্যার ফিট হবে না?'

'তা হবে।'

'বাড়ি ভাঙা হলে সমপরিমাণ জায়গার ফ্ল্যাট আমরা পাব না? রাঘববাবুদের ভাড়াটে তো পাচ্ছে।'

'দাঁড়া। আগে তোদের ওপরওয়ালা রাজি হোক। তাদের সঙ্গে দরে বনুক।'

'বনবে গো বনবে। মোটা প্রণামী পেলে ওপরওয়ালাও গলে জল হয়ে যায়।'

ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময়েও কথাটা পাক খাচ্ছিল মাথায়। রাস্তায় নেমে এক বার ঘুরে দেখলাম বাড়িখানাকে। ইস্, কী জীর্ণ দশা! রঙের বালাই নেই-ই, চতুর্দিক থেকে প্লাস্টার খসে খসে পড়ছে। নিজেরাও সুরত্ ফেরাবে না, আমাদেরও হাত ছোঁয়াতে দেবে

না। বছর দুয়েক আগে রমু ঘরগুলো চুনকাম করান, তাই নিয়েও দোতলা থেকে যা খিস্তির ফোয়ারা ছুটেছে।

নাহ্, প্রোমোটারের হাতে গেলেই বেশ হয়। তখন ফ্ল্যাট তো একটা জুটবেই, সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় অশান্তির অবসান। তোমরাও সুখে থাকো, আমরাও স্বস্তি পাই। নগেন না খগেন, তাকে বলে একটা ফ্ল্যাটকেই যদি দুটো করে নেওয়া যায়, একটাতে রমু থাকল অন্যটায় তুলতুলিকে নিয়ে প্রমিতা। সমু মারা যাবার পর রমুই সংসারটা দ্যাখে, নিজে বিয়ে-থা করেনি, বউদি-ভাইঝির কোনও অযত্নই সে করে না। তবু পায়ের নীচে নিজের ফ্ল্যাটের শক্ত মাটি থাকলে প্রমিতাও বুঝি একটু বেশি নিশ্চিন্ত হয়।

হা হতোস্মি, কোথায় কী! পরের সপ্তাহে গিয়ে দেখি প্রমিতার মুখ ভার, মা ফিক ফিক হাসছে। সোফায় বসতে না বসতেই মাতা ঠাকুরানির সে কী উচ্ছ্বাস, 'অ্যাই জানিস তো, মন্টুর বউ এতদিনে একটা বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করেছে।'

ধন্দ মাখা মুখে বললাম, 'কী রকম?'

'এক বজ্জাত প্রোমোটার বাড়ি ভেঙে ফ্ল্যাট বানানোর টোপ দিতে এসেছিল, তাকে ঘেঁটি ধরে বের করে দিয়েছে।'

শুনে খুশি হব, না ব্যথিত বুঝে উঠতে পারছিলাম না। মা ফের বলল, 'তোরা তো শুধু বউটার নিন্দেমন্দই করিস, দ্যাখ একটা কত বড় প্রলোভন জয় করল।'

'ওকথা বলবেন না মা।' প্রমিতা ঝনঝন বেজে উঠেছে, 'শুনিয়ে শুনিয়ে কী বলছিল কানে যায়নি আপনার?'

'আমি অত খেয়াল করিনি।' মা নির্বিকার।

প্রমিতা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কী বলে চেল্লাচ্ছিল জানো? হারামজাদা ভাড়াটে ফোকটে ফ্ল্যাট পেয়ে যাবে, এমন ডিলে আমি ইয়ে করে দিই। ভাবো দিদি, কেমন নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ করার পলিসি! ঝন্টুদা-মন্টুদা দু-তরফেই তো ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে, বাচ্চা-কাচ্চা হচ্ছে, দোতলায় এমন না হোক আট-নটা প্রাণীর বাস। নিশ্চয়ই অসুবিধা হয়। তবু তেএঁটেপনা যাবে না। ভাড়াটেকে বাম্বু দেওয়া যাচ্ছে, এতেই প্রাণে মলয় বইছে!'

'তাতে তোমার এত জ্বালা ধরে কেন বাছা?' মা ফুট কাটল, 'ওদের সুবিধে অসুবিধে ওরা বুঝবে, তোমায় ভাবতে হবে না।'

ফোঁস ফোঁস মন্তব্য, টুকুস টুকুস টিপ্পুনি চাপান-উতোর শুরু হয়ে গেছে। হাওয়া গরম ক্রমশ। আমি আর বেশিক্ষণ বসলাম না। বেরিয়ে আজও একবার ঘুরে দেখলাম বাড়িটাকে। আমার কুমারীবেলার গন্ধমাখা বাড়িটা ধূলিসাৎ হয়ে যাবে ভেবে বুঝি বা একটু স্মৃতিমেদুরই হয়ে পড়েছিলাম সেদিন, আজ মোটেই তেমনটা লাগছে না। বরং বিরক্তিই জাগছে। মনে হচ্ছে ছিরিছাঁদহীন এক বুড়ো গায়ে ছেঁড়াখোঁড়া আলখাল্লা চাপিয়ে মাড়ি বার করে ভ্যাংচাচ্ছে আমাকে। তর্জনী নাচিয়ে বলছে, নেহি মিলেগা শান্তি, নেহি মিলেগা।

দিন আষ্টেক পর আবার গেলাম মায়ের ডেরায়। ফোনে মা এত্তেলা পাঠিয়ে দিয়েছিল ইডলি বানাচ্ছি, খেয়ে যা। সেদিন উত্তেজনার লেশমাত্র নেই, গৃহে অপার শান্তি বিরাজমান। শাশুড়ি-বধূ দুজনেই সুহাসিনীম্, সুমধুরভাষিণীম্। বাড়ি ভাঙাভাঙি তো দূরস্থান, দোতলার

প্রসঙ্গই উঠল না। রমুও ফিরেছে চটপট, তুলতুলিরও টিউটোরিয়াল নেই, সকলে মিলে জমিয়ে আড্ডা মারলাম সারা সন্ধে।

সময় গড়াচ্ছে নিজের মনে। গোটা গ্রীষ্মকালটা কলকাতাবাসীদের এবার তাপে ভাজাভাজা করলেন সূর্যদেব। কপাল ভালো, মৌসুমি বায়ু বেশ জলদি জলদি পৌঁছে গেল। আষাঢ়ের গোড়াতেই বৃষ্টির কী ধুম! সারাটা দিন আকাশের পাঁশুটে বর্ণ, কাড়ানাকাড়া বাজাচ্ছে মেঘবাহিনী, টিপটিপ ঝিরঝির ঝমঝম কত বিচিত্র ধারাই যে ঝরছে অবিরাম।

এবারও বর্ষায় ও বাড়ির অবস্থা বেশ কাহিল। রেনপাইপ ভেঙে উঠোন বারান্দা জলে কাদায় থইথই, স্নানঘরের ফুটো চাল দিয়ে ঝুপুর ঝুপুর বৃষ্টি ঢুকে পড়ছে, পাঁচিলের ওপারে গাছা-আগাছা বেড়ে মশককুলের বংশবৃদ্ধি ঘটেছে দ্রুত। আর রুটিনমাফিক ঝরে-পড়া পচা আবর্জনায় ঘরের আশ-পাশ তো ম ম করেই।

তা, রেন পাইপে তো আর হাত ছোঁয়ানোর অনুমতি নেই। ওপারের মশা নিধনও নিষিদ্ধ। বোধহয় ওপরতলা আশায় আশায় আছে এবার ষাঁড়ের শত্রু বাঘে খাবে, ম্যালেরিয়ায় টাঁসবে ভাড়াটের গুষ্টি। এসবের মধ্যেই আমার নির্বিরোধী ভাইটি হঠাৎ একটা দুঃসাহসিক কাণ্ড করে বসল। ঝটাক্‌সে বদলে ফেলল কলঘরের টিনের চালখানা। কত আর বৃষ্টিতে ভিজে চৌবাচ্চা থেকে গায়ে জল ঢালা যায়!

প্রথম এক-দুই-দিন বাড়িওয়ালা চুপচাপ, তারপরই নতুন করোগেটেড টিনের আচ্ছাদনে ধাঁই ধপাধপ ইঁট। ছোট খাটো ঢেলা নয়, আস্ত আস্ত থান ইঁট। নিয়ম করে পড়ছে রোজ, সন্ধে নামার পরে। হঠাৎই বুদুম করে একটা আওয়াজ হয়, তারপর ক্ষণিক নৈঃশব্দ্য, কয়েক সেকেন্ড পর দোতলার বারান্দায় চাপা খিল খিল হাসি। মা একদিন নরম করে গলা উঠিয়েছিল, কেন বাবা ওরকম করছ? কষ্টের পয়সায় সারানো চালাটা ভেঙে যাবে যে। অমনি যুবক কণ্ঠে ওপর থেকে হরিধ্বনি, বলো হরি, হরিবোল। বুড়িটা এবার খাটে তোল।

রমু বেচারি নার্ভাস হয়ে পড়েছে রীতিমতো। সে চিরকালই সাংসারিক ঝামেলা পাশ কাটিয়ে চলতে চায়। ওবাড়ি যেতে সেই রমুর গলাতেই অন্য সুর, 'আর তো পারা যায় না রে দিদি। এবার একটা এস্‌পার-ওস্‌পার করতেই হয়।'

'কী করবি? থানায় যাবি?'

দূর দূর, দারোগাবাবুদের ডিম খাইয়ে কী হবে। ভাবছি দোতলার সবকটাকে একদিন বাঁশপেটা করে আসব।

বুঝলাম, উদাসীন রমু খেপেছে বিস্তর। শান্ত করার জন্য ঠাট্টা জুড়লাম, 'তারপর লাল গামছায় মুখ ঢেকে হাতকড়া পরে কোর্টে উঠবি, তাই তো?'

'কপালে বোধহয় সেটাই নাচছে। জানিস, তুলতুলিটা এক চুলের বেঁচে গেছে। উঠোনে কী জন্যে যেন নেমেছিল, অমনি ছাদ থেকে মিশাইলের মতো একখানা ফাঁকা মদের বোতল। এক টুকরো যদি ছিটকে এসে বিঁধে যেত.....'

'আমরা তো সন্ধের পর কলতলা যাওয়া ছেড়েই দিয়েছি।' প্রমিতা বলে উঠল, 'অমূল্য বালতি করে জল তুলে রাখে, ভেতর বারান্দার ছোট বাথরুমটাতে.....'

হুম্। বড় একটা শ্বাস টেনে খানিকটা হাওয়া ভরে নিলাম বুকে। মাথা নেড়ে বললাম,

'কিন্তু এটা তো কোনও পার্মানেন্ট সলিউশান নয়।'

'সমাধানের তো একটাই রাস্তা।' রমুর স্বর গুমগুমে, 'সূর্য চাটুজ্যের শয়তান নাতিগুলোরই জয় হোক। আমরা মানে মানে কেটে পড়ি।'

'পালাবি?'

'উপায় কী? টিনের চালটা ভেঙে গেলেই যে ওরা থামবে তার কোনও গ্যারান্টি আছে? প্লাস রোজ রোজ খ্যাচর খ্যাচর, টেনশান..... বাড়ি ফিরলেই এই কমপ্লেন, ওই কমপ্লেন......। আমি কাজকর্ম করব, না থানা পুলিশ করে বেড়াব?' রমু মাথা ঝাঁকাচ্ছে, 'বাড়িটা প্রোমোটারের হাতে দিতে পারছে না বলে আমাদের ওপর আক্রোশ আরও বাড়ছে। যতরকম ভাবে পারে এখন হ্যারাস করবে। তার চেয়ে সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো, বাইপাসের দিকে একটা ফ্ল্যাট বুক করে ফেলি। লোন-টোন নিয়ে হোক, যে করে হোক। তার পর পজেশান পেলে চলে যাব।'

'উঠে যাব আমরা? বাড়ি ছেড়ে?' বহুক্ষণ নিশ্চুপ বসে থাকা মা হঠাৎই প্রায় আর্তনাদ করে উঠেছে, 'কেন যাব?'

'ওরা আর তিষ্ঠোতে দিচ্ছে না, তাই।'

'ওরা চাইলেই চলে যেতে হবে? কে ওরা? ওরা কে?' মার গলা আরও চড়ে গেল, 'কদ্দিন আছে ওরা এই বাড়িতে? ছোঁড়াগুলো তো এই সেদিন জন্মাল! ওদের বউগুলোই বা কতদিন এসেছে, অ্যাঁ? তিন বছর? চার বছর? পাঁচ বছর? আমি আছি পাক্কা ঊনষাট বছর। সেই বিয়ে হয়ে আসা ইস্তক। ঝন্টু-মন্টুর বউরা যতদিন এ বাড়িতে আছে, তার চেয়ে ঢের বেশি দিন।'

'আশ্চর্য, এ যে কমলাকান্তর মতো যুক্তি। দুধ আমি খেয়েছি, অতএব গোরুও আমার।' রমু ঠোঁট বেঁকাল, 'বি প্র্যাকটিকাল মা। ঊনষাট বছর বসবাস করলেই বাড়ি ভাড়াটের হয়ে যায় না।'

'আলবাত হয়। লক্ষ বার হয়। এটাই তো আমার ভিটেমাটি। এবাড়িতে বউ হয়ে আমি প্রথম পা রেখেছিলাম, এখানেই ছেলে-মেয়ে হয়েছে, এখানেই এতকাল সংসার করলাম, এ বাড়িতেই তোর বাবা মরেছে, আমার সমু মরেছে......'

মার গলা মাঝপথেই আটকে গেল। স্বরযন্ত্র স্তব্ধ কিন্তু কণ্ঠনালী ওঠানামা চলছেই। ক্ষীণ হয়ে আসা দুই-চোখ বেয়ে গড়িয়ে এল জল।

এ কী শুধুই অশ্রু? না কি ঊনষাট বছর ধরে এবাড়ির একতলার ভিতে ইট-কাঠে কড়ি-বরগায় জানলা-দরজায় চারিয়ে যাওয়া অদৃশ্য এক শিকড়ের রস? বুঝতে পারছিলাম না। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে মার কথাগুলো হয়তো নেহাতই হাস্যকর। নিছকই এক বৃদ্ধার প্রলাপ। তবু যে কেন গলার কাছে একটা ডেলা জমাট বাঁধে।

নাহ্, শিকড়টাকে এখন উপড়ে ফেলা অসম্ভব। মন্টুদার ছেলেরা বোমা মেরেও পারবে না।

পাখি সব করে রব

আবুল বাশার

লাল টাইয়ের ঝুলন্ত ডগা দু-আঙুলে চিমটের মতো করে ধরে ঈষৎ হকচকিয়ে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে পড়ে সোমনাথ। সিঁড়ির তলায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন মা। সোমনাথের বাঁ হাতে ঝোলানো ভি.আই.পি ব্যাগ, ডান হাতে টাইয়ে।

একটু আড়ষ্ট ভঙ্গিতে সিঁড়ি ভেঙে নেমে মায়ের মুখোমুখি হতে হয় এবং সোমনাথ খানিকটা বেঁকে যায় লজ্জায়। মা একেবারেই শুধু মনে করিয়ে দেন —'আজ আনবি তো?'

সোমনাথ মাথা নুইয়ে কাটতি জবাব দেয়, 'হ্যাঁ আনব। আজ ঠিক মনে করে আনব।'

'চোখ না ফুটলে নিবি না কিন্তু!'

'জানি।'

'আর শোন। বেয়ারা-টেয়ারা নিয়ে কেনাস না, নিজে দেখে কিনবি।'

'হ্যাঁ। আমিই কিনব।'

'রোজ রোজ অফিস বেরানোর মুখে তোকে এভাবে বলতে হচ্ছে।'

গাড়িতে উঠে পিছনের সিটে একলা বসে সোমনাথ মনে মনে আরও একবার লজ্জা পায়। কোম্পানির গাড়ি, সে একজন মাঝারি অফিসার। গাড়ি এসে তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায়, ফিরিয়েও দেয়। পাখি কেনার জন্য সে অবশ্য গাড়িটাকে ব্যবহার করতে পারে। কিছু না, একটি সামান্য, চোখফোটা ময়না, মায়ের জন্য। তা-ও তার কিছুতেই মনে থাকে না।

ঘটনাটি বাস্তবিকই লজ্জার। কবে থেকে এই-ই হচ্ছে। পাখির কথা মনে করতে করতে অফিস অবধি পৌঁছে কাজের ভারী চেয়ারটায় বসার সঙ্গে সঙ্গে সোনমাথ তা ভুলতে শুরু করে। অফিসের কাজ শেষ হলেও অফিস সংক্রান্ত কাজের অবশেষ থেকে যায়, সেই চাপ মাথায় নিয়ে তাকে দৌড়তে হয় বেহালার তারাতলায় এক উকিলের কাছে। কাজ তার বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করে, অফিসটাকে বাইরে ফেলে এলেও অফিসের ওই চেয়ারটা তার মাথার মধ্যে থেকে যায়। এ কথা মাকে বোঝানো যাবে না।

খাঁচার ভরা দাঁড়ে দাড়ানো তাদের অবশ্য একটা সুন্দর ময়নাপাখি ছিল। মায়ের নির্দেশে সোমনাথ সেই অদূরে আক্কেলদার পাখিটাকে ভগবানের নাম শিখিয়েছিল। নিতান্ত ছটফটে তেজালো ছোটটুকুনই পাখিটা।

পাখি ভগবানের নাম বলে, কিন্তু ভগবান কাকে বলে জানে না। দাঁড়ে বসে ভগবানের নাম সাধলেই কি হল। পাখিদের ধ্যান থাকে না। বাড়ির কাজের লোক হরি। পাখি কেবলই হরি হরি করত, ছেলেবেলা মনে হত, কাজের লোক হরির কাছেই খেতে চাইছে ছোলা আর ছাতু আর আহ্লাদের শেষ নেই। কখনও মনেই হত না, পাখির কোনও আধ্যাত্মিক-সরণি রয়েছে আকাশে, সে ভগবানের কাছে যেতে চাইছে বা ভগবানেকেই কোনও যাতনা ভোলার জন্য কাছে ডাকছে। পাখির কোনও স্বাধীনতাবোধও নেই, সেই কখনও মুক্তিও চায় না। খাঁচার মধ্যেই খেতে পেলে পাখি ভাল থাকে, তার একেফোঁটাও ঈশ্বর-তৃষ্ণা নেই, তার কেবল জলতেষ্টা পায়।

কৌতূহলী সোমনাথ পক্ষিবিশারদের বইতে পড়েছে, সেই ছেলেবেলাতেই, পাখি বন্দিত্ব বোঝে না, কবিরা ওই রকম কল্পনা করে থাকেন। নইলে ওই মুখপুড়ি ময়না হরি বলতে কাজের লোককেই বুঝবে কেন। বলা বাহুল্য, হরিই বেশ যত্ন করে পাখিটাকে খেতে নিত।

অতএব পাখিকে ভগবানের নাম শেখানোর চেয়ে ছেলেমানুষি আর কী হতে পারে। গলার আওয়াজও ছিল যন্ত্রের মতো তীক্ষ্ণ। একটি যন্ত্র চালু করে রাখলে যা হয়, নাগাড়ে ডাকছে হরিকে। হরিও মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে চড়া গাল দিত বিড়বিড় করে, প্রকাশ্যে বলত—ধুর মাগি!

তা শুনে সোমনাথ খিলখিল করে হেসে ফেলত সেই কৈশোরে। মা ভয়ানক রেগে যেতেন বটে, কিন্তু পাখিকে শেখানো বুলিতে সোমনাথেরই বিশ্বাস ছিল না। খানিকটা বুদ্ধি পড়ার পরই সে একটু একটু করে নাস্তিক হয়ে উঠতে থাকে। যৌবনে হয়ে ওঠে ঘোর নাস্তিক। কিন্তু মনে আছে, পাখিটাকে সে-ই হরিনাম শিখিয়েছিল। কথা হচ্ছে, প্রত্যেক নাস্তিকেরই ছেলেবেলায় কোনও এক ধরনের আস্তিকতার চর্চা থাকে। ধ্যান দিয়ে না হোক, গলায় খানিকটা হরিনাম সাধা, পাখিকে শেখানোর ছলে। ছলনা মায়েরও ছিল, ব্যথা যেমন চড়া ধর্মবিদ্বেষী, তাতে ছেলেও সেই দিকেই ঝুঁকবে, সেই ভয়ে মা পাখি পড়াতে দিয়েছিলেন সোমনাথকে সোমনাথের ভগবদচর্চা তাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

হরিধ্বনি মুখরিত এমন নাস্তিক পরিবার সংসার কমই হয়। বাবা ছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামী গুপ্ত সমিতির লোক। আচ্চা-অর্চনা দেবভক্তি একেবারেই ছিল না স্বভাবে। পাখিটা ছিল এক তীব্র প্রতিবাদ। বাবার বিরুদ্ধপক্ষ। সেই প্রতিবাদে বাবা প্রায় একশোভাগ চুপ করে থাকতেন। হঠাৎ হয়তো একদিন হরিকে ডেকে বলতেন, 'পাখিটা চেঁচাচ্ছে খেতে দে।'

বাবা নিঃশব্দে মিষ্টি করে হেসে সোমনাথকে শোনানোর জন্য, সেই তালে মাকে শোনানোর জন্যও বলেছিলেন, ছাতু ছোলা, লাল লঙ্কা, এই সব হল পাখির ভগবান। গরিব মানুষের কাছেও তার ইষ্টমন্ত্রে রূপে আসেন; বিবেকানন্দের কথা বুঝলি সোম, পাখিটা হরি হরি করছে, ওটা হল স্রেফ গাওনা।'

এ কথায় মায়ের চোখে-মুখে বিষণ্ণভাব, ক্ষীণ কষ্টের ছাপ ফুটে উঠল, থমথম করত

মুখটা, কিছুই বলতেন না মা, অভিমান করতেন বাবার উপর।

মনে আছে, এম.এ. তে যে-বছর সোমনাথ ভর্তি হয়, সেই বছর গ্রীষ্মকালে ছাতি-ফাটানো দুপুরে কালো হয়ে মেঘ উঠল আকাশে, সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে পাখিটা অল্প একটু ঠোঁট ফাঁক করে দাঁড় থেকে পড়ে গেল। সোম খাঁচার কাছে গিয়ে তারের গোল ফোকরে আঙুল ঢুকিয়ে আঁকড়ে ধরে দেখল, পাখি মরে গিয়েছে।

পাখির চিৎকার শেষ, বলে বাড়িটা হয়ে যায় আশ্চর্য নরম আর কঠিন রকমের নিস্তব্ধ। কাজের লোক হরিকে আর হরি বলে ডাকে না কেউ। পাখির মৃত্যুর কিছুদিন বাদে বাবা মারা গেলেন। এম.এ. পড়াকালীনই সোমের চাকরি-পাওয়া আর বিয়ে-হওয়া এবং পিতৃবিয়োগের ঘটনা ঘটেছিল। বাপের মৃত্যুর জন্যই তাকে চাকরি নিতে বাধ্য হতে হয় এবং সেই ঝোঁকে বিয়েও হয়ে যায়।

হরির নাম ধরে মা আর ডাকতে পারেন না, ডাকতে গেলেই চোখ ছাপিয়ে জল আসে। চোখের জলের দিকে চেয়ে দেখে সোমনাথের মনে হয়েছে, মায়ের জন্য একটি চোখ-ফোটা ভগবানের নামজপা ময়না দরকার। সময় গড়িয়েছে অনেকটা, পাখির ডাকও সংসারে আর শোনা যায়নি। তাপর হঠাৎ একদিন মা-ই ঈষৎ আকুল হয়ে বললেন, 'আমাকে একটা ময়না এনে দে সোম। পুরতে হবে। হরিটাও চলে গেল যে। সবাই আপন আপন ফিরে যাচ্ছে।'

এ কথায় ধাক্কা লেগেছে ঠিকই, তবু সোমনাথ পাখি আনতে ভুলে গেছে। বউকে অবশেষে বলেছে, 'একটু মনে করিয়ে দিলেও তা পার। রোজই ভুলে যাই।'

'আমি দেব কী? মা-ই তো দিচ্ছেন, তা-ও যদি মনে না থাকে। মা-ই তো রোজ অফিস বেরোনোর মুখে তলায় সিঁড়ির মুখে দাঁড়াচ্ছেন এসে। তারপর যদি কেউ ভুলে যায়।'

'বাঃ। তাই বলে তুমি মনে করিয়ে দেবে না। দেখছ তো, মা বলা সত্ত্বেও ভুলে যাচ্ছি।'

'একটা বাচ্চা মেয়ে তো আর খেলনা কিনে আনতে বলেছে না যে, রোজই ভুলে যাবে। বলো, ঠিক বলছি কিনা।'

'না মোটেই ঠিক বলছ না। তুমি জান অফিসটা আমার কী! কাজের কত চাপ থাকে।'

'অনেকেরই থাকে। তুমি একা নও! তাই বলে মায়ের আবদার আমার মনে করিয়ে দিতে হবে কেন? বেশ, তাই দেব। বলছ তো, দেব! আমি দিলেই যদি হয়।'

'আচ্ছা রিনা, তুমি রেগে যাচ্ছ কেন? আশ্চর্য তো। আমি কি তোমার সামনে কোনও জোর দেখাচ্ছি নাকি। কাজ কী বোঝ তুমি? আমার না আছে আকাশ, না আছে পাখি।'

'মা তো সেই জন্য একটা ময়না কিনতে বলছেন সোম।'

'তবু! তুমি তা হলে রসিকতা করছ! এটা মোটেও ঠাট্টার জিনিস নয় রিনা।'

'এতই যদি ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার তা হলে ভুলে যাচ্ছ কেন? আর একজনকে মনে করিয়ে দিতে হবে বলছ।'

'বেশ, দিতে হবে না। ঠিক আছে, আমিই মনে করে আনব। অফিসের গাড়ি নিয়ে হাতিবাগান চলে যাব।'

'রেগে তো গেলে শেষে; এইবার মনে থাকবে। কালই মনে করিয়ে দেব।'

রিনা কিন্তু মনে করিয়ে দিল না। তাই নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে মনোমালিন্য অবধি হল ছোটখাটো।

মা মনে মনে আঘাত পেয়ে চুপ করে রইলেন। কেবল সিঁড়ির মুখে এসে প্রত্যহের অঙ্গিতে দাঁড়ালেন চুপচাপ। দেখা গেল, মা আর পাখির কথা বলছেন না। সলজ্জ সোমনাথ নিশ্চুপ মায়ের ভঙ্গিটি দেখে নিজে থেকেই বলল, 'আচ্ছা আনব।'

কিন্তু এই বলার মধ্যে চাপা বিরক্তি গোপন রইল না। পাতলা হেসে মা বললেন, 'থাক বাছা, আর আনতে হবে না। ভগবানের ভক্তি না থাকলে কি আর মায়ের কথা মনে থাকে।'

'কিন্তু রিনা তো মনে করিয়ে দিতে পারত। অনেক কাজে রুমালে লবঙ্গ গিয়ে গিট বেঁধে দেয় না ও! জিজ্ঞাসা করো। লবঙ্গ মুখে পুরে অফিসের চেয়ারে বসে অনেক কথা মনে পড়ে। জল খাই। তারপর স্ট্রেইট মনে পড়ে যায়। বলুক রিনা, তাই হয় কি না।'

ছেলের অসহায় ভঙ্গি দেখে মা আরও একবার পাতলা করে হেসে বললেন, 'কাকে কী মন রাখতে বলো, ও-ও কি ভগবান বোঝে যে, মনে করিয়ে দেবে। তবে রিনা ঠিকই বলেছে, আমি এখন একটা খেলনাই চাইছি।'

শাশুড়ির কথায় ক্লিষ্ট হেসে রিনা সিঁড়ির উপরের চাতালে রেলিং ধরে ঘাড় নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। মা বললেন, 'পুতুল খেলার বয়স তো আর নেই। বুড়ো হলে মানুষ ভগবানের সঙ্গেই খেলা করে, বুড়ো হও বুঝবে।' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন মা। তারপর বললেন, 'পাখিটা থাকলে মনটা ভরে থাকত। খাঁচার দিকে চাইলে মনটা খাঁ খাঁ করে, সংসারটা কেমন ফাঁকা শূন্য লাগে সোম। মানুষকে তো একটা কিছুর ওপর ভর করে থাকতে হয়, হলই বা পাখির বলা বুলি—কানের কাছে হামেশা ককিয়ে ককিয়ে বলত, মনে হত আকাশ-বাতাস ভরে আছে।' বলে বুকের মধ্যে লম্বা করে শ্বাস টেনে দেন মা। অতঃপর গলার সুর পালটে বলেন, 'আর এখন? মনে হয় শ্মশানে বাস করছি! কিন্তু ভাবি, তোমরা ঠিক কেমন করে বেঁচে আছ, কীসের উপর ভর করে আছ, তোমাদের কি কখনও ফাঁকা লাগে না? সঙ্কটে -আপদে তোমরা কার কাছে যাও। তাই ভাবি। কী কর তখন। আমার বুদ্ধিতে আসে না, কিছুতেই আসে না। পাপপুণ্য নয়, কিন্তু একটা কিছু নির্ভরতা তো লাগে।' —বলতে বলতে মা থানের আঁচলের খুঁটে চোখ মোছেন।

অবশেষে সোমনাথ একটি চোখ ফোটা ময়না বাস্তবিকই কিনে আনে। বলে, 'নাও শিখিয়ে পড়িয়ে নাও।'

মা বললেন, 'তা কেন, একলা আমি কী করব? আমার দাঁত পড়ে গেছে, পাখি আমার কথা বুঝবে না! তোমরা দুজনে শেখাবে।'

শাশুড়ির কথা শুনে রিনার দু-চোখে বিস্ফারিত হয়ে গেল। সোমনাথ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তোমার খেলার সামগ্রীতে আমরা কোনও ভাগ চাইব না মা। না পার, মনোমত নিজেই শেখাও। আমাদের টেনো না।'

'কেন?'

'সে কথা শুনলে তোমার মন খারাপ করবে।'

'তবু শুনিই না কী বলছ তুমি!'

'না থাক। আমরা আমাদের মতো বুঝি। তুমি তোমার মতো বোঝ। বুড়ো হই, তারপর দেখা যাবে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।'

মা সহসা চুপ করে যান। কোনও কথা না বলে নিঃসন্দেহে পাখির খাঁচার দিকে এগিয়ে যান। শেখানোর কাজে মন দেবার আগে খালি একবার আপন মনে বলে ওঠেন, 'ছেলে কার দেখতে হবে তো। কথায় বলে, বাপ কা বেটা! হবেই তো।' বলেই মা খাঁচার ভিতরে পাখিকে অদূরে গলায় দাঁত-পড়া মুখে আহ্বান করেন, 'বলে, পাখি, লাম লাম। অর্থাৎ রাম রাম।'

মা শুরু করলেন বটে, কিন্তু দুদিন বাদেই পুত্র আর পুত্রবধূকে নানান ভাবে দুষতে লাগলেন, ছুতো একটা হয়েছিল— পাখি তোতলা হয়ে যাচ্ছে, তাই পদে পদে চেষ্টা করতে লাগলেন, অন্তত রিনা একবার, খালি একবার নত হোক। সেই সময় রিনার পেটে বাচ্চা এল। মা দেখলেন, এই এক মস্ত কাণ্ড বেধেছে, এখন রিনার ভগবানকে মনে ধরবে। মানুষ এই সময় নরম হয়। রিনা শাশুড়ির প্রস্তাব শুনে ফিকে হেসে বলল, 'ভগবানকে কী ডাকব, একবেলা করে ডাক্তার ডাকা ভাল। তারাদা দেখে যাবে এখন।'

বাচ্চা হতে গিয়ে রিনা হাসপাতালে লেবার রুমে শুয়েও মরতে মরতে বলেছিল, 'ভগবানকে কেন ডাকব ডাক্তারবাবু, আপনাকেই ডাকছি।'

ডাক্তার চেষ্টা করেছিলেন বেহদ্দ-বিস্তর, শ্রমে, বিদ্যায় আন্তরিকতায়। রিনা বাঁচেনি। তারপর মায়েরও মৃত্যু হয় সোমনাথের। চৈত্রের খাঁ খাঁ দুপুরে, চাপা বাসন্তী আলোর মধ্যে মা বিছানা ছেড়ে খাঁচাটার দিকে এগিয়ে গেলেন। খাঁচা খুলে পাখিটাকে ছেড়ে দিতে চাইলেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'কেউ তোর কথার খোঁটা দেয় না পাখি, তোর আর দরকার নেই, তুই চলে যা।' বলে খুলতে গেলেন খাঁচাটা, হাত শূন্যে রইল, মা পড়ে গেলেন মেঝেয়। ঘাড় তুলতে পারলেন না। চোখ স্থির হয়ে গেল।

'মা-ও যখন চলে গেলেন, রইল একটি খাঁচা ও একটি ময়না পাখি, পাখিটা রাতদিন ভগবানকে ডাকত। দোতলার বারান্দার চেয়ারে বসে ভোরবেলা সোমনাথ সেই নামগান শুনতে শুনতে ভাবত, তার বয়স কতটা বেড়েছে। তার সময় হল কি না! সত্যিই তো, কীভাবে অহেতুক সব কেমন শূন্য হয়ে গেল। রিনাকে সে ভালবেসে বিয়ে না করলেও, বিয়ে করেই কী নিবিড় ভালবেসেছিল। রিনারই জন্য তার একটা আশ্চর্য সাহস ছিল। মনে হত রিনা কী বলিষ্ঠ মেয়ে। মৃত্যুতে অব্যক্ত প্রসব-যন্ত্রণাতেও সে ভগবানকে ডাকবে না। বড়জোর একপাশে ডাক্তার, অন্য পাশে স্বামী, এক আশ্বাসের ভিতর দিয়ে কোথায় যেন চলে গেল! জীবনের জন্য এমনই ভালোবাসা আর অত তীব্র বিজ্ঞান-বুদ্ধি কি ভালো! জীবনের চারধার সে পূর্ণ করে রেখেছিল।

সেই শূন্যতায় বারবার ভগবান এসে পড়তে চাইছিলেন। একদিকে মা, অন্যদিকে রিনা, কাকে গ্রহণ করবে, সোমনাথ স্থির করতে পারছিল না। মৃত্যুর মুহূর্তে মা কী বলেছিলেন? পাখিটার আর তাঁর দরকার নেই। কেন? যে পাখির জন্য এতই তার অভিমান ছিল! রিনার সঙ্গে জেদাজিদি করেছিলেন, তোতলা নামকীর্তন শিখিয়েছিলেন ধৈর্য না হারিয়ে। তার আর দরকার ছিল না কেন? পাখিকে নামগানের জন্য খোঁটা দিত না কেউ। এই মানুষটি যে বাবা,

কেউ বলতে অবশ্যই বাবা, সে কথা বুঝতে কি সময় লাগে? তা হলে সব ব্যাপারটার হেতু কী? পাখি আর এই খাঁচাটাই বা কীসের।

একদিকে রিনা, অন্য তরফে মা— মাঝখানে পাখির খাঁচা, খাঁচার পাখি। এভাবে চলতে চলতে সহসা কেমন এক অথর্ব ভাব, বুড়ো দশা এসেছিল। আর ঠিক সেই সময়েই কোম্পানি লক-আউট ঘোষণা করে দিল অনির্দিষ্টকাল। সোম কেমন চুপসে গেল। প্রথমে বাবা, পরে রিনা, শেষে মা, এমনকি কাজের লোক হরিও কোথায় চলে গেল। এল নির্বাক বেকারত্ব। সব মিলে সোমনাথের মন কেমন এক ভয়াবহ্ শূন্যতার খাঁজে ঢুকে যেতে লাগল। জীবন হয়ে উঠল আশ্চর্য শ্লথ, বেগহীন, বিষণ্ণ, উদাস।

সব সময় একটি বিস্ময়-বিপন্ন ভাবনা তাকে ঘিরে ধরেছিল। সে ঠিক কীসের ওপর ভর করে দাঁড়াবে, কার কাছে বলবে গিয়ে, তুমি তো আছ। এরই সঙ্গে মৃত্যুর ভয় এসে চেপে বসেছিল সর্বক্ষণের জন্য। আর আশ্চর্য এই যে, তাকে ভাবিত করছিল, মৃত্যুর পর আর কোনও জীবন নেই, কিছু নেই। তা হলে কী হবে? মৃত্যুর পর আমার চেতনার বিলয় হবে, আমার প্রেম থাকবে না, স্নেহ-মমতা-ক্রোধ কিংবা ঘৃণাও নয়। এত বড় সুন্দর একটা মানুষের কিছুই থাকবে না। তাই-ই কি হয়? অথচ যদি তা না হয়ে সব কিছু আরও একবার ফিরে পাওয়া যেত। সোমনাথ কবিতায় পড়েছিল, 'এ পৃথিবী একবারই পায় তারে পায় নাকো আর।' আরও পড়েছিল, 'পৃথিবীর পরপারে বড় অন্ধকার এই সব আলো প্রেম নির্জনতার মতো।' তা হলে, এই পৃথিবী বাবাকে, মাকে, রিনাকে একবারই পেয়েছে, আর পাবে না।

কখনও ফিরবে না ওরা। কষ্ট তো পৃথিবীর। ওদের তো নয়। নাকি ওরাও ফিরে আসতে না পেরে কষ্ট পায়? পরপারে ভয়াল এক অন্ধকার ছড়ানো। সেখানে তাদের দেখা মিলবে না। তবে এই জীবনের আনন্দ কোথায়?

আনন্দের নিস্বন শোনায় পাখির গলা। সোমনাথ অবাক হয়, অতীতের ময়নার সঙ্গে আজকের ময়নার কোনও পার্থক্য নেই। সব ময়নাই বুঝি দেখতে এক রকম। অবিকল সেই চেহারা, তেমনি ঘাড় নাড়া, দাঁড়ে চড়া, খাঁচার গায়ে পায়ের নখ আঁচড়ানো, প্রদক্ষিণ করা। সবই এক। বুলিও এক। কিছু, কোনও কিছু ফিরে না এলেও পাখি ফিরে আসে। তখন মনে হয় ঈশ্বর-গ্রন্থের মতো এই পাখিটা অন্তত শাশ্বত। এই পাখির মধ্যে মা আছে, বাবা আছে, রিনাও যে আছে। রিনা আছে, কেননা, রিনা পাখিকে ধর্ম না শেখালেও ছাতু আর ছোলা দিত।

অতএব সোমনাথের মনে হল, মানুষ মৃত্যুর পরও ইচ্ছে করলে একটা কিছুর মধ্যে থেকে যেতে পারে, যেমন একটা পাখিই যা। এভাবে সোম পাখি দেখে জীবন কাটাতে শুরু করে। ছাতু আর ছোলা দেয়, যেমন মা আর রিনা দিত। তারপর এই পাখিও একদিন প্রচণ্ড শীতের কামড়ে হলুদ বিবর্ণ পা ঠোকে, সাদা ফ্যাকাসে পা ঠোকে দাঁড়ে, কেমন ঘাড় বাঁকিয়ে ঠোকরায় খাঁচার কানাত এবং দাঁড়ের নীচে ঢলে পড়ে। এরও ঠোঁট এক ফোঁটা পৃথিবীর শাশ্বত জলকণার জন্য হাঁ হয়ে রইল।

প্রকৃত অসহ্য অবস্থা শুরু হল তারপর। শূন্য খাঁচার দিকে চাইলে বুকের মধ্যে দোমড়ানো মোচড়ানো শ্বাসরোধকারী বিপন্নতা সোমনাথকে কাহিল করে তুলল। ওর স্বাস্থ্যও শুকিয়ে

যেতে লাগল। চোখের কোলে কালি পড়ল, দুই চোখ শূন্য দৃষ্টিতে ভরে গেল। মনে হল, সে একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছে। মায়ের অভাব, রিনার অভাব, পরপারের অর্থহীন অন্ধকার, যা সে আকাশের পিঠ বেয়ে আরও আকাশে চলে গিয়ে দিব্য-মন্থনে দেখে ফিরেছে; দেহ ছেড়ে গিয়ে— সেই সব মিলে এক গহন আকুলতা, জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে নেওয়া ব্যথা তাকে নির্বাক করে দেয়।

ঘরে বসে বসে অনেকদিন কাটাল এরকম। হঠাৎ মনে হল, কোম্পানির লক-আউট হয়েছে, যদি ফের চালু হয়, নিশ্চয় তাকে কাজে যোগ দিতে বলবে। তখন সে কী করবে? সে কি আর কাজ করতে পারবে? রিনা নেই, মা নেই, কার জন্য সে কাজ করবে? অন্তত পাখিটা যদি থাকত। পাখির মৃত্যুর পর তার মনে হল, রিনা যদি হাসপাতালে ভগবানের নাম করত, তাহলে রিনা মরত না। যদি সোমনাথ নিজেও মায়ের কথা শুনে চলত কিছুটা, তাহলে রিনা বেঁচে থাকত। রিনার মৃত্যুর জন্য রিনাই দায়ী এবং সে কারণেই পাখিটা বাঁচল না। কারণ পাখি না মরলে বোঝা যেত না মানুষের একটা কিছু নির্ভরতা লাগে। ভর করে থাকার মতন অন্তত একটা পাখি ও তার খাঁচার দরকার হয়। ব্যাপারটা সে কাউকে বলে বোঝাতেও পারবে না—রিনার মৃত্যুর জন্য রিনাই কেন দায়ী আর ভগবানের নাম করলে রিনা কেন বেঁচে যেত। এবং এই যে উপলব্ধি, এ কোনও আস্তিক্যগত ভাবের কথা নয়। মানুষ যাই মনে করুক। পাখিটার নিদেন বেঁচে থাকা উচিত ছিল।

অতএব সে সেদিন নিজেকে খানিক সক্রিয় করার জন্যে পাখির খোঁজে রাস্তায় নামল। সে স্থির করল, একটি ময়না কিনে এনে তাকে ভগবানের নাম শেখাবে। এভাবে রিনা ও মায়ের সঙ্গে, যারা অদৃশ্যভাবে চোখের উপর ঘোরাফেরা করছে, তাদের সঙ্গে পাখির চর্চা করতে পারলে জীবন আবার সহজ হয়ে আসতে পারে। তার আদতে সেই রকমই মনে হল। রাস্তায় চলতে চলতে এই কথাই নাগাড়ে ভাবছিল সোমনাথ। জীবন সহজ হবে। কারণ পাখি হচ্ছে শাশ্বত জীবনের রোমে ভরা রঙিন অস্তিত্ব, তার ভিতরে মৃত মানুষ ভর করে থাকে।

এইভাবে সোমনাথ একটা অদ্ভুত আধ্যাত্মিকতার চর্চা করছিল। এবং একটি পাখি খুঁজতে বার হয়েছিল। হাঁটতে হাঁটতে সোম এল উঁচু চাতালটার কাছে, তারপর নীচে গড়ানের দিকে চাইল, ফলের দোকানগুলোর কাছেই ঝাঁকাঅলারা বসত, এখান থেকেই গত-পাখিটা কিনে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে ট্যাক্সি ধরে ওইদিক দিয়ে দক্ষিণ শেয়ালদা স্টেশনের গা-ঘেঁসে ঘুরে উড়ালপুলে উঠে গিয়েছিল। এখানে আজ কোনও ঝাঁকা বা খাঁচাঅলাই বসেনি।

আবার হাঁটতে শুরু করল সোমনাথ। মানিকতলার দিকে চলে এসে অন্য কোথায় যে চলে এল। ঘুরতে ঘুরতে আরও একটা পাখি বেচা দোকান খুঁজে পায়। এখানে সব পাখিই পোষার মতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভালো ময়না নেই, যা আছে, তাদের চোখ ফোটেনি। বাড়ি ফিরে এল সে অনেক রাতে। পরের দিন ফের পথে নামল। কলকাতার রাস্তা তার মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে ফেলেছে। কোনও পথই সে আর চিনতে পারছে না। একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে মনে হল, জায়গাটা একটু চেনা-চেনা, সামনের বাড়িটায় কি সে আগে কখনও এসেছে?

বাড়ির সকলে ওকে দেখে প্রথমে অনেকক্ষণ হতবাক হয়ে চেয়ে রইল। শালি নন্দিনী

জামাইবাবুকে দেখে আঁতকে উঠে সামনে এগিয়ে এল। সোমনাথের ঝরে যাওয়া বিধ্বস্ত চেহারা দেখে কেঁদেই ফেলল। এই মানুষটাকে নিয়ে কী করবে, কোথায় রাখবে, কী করে বাঁচবে ভেবেই পেল না।

রিনার সঙ্গে নন্দিনীর চেহারা-আদলে-অভিব্যক্তিতে এত মিল আগে কখনও অনুভব করেনি সোমনাথ। জল দেওয়া, লোডশেডিং হলে হাত-পাখার হাওয়া দেওয়া, গ্রীবাভঙ্গি, লজ্জা পাওয়া, সবই এক আড়ায় ঘটে চলে সম্মুখে। এই অবিবাহিত নন্দিনী কি আদতে রিনাই নয়? শরীরটাও তো এক। গলার স্বরে পর্যন্ত দিদির সঙ্গে বোনের অবৈকল্য লক্ষ্য করে সোম।

'এদিকে কোথায় এসেছিলেন জামাইবাবু?'—এ প্রশ্নে আশ্চর্য স্নিগ্ধ নন্দিনীকে কেবল দেখেই চলে চোখ ভবে সোমনাথ। সত্যিই তো, কোথায় সে এসেছিল? মনে পড়ে না।

'তোমারই কাছে নন্দিনী।'

'যাঃ!'

এমনই করে রিনা যাঃ বলত। লজ্জা পেত। নন্দিনীর প্রশ্রয়-মুদ্রা রিনারই নকল। ঠিক আছে, অনেক নকলই রয়েছে, যা আসলের অনেক কাছাকাছি যায়। অবিকল নকলের সৌন্দর্য মন ভোলাতে পারে। আসলকে ভুলিয়ে দিতে সক্ষম নকলও এক ধরনের আসল।

'কী একটা কিনতে বার হয়েছিলাম নন্দিনী। মনে পড়ছে না।'

'কষ্ট করে মনে না করাই ভালো। জরুরি কিছু হলে মনে থাকত। কখনও মনে পড়লে নিশ্চয়ই কিনবেন।'

সোমনাথকে সুস্থ আর তাজা করে নন্দিনী সোমনাথের বাড়ি অবধি এল। সোম শূন্য খাঁচার দিকে চেয়ে বলল, 'একটা ময়না কতদিন বাঁচে নন্দিনী। পোষা ময়না?'

নন্দিনী বলল, 'এবার একটা টিয়া পুষুন জামাইবাবু!'

'তুমি পুষবে? ভগবানের নাম শেখাবে বুঝি!'

'তাও শেখাব, আপনি চাইলে।'

সোমনাথের কোম্পানি আবার চালু হল। এয়োরঙা বউ নন্দিনী যেদিন স্বামী সোমনাথকে চাকরিতে পাঠাচ্ছে সেদিন স্বামীর কপালে সুলক্ষণী চন্দন-ফোঁটা দিতে এগিয়ে এলে কপাল টেনে নিল সোমনাথ। বলল, 'নো, প্লিজ!' বলেই খাঁচাটার দিকে চাইল সোম। সিঁড়ির তলার এক প্রৌঢ় বিধবার কঙ্কাল দাঁড়িয়ে। তাঁকে দেখে নন্দিনীর সামনে কপাল পেতে দিয়ে সোমনাথ বলল, 'ঠিক আছে, দাও।'



অশনি ও আবেগথেরাপি

অনীশ দেব

ঘড়িতে সকাল আটটা। কিন্তু তখনও আড়মোড়া ভাঙছিল। ওর বড় বেড-টির শখ। একটু আগেই ও বেড-টির স্বপ্ন দেখছে। মুক্তোমালা আদর করে ওকে ডাকছে। বিয়ের প্রথম দিককার মতো নরম ছোঁয়ায় ওর ঘুম ভাঙাচ্ছে। তারপর ঘুম জড়ানো চোখ খুলতেই হাতে তুলে দিচ্ছে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ। কিন্তু কী অদ্ভুতভাবে স্বপ্নের মধ্যেই অশনি বুঝতে পারছিল ও ভুল দেখেছে— অর্থাৎ স্বপ্ন দেখছে। ওটা ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপ না হয়ে হয়ে রোঁয়া-ওঠা ফুলঝাড়ু। আর বেড-টিটা নির্ঘাৎ ডেথ-বেডটি।

বিছানায় উঠে বসে সবে প্রথম হাই তুলছিল অশনি। হাই ইনকমপ্লিট রয়ে গেল। মুক্তোমালা কী কাজে যেন শোবার ঘরে এসেছিল, ঠাণ্ডা গলায় ফরমান শুনিয়ে গেল, 'জলদি বাজারে যাও। বাবার শরীরটা ভাল নয়। দেরি হলে রান্না দেরি হবে। আর রান্না মানে অফিস-দেরি হবে শেষে, আমায় দোষ দিও না।'

বাবা বলতে অশনির পিতা, মুক্তোমালার শ্বশুর। কিন্তু সে কেবল ভারতীয় সামাজিক বিধি অনুসারে। অশনির বদ্ধমূল বিশ্বাস ওর বিয়ের পর থেকেই পিতা মুক্তোমালার পিতায় রূপান্তরিত হয়েছে। তার ওপর মুক্তোমালার আসল পিতা মাইনাস হয় গেছে কোন ছোটবেলায়। সেই জন্যেই ও হয়তো অশনির ফাদারকে নিজের ফাদারের পুনর্জন্ম বলে ধরে নিয়েছে। কে জানে! মোট কথা ফাদার আর ডটারের স্নেহ শ্রদ্ধা-ভালোবাসার লড়ালড়িতে অশনির অবস্থা 'মাপ করো' উপদেশ পাওয়া ভিখিরির মতো।

অতএব মুখ বেজার করে বাজারের থলে নিয়ে অশনি বেরিয়ে পড়ল। বেরোবার সময়ে দেখল বসবার ঘরে সোফায় হেলান দিয়ে বাবা খবরের কাগজ পড়ছে। সামনের টেবিলে চা-বিস্কুট। মুক্তোমালা বাবাকে আর একটা বিস্কুট সাধছে। আর বাবা একটা হত্যা, রহস্য খবরের কাগজ দেখে দেখে বউমা ও মেয়েকে পড়ে শোনাচ্ছে।

হুঁ বাবার শরীর ভাল নয়। অশনি বুঝি দারা সিং। যখন তখন যা খুশি হুকুম করলেই হল! কিন্তু মুক্তোমালার দুষ্কর্মের প্রতিবাদ করা অশনির সাহসে কখনও কুলোয়নি। প্রতিবাদ করার কথা ভেবেছে বহুবার, ঠিক শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম জপ করার মতো কিন্তু আসল কাজের সময়েই দেখে হাত-পাগুলো কেমন বশে থাকে না। বুকটা কেমন ফাঁকা

ফাঁকা ঠেকে। আর, মুক্তোমালার কথা মানতে ইচ্ছে করে। ভয়ে হোক ভক্তি হোক, ওর বাধ্য হতে ইচ্ছে করে।

সুতরাং বেরোবার মুখে অশনি বলে গেল, 'চা টা গরম করে রেখো, বাজারটা সেরে আসছি।'

আশনির এই করুণ কাহিনি আজকের নয়, কম সে কম আধ যুগ পুরনো। এত দিনের চেষ্টাতেও ও সিংহ হয়ে উঠতে পারেনি, সেই শশকটিই রয়ে গেছে। অশনির চেষ্টার রকমফের ছিল মন্দ নয়। একবার বাবা সঙ্গে পিস, ট্রিটি, মুক্তোমালার সঙ্গে যুদ্ধং দেহি। এবং তার আশু ফলাফল সগৌরবে পরাজয়বরণ। তারপর শাড়ি-গয়না দিয়ে মন নরম করার চেষ্টা। তাতেও কিছুদিন পর বোঝা গেল সেটা একমুখী পরিকল্পনা। লাভের মধ্যে রানিসাহেবার মর্জিমাফিক কখনও কখনও ভালবাসা আদান প্রদানের লাইসেন্স অর্থাৎ যে কে সেই; অতঃপর বন্ধুদের পরামর্শ নিতে গিয়ে শুনল তারাও অনেকটা একই টাইপের সাজেশন বহুদিন যাবৎ খুঁজে বেড়াচ্ছে। তখন কে যেন বলেছিল, শোন, এটা স্রেফ তোর মনের ব্যাপার। তুই বরং একবার সাইকিয়াট্রিস্ট দেখা। চুপি চুপি তাই করেছিল অশনি। সবকিছু শোনার পর মনের ডাক্তার ওকে খুঁটিয়ে জরিপ করেছে। তারপর আচমকা প্রশ্ন করেছে, 'গলার কাছটা ভারি ভারি লাগে? এমন মনে হয় যে কোনও মালা-টালা পরে আছেন?'

অশনি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়ে বলেছে, 'হ্যাঁ-মানে, মাঝে মাঝে মনে হয়।'

ডাক্তারবাবু টেবিলে চাপড় মেরে গর্বের হাসি হেসে বলে উঠেছেন, 'এই তো কেস ক্লিয়ার! একটা বেঙ্গলি প্রবাদ আছে জানেন তো, বানরের গলায় মুক্তোরমালা? আপনার বউয়ের নামটাই এমন যে সেটাকে ওই প্রবাদের সঙ্গে কানেক্ট করে নিয়ে আপনি নিজে-ইয়ে-আই মিন-হীনম্মন্যতায় ভোগেন। একটা সারভেন্ট সাইকোলজি সবসময় আপনার মধ্যে কাজ করে চলে।'

অশনি পাথর। গলার কাছে উঠে আসা কাতর আর্তনাদটাকে অতি কষ্টে গিলে ফেলল।

ডাক্তারবাবু সেসব গ্রাহ্যই করলেন না বলে চললেন এক নিশ্বাসে— 'আপনি বউয়ের নামটার কথা ভুলে যান। তাহলেই সব ওকে হয়ে যাবে। সিক্সটি ফোর, প্লিজ।'

শেষের কথাটা যে ভিজিটের অঙ্ক সেটা বুঝতে অশনির কয়েক সেকেন্ড সময় লেগে গিয়েছিল।

মুক্তোমালাকে অশনি মাঝে মধ্যে মালা বলে ডাকত। ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার পরই ও মালা নামটাকে পারমানেন্ট করে দিল। মুক্তোমালার বিস্ময় অথবা ভ্রূকুটি ওকে টলাতে পারেনি। কিন্তু তাতেও ফলং নাস্তি। তখন মরিয়া হয়ে অশনি তন্ত্র-মন্ত্র তাবিজ-কবচ খুঁজতে লাগল। বশীকরণ খুশিকরণ সবরকমই পদ্ধতিরই খানা-তল্লাশ নিতে শুরু করল। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনগুলো গোয়েন্দার চোখে বিশ্লেষণ করতে লাগল। অলৌকিক শক্তিওয়ালা 'মহাপুরুষদের' দোরে দোরে গোপন ধর্নার আয়োজন শুরু করল। যে করে হোক মুক্তি চাই-ই চাই। স্ত্রৈণ উপাধি নিয়ে অশনি বৈতরণী পেরোতে চায় না।

ঠিক এইরকমই একটা মানসিক অবস্থার মধ্যে একটা অদ্ভুত বিজ্ঞাপন অশনির নজরে

পড়ল। রাত্রিবেলা খবরের কাগজের দখল পেয়ে কাগজটা খুঁটিয়ে পড়ছিল, তখনই শেষ পৃষ্ঠার ছোট্ট বিজ্ঞাপনটায় চোখ আটকে গেল —

বৈজ্ঞানিক যুগের দ্রুততম অবদান আবেগথেরাপি

দূর থেকে প্রিয় কিংবা অপ্রিয়জনের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করুন। আকার পকেট ট্রানজিস্টারের মতো-ব্যবস্থার সুপযোগী। দাম মাত্র দুশো টাকা। প্রখ্যাত তান্ত্রিক বিজ্ঞানীর অমূল্য আবিষ্কার- তন্ত্র ও বিজ্ঞানের অপূর্ব সমন্বয়। ব্যবহারে সুস্পষ্ট না হলে টাকা ফেরত।

তারপর প্রাপ্তিস্থানে উল্লেখ করে একট ঠিকানা দেওয়া আছে।

অশনি আর দেরি করল না। পরদিন সকালেই অফিস থেকে সোজা প্রাপ্তিস্থানে গিয়ে হাজির। কড়েকড়ে দুইশত টাকা প্রদান। এবং পকেট ট্রানজিস্টারের আকৃতিসম্পন্ন আবেগ থেরাপি যন্ত্র আনয়ন।

বাড়িতে এসেই যন্ত্রটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল অশনি। ওর প্রাইভেসি বলতে এই ছয় বাই চার ঘরটুকু। অথএব সেখানে বসে নিরাপদে যন্ত্রটি দেখতে লাগল আর সঙ্গে দেওয়া নিয়মাবলির ছাপা কাগজ বার বার করে খুঁটিয়ে পড়তে লাগল।

অশনি আনন্দে খুশিতে কাঁপতে শুরু করল। ছাপা কাগজটায় যা যা লিখেছে তা যদি সত্যি সত্যিই হয়, তাহলে তো মার দিয়া কেল্লা! এতদিনে বোধহয় ক্রীতদাস-জীবনের অবসান হবে। কিন্তু অশনি কি সেরকম কপাল করে এসেছে? এইটুকু যন্ত্রে কি সত্যিই এতোটা শক্তি হতে পারে?

যন্ত্রটা ছোট্ট ট্রানজিস্টার রেডিওর মতো দেখতে। রঙ কালো। একদিকে আধুলির মাপের একটা ছোট্ট জানলা। মুখে জাল দেওয়া। আর উলটোদিকে কুড়িটা ছোট ছোট 'নব' ঠিক রেডিওর ভলিউম কন্ট্রোল নবের মতো। এছাড়া অফ করার জন্য একটা খুদে সুইচ আছে।

নবগুলোর প্রত্যেকটার এক-দুই করে কুড়ি পর্যন্ত নম্বর দেওয়া আছে। নম্বরগুলো এক একটা আবেগের সাংকেতিক নাম। যেমন নিয়মাবলি পড়ে অশনি জেনেছে পাঁচ নম্বরটার অর্থ ভালবাসা। সাত নম্বরটা ক্রোধ। তেরো নম্বরটা উদাসীনতা। উনিশ নম্বর অশ্রদ্ধা। এরকম কুড়ি রকম আবেগের কুড়িটা নম্বর। যে ব্যক্তিকে আবেগথেরাপি করা প্রয়োজন তার মাথার দিকে প্রথমেই ওই ছোট্ট জানলাটা তাক করতে হবে। তারপর সুইচ টিপে যন্ত্রটা অন করেই দরকার মতো নব ঘোরাতে হবে। যেনন সাত নম্বর নবটা পুরো ডানদিকে ঘুরিয়ে দিলে সেই মানুষটি রাগে একেবারে আগ্নেয়গিরি হয়ে উঠবে। আবার পুরো না ঘুরিয়ে আধাআধি ঘোরালে রাগটাও হবে মাঝামাঝি। এইভাবে প্রত্যেকটা আবেগকেই আলাদা করে খুশিমতো কন্ট্রোল করা যায়। যেমন যেমন দরকার তেমন তেমন করে আবেগের ডোজ খুশিমতো কমাতে বাড়াতে পারবে অশনি।

দু-একটা বিজ্ঞানের কথাবার্তাও নিয়মাবলির কাগজটায় লেখা আছে। যেমন, যন্ত্রটা অন করলেই তার জানলা দিয়ে এরকম অদৃশ্য তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ বেরিয়ে আসে। সেটা নির্দিষ্ট ব্যক্তির মগজের কোষগুলিকে উত্তেজিত করে তোলে। বিভিন্ন নব ঘোরালে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের কম্পাঙ্ক তার ধরন-ধারণ পালটে যায়। আর সেই অনুযায়ী মগজের বিভিন্ন অংশের কোষ উত্তেজিত হয়ে মানুষটিকে বিভিন্ন রকম আবেগ প্রকাশে* বাধ্য করে।

মানুষের মধ্যে মূল যে কয়েকটি আবেগ রয়েছে সেগুলোকে ফ্রয়েডীয় রীতিতে আরও শাখা-প্রশাখায় ভাগ করে মোট কুড়িটি আবেগ-উপআবেগ পাওয়া গেছে। আবিষ্কারক তান্ত্রিক বিজ্ঞানী আশা করেন যে এতেই খদ্দেরের চাহিদা ভালরকম মিটে যাবে।

'কী ব্যাপার বাথরুমেই ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?' -মুক্তোমালার ঝাঁঝালো গলা শোনা গেল, 'জলদি বেরোও, বাবা যাবেন। কোনও একটা কাণ্ডজ্ঞান নেই।'

অশনি তখন বিশ রকম আবেগের বিশ রকম নম্বর মুখস্থ করেছিল। চমকে উঠে যন্ত্র আর কাগজ তোয়ালের আড়ালে লুকিয়ে বেরিয়ে এল বাথরুম থেকে বউয়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎই হেসে উঠে বলল, 'অ্যায়সা দিন নেহি রহেগা, বিবিজি!'

মুক্তোমালার তাচ্ছিল্যের গলায় বলে উঠল, 'পাগল, আর কাকে বলে!'

অশনির সেসব গ্রাহ্য হবার নয়। ও তখন মনে মনে আওড়াচ্ছে : ...'পাঁচ-ভালবাসা, ছয়-লোভ, সাত-ক্রোধ....'

অশনি অ্যাকশান শুরু করল রাতে।

বিয়ের পর পর বেচারা বউয়ের ভালবাসা পেত নিয়মিত। কিন্তু তারপরেই অকস্মাৎ সেখানে ভাঁটা পড়েছে। প্রথম তিন-চার বছরে সন্তান না আনার পরিকল্পনা নিয়েছিল দুজনেই। অথচ পরিবার নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে স্বামীকে আদর-সোহাগ করার ব্যাপারেও সরকারি রেশনিংয়ের আকাল লেগেছে। বউয়ের এই ভাবসাব দেখে অশনি একদিন বলেই ফেলেছিল, 'মালা, তুমি মাইরি ফ্রিজিড।' মালা সঙ্গে সঙ্গে চোখ মটকে বলেছে, 'আর তুমি বুঝি ভিসুভিয়াস!' অশনি ফিউজ হয়ে গেছে। এরপর প্রাকৃতিক কি কৃত্রিম কারণে জানি না তিন প্রাণীর সংসার তিন প্রাণীই রয়ে গেছে—অশনি, পিতা ও পত্নী। শুধু লক্ষ্মী নামে শান্তশিষ্ট একটি কাজের মেয়ে সকাল-বিকাল আসে। মুক্তোমালা মেয়েটাকে খুব পছন্দ করে, ভালোবাসে, আবার বকা-ঝকাও করে। বাড়িতে সবাই স্নেহ-শ্রদ্ধা, ভালবাসার মিলিয়ে মিশিয়ে বেশ মাখো মাখো হয়ে আছে, শুধু অশনিই যেন আমড়ার আঁটি— মেঝেতে দিন-রাত ড্রপ খাচ্ছে।

ঘড়িতে এখন নিশ্চয়ই এগারোটা বাজে। অশনি বিছানায় গা ঢেলেছে সাড়ে দশটায়। তখন থেকেই ঘুমের ভান করে চোখ বুজে মটকা মেরে পড়ে আছে। যন্তর বালিশের তলায় রেডি। একটু পরেই মালা এসে আলো নিভিয়ে পাশে শুয়ে পড়ল। অশনি আস্তে আস্তে একটা হাত বাড়িয়ে মালার বাহুতে রাখল। সামান্য চাপ দিয়ে কাছে টানল। সঙ্গে সঙ্গেই শান্ত গলায় জবাব ভেসে এল, 'চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ো-বিরক্ত কোরো না।' এবং অশনির হাতটা অহিংস পথে যথাস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া হল। মাঝে-মধ্যেই অশনি এরকম হাত ফেরত পায়। কিন্তু আজ আর নয় অশনি একেবারে সহিংস হয়ে গেল। অন্ধকারে বালিশের নিচ থেকে যন্ত্র বের করে সুইচ অন করল। সন্তর্পণে তারপর ছোট্ট জানলাটা স্ত্রীর মস্তকে তাক করে প্রথম বোতামটাকে পুরোটা ঘুরিয়ে দিল। ওয়ান টু থ্রি—স্টার্ট।

মুক্তোমালা চকিতে স্বামীর দিকে ফিরল, তারপর অশনিকে একেবারে জাপটে ধরল। অশনি কোনওরকমে যন্ত্রটার বালিশের খাঁজে নামিয়ে রাখল, অবশ্য জানলাটা তখনও মোটামুটি মালার মাথার দিকে তাক করা। তারপর মালার সঙ্গে সুর মেলাল। মালা

যে এরকম ভিসুভিয়াসের মতো উদ্দাম হয়ে উঠতে পারে তা অশনি কখনও কল্পনাও করেনি। এ যেন বিলিতি ফুলশয্যার রাত! তার ওপর রাতের যেন আর শেষ নেই। আনন্দে আর বিস্ময়ে অশনি কোনও কথা বলতে পারছিল না।

ঘন্টাখানেক পর অশনি মুক্তোমালার হাত থেকে মুক্ত হল। তারপর ও যন্ত্রটাকে অফ করে অন্ধকারেই কপালে তিনবার ঠেকাল। জয় বাবা তান্ত্রিক বিজ্ঞানী! গরিবের কপাল তাহলে শেষ পর্যন্ত খুলল!

সকালবেলা অশনি লক্ষ করল, মুক্তোমালা ঠিক সহজভাবে ওর সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। দু-একবার চোখ নামিয়ে নিল। না, গত রাতের কথা মালা ভোলেনি। ভোলার কথাও নয়।

বাজার-টাজার সেরে এসে অশনি বাবার সঙ্গে চায়ের আসরে যোগ দিল। বাবা এখন খবরের কাগজ পড়ছে। খবরের কাগজের দখল না পেয়ে অশনি আজ আর অখুশি হল না। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে দিব্যি টুকটাক গল্প জুড়ে দিল। বারকয়েক অকারণেই বলে ফেলল, 'বুঝলেন বাবা, এখন হল গিয়ে বিজ্ঞানের যুগ।'

বাবা বলল, 'হুঁ।' চোখের নজর কিন্তু খবরের কাগজের দিকে।

মুক্তোমালা ব্যস্তভাবে একবার ঘরে ঢুকে বাবার সুবিধে-অসুবিধের কথা জিজ্ঞেস করল, 'আর কিছু লাগবে কিনা, বাবা কোথাও বেরোবেন কি না।' বেরোলে কখন বেরবেন ইত্যাদি।

অশনি অনেকক্ষণ ধরে মালার শ্বশুরভক্তি দেখল। তারপর গম্ভীরভাবে বলল, 'আজ শরীরটা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে, অফিস যাব না। রান্নার জন্য আজ তাড়াহুড়ো কোরো না।

মুক্তোমালা চুপ করেই ছিল। কিন্তু কাগজ নামিয়ে বাবা সন্তানের দিকে তাকাল। চিন্তিত সুর জানতে চাইল, 'কেন, ম্যাজম্যাজ করছে কেন?'

অশনি মালার দিকে তাকাল। মুক্তোমালা চকিতে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

তখন অশনি একটু হেসে বিজ্ঞভাবে বলল, 'এখন হল গিয়ে বিজ্ঞানের যুগ—।' তারপর চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে উঠে পড়ল। অফিস কি আর ও এমনি এমনি কামাই দেবে! আবেগথেরাপি যন্ত্র দিয়ে মালার ওপরে নতুন নতুন অ্যাকশান করে বিজ্ঞানের দিগ্‌বিজয়কে ও অব্যাহত রাখবেই। ও এখন লক্ষ্মীর গলা শুনতে পাচ্ছে। বেচারি মালার তিরস্কার নির্বিবাদে গ্রহণ করে। বউয়ের মুখে অশনি কত কোটি বার যে শুনেছে, এরকম মেয়ে হয় না! আর কথায় কথায় অশনির সঙ্গে লক্ষ্মীর তুলনা তো আছেই। সুতরাং এটাই সেকেন্ড অ্যাকশানের মাহেন্দ্রক্ষণ।

যন্ত্রটা আমার আড়ালে লুকিয়ে অশোনি রান্নাঘরের কাছাকাছি গিয়ে হাজির। মুক্তোমালা তখন লক্ষ্মীর ওপর শাসন ফলাচ্ছে। কারণ বাসন ঠিকমতো মাজা হয়নি। মাজা বাসনের গায়ে এঁটো লেগে আছে।

'তোকে রোজ রোজ একই কথা বলি, তবু তোর চৈতন্য হয় না।'

লক্ষ্মী কাঁচুমাচু মুখে চুপ।

অশনি যন্ত্রটা লক্ষ্মীর মাথার দিকে তাক করে সুইচ টিপে সাত নম্বর নব বোঁ করে ঘুরিয়ে দিয়ে। ক্রোধ স্টার্ট।

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী মুখ ঝামটা দিয়ে ফোঁস করে উঠল, 'অতো যদি তোমার ছুঁচিবাই বউদিদি, তো নিজে মেজে নিলেই পারো। দিনরাত্তির অমন। ট্যাকট্যাক করে কথা আর সহ্য হয় না।'

মুক্তোমালা স্পিকটি নট। ওর চোখ দুটো রসগোল্লার মতো হয়ে গেছে। যেন মঙ্গলগ্রহ থেকে পাঁচ-পাওয়ালা কোনও প্রাণী আচমকা ওর সামনে এসে হাজির হয়েছে।

'লক্ষ্মী! এসব কী যা তা বলছিস! তুই কি পাগলি হয়ে গেলি?'

'কি বললে, বউদি, আমি পাগল! তা তুমি রোজ অমন ছাগলের মতো আমার গুঁতোও কেন বল দিকি? ন্যায্য কথা বললেই যত দোষ! কোথাকার লাটসাহেবের বউ এয়েছেন যেন, হুঁঃ!' —লক্ষ্মী দূরে দাঁড়িয়ে থাকা অশনিকে এক ঝলক দেখল।

'যা, তুই এক্ষুনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা!' মুক্তোমালার মুখ টকটকে লাল। হাত-পা রাগে থরথর করে। কাঁপছে।

অশনি মনে মনে মুচকি হেসে উনিশ নম্বর নবটাকে আড়াই পাঁচ ঘুরিয়ে দিল। ব্যাস্, ক্রোধের ওপর অশ্রদ্ধার বিষফোঁড়া চেপে বসল।

'হুঁঃ। বেরিয়ে যা বললেই যেন বেরিয়ে যেতে হবে। এটা তোমার বাপের বাড়ি যে বেরিয়ে যাব?' —লক্ষ্মী মুখ ঘুরিয়ে অশনির দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা দাদাবাবুর বাড়ি। দাদাবাবু বললে তবেই বেরোব—'

লক্ষ্মীর এই কথায় মুক্তোমালা চোখ কপালে তুলে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে কী সব বলতে লাগল বোঝা গেল না। লক্ষ্মী তখনও সমানে মুখ চালিয়ে যাচ্ছে। অশনি নব উলটোদিকে ঘুরিয়ে সুইচ টিপে যন্ত্রটা অন করে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মীর চোখ কপালে তোলার পালা।

'তোমায় এসব কী অকথা-কুকথা বললুম গো বউদিদি! আমার মাথায় কি শাঁকচুন্নি ভর করেছিলো! এ কী পাপ করলুম গো আমি!' —বলেই হাউমাউ করে কেঁদে মেয়েটা সটান মালার পা জাপটে ধরল, 'আমায় তুমি বঁটি দিয়ে কেটে ফ্যাল, আমার মুখে নুড়ো জ্বেলে দাও গো।'

অশনি আরও কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে, লেডিজের লাগাম-ছাড়া কান্নাকাটি দেখল। অকারণেই গলা তুলে বলল, 'বুঝলে এ হল গিয়ে বিজ্ঞানের যুগ!' তারপর চলে যেতে গিয়েই দেখল পেছনে বাবা দাঁড়িয়ে। চেঁচামেচি কান্নাকাটি শুনেই বোধহয় এসেছে। অশনি যন্ত্রটা কিছুক্ষণ আগেই লুকিয়ে ফেলেছিল। তবে বাবা দেখতে পেয়েছে কি না কে জানে। অশনি বাবাকে চুপচাপ পাশ কাটিয়ে চলে গেল ভেতরের ঘরের-দিকে।

অশনি লক্ষ করল, মালার পুরনো প্রতাপ যেন অনেকটা মিইয়ে গেছে। কথাবার্তা কম বলছে। প্রতি পদে অশনিকে ডাক দিতেও ভুলে যাচ্ছে। আপন মনেই কি যেন ভাবছে।

সারাদিনের সামান্য কথাবার্তায় অশনি জেনেছে লক্ষ্মী এখনও কাজে বহাল রয়েছে। অনেক করে ক্ষমা-টমা চেয়ে ও নাকি স্বীকার করেছে ওদের ফ্যামিলিতে বরাবরই ভূতে

পাওয়ার রোগ আছে। এরকম ও আর কখনও করবে না। করলে গলা টিপে বউদিমণি যেন ওর মুখে নুন ঠেসে দেয়। এরকম আরও কত কথা।

মুক্তোমালা এসব কথা বাবাকে বলছিল। অশনি কোনওরকমে হাসি চেপে সেখান থেকে সরে এসেছে।

বিকেলে বাবা বেরিয়েছিল। রোজই এরকম আড্ডা মারতে যা তাস-টাস খেলতে বেরোয়। সাতটা -সাড়ে সাতটা নাগাদ বিষণ্ণ মুখে ফিরে এসে বউমাকে খবর দিল, 'জানো, আজ সকালে হরিপদ মারা গেছে। স্ট্রোক হয়েছিল।'

হরিপদ বোস বাবার প্রাণের বন্ধু। সেই কোন ছোটবেলা থেকেই দুজনে প্রায় গলায় গলায়। সুতরাং বাবা যে আঘাত পাবে তাতে আর সন্দেহ কী!

বাবা মুখ কালো করে চেয়ারে বসতেই মুক্তোমালা এক গাল হেসে বলল, 'সত্যি, একটা দারুণ খবর শোনালেন বাবা।

বাবা চমকে উঠে উঠে বউমার মুখের দিকে তাকাল।

স্নেহের বউমা তখন আপন মনেই বলে চলেছে, 'সত্যি কতদিন যে এরকম খুশির খবর শুনিনি। হরিপদ কাকা মারা গেছেন। আঃ, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বুড়ো হয়ে কী কষ্টটাই না পাচ্ছিলেন। হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে—'

'বউমা এসব কী বলছ তুমি? তোমার কী মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

পাশের ঘরের জানলা থেকে চুপিসাড়ে অশনি সব দেখছিল। চিতাবাঘের মতো ঘাপটি মেরে যন্ত্রটাকে ও তাক করে রেখেছিল মালার মাথা লক্ষ্য করে। খুশি ও আনন্দের এক নম্বর নব পুরোটা ঘোরানো। বাবা ও বউমার অবস্থা যখন চরমে, তখন অশনি যন্ত্রটা অফ করে ভিজে বেড়ালটি সেজে পাশের ঘরে এসে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে আঁচল চেপে মালা তীর বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

অশনি ভালমানুষি সুরে জানতে চাইল, 'কী হয়েছে বাবা?'

বাবা মাথায় হাত রেখে বসেছিল। আস্তে করে শুধু বলল, 'বউমাকে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা কর। তোমার সম্বন্ধ ঠিক করার সময় যতদূর খোঁজ নিয়েছিলাম তাতে ওদের ফ্যামিলিতে পাগলামির ধাত আছে বলে শুনিনি। অবশ্য....'

অশনি ছোট্ট করে 'হুঁ' বলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

মালার খোঁজে শোয়ার ঘরে এসে দেখল ঘর অন্ধকার করে বেচারি বিছানায় উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। উৎফুল্ল অশনি দরজাটা বন্ধ করে খোঁজে সান্ত্বনা দেবার মহান কর্তব্য পালন করতে মনোযোগ দিল।

অশনি বাবাকে কখনও রাগতে দেখেনি বা চিৎকার করে কথা বলতে শোনেনি। ওর খুব সাধ হচ্ছিল আবেগথেরাপি যন্ত্রের কেরামতি দেখিয়ে বাবাকে তেলে-বেগুনে আগুন করে দেয়। সেই জন্যেই তক্কে তক্কে ছিল। পরিদন সকালে চায়ের টেবিলেই সুযোগ এসে গেল।

মনে মনে অশনি ঠিক করেছিল, আজই মুক্তোমালাকে শেষবারের মতো টাইট দেবে। তাহলে ওর সাধ পূর্ণ হবে। পত্নী বশ মানছে। আর অশনিও রোজ ভোরবেলা বেড-টি

পাবে।

মালার অবস্থা আপাতত মোটেই সুবিধের নয়। গতকাল রাতে আপনিই জড়িয়ে ধরে খুব কান্নাকাটি করেছে। না, যন্ত্রটা ব্যবহার করতে হয়নি। কাঁদতে কাঁদতেই মালা স্বামীকে বলেছে, 'আমার। বোধহয় মাথা-টাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নইলে বাবার সামনে ওরকম আজেবাজে কথা বলি! আবার দ্যাখো, লক্ষ্মী মেয়েটাও কেমন বজ্জাত! সক্কালবেলায় পাগলের মতো কী ঝগড়টাই না করলে। আচ্ছা, আমরা সবাই কি আস্তে আস্তে পাগল হয়ে যাচ্ছি?.... কে জানে, হয়তো শনির দশায় ধরেছে।'

অশনি বউকে আদর করতে করতে বলেছে, 'তুমি এসব বাজে চিন্তা ছেড়ে একটু ঘুমোও তো দেখি।'

তারপর মুচকি হেসে মনে মনে বলেছে, 'এসব শনির দশা নয়, ডার্লিং অশনির দশা!'

মুক্তোমালার মুষড়ে পড়া অবস্থা দেখে অশনির মনের ভাব সমবেদনার দিকে টার্ন নিয়েছিল সেই জন্যেই কাল রাতে আর যন্ত্র দিয়ে ভালোবাসা আদায় করেনি। কিন্তু আজ সকালে নিজের দীর্ঘদিনের অত্যাচারিত হওয়ায় ইতিহাস রোমন্থন করতেই 'বাঙালি জাগো' মনোভাব ফিরে এল। তার ওপর 'বেড টি' না পাওয়ার আক্ষেপ ও বিরক্তি অতএব ওয়ান-টু-থ্রি। অ্যাকশন।

চায়ে পর পর চুমুক দিয়ে বাবা ফিরল, 'বউমা চা টা আজ দারুণ হয়েছে। আমাকে আর একটা বিস্কুট দাও তো।'

অশনি থেরাপি যন্ত্রের ক্রোধ, বিরক্তি, তাচ্ছিল্য ও অশ্রদ্ধা-মোট চারটে নব ফুল অন করে মুক্তেমালার মস্তক তাক করে বাসছিল। অতএব বউমা মুখ নেড়ে বলে উঠল, 'বিস্কুট লাগলে নিজে নিয়ে নিন আমি দিতে পারব না। বসে বসে খালি ফরমাস।'

অশনি এবার যন্ত্র তাক করল। বাবার মাথার দিকে সঙ্গে। সঙ্গে সঙ্গে বাবা চেয়ার ছেড়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে বলল 'ডটার.ইন ল হোল্ড ইয়োর টাং' ডোন্ট ফরগেট, আই অ্যাম ইওর ফাদার ইন ল!'

বাবা একসময়ে প্রাইমারি স্কুলে ইংরাজি পড়াত। বেঁচে থাকতে মায়ের মুখে শুনেছিল, রেগে গেলে বাবা নাকি, ক্রমশ ইংরাজি শব্দের ব্যবহার বারবার বাড়াতে থাকে আর গলার স্বর উঁচু পর্দায় তোলে। অশনির বালক বয়েসে মা বিদায় নিয়েছে। বাবাই ওকে মানুষ করেছে, কিন্তু ভদ্রলোকের রুদ্রমূর্তি কখনও দেখার সুযোগ হয়নি। আজ হচ্ছে।

ফাদার-ইন-ল ডটার ইন ল ততক্ষণে পানিপথের যুদ্ধ বাঁধিয়ে দিয়েছে। আর অশনির যন্ত্র তালে তাল মিলিয়ে একবার একে অফ করেছে, আর একবার ওকে।

এমন সময় ঘরে ঢুকে পড়ল লক্ষ্মী। বিচিত্র দৃশ্য দেখে সে তো একেবারে থ। অশনিকে লক্ষ্য করে বলল, 'এসব কী কাণ্ড হচ্ছে গো, দাদাবাবু?'

অশনি অন্য নবগুলো কমিয়ে দিয়ে ফুল ডোজে বিনয় চালিয়ে দিল।

ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে বাবা ও বউমা বৈষ্ণব বিনয়ে গদগদ।

বাবা কোমল সুরে তখন বলতে শুরু করেছে। 'আমাকে ক্ষমা করে দাও, বউমা, আমার ভীষণ অন্যায় হয়ে গেছে। আর কখনও এরকম হবে না।'

আর বউমাও কম যায় না। মাথায় ঘোমটা দিয়ে গলায় আঁচল জড়িয়ে ঝপ্ করে শ্বশুরমশাইকে এক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ঃ 'অন্যায় আমার হয়েছে বাবা আমায় শাস্তি দিন।'

তারপর একটানা অনুশোচনা, অনুতাপ, বিলাপ-প্রলাপ ইত্যাদি চলছিল, অশনি যন্তর অফ করে ঘর থেকে সটকে পড়ল। লক্ষ্মী তখনও হাঁ করে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। বোধহয় গতকাল বউদিমণির সঙ্গে ওর বিচিত্র ঝগড়ার কথা ভাবছিল।

ততক্ষণে সম্বিত পেয়ে, লক্ষ্মীকে দেখে ফাদার-ডটার দুজনের অবস্থাই ডেলিকেট।

অশনি নাটকের শেষটুকু উঁকি মেরে দেখেই শোবার ঘরে ঢুকে পড়ল। হাতের যন্ত্রটা লক্ষ্মী দেখতে পেরেছে কি না কে, জানে।

শেষ সংশয়ের উত্তর অশনি পেয়ে গেল একটু পরেই। ফোলা চোখ নিয়ে নাক টানতে টানতে ঘরে এসে ঢুকল মালা। ঢুকেই সটান অশনির পা জড়িয়ে ধরে বলল, 'তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে তুমি বাঁচাও।'

অশনি যন্ত্রটা লুকিয়ে ফেলেছিল। বউকে দু-হাতে দাঁড় করিয়ে অবাক হয়ে বলল, 'কিসের বাঁচানোর কথা বলছ, মালা? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

অশনির বুকে মাথা রেখে মালা বলল, 'লক্ষ্মী আমাকে সব বলেছে। তুমি হাতে করে রেডিওর মতো কী একটা নাড়াচাড়া করছিলে আর তাতেই নাকি আমার-বাবার মাথার গোলমাল শুরু হয়ে গিয়েছিল। কালও যখন লক্ষ্মী আমার সঙ্গে ঝগড়া করছিল তখনও তোমার হাতে ওই কালো রঙের যন্ত্রটা ছিল। তুমি সব জানো। সেদিন রাতেও নিশ্চয়ই ওই যন্ত্রটা তুমি কাজে লাগিয়েছিলে। নইলে —'

অশনি আর কঠোর হতে পরল না। আবেগে গদগদ হয়ে মালাকে সব ফাঁস করে দিল। এমনকি বালিশের নীচ থেকে আবেগথেরাপি যন্ত্রটা বের করেও দেখাল। মালা দুঃখ-কান্নায় সব ভুলে গিয়ে হাঁ করে যন্ত্রটা দেখতে লাগল। দেখাশোনা শেষ হলে ও বলল, 'তাই বলে শুধু শুধু তুমি আমাকে এরকম নাজেহাল করলে?'

অশনি পালটা প্রশ্ন করল, শুধু শুধু মানে? তারপর যন্ত্রসমেত হাত নেড়ে নেড়ে বলল, 'আমার দাবি-দাওয়া না মিটলে এই যন্ত্রের রাইট অ্যান্ড লেফ্‌ট অ্যাপ্লিকেশন চলতেই থাকবে!'

মালা অবাক হয়ে জানতে চাইল, 'কীসের দাবি-দাওয়া?'

অশনি একে সবিস্তারে নিজের বঞ্চিত জীবনের ইতিহাস থেকে শুনিয়ে ছিল। এমনকি বেড-টি খাওয়ার অতৃপ্ত বাসনার কথাও বাদ দিল না।

মালা সব শুনে হেসে বলল, 'ব্যাস এই? কাল থেকে তুমি দেখে নিও। তুমি হলে আমার সব, তোমাকে আমি কখনও, হেলা-শ্রদ্ধা করতে পারি! তবে লক্ষ্মীটি, ওই যন্ত্রটা তুমি বাড়ি থেকে বিদেয় কর। নইলে সবসময় ভয়ে ভয়েই আমি মরে যাব। বাব্বাঃ কী লজ্জা, কী লজ্জা!'

শ্বশুরের সঙ্গে এনকাউন্টারের কথা মনে করে মালা মরমে মরে গেল যেন।

অশনি এগিয়ে এসে বউকে নতুন বউয়ের মতো করে আবার কাছে টানল। মুক্তোমালা নিচু গলায় বলল, 'তুমি আজ আর অফিসে যেও না। বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে আগে ঠাণ্ডা করো। বাবাকে আমি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না।'

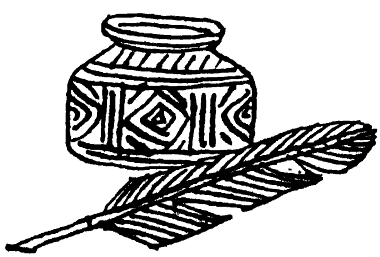
অশনি বলল, 'তথাস্তু। আর যন্তরটাকেও আমি নিক্ষেপ করে দিচ্ছি। তা হলে তোমার শর্ত তুমি ভুলো না যেন। কাল সকালের বেড টি দিয়েই আমার নতুন লাইফ শুরু হোক। প্রমিস?'

মুক্তোমালা ওর হাতের বাঁধন ছাড়িয়ে বলল, 'প্রমিস। প্রমিস। প্রমিস।'

সঙ্গে সঙ্গে 'হিপ হিপ হুররে' বলে এক কান-ফাটানো চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল অশনি এবং পরমুহূর্তেই আবেগথেরাপি যন্ত্রটাকে সর্বশক্তি দিয়ে এক ভয়ঙ্কর আছাড় মারল মেঝেতে।

মুক্তোমালা প্রতিদিনই ছোট্ট ট্রানজিস্টার রেডিও মাথার কাছে নিয়ে শুতে যায়। আজও সঙ্গে নিয়েছিল। অশনি ঘুম ভেঙে দেখল সেটা দু-টুকরো হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে। আর সামনের দেওয়ালে মালার বাপের বাড়ির হোল ফ্যামিলির গুরুদেবের ফটো টাঙানো ছিল, সেটা ফটোর কাচ ভেঙে চৌচির। এবং গুরুদেবের ঠোঁটে যেন তান্ত্রিক-বিজ্ঞানীর হাসি।

মুক্তোমালা তখন রাগ-থমথমে মুখে সদ্য স্বপ্ন ভেঙে জেগেওঠা স্বামীকে কটমট করে দেখছে।



জালিয়াৎ এবং জালিয়াৎ

অমর মিত্র

প্রতি রোববার, ছুটির দিন সতীনাথকে নিয়ে বেরোয় বীরেন। তার মোটর সাইকেলের পেছনে চেপে ঘুরছে সতীনাথ। কোথাও জমি পছন্দ হচ্ছে তো দামে কুলোচ্ছে না, কোথাও দাম দিতে পারছে কিন্তু জমি অনেক ভিতরে। বাসরাস্তা থেকে পায়ে হেঁটে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট, রিকশায় ভাড়া পাঁচ টাকা। অটো রিকশা চালু হতে দিচ্ছে না রিকশাওয়ালারা, এমন শোনা যাচ্ছে। সস্তায় যেখানে জমি, সেই জায়গায় পৌঁছনো খুব কষ্ট। এক জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল বীরেন, বাসরাস্তা থেকে সেখানে ঢুকতে ভ্যান রিকশা ভরসা, ভ্যান রিকশায় মোটর লাগানো। ভকভক করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলেছে সেই অদ্ভুত ত্রিচক্রযান। বীরেন একদিন ফিরতে ফিরতে বলল, 'এভাবে হবে না।'

বীরেনের স্বার্থ আছে। জমির যে দাম হবে তার ফাইভ পার্সেন্ট ওকে দেবে সতীনাথ। আর এই যে ঘুরছে তাকে নিয়ে জগৎপুর থেকে অনন্তপুর, গাড়ির তেলের দামটা সতীনাথের।

একদিন বীরেন বলল, 'ডিসপিউটেড জমি কিনবেন দাদা, তাহলে একটু কমে হয়, এখন কিনে নেওয়া ভাল, এরপর এক ঝুড়ি মাটিও পাবেন না।'

'কীরকম ডিসপিউট?'

'ধরুন ভায়ে ভায়ে গোলমাল, এক ভাই থাকে অন্য জায়গায়, অন্য ভাই একা সব বেচে দিল, কিনে আপনাকে সামলাতে হবে সব।'

'মামলা হবে?'

'হবে, কিন্তু আলটিমেটলি আপনিই জিতবেন, দখল আপনার।'

'মামলার খরচা হবে?'

'হবে।'

'তাহলে আর সস্তা হল কোথায়?'

'ও খরচ সামান্য, যেদিন ডেট পড়বে, কলকাতা হাইকোর্টে কয়েক লাখ মামলা পেনডিং, জেলা কোর্টে আরো অনেক বেশি, জমির অফিসে হাজার হাজার, কোনোও মামলাই মিটবে না।'

'আমি বাড়ি করতে পারব?' সতীনাথ জিজ্ঞেস করে।

'পারবেন, সে ব্যবস্থা হবে।'

'তুমি তো কিনিয়ে দিয়ে সরে পড়বে।'

'আপনাকে একটু লড়তে হবে দাদা। নাহলে দেড় লাখ টাকা কাঠার জমি পঞ্চাশ হাজারে, চল্লিশ হাজারে পাবেন কীভাবে?'

'এত কম?'

'তাহলে আর বলছি কী, আপনি কি ভি. আই.পি. রোডের ধারে, ই এম বাইপাসের ধারে কোনওকালে জমি পাবেন? দমদম রোডে, সিঁথিতে কোনওকালে ঢুকতে পারবেন, ঢুকে যাবে শ্যামসুন্দর আগরওয়ালরা।'

বীরেন বোঝাতে লাগল সতীনাথকে। কলকাতার পারের জমি সব শ্যামসুন্দর, প্রভুসুন্দররা কিনে নিচ্ছে এইভাবে। সেখানে যদি কলকাতার আদি বাসিন্দারা মাথা গলাতে না পারে, একদিন সবাইকে কলকাতা ছেড়ে সুন্দরবনের দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে।

সতীনাথ জিজ্ঞেস করে, 'আমি পারব?'

'পারতে হবে স্যার, আমি বীরেন সিংহানিয়া বলছি, আমরা হচ্ছি সান অফ দ্য সয়েল, আমার ঠাকুর্দার জন্মও কলকাতায়। আমরা কিনা বারাসত পার হয়ে কদমগাছি-গোলাবাড়ি চলে যাব, আর দু-দিনকা সঙ্গীরা এসে কলকাতা, ভি আই পি রোড, বাইপাস সুদ্ধ কিনে নেবে, এসব চলবে না।'

'পারব কী করে বীরেন, আমাদের অত টাকা নেই।'

'টাকা নেই তো কী আছে, ব্রেইন আছে, বাঙালি ব্রেইন কাজে লাগায় না, টাইম কাটায় তো শুধু প্রোজ, পোয়েট্রি, সাহিত্য করে। আমার ভাইপোটা কবিতা লিখছে, ম্যাগাজিন বের করেছে, দিনরাত কফি হাউসে বসে সিগারেট ফুঁকছে, কী হবে বলুন স্যার।'

'আমাকে কী করতে হবে বীরেন?' সতীনাথ জিজ্ঞেস করে।

'আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

'যাচ্ছি তো প্রায়ই, প্রতি সানডে, হলিডেতে, কিছু কি হচ্ছে, আমাকে মল্লিকপুর, বারুইপুর যেতে হবে এরপর। এই দেড়খানা ঘরে আর চলছে না, ছেলে-মেয়ে বড় হয়ে যাচ্ছে।'

বীরেন বলল, 'আমাকে আর ক-টা দিন সময় দিন, আমি আপনাকে কলকাতা ছেড়ে যেতে দেব না। শালা নয়া আদমি এসে কলকাতা কিনে নেবে, আমরা কি কলকাতার কেউ না। আমার কাকাও বলছে, কদমগাছি চলে যাবে, ওখানে গিয়ে বড় ব্যবসা খুলবে, কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না।'

বীরেনকে অদ্ভুত লাগে সতীনাথের। দেড়শো বছর আগে বীরেনের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা দূর রাজস্থান থেকে কলকাতায় এসে পড়ে মাছভাতও খেতে শিখে গেছে। চাকরি-বাকরি নেই বীরেনের। একটা টেলিফোন বুথ করেছে। আর জমির দালালি করে বেড়ায়। বাংলা কাগজ পড়ে। কাগজে চিঠি লেখে ক্ষোভ জানিয়ে। সেই সব চিঠি বেরোলে বীরেন তার ফটোকপি বুথের দেওয়ালে এঁটে দেয়। পাবলিক পড়ুক, কলকাতার এ কী হাল হচ্ছে। প্রায়ই ট্রাম আউট লাইন হয়ে যায়, কেন হবে? ট্রাম উঠে যাবে কেন?

বীরেন বলল, 'সিঁথিতে যেতে হবে, মোটরবাইকে মিনিট পনেরো-কুড়ি, একটু ঘুর প্যাঁচ আছে দয়াময় কুণ্ডুর বাড়ি।'

'কে দয়াময়?'

'ডি.কে, কলকাতা আর তার আশপাশের সব জমির সুলুক জানে। জমির ডিকশনারি বলতে পারেন। হুজ হু, কার জমি কে কিনেছে, নেক্সট সানডে স্যার। ইউ আর এ গুড ম্যান। আমার ভাইপো বলেছে, আপনি এ সময়ের নামী পোয়েট, আমি আপনাকে কলকাতা ছেড়ে যেতে দেব না। কবিকে সম্মান না দিলে সোসাইটি বাঁচে না।'

বীরেন সবই খোঁজ রাখে। তবে সতীনাথ যে এখন আর কবিতায় নেই, তা জানে না। সতীনাথের মনে বিষণ্ণতা এল। গত বছর পাঁচে সে আর কবিতার ধারে-কাছে নেই। বুঝেছে কবিতা তাকে পার্থিব কিছু দেবে না। বরং উপার্জন বাড়াবার দিকে মন দিলে জীবন সুখের হবে। তাই উপার্জনে মন দিয়েছে, ছেলেমেয়ের পড়াশুনোয় নজর দিয়েছে সতীনাথ। এখন একটি গৃহ নির্মাণ করতে পারলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়। এদিকের কাজ শেষ হলে আবার কবিতায় ফেরা যেতে পারে। সমস্ত জীবন কবিতা লিখে, কবিতার কাগজ বের করে বেহালার জীবেশ মাইতি একেবারে নিঃস্ব করে রেখে গেছে তার পরিবারকে। এরকম কত উদাহরণ আছে। কিন্তু বীরেন সিংহানিয়ার ভাইপো যে তাকে কবি হিসেবে চিনে রেখেছে। এতো ভীষণ বিড়ম্বনা। আবার এতে নিজের উপর আস্থাও বাড়ে। খুব খারাপ লিখত না সে। লেগে থাকলে একদিন কিছু একটা হত। কী হত সে জানে না সতীনাথ।

পরের রবিবার বীরেনের মোটরসাইকেলে চেপে সতীনাথ চলল কোনও এক দয়াময় কুণ্ডুর বাড়ি। কত গলি ঘুপচি দিয়ে সিঁথির কত ভিতরে যে ঢুকে গেল বীরেন, তারপর যে বাড়ির দেওয়াল-কাটা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তার বয়স প্রায় একশো বছর হবে। দেওয়ালে পলেস্তারা নেই, পুরনো ইটের গা থেকে বটের চারা বেরিয়েছে। এমন একখানি প্রায় ধ্বংসস্তূপ কলকাতা আর তার আশপাশে আছে বলে হয় না। দেওয়াল কত ঠাণ্ডা, সূর্যের আলো কোনওদিন পড়ে বলে মনে হয় না।

বীরেন বলল, 'প্রোমোটার নিতে চেয়েছে, মালটিস্টোরিড হবে। দয়াময়দা আটকে দিয়েছে। এমন বুদ্ধি ওর, এখন প্রোমোটার ওকেই সাধাসাধি করছে।'

সতীনাথ বলল, 'এইটুকু রাস্তার উপর মালটিস্টোরিড উঠবে?'

'উঠবে। মিউনিসিপ্যালিটির সঙ্গে চুক্তি হয়ে গেছে। পিছনে একটা পুকুরও আছে, বুজিয়ে দেবে, কিন্তু ডি কে আটকে দিয়েছে।'

'কী করে?'

'একটা পার্ট ভায়রাভাইকে ঝেড়ে দিয়ে জমি ডিসপিউটেড করে দিয়েছে, ভায়রাভাইয়ের হয়ে প্রোমোটার তেওয়ারির সঙ্গে লড়ছে।'— বলতে বলতে বীরেন পুরোন ঘুণ ধরা দরজা ধাক্কা দিল, দরজা খুলে যেতেই ভিতরে অনেকটা খোলা জায়গা। বীরেন ডাক দিল, 'কুণ্ডুদা, দয়াময়দা।'

সতীনাথ দেখল উঠোনের পরে পুরোন বাড়ি, দোতলার ব্যালকনি প্রায় ভেঙে পড়ে পড়ে এমন ভাব। জানলার সরু সরু গরাদের অনেকগুলি অদৃশ্য। সিঁড়ির রেলিং ভাঙা। উঠোন

থেকেই সব দেখতে পাচ্ছিল সতীনাথ। দেখছিল, সিঁড়ি দিয়ে খুব রোগা একটা মানুষ নেমে এল ভেসে ভেসে। গায়ে আধ ময়লা শার্ট, পায়জামা, চোখে কালো ফ্রেমের চশমা, পাওয়ার খুব বেশি। মাথার চুল সব সাদা।

'কী হল বীরেন?'

'দাদাকে নিয়ে এলাম। দাদা খুব বড় পোয়েট, বড় বড় অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। রবীন্দ্র পুরস্কার, নজরুল পুরস্কার। কিন্তু দাদার কোনও বাড়ি নেই।'

'বীরেন এসো, ভিতরে এসো, ওঁকে নিয়ে এসো।'— বলতে বলতে সেই বাতাসহীন শূন্যতায় প্রায় টলোমলো সিঁড়ি ভেঙে মানুষটি এগোতে থাকে। তাকে অনুসরণ করে বীরেন ও সতীনাথ। সতীনাথের মনে হল কোনও গুহার ভিতরে চলে যাচ্ছে যেন। দমচাপা গরম, গুমোট গন্ধ। ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যেতে হল তাকে। তারপর যে ঘরে ঢুকল, তার দেওয়ালে খসে যাওয়া পলেস্তারা, পুরোন হোয়াইট ওয়াশ, মাথার উপরে ঢিমে তালে একটি ডি সি পাখা ঘুরছে। বাল্‌ব জ্বলছে এই দিনের বেলায়। একটি হাফ সেক্রেটারিয়েট টেবিল, গদিওয়ালা রিভলভিং চেয়ার, সামনে কতগুলো মোল্ডেড প্লাস্টিকের টুল। লোকটা গিয়ে সেই ঘুরুনি চেয়ারে বসল। সতীনাথ দেখল ঘরের কোণে লোহার বুক সেলফে মোটা মোটা কাগজের বান্ডিল, সব লাল কাপড়ে বাঁধা।

চেয়ারে বসে দয়াময় কুণ্ডু বলল, 'বলুন, কোথাকার কী চাই?'

'কম দামে ভাল জমি।' বলল বীরেন, 'কলকাতা থেকে উনি যাবেন না।'

'ডিসপিউটেড ল্যান্ড তো।'

'ইয়েস স্যার, এমন জমি দেবেন যার ডিসপিউট যেন একশো বছরেও না মেটে।'

দয়াময় বলল, 'রেকর্ড দেখতে হবে।'

'রেকর্ড তো আপনার কাছে।'

'এত রেকর্ড আছে তার ভিতর থেকে খুঁজে বের করতে হবে তো।'

সতীনাথ অবাক হয়ে দয়াময়কে লক্ষ করছিল টেবিল-চেয়ার সমেত। এই টেবিল তার অফিসেও আছে। এমন একটি টেবিলের সামনেই তো সে বসে থাকে। অফিসের জন্য বানানো হয় এই ধরনটি। ওই চেয়ার এই ঘরে এলো কী করে?

বীরেন বলল, 'ম্যাপ বের করুন না বাইপাসের ধারে মৌজার, ম্যাপ না দেখলে আপনি ধরতে পারবেন না কোথায় খালি জমি আছে।'

'চোঙাটা নিয়ে এসো। র‍্যাকের উপর আছে।'

বীরেন উঠে চোঙা নিয়ে আসতেই সতীনাথ চিনতে পারল। বলেই ফেলল, 'এ তো গভমেন্ট অফিসের। এর ভিতরে মৌজা ম্যাপ থাকে।'

'তাই তো।'

'আপনি এসব পেলেন কী করে?'

লোকটা হেসে বলল, 'আপনার তো জমি চাই, বিতর্কিত জমি। কিনে নেবেন, তারপর কিছু খরচা করলে দখল নিরঙ্কুশ।'

'এই টেবিল তো গভমেন্ট অফিসে থাকে।'

'থাকেই তো।'

'ওই চেয়ারও।'

দয়াময় কুণ্ডু বলে, 'গভর্নমেন্ট অফিস থেকে আনা, গুদামে পড়েছিল, ম্যানেজ করে নিয়ে এসেছি। অন্যায় হয়েছে?'

'না সে কথা নয়, কী করে পেলেন?'

দয়াময় বলল, 'আমি তো সরকারি অফিসে মুহুরি ছিলাম স্যার, যাকে একরকমে অফিসের এজেন্ট বলা যায়, তাই ছিলাম মশায়। না হলে ম্যাপ বুঝব, রেকর্ড বুঝব কী করে?'

সতীনাথের জমি খোঁজার ইচ্ছে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু দয়াময় কুণ্ডুকে চিনে নিতে উৎসাহ বাড়ছিল। বলল, 'অফিস থেকে চেয়ার টেবিল—এ তো গুড কন্ডিশনে রয়েছে।'

'আছে, কিন্তু খাতায় কলমে ছিল না। নতুন এল, পুরোনগুলো গোডাউনে গেল, গোডাউনের কোনও হিসেব থাকে না, রেজিস্টার থাকে না, কী ঢুকল, কী থাকল তা কেউ জানে না। ম্যানেজ করেছি। আপনি কি পুলিশে খবর দেবেন?'

'না, মনে হচ্ছে পুলিশ টুলিশ সব জানে।'

'জানে, পুলিশ জানে না এমন কোনও সত্য নেই।'

সতীনাথ বলল, 'এই সব ম্যাপ?'

'অফিসের, তবে ফটোকপি করা। রেকর্ডও আছে। সব ফটোকপি করা। আমার এখানে যা আছে সরকারের ঘরে তা নেই মশায়।....'

'সত্যি বলছেন?'

'হ্যাঁ, নেই বলে জমির ডিসপিউট মেটে না, রেকর্ডই নেই, কার সম্পত্তি কে জানে, কোর্টে কী দেখাবে, কোনও কাগজ, কোনও ডকুমেন্ট?'

সতীনাথ টের পায় পাকা এক জালিয়াতের ঘরে তাকে নিয়ে এসেছে বীরেন। বীরেন সবটা বুঝছে না। সরকারের যা নথি নেই, সেই নথি এই দয়াময় কুণ্ডুর ঘরে আছে। এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না। বীরেন বলে ওঠে, 'স্যার দেখলেন তো কার কাছে এনেছি। এমন জমি দেবেন উনি, কেসই হবে না।'

দয়াময় বলল, 'আপনি এসব নিয়ে ভাববেন না স্যার। আপনার জমি চাই, খোঁজ দেব আমি, ঠিকানা দেব। সে দলিল করে দেবে, আপনি জমি পেয়ে যাবেন। দখল নিয়ে হামলা হবে। থানায় আগে ঢেলে দেবেন, আমিই আগে খবর দিয়ে রাখব। থানা আপনাকে জমিতে বসিয়ে দেবে।'

'তারপর আর কী, পাঁচিল টেনে দিলেন, বাড়ি আরম্ভ করলেন।'

'সেই জমি কোথায়?' সতীনাথ জিজ্ঞেস করল।

'ওই রেকর্ডে আছে। এই ম্যাপে আছে। পঞ্চানপুরের রেকর্ড সরকারি অফিসে সব ছেঁড়া, আমার কাছে আসল কাগজ—'

'এত কাগজ নিয়ে আসতে পারলেন?'

'পারলাম, পাতা আগে ফটোকপি করিয়ে ছিঁড়ে দিয়েছি।'

সতীনাথ বলল, 'অফিস চলবে কী করে?'

'চলবে না, মাঝে মধ্যে অফিসের লোক এসে আমার কাছ থেকে জেনে যায় কার নামে কোন জমি, এইটা আসল অফিস স্যার।'—বলে সিগারেট ধরায় দয়াময় কুণ্ডু। দামি কিংসাইজ। ধোঁয়া উড়িয়ে বলে, 'মাঝেমধ্যে অফিসের লোকেরও তো দরকার পড়ে, তাদের কাছে পাবলিক যায় খবর জানতে—'

সতীনাথ বলল, 'আমাকে আপনি সত্যিই দিতে পারবেন জমি?'

'পারব, কত লোককে দিচ্ছি। আপনাকে দিতে পারব না কেন। আপনি কি নিতে রাজি। অনেকে তো ডিসপিউট ল্যান্ড কিনতে চায় না। চায় না বলে আমরা আজ সমস্ত ভাল জায়গা থেকে হটে যাচ্ছি মশায়, এখন ভুজিওয়ালা, মিঠাইওয়ালা আসুক, রেকর্ড, ম্যাপ অফিস সমেত জমি কিনে নেবে, নিচ্ছেও তাই। কে কী করতে পারছে?'

সতীনাথ বলল, 'আমার ভয় করছে।'

হা হা করে হাসল দয়াময়। 'ভয় করলে হবে? ভুজিওয়ালার পাশের প্লট আপনি যদি নিতে চান, ভয় করলে চলবে না।'

সতীনাথ বলল, 'ডিসপিউট ল্যান্ড কিনে মরে যেতে পারি।'

'পারেন। যারটা চলে যাবে, সে কী ছাড়বে। কিন্তু আপনার পাশে পুলিশ থাকবে।'

'যদি পুলিশ ঠিক লোকের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়?'

'দাঁড়াবে না, পুলিশের কাজ হল ডিসপিউট খোঁজা, ডিসপিউট না থাকলে পুলিশের চাকরিই থাকে না স্যার। আপনি বীরেনের কথা শুনুন। বীরেনই মালিক সেজে আপনাকে রেজিস্ট্রি করে দেবে। জমির রেকর্ড আমার কাছে, বীরেনের নামে করে রেখেছি।'

বীরেন সিংহানিয়া হাসল। 'ট্রু স্যার। আমার নামের জমি নিয়ে নিন দাদা, কোনও ডিসপিউট নেই।'

'তুমি পেলে কী করে, কিনেছ?' সতীনাথ জিজ্ঞেস করে।

'রেকর্ডে আমার নাম লিখে দিয়েছে দয়াময়দা, আমি এবার বেচে দেব স্যার। আপনি কিনে নিন, সিকি দামে ছেড়ে দেব, বাইপাসের ধারে প্লট, বহুৎ হাওয়া, বহুৎ আলো, হু হু করছে সব। এখন ভুট্টা চাষ হয়েছে। ভুট্টা কাটলেই পাঁচিল পড়ে যাবে। টাকা রেডি করুন স্যার।'

সতীনাথ চুপ করে বসে থাকল। তার সামনে-পিছনে দুই জালিয়াৎ পালা করে গান গেয়ে যাচ্ছিল। কলকাতার আশপাশ এইরকমে বেচে দেবে তারা। সতীনাথ কিনলেই হয়। না কিনলে ভুজিয়াওলা-মিঠাইওয়ালারা দখল করে নেবে।

ফিরতে ফিরতে কেউ কোনও কথা বলল না। মোটর সাইকেল থেকে নেমে সতীনাথ বলল, 'বীরেন তোমার অত জমি।'

'হ্যাঁ স্যার।'

'একটুও বেচতে পেরেছ?'

'নো স্যার, আপনারা যদি সাহস করে না কিনবেন তো সন অফ দ্য সয়েল বাঁচবে কী করে বলুন? পোয়েটের গায়ে হাত দেওয়াও সহজ নয়। খবর হয়ে যাবে।'

সতীনাথ বলল, 'এই ভাবেই বাঁচবে বীরেন। গোটা দেশ এইভাবেই বাঁচছে।'

বীরেন হাসতে হাসতে চলে গেল।

সতীনাথ ঘরে ফিরে এল। ঠোঁটের কোণে হাসি দেখে তার বউ কাবেরী জিজ্ঞেস করল, 'জমি পছন্দ হল?'

'জমি বীরেনের, তা কি তুমি জান? বাইপাসের ধারে।'

'অনেক দাম?'

'নাহ। ডিসট্রেস সেল। কেনা দামে দেবে আমায়। আসলে আমার কবিতা ওর ভাইপো খুব পছন্দ করে। আমাকে দেখে ওর মনে শ্রদ্ধা জেগেছে খুব।'

'তুমি তো এখন লেখই না।'

সতীনাথ বলল, 'আমার নামে কেউ নিশ্চয়ই লেখে, চুপ করে থাকলেই হল, কাকে কে খুঁজতে যাচ্ছে। আর এক সতীনাথের নিশ্চয়ই খুব নাম।'

সতীনাথের বউ বলল, 'তুমি তাহলে আর কবিতা লিখ না, ওর নামেই তোমার নাম হোক, ভগবান এইভাবেই দেন, এই ভাবে ধরা যায় ভগবান আছেন।'



স্বপ্নসম্ভব

স্বপ্নময় চক্রবর্তী

সাবমেরিনটা পুরো এসি। ভিতরে লাল গদির চেয়ার। ডিজিটাল সিরিয়োফোনিক মিউজিক বাজছে। মিউজিকটা চেনা। টাইটানিকের। সাবমেরিনের দেওয়ালে কাচের ওয়াটার-টাইট জানলা। জানলার বাইরে লাল মাছ-নীল মাছ। সাবমেরিনের ভিতরে একটা সোফায় বসে আছেন নেতাজি। নেতাজি মানে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। মিলিটারি পোশাক, বুকে নানা রকম স্টার লাগানো। নেতাজির গা থেকে খুব ভাল ওডিকোলনের গন্ধ আসছে, রাকেশ সাকসেনার বাবার গায়ে যেমন। নেতাজির ঠিক পাশেই বসে আছে সন্দীপ। সন্দীপ কী করে নেতাজির সঙ্গে সাবমেরিনে চাপল, সন্দীপ জানে না। কারণ, এটা স্বপ্ন তো, স্বপ্নের সব জানা যায় না। তবে সন্দীপ জানে নেতাজি এখন জাপানে যাচ্ছেন।

নেতাজি এতক্ষণ খবরের কাগজ পড়ছিলেন। খবরের কাগজ থেকে মুখ উঠিয়ে সন্দপীকে দেখলেন। দেখে একটু মুচকি হাসলেন। এই মুচকি হাসিটার মানেই হচ্ছে 'হাই'। সন্দীপ জানে। নেতাজি তো আর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েননি—কটকের স্কুলটা কি ইংলিশ মিডিয়াম ছিল?

নেতাজি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম কী খোকা?

সন্দীপ বলল, 'স্যান্ডি।'

নেতাজি বললেন, 'এ আবার কেমন নাম? কে রেখেছে।'

সন্দীপ বলল, 'স্কুলের ফ্রেন্ডসরা।'

'ও। তোমার বাবা-মা কী নাম রেখেছিলেন?'

'সন্দীপ'।

'ও। বুঝেছি । তা কোন স্কুলে পড়?'

সেন্ট জোসেফ স্কুল, কার্শিয়াং।

তোমার বাবার কার্শিয়াং-এ রেখে পড়াচ্ছেন? বাবা কী করেন?

বিজনেস।

বাঃ! বাঙালির তো বিজনেস-এ আসা উচিত। তুমি বড় হয়ে ব্যবসা কোরো। ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করবে, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে তো, তোমার বাবার কীসের বিজনেস?

একটা ঢোক গিলে সন্দীপ বলল, 'ইঞ্জিনিয়ারিং বিজনেস।'

তোমার বাবা ইঞ্জিনিয়ার বুঝি?

সন্দীপ এমনভাবে মাথা নাড়ল, তাতে মোটামুটি হ্যাঁ-ই বোঝায়।

নেতাজি পকেট থেকে দুটো চুইংগাম বার করে দিলেন সন্দীপকে। জার্মান চুইংগাম। সন্দীপ ট্রাউজারের হিপ পকেট থেকে একটা টুকরো কাগজ বের করে নেতাজির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'অটোগ্রাফ প্লিজ।'

নেতাজি মুচকি হেসে বললেন, 'সরি, অটোগ্রাফ দেওয়া যাবে না। আমি খুব গোপনে জাপান যাচ্ছি তো।

সন্দীপ ব্যাপারটা বুঝল। বলল, 'নো প্রবলেম।'

নেতাজি জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার বাড়ি কোথায়?'

সন্দীপের দমদম বলতে লজ্জা করল। সন্দীপ বলল, 'সল্টলেক।'

'কোন ক্লাসে পড়?'

'এইট্থ্।'

'খেলাধূলা কর?'

'ওহ্, ইয়েস।'

নেতাজি বললেন, 'তোমার সঙ্গে কথা বলে খুব খুশি হয়েছি। তোমার সাহসেরও প্রশংসা করি। কী সুন্দর একা একা জাপান যাচ্ছ। এই নাও জাপানের হাতখরচ।' এক গোছা ডলার তুলে দিলেন। সন্দীপের হাতে। সন্দীপের এত আনন্দ হল যে, থ্যাংকিউ বলতেই ভুলে গেল।

এরপর তো জাপানে পৌঁছে গেল সন্দীপ। ডলার পকেটে সন্দীপ সোজা গেল জাপানের মার্কেটে। ওঃ! কত জিনিস। স্তূপ করে রাখা ইলেকট্রনিক গুডস। একটা দারুণ মোবাইল সেট কিনল। ছবি তোলা যায়, টিভি দেখা যায়, কালার্ড। ওটায় আবার তিন মিনিটের ভিডিও তোলা যায়। চিজ বড়ি হ্যায়, মস্ত মস্ত। নীনাকে একটা এস এম এস করল —নীনা, আই অ্যাম ইন দ্য ইলেকট্রনিক প্যারাডাইস। টেল মি হোয়াট ডু আই ডু। বাবাকে এস এম এস — আই অ্যাম সো নাইস ইন জাপান। সো মেনি থিংস অ্যারাউন্ড। ট্রাইং টু ফাইন্ড এ মোবাইল সেট ফর ইউ। ইয়োর সেট ইজ অবসোলিট নাউ। কিন্তু এত লেখা যাবে না। বাবা এত ইংরাজি বোঝে না। বাংলায় আবার এস এম এস হয় না। সন্দীপও বাংলা লিখতে পারে না ভাল।

কত কী কিনল সন্দীপ! ডিজিটাল ক্যামেরা, মিনি ভিসিডি প্লেয়ার, মিনি রেকর্ডার, জিন্স্, পারফিউম। কসমেটিক্স এর ডিপার্টমেন্টে গিয়ে মনে হল ওর সে রকম বেলি গার্লফ্রেন্ড নেই। তবু কিনল একগাদা। মা আগে পরত না, আজকাল পরছে। মায়ের চারটে। বাকি লিপস্টিকগুলো মেয়েদের ভলিবল খেলার মাঠে ছড়িয়ে দেবে। ব্যাগ ভর্তি। এ বার কিনল এক আজব জিনিস। ইলেকট্রনিক উইংগ্স্। ডানা। ওখানে একটা ছোট্ট কী-বোর্ড আছে। ডেসটিনশেনটা টাইপ করে দিলেই স্ক্রিনে ওখানকার ল্যাটিচিউড লংগিচিউড ফুটে উঠবে। তার পর এন্টার মারলেই উড়তে শুরু করে দেবে, নিয়ে যাবে যেখানে যেতে চায় সেখানে।

সন্দীপ টাইপ করে দিল কলকাতা। সন্দীপ উড়তে লাগল আকাশে। ও দু'হাতে আঁকড়ে ধরে আছে ওর শখের জিনিস ভর্তি ব্যাগ। সব বড় বড় হাইরাইজ পেরিয়ে সমুদ্রের উপরে উঠে এল সন্দীপ। আশেপাশে মেঘ। এমন সময় মেঘের আড়াল থেকে চার-পাঁচ জন ফ্লাইংম্যান ওর কাছে চলে এল। ওকে ঘিরে নিল। ওদেরও ও রকম জাপানি ডানা। ওরা সন্দিপের ব্যাগটা ছিনতাই করে নিয়ে উড়ে গেল। সন্দীপ মহাকাশে একা ভ্যাঁ করে কাঁদছে।

নিজের কান্নার শব্দেই ঘুম ভেঙে গেল সন্দীপের। হোস্টেলের ঘরে পাশের বেডে রুমমেট রাকেশ ঘুমোচ্ছে। ভাগ্যিস ও জাগেনি। কাচের শার্সিতে শিশির পড়েছে। একটু একটু ভোর। তা হলে এটা শেষ রাতের স্বপ্ন। শেষ রাতের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়। সত্যি যেন আসে ডলার আর জাপান মার্কেট।

পাশে ফিরে শোয় সন্দীপ। শার্সিগড়ানো শিশির কান্নার মতো লাগাছে। সব কিছু পেয়েও হারাতে হল। একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল। জাপান মার্কেট পিস্তল কেন খুঁজল না। পিস্তলই বা কেন, আরও কত অ্যানিহিলেটের আছে, হিম্যানদের মতো, স্পাইডারম্যানদের মতো। ওদের বন্দুক থেকে একটা রে বের হয়, আর সেই রে যার গায়ে লাগে সে ভ্যানিশ হয়ে যায়। ও রকম একটা বন্দুক যদি কিনে নিত, তা হলে ওই সব কসমিক পাইরেটসদের ভ্যানিশ করে দিত। তার চেয়ে গুলি করে দেওয়াই বেটার। পড়ে যেত সমুদ্রে, শার্করা খেয়ে নিত। সব জিনিসপত্র নিয়ে সেফলি চলে আসত, রাকেশ-টাকেশরা ট্যারা হয়ে যেত। ভুল হয়ে গেছে। দ্যাট ওয়াজ এ গ্রেট মিসটেক। এ বার থেকে স্বপ্নে বন্দুক কিনবে। বেল বাজল। ঘুম ভাঙানোর বেল। মুখ ধুয়েই জগিং -এ যেতে হবে। বারান্দায় বেরতেই পাইন-পাহাড় কুয়াশা সাঁতরানো পাখি বলল, গুড মর্নিং।

সন্দীপের বাবা সুভাষবাবুর সঙ্গে চা খাচ্ছেন। সুভাষবাবুর মাথায় সাদা রঙের গোল টুপি। ইনি সুভাষ চক্রবর্তী। মন্ত্রী। একটু আগে এসেছেন। মুড়ি-নারকেল খেয়েছেন। এখন চা। বললেন, 'এখন দমদম কেমন দেখছেন?'

সন্দীপের বাবা বললেন, 'দারুণ! কত ফ্ল্যাট! কারখানাগুলোর ধুলো-ধোঁয়া আর নেই। কলোনিতে এখন বিউটি পার্লার সাইবার কাফে। যশোর রোড চওড়া হয়ে গেছে। শুধু এ পাশে এখনও একটা ফ্লাইওভার নেই। ওটা হলেই এলাকার ইজ্জত বেড়ে যাবে।

সুভাষবাবুর মুচকি হাসতে লাগলেন।

সন্দীপের বাবার নাম মনোতোষ দাস। পাড়ায় মনু বলেই সবাই চেনে। ট্যারা মনু। দমদম এলাকার একটা বড় অঞ্চলে জমির দালালির একচ্ছত্র অধিকার মনুর। প্রোমোটারের মেটিরিয়াল ও সাপ্লাই করেন। ভাড়াটে তোলারও কনট্রাক্ট নেন। মস্তান ফিট আছে। গডফাদার ও ফিট আছে। কলোনিতে থাকতেন দু-বছর আগে বাগজোলা খালের ধারে একটি বাড়ি ভাড়াটে সমেত কিনেছিলেন, চমকে ভাড়াটে উঠিয়ে দিয়েছেন। এক তলায় ওঁর অফিস এবং ঠেক। দেওয়ালে কালী ও বিবেকানন্দ। এখানে সুভাষবাবুর মতো মানুষ কেন এলেন, কী ভাবে এলেন মনু জানেন না। কারণ, স্বপ্নে তো স্বপ্নের সব জানা যায় না।

মনুবাবু ঠিক সুভাষদা বলতে ভরসা পাচ্ছেন না। কখনও এত সামনাসামনি কথা হয়নি তো, দূর থেকেই দেখেছেন। সুভাষদা জিজ্ঞেস করলেন, 'ছেলেমেয়ে কটা?'

'একটা।'

'কী করছে?'

'কার্শিয়াং-এর সেন্ট জোসেফে দিয়েছি।'

'অনেক তো খরচ ওখানে। কী রকম খরচ লাগে?'

'সেভেন থাউজেন্টের মতো ....'

'আপনার সাহস আছে তো ...'

'হ্যাঁ। একমাত্র ছেলেকে মানুষ করতে কোনও কঞ্জুসি নয়। এ পাড়ায় অফিসার আছে, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার আছে। কোনও শালার হিম্মত নেই ছেলেকে দার্জিলিং দেরাদুন - কার্শিয়াং-এ রেখে পড়াবার। খালি পয়সা থাকলেই হয় না, দিল চাই। হিম্মত চাই। মানুর স্যাটিস্যাফেকশন আছে ওঁর মাকে শ্বেতপাথর বসানো ঠাকুরঘর করে দিতে পেরেছেন। পেতলের সিংহাসনে ফিলিপস-এর লাইট কষ্টিপাথরের কৃষ্ণকে ফোকাস মারছে। ঠাকুরঘরের জন্য আলাদা মিউজিক সিসটেম। সেখানে অনুপ জলোটা, অমৃক সিং আরোরা তার পর কী যেন লক্ষ্মী, সবার ভজন-টজন মন্ত্রের গান স্টক আছে। মা বহুত কষ্ট করেছেন এক সময়। এখন মা মৃত্যুর আগে দেখে যাচ্ছেন এঁর নাতি সাহেব স্কুলে পড়ছে। বাড়িতে এলে ইংলিশ গান গায়।'

এ-পাড়ায় অনেকের বাচ্চাই ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে, কিন্তু ওঁর ছেলের মতো ইংলিশ কেউ বলতে পারে না। এমন গড়গড় করে বলে যে, ওর বন্ধুরা ও বুঝতে পারে না। ভগবান যদি সহায় থাকে ছেলেকে ফরেন পাঠাবেন। তা হলে তো আবার মেম আসবে ঘরে। তখন কি এই বাড়িটা পছন্দ হবে? পাড়াটা একটু ইয়ে মতো। বাড়ির সামনে খালের ধারে ঝুপড়ি। নোংরা। সব সময় খিস্তা-খিস্তি। তা ছাড়া এ পাড়ায় ফ্লাইওভার কই? ফোয়ারা ? অন্য বাড়ি করাও সম্ভব নয়। ছেলের পিছনে কাঁড়ি কাঁড়ি খরচ। কারবারটাও মন্দা চলছে। খালি জমি শেষ। সুতরাং জমির দালালিও শেষ। দালালির কাজ হত খুচখাচ ফ্ল্যাটে। এখন সব বিগবিগ ক্যাপিটালের ফ্ল্যাট। যত কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, ওই সব জমিতে ফ্ল্যাট হচ্ছে। হাই লেভেলের ব্যাপার। কোটি কোটি টাকার খেলা। ফ্ল্যাট বিক্কিরি করতে দালাল লাগে না। খবর কাগজে গাছ পাখি ফুল আর সুইমিংপুল মিশিয়ে একটা ছবি ছেপে দেয় খদ্দেররা চেক বুক বুকে চেপে লাইন দেয়।

এখন অন্য লাইন ধরতে হবে। দালালকে ভাল কথায় বলে ব্রোকার। এখন ব্রোকারির দিনও শেষ হয়ে যাচ্ছে। এ বার এজেন্ট হতে হবে। কিছু একটার। এক বার রিকোয়েস্ট করবে নাকি সুভাষদাকে। কিন্তু তার আগেই সুভাষবাবু বলে ফেলেন, 'একটা রিকোয়েস্ট করব, মনুবাবু?'

মনুবাবু অবাক! —'আমাকে রিকোয়েস্ট?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী রিকোয়েস্ট ?'

'একবার বাইরে আসবেন?'

'নিশ্চয়ই । নিশ্চয়ই।'

'আচ্ছা মনুবাবু, আপনার একবারও মনে হয়নি, আমি কেন এখানে এলাম?'

'মনে হয়েছিল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয়নি।'

'তবে বলি। আমি একটু দোলনা চড়ব। কেউ জানবে না। শুধু আপনি আর আমি। আমায় একটু দোল দেবেন?'

মহা অস্বস্তিতে পড়েন মনু। মাথা চুলকোতে থাকেন।

সুভাষবাবু বলেন, 'এ-পাড়ায় একটু একা একা ঘুরছিলাম। গোপনে। সুযোগ তো পাই না, সব সময় লোক ঘিরে থাকে। আপনাদের বাড়ির উলটো দিকে বটগাছের ডাল থেকে ঝোলানো দোলনাটা দেখে খুব লোভ হল। কত কাল ...। একটু দোল দেবেন?'

খালধারের ঝুপড়ির বাচ্চারা বটগাছের ডালে দড়ি বেঁধে দোলনা করছে। ওখানে সুভাষবাবু বসলেন। মনু দোল দিতে লাগল। দোল দিতে দিতেই ভাবছিল এ বারই কথাটা পাড়বে। বলবে সুভাষদা, বাড়ির সামনের ঝুপড়িগুলো উঠিয়ে দিন। আপনি তো কী সুন্দর অপারেশন সানশাইন করেছিলেন। এটাও করে দিন। মেয়রের সঙ্গে কথা বলুন। বুলডোজার দিয়ে এক ঘণ্টায় সাফ হয়ে যাবে সব। আমি আপনারই লোক। আপনাকে দোল দিচ্ছি, আমাদের পাড়ায় এখন ডব্লিউ. বি. সি. এস. অফিসার এসেছে অনেক। এ বার পাড়াটাকে পরিষ্কার করে দিন, ঝুপড়ি উঠিয়ে খালধারে একটা পার্ক..। এখন দোল দিচ্ছি, দোল....।

'ধাক্কা মারছ কেন? কী হল?' মনুবাবুর বউ ঝাঁজিয়ে উঠল। মনু বুঝল স্বপ্ন দেখছিল। আর একটু দেখতে পারলে ভাল হত। কথাটাই পাড়তে পারল না। ইস একটু আগে বৃষ্টি হয়েছে, কাচের শার্সিতে জল গড়াচ্ছে, কান্নার মতো লাগছে।

সন্দীপ ফোন করল ওর বাবাকে। চিঠি কমই লেখে। কথা হয় ফোনে। সন্দীপ ওর স্বপ্নের কথা জানাল, নেতাজির কথা. জাপানের কথা, একটুর জন্য ইচ্ছে ফস্কে যাবার কথা...। সন্দীপের বাবাও ওর স্বপ্নের কথা জানালেন, মন্ত্রীর কথা দোলনার কথা, একটুর জন্য ইচ্ছে ফস্কে যাবার কথা। বাপ-বেটায় স্বপ্ন বিনিময় হল।

কিছুদিন পর সন্দীপের বাবা একটি চিঠি পেল। ছেলের চিঠি। মাইডিয়ার ড্যাড। চিঠি তো ছেলে বিশেষ লেখে না, স্কুলের কাগজপত্র থাকলে দেয়, সঙ্গে একটু চিঠি। আজও স্কুলের কাগজ আছে। মনুবাবু ইংরাজি মোটামুটি পড়তে পারেন। কিন্তু মানেটা পুরোপুরি বুঝতে পারেন না। সুপ্রিয়কে দিয়ে পড়িয়ে নেন। সুপ্রিয় বি-কম। মনুর আন্ডারে সাব-ব্রেকার। কিন্তু এখন সুপ্রিয় নেই। একটা আঠারো লাখের ফ্ল্যাটের কমিশন পেয়ে ফুর্তি করতে দিঘা গেছে। চিঠিটা একটু বড়। মনু মানি শব্দটা খুঁজতে থাকেন। কারণ, চিঠি লেখা মানেই টাকা চাওয়া। স্কুলটাও তেমনই। পেয়ে যায়। এম ও এন ই ওয়াই। ভেরি ইমপর্টেন্ট, ভেরি আর্জেন্ট— এই সব শব্দও দেখতে পাচ্ছেন। সুতরাং চিঠিটা পড়াতে হবে।

পাড়ার কাউকে দিয়ে পড়াবেন না। একটু দূরে গিয়ে একটা মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়ান। একটা সরল সাধাসিধে মুখ খুঁজতে থাকেন। ধুতি-শার্ট পরা বেঁটে টাকমাথা একটা লোককে পান। মনু সিধে অ্যাপ্রোচ করে, এক্সকিউচ মি, একটা চিঠি পড়ে দেবেন?

লোকটা একটু অবাক হয়। মুখে এক্সকিউজ মি, অথচ বলেছে চিঠি পড়ে দিতে। অবাক

তাকিয়ে বলে, কি চিঠি?

চিঠিটা খাম থেকে বের করেন মনু। লোকটা আর কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই মনু বলে দেন, ইংলিশটা ঠিকমত বুঝি না স্যার, আবার আমার ছেলেটাও ঠিকমতো বাংলাটা লিখতে পারে না। আমার ছেলের চিঠি —'একটু পড়ে দেন না প্লিজ।'

লোকটা পড়ে দেয়। নেতাজির সঙ্গে সাবমেরিনের স্বপ্নের কথা বলে। ব্যাগটা ছিনতাই হবার কথাও বলে। তারপর বলে, 'ডোন্ট মাইন্ড ড্যাডি ওয়ান ডে আই উইল গো টু ফরেন অ্যান্ড পারচেজ অল দোজ থিংস। মানে ...।'

মনু বলেন, 'বুঝেছি বুঝেছি।' মনুর চোখ ভিজে যায়। লোকটা আবার পড়ে দেয়। ভলিবল-এ স্কুল টিমে চান্স পেয়ে দার্জিলিং এর একটা স্কুলকে হারিয়েছে। সবাই ওর সুখ্যাতি করছে।

চোখ দিয়ে জল গড়ায় মনুর।

'এবার গ্যাংটক খেলতে যাবে, এ জন্য টাকা পাঠাতে হবে। '

'কত টাকা?' তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে নেন মনু।

'চার হাজার টাকা। আপনার ছেলে কার্শিয়াং-এ পড়ে।' লোকটা জিজ্ঞেস করে।

মনু মাথা নাড়ান। এ রকম মাথা নাড়াতে গর্ব হয়।

আরও লিখেছে। খেলাটা দেখতে যেতে লিখেছে, আর একটা হ্যান্ডিক্যাম ক্যামেরা কিনে নিয়ে যেতে লিখেছে। কিংবা বাইশ হাজার টাকা পাঠাতে লিখেছে। টাকা পাঠালে স্যারেরাই শিলিগুড়ি থেকে আনিয়ে নেবেন। ওর খেলাটার ভিডিয়োয় তুলে সবাইকে দেখাবে। লিখেছে, টাকা পাঠাতে বলত না, যদি ব্যাগটা ছিনতাই হয়ে না যেত।

'থ্যাংকিউ।'

বেঁটে লোকটা একটু থতমত খেয়ে কড়াপাকের সন্দেশের বাক্সটা নিয়ে চলে যায়। মনুর বউ কলোনির মেয়ে। সিধে কথা বলতে ছাড়ে না। বলে —টাকার গাছ আছে নাকি? আমি আজ পর্যন্ত একটা হীরার দুল গড়াইয়ের শকের কথা বলতে পারলাম না, আর ছেলের একেবারে ভিডিয়ো ক্যামেরা? এত লাই দিবার দরকার নেই। সামনে খরচা আছে। নিজের পেটের দিকে ইঙ্গিত করে মনুর বউ।

একটা বাচ্চা আসছে ওদের। বলা যায়, অ্যাকসিডেন্ট । অপারেশন করতে চেয়েছিল। ডাক্তার বলল, 'এই বয়সে ঠিক হবে না। তা ছাড়া একটা বাচ্চা কি ভাল?

বউও তাই বলল। একটা বোন হলে ফোঁটা দেবে। ছেলেটা ভাগনে-ভাগনি পাবে। আসলে ছেলের কথাই ভেবেই আর একটা। মা, খুব খুশি। ঘরে কাঁথা সেলাই চলছে।

মনু ছেলেকে ফোন করলেন। 'রাগ করে না সোনা। খেলার চার হাজারের চেক স্কুলের নামে ক্যুরিয়ার করে দিচ্ছি। তোর হ্যান্ডিক্যাম পারলাম না। পরে দেখা যাবে। আরও কত খেলবা কত প্রাইজ পাবা। পরে দেখব নে।'

ছেলে ফোন কেটে দিল।

সন্দীপ বাড়ি ফিরল, অল্প ক-দিনের ছুটিতে। ফিরেই ম্যাক্সিপরা মায়ের পেটের দিকে চোখ পড়ল। সন্দীপের মা ছেলের কাঁধে হাত দিয়ে বলল, 'তোর একটা খেলার সাথী আসছে।'

সন্দীপ কাঁধ বেঁকিয়ে হাতটা সরাল। সন্দীপ গম্ভীর।

আর এক জন আসছে। ওর দুটো ওয়াকম্যান আছে, একটা নিয়ে নেবে। বাবা যদি কম্পিউটার কিনে দেয় ভাগ বসাবে। হ্যান্ডিক্যামটাও আর হবে না। ওর জন্য খরচা আছে না? শুধু ওকে দিয়ে হচ্ছিল না? কেন আর এক জন? আমি সব বুঝি। ছিঃ! আবার?

সন্দীপের কান্না পাচ্ছে। ওর মা-বাবাকে ভালবাসত সন্দীপ। আঁকড়ে ধরা ভালবাসার ব্যাগটা যেন কোনও ফ্লাইং গুণ্ডা ছিনতাই করে নিয়েছে।

সন্দীপ একা ঘরে থম মেরে আছে। মা আবার ডাকতে এল। তক্ষুণি স্বপ্নের মার্কেট হাতড়ে ওই রে বের করা বন্দুক নিয়ে এসে মায়ের পেটের দিকে তাক করল স্যান্ডি, দি হিম্যান। সাঁই করে আশ্চর্য আলো বেরুল। মায়ের পেটে গিয়ে লাগল, একটা মিউজিক, ব্যাস, অ্যানিহিলেটেড।

বাবা ট্রেনে তুলে দিল। ছুটি শেষ। অন্য ছেলেমেয়েরাও যাচ্ছে। সন্দীপ টা টা করার সময় ব্যাটারি কমে যাওয়া রোবটের মতো হাত নাড়ল।

কিছু দিন পর বাবার ফোন পেয়েছিল সন্দীপ। ভাইটা মায়ের পেটেই মারা গেছে। পেট কেটে বার করতে হয়েছে।

এ বার কান্না পেল স্যান্ডির। মার্ডারার মনে হচ্ছে নিজেকে।

আবার যখন বাড়ি ফিরল, চার মাস পর, দেখল মা কত রোগা। দেখল ঘরের কোনায় ঝুল, ঠাকুমার ঠাকুরঘরের মেঝেতে কালো দাগ, বাবার মুখে হাসি নেই। মায়ের গলার শিরা দেখা যায়।

সন্দীপ স্কেচ পেনসিল দিয়ে ঘরের দেয়ালে লেখে F.M. বাবার ঘরে লেখে। বারান্দায়, ব্যালকনিতে লেখে F.M. মানে ফরগিভ মি।

ব্যালকনি দিয়ে সামনে তাকালে এখন অন্য দৃশ্য। ঝুপড়িগুলো নেই। ওখানে বাগান। বটগাছটা আছে, কিন্তু দড়ির দোলনাটা নেই। একটা লোহার ফ্রেমের দোলনা হয়েছে। ওটা এখন চিলড্রেন্স পার্ক। নতুন নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি বাচ্চারা খেলবে। বাবার কাছে শুনল একদিন বুলডোজার এসে সব সাফ করে দিয়ে গেছে।

ওখানে ডালিয়ারা থাকত। এ বাড়িতে কাজ করত ডালিয়া।

চিলড্রেন্স'স পার্ক সেজে উঠেছে। স্লিপ, দোলনা, বাগান। বাগানে চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়ার কুঁড়ি, আইসক্রিমগুলো, বেলুন। পাড়ার উন্নতি দেখছে সন্দীপ ব্যালকনিতে।

দেওয়ালে দেওয়ালে এফ এম লিখেছিল সন্দীপ। বাবা, বাবা, তোমার হয়ে যাওয়া স্বপ্নে ওই ফুলবাগানের পাতায় কুঁড়িতে, ফুল পাপড়িতে, নতুন ডালিয়ায়, তোমার কি কিছুই লেখার নেই?

ও কালো জল

কিন্নর রায়

'গান্ধীজি সম্বন্ধে আপনার কোনও স্মৃতি আছে?'

বলেই অমল বিশ্বাস তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কাঁচা হলুদ বাটা মাখানো শাদা মার্বেল পাথর যেমন হয়, তেমন গায়ের রং। ভারী বড় মুখ। টান চোখ। সেই চোখে বয়েস অনেকটাই ছায়া ফেলেছে।

চারপাশে একটু একটু করে খুব মন দিয়ে লাটাইয়ে রোদ গুটিয়ে নিচ্ছে কেউ। অক্টোবরের আট তারিখ, তবুও ভাদ্র মাসের গরম। চারপাশে দূরে দূরে শুকনো মাটির ওপর মাথা চাড়া দেয়া প্রাচীন, নবীন শাল। এখানে ওখানে পুটুস।

আশি পেরিয়ে এসেছেন অনেকদিন। তবু তাঁর তসর তসর চামড়ায় সময় সেভাবে আঁকিবুঁকি কাটতে পারেনি। হাতলওলা কাঠের চেয়ারে বসিয়ে দিলে এখনও বোঝা যায় তিনি কত লম্বা। তাঁর মাথার চুল কত ঘন। দীর্ঘ। শাদায়-কালোয় বোনা— সেখানে শাদাই বেশি, সেই চুলের গোছা সুন্দর করে বিনুনি করে বাঁধা হয়েছে বিকেল নামার আগে। খাদির শাদা ব্লাউজ, শাদা শাড়ি। একটা খুব হালকা ঘি রঙের চাদর— সে'ও হয়ত এন্ডির হবে, নয়ত সুতি খাদির, তাঁর সামনে —গলা থেকে পা অব্দি চাপা দেয়া।

নজর করলে দেখা যাবে ফরসা ফরসা দুপায়েব পাতা সামান্য ফোলা। কাঠের চৌকো উঁচু পিঁড়ির ওপর সেই এক জোড়া পা। তার বুড়ো আঙুলের নখের কোণে সময়ের কালচে ধুলো।

কথা বলতে একটু কষ্টই হয়। সেরিব্রাল অ্যাটাক হয়ে গেছে বছর ছয় আগে। কিন্তু অমল বিশ্বাসের প্রশ্ন শুনে তিনি তো সেই ট্রেনটি দেখতে পান।

ট্রেন চলেছে রামগড়।

সেখানে রামগড় কংগ্রেস।

গান্ধীজির সঙ্গে আমি।

যেখানে, যে স্টেশনে ট্রেন থামছে, সেখানেই জনতা, মালা, ভিড়। সবাই চিৎকার করছেন—গান্ধী মহারাজ কি জয়। মহাত্মা গান্ধী কি জয়। ভারতমাতা কি জয়।

গান্ধীজি ট্রেন-কামরার দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

এসব ছবি পর পর আসে না। কখনও খুব দ্রুত এসে পড়ে। কখনও ধীরে। ছবি আসে। মুছে যায়। সেভাবে নিয়ম করে আসা-যাওয়া নেই।

অমল মাটির উঁচু দাওয়ায় চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসা তাঁর দিকে, আর একবার সামনের উঠোনের দিকে তাকাল।

উঠোনে খাটিয়া পাতা। সেখানে ঋতা, শাঁওলি, সুদীপা। দেবু আর পার্থকে নিয়ে গৈরিক গেছে একটু দূরে—নদী দেখাতে। শিশির আর অর্চনা বসে আছে আর একটা খাটিয়ায়।

এমনিতেই বলরামপুর থেকে চাণ্ডিল হয়ে ট্রেকারে নিমডি আসতে দুপুর গড়িয়ে গেছে। সকাল দশটায় বলরামপুর থেকে ভাত খেয়ে চাণ্ডিল ড্যাম। সেও এক দেখার মতো ব্যাপার। রাস্তা খুব খারাপ। কিন্তু বাঁধের ওপর উঠে আসতে পারলে আশ্চর্য পাহাড়। তার পায়ের কাছে জল। মানুষ তার নিজের সুবিধেমতো অঙ্ক কষে জলকে বেঁধেছে। পাহাড়ের গায়ে সবুজ। আকাশের নীল আর পাহাড়ের হরিয়ালি কে যেন এক সঙ্গে গুলে দিয়েছে চাণ্ডিল বাঁধের জলে। অনেকটা উঁচু থেকে জল নেমে আসছে নীচে। তার শব্দ আছে। স্রোত আছে। ফেনা আছে।

সেই লাফিয়ে পড়া জলের কিনারা ঘেঁষে রবারের কালো টিউব ভাসিয়েছে একটা বাচ্চা ছেলে। জল সেখানে তেমন চঞ্চল নয় কিন্তু উথাল-পাথাল আছে।

স্মৃতির কারপেট ছড়িয়ে দিয়ে তিনি বের করে আনতে চাইলেন ট্রেনে ওয়ার্ধা থেকে রামগড় যাওয়ার নকশাটিকে।

'মহাত্মা তো বরাবরই ওইরকম।'

'কেমন?'— বলে অমল তার টেপ রেকর্ডারের সুইচ অন করল।

পাথরে ধাক্কা খেতে খেতে চলেছে সুবর্ণরেখা। এই শেষ আশ্বিনে তার বুকে তেমন জল নেই। কিন্তু স্রোত আছে। চাণ্ডিল বাঁধে যেতে একটা ব্রিজ পেরতে হয়। তেমন চওড়া নয়। রোদ আর কুচো কুচো পাখিরা একই সঙ্গে জল খেলছে সুবর্ণরেখার জলে।

গান্ধী আশ্রমের উঁচু দাওয়ায় বসা একই সঙ্গে তাঁকে আর সুবর্ণরেখাকে দেখতে পাচ্ছে অমল।

গৈরিক, পার্থ, দেবু তখন নদী দেখে ফিরে ইঁদারার পাশে দাঁড়িয়ে। যেখানে ছায়া নামছে বিকেলের।

বড্ড চোরকাঁটা এখানে—ছুটতে ছুটতে টুলকির মনে হলো। তার লং স্কার্টে চোরকাঁটা জড়িয়ে যাচ্ছে। স্বপ্ন, তিতলি, আকাশ, পূষণ, কাহিনি, টুলকিরা নিজেদের বাবা মাদের থেকে খানিকটা দূরে, নিজেদের মতো।

'কী সুন্দর আচার রে তিতলি।'—বলতে বলতে ক্লাস নাইনের টুলকি তিতলির গলা জড়িয়ে ধরল। তিতলির ক্লাস এইট। স্বপ্ন সিক্স। পূষণ আকাশরা ওয়ান। কাহিনি টু!

'এই যে অ্যাত্ত বড় জায়গা, কোথাও কোনও বাউন্ডারি নেই দেখছেন তো। দূরে পাহাড়। সামনে মাইলের পর মাইল টাঁড়। শালের সারি। পুটুস। বাবার সঙ্গে এখানে এলে একেবারে রামায়ণ-মহাভারতের পৃথিবী'—বলেই বছর চল্লিশের গৈরিক দেবুর দিকে তাকাল।

সবে তেতাল্লিশ পেরনো দেবু তেমন জোরে হাঁটতে পারে না। কোমরে ব্যথা। ঘাড়ে স্পন্ডিলোসিস। দু-পায়ের হাঁটুতে ব্যথা। বলরামপুর আসার পর ডান পায়ের নখের কোণে একটা অস্বস্তিকর যন্ত্রণা। পেকে উঠল না কি!

গৈরিক আর সুদীপা জোর করে থিন অ্যারারুট বিস্কুট ভিজিয়ে সেই কাই কাই প্রলেপ আঙুলে লাগিয়ে দিল রাতে। সঙ্গে হোমিওপ্যাথি ওষুধ। নখের ব্যথাটা তাতেই একটু কমে এল কি?

রামগড় ওয়ার্ধা—ওয়ার্ধা—একটা বড় মেল ট্রেন দৌড়ে যাচ্ছে তাঁর মাথার ভেতর দিয়ে। বাপু নেমে এলেন জনতার মাঝে। তিনি বললেন, এখন আজাদির লড়াই চলছে। এই সংঘর্ষে অনেক অর্থের দরকার।

তিনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন মহাত্মাকে।

সবে ছেচল্লিশ পার করা অমল বিশ্বাস দেখতে পেল কাঁচা হলুদ বাটা মাখা শ্বেত পাথর ইতিহাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে আসছেন। কথা কইছেন।

পাশাপাশি আরও দুটো কাঠের চেয়ার, একটায় গৈরিকের মা গীতা মাসিমা। তিনি এই আশ্রম, তাঁকে চেনেন। যেমন জানেন তাঁর গায়ের কাথায় আঁচিল আছে।

দূরে কী একটা পাখি ডাকছে।

দাঁতের ফাঁক থেকে আখি গুড় আর বেসনে বানানো বোঁদের লাড্ডুর টুকরো জিভে তুলে আনল তিতলি। তার মনে পড়ল জলের স্বাদও কী সুন্দর এখানে।

'ইঁদারার পাশে তোদের একটা ছবি তুলব।' 'নীহারিকা' নামে অ্যাড এজেন্সির আর্ট ডিরেক্টর দেবু আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবল। এই চল্লিশ পেরিয়ে আসার পর জীবন বড় বোঝা মনে হয়। সব সময় শুধু কাজ আর কাজ । ঘাড়, কোমর—সব গেল। সরু কালো ফ্রেমের চশমার ভেতর দিয়ে দেবু আশ্রমের চারপাশ, শাল গাছ, ঢলে আসা সূর্য, ইঁদারা—সব এক সঙ্গে দেখতে পেল। তারপর গালের দাড়িতে বার তিনেক আঙুল ছুঁইয়ে তিতলি আর টুলকিকে বলল, 'লেখাপড়ায় তোর, তো খালি কাটলেট পাস। এখন দাঁড়াতো কুয়োর পাশে। পার্থ কাকু তোদের একটা ছবি তুলবে।'

কাহিনি বলল, 'আমারও।'

আকাশ, স্বপ্ন, পূষণ বলল, 'আমাদেরও।'

'সবাইয়ের হবে। আগে টুলকি আর তিতলির হোক। তোরা এই সব চোরকাঁটা তুলে নিয়ে একটু মাথার চুলে দে।'

টুলকি. তিতলি জানে দেবুকাকু এরকমই। কত রাত অব্দি গল্প বলবে। সঙ্গে আঁকাআঁকি। তখন পূষণ, স্বপ্ন, আকাশ, কাহিনি, টুলকি, তিতলি —কারও মুখে কোনও কথা নেই। সবাই দেবুর সঙ্গে গল্পে।

গৈরিক, শিশির, পার্থ, অমল অবাক হয়ে যায়। অতবড় আর্টিস্ট, কোনও গেরামভারি ব্যাপার নেই। সবার সঙ্গে সমান মিশতে পারে। বিশেষ করে ছোটদের সঙ্গে।

পার্থর ক্যামেরায় শাটার পড়ে। পার্থর নীল জিনসে চোরকাঁটা। সিমেন্ট বাঁধানো ইঁদারার পাশে টুলকি, তিতলি, কাহিনি পূষণ, স্বপ্ন আকাশ।

কাহিনি জানে তার বাবা দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে, চোখ থেকে চশমা নামিয়ে কী একটা ভাবছে একা একা। হয়ত সেই খোঁড়া শালিকটার কথা, সে রোজ আমাদের সন্তোষপুরের একতলায় রোদমাখা বারান্দায় এসে চু-কিত -কিত খেলে। নয়ত সেই কাকটাকে মনে করেছে। যে রোজ শালিকের গলায় ক্রুর-র-ক্রু—র-উ-র বলতে বলতে রুটি চায়। কেউ বিশ্বাসই করবে না কাহিনির এই কথা। খালি কাহিনি জানে আর জানে তার বাবা-দেবু সেন।

কাঠের চেয়ারে হেলান দিয়ে। তিনি বলে চলেছেন, 'গান্ধীজি অনেক অনেক টাকার কথা বললেন তাঁকে দেখতে আসা গরিব কিষানদের। গ্রামের হদ্দ গরিব মানুষ সব। তখন দেশ পরাধীন।'

একজন আশ্রমবাসিনী এসে রুমাল দিয়ে তাঁর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে গেল। স্মৃতি কি তাঁকে কষ্ট দিচ্ছে? অমল গীতা মাসিমার মুখের দিকে তাকাল।

গীতা মাসিমাও প্রায় ষাট। পায়ে একটু অসুবিধে আছে। এই আশ্রমের সামনে ট্রেকার থামার আগে তিনি গলায় অনেকখানি আবেগ এনে বলেছিলেন, 'তোমরা তো জান আমাদের দেশ এক সময় ইংরেজের অধীন ছিল। আমরা পরাধীন ছিলাম।'

চাণ্ডিল মোড়ে মিষ্টির দোকানে সিঙাড়া, চা, নিমকি, মিষ্টি খাওয়া হয়েছে। তারপর টানা ট্রেকার যাত্রা। সারা রাস্তায় যেমন হয় — বাচ্চাদের ভেতর টুকটাক ঝগড়া, চিৎকার, মান-অভিমান, দলাদলি পর পর চলছে।

গীতা মাসিমার কথায় সবাই সোজা হয়ে বসল।

'এই যে আজ আমরা স্বাধীন দেশে বাস করছি, তার জন্যে অনেক লড়াই করতে হয়েছে। অনেকে ফাঁসি গেছেন। জেল। দ্বীপান্তর। দ্বীপান্তর বোঝো তো?'

টুলকি, তিতলি ঘাড় নাড়ল।

অন্য ছোটরা চুপ।

'ইংরেজ এমনি এমনি দেশ ছেড়ে চলে যায়নি। সেই অত্যাচারী বিদেশিদের এই দেশ থেকে দূরে সরানোর জন্যে যাঁরা লড়াই করেছেন, জেলে গেছেন, পুলিশের লাঠির বাড়ি মাথায় নিয়েছেন, তেমন একজনের কাছে আমরা যাচ্ছি। তোমরা আমার কথা বুঝতে পারছ?'

কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। শুধু নাম না জানা কোনও পাখির ডাক ভেসে আসছে। অমল জানে গৈরিকের মা গীতামাসি এসব ব্যাপারে খুব সিরিয়াস। নিজে একটি স্কুল চালান। এই আশ্রমেও ছিলেন বহুদিন।

'আমরা তাঁর কাছে যাব। তাঁকে প্রণাম করব। প্রণাম করে কিছু কথা শুনব। সেই সময়ের কথা, দেশের কথা, স্বাধীনতার কথা।'— বলতে বলতে গীতা মাসি অমলের দিকে তাকালেন।

একটি ইংরেজি দৈনিকের সিনিয়ার রিপোর্টার অমল বিশ্বাস বুঝতে পারল, তার লেখার বিষয় সামনে অপেক্ষা করছে।

'বাপু আমরা কেমন করে টাকা-পয়সা দেব? আমরা খুব গরিব। গ্রাম থেকে আসা সেই সব মানুষরা বলে উঠলেন। একটু আগেই তাঁরা মহাত্মা গান্ধীজি কি জয়, গান্ধীবাবা কি জয়, ভারতমাতা কি জয় বলেছেন।' —বলতে বলতে তিনি সামনে চলে যাওয়া রোদের দিকে তাকালেন।

টেপের ভেতর খালি ক্যাসেট ঘুরছে। পায়ের কাছে কাঁসার মাজা ঘটিতে জল , একটু পরেই চা এসে গেল। সঙ্গে সস্তার বিস্কুট। কুচো নিমকি। তিনিও খাবেন চা। তাঁর জন্যে একটু বড় সাইজের কাপ।

বলরামপুরে নিজেদের বাড়িতে উঠোনে পাতা দড়ির চারপাইয়ের ওপর বসে বসে গৈরিক বলেছিল, 'অমলদা, ওঁকে আমরা পিসিমা বলি। মায়ের পেটের বোন না হলে কী হবে, বাবা ওঁকে নিজের দিদির থেকেও বেশি ভালবাসতেন। পিসিমাও বাবাকে। বাবাকে উনি ডাকতেন গুগুা বলে—বাবার ডাক নামে। বাবা মারা যাওয়ার পর আমরা সবাই এখানে এসে বহুদিন ছিলাম। বাবার লাগানো কয়েকটা গাছ আছে এই আশ্রমে। তার মধ্যে অনেকগুলো শাল আর একটা অর্জুন। সেই গাছটা বেশ বড় হয়ে গেছে। মনে আছে বাবা চলে যাওয়ার পর আমি তো প্রায়ই আসি এখানে। একবার ফিরে যাওয়ার সময় পিসিমা আমায় বলেছিলেন, এখন এইখানে বসে বসে আমি পাতা ঝরা দেখব। এখন তো পাতা ঝরার দিন। তখন শীতকাল। পিসিমার দিকে তাকিয়ে ওঁর কথা শুনে চোখে জল এসে গেল।'

নিজের হাতে চায়ের কাপ তুলে মুখে দিলেন তিনি।

অমল দেখতে পেল গীতামাসির ঠোঁটে চায়ের কাপ।

চারপাইয়ে বসা ঋতা, শাঁওলি, সুদীপারা একটু একটু করে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছে চায়ে। সঙ্গে ঘরে ভাজা কুচো নিমকি। বিস্কুট।

শিশির চা খায় না। একা একা উঠোনের অর্জুন গাছের দিকে তাকিয়ে রোদের মুছে যাওয়া দেখছে শিশির। অর্চনা চায়ের কাপ ধরে, শিশিরকে দেখছে আর ভাবছে আশ্চর্য মুখচোরা এই লোকটা। গৈরিক এগিয়ে এসে শিশিরকে বলল, 'গুড়ের লাড্ডু খেয়েছেন?'

'খেয়েছি গৈরিক।'

'কেমন লাগল।'

'খুব ভাল।'

'এটা এখানকার স্পেশাল। আমরাও ছোটবেলায় এসে খেয়েছি।'

'এই গাছটাই কি মেসোমশাইয়ের লাগান?

'হ্যাঁ। বাবা নিজে হাতে লাগিয়েছিলেন শিশিরদা। আকাশ তিতলিদের আবার দেখিয়ে নিয়ে গেলাম ওদের ঠাকুর্দার হাতে লাগান গাছ। বাবা নেই শিশিরদা। গাছ আছে। একদিন এই অর্জুন গাছও থাকবে না। কিন্তু এই আকাশ আলো, ভালোবাসা থাকবে।'

'থাকবে বলছ?'

'থাকবে শিশিরদা।'

ঠিক তখনই টুলকি আর তিতলিরা মাথার চুল থেকে চোরকাঁটা পরিষ্কার করতে সেই খাড়া ঝাড়াল অর্জুন গাছটিকে দেখতে পেল। তিতলি দেখল তার বাবা হাত বোলাচ্ছে অর্জুনের গায়ে। টুলকি দেখল তার বাবা অমল বিশ্বাস কাঠের চেয়ারের ওপর একটু কুঁজো হয়ে বসে টেপ রেকর্ডার ধরে আছে সেই 'দিয়া দিয়া' দেখতে মানুষটির মুখের কাছে। আমার দিদিমাকে আমি 'দিয়া' বলি। খুব ভালবাসি দিয়াকে। সত্যি বলতে কি, মা-বাবার থেকে অনেক বেশি। দিয়ার মতো কাউকে দেখলেই চোখে জল আসে আমার। কেন আসে?

কেন এসে যায়— নিজের ভেতর এইসব কথার ঢেউ তুলতে টুলকি ডান হাতের উলটো পিঠে চোখের জল মুছল।

ঠাকুর্দার পোঁতা অর্জুন গাছ, চার পাশে বাবা, বাবার গলায় কত স্মৃতি। বাবা-কাকাদের ছোটবেলা। শুনতে শুনতে তিতলির গলার ভেতর শুকনো ব্লটিং পেপার আটকে যেতে থাকল। এক দলা ব্লটিং-কাগজ।

অমল দেখতে পেল ওঁর চা খাওয়া হয়ে গেছে।

শাদা কাপড় পরা একজন রোগা মতো মহিলা তাঁর হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে নিলেন। উনি বলছেন, 'বাপুজি সেই সব গ্রামবাসীদের কথা শুনে বললেন, আপনারা ঠিকই বলেছেন, আপনারা সত্যিই খুব গরিব। গরিব দেশ আমাদের, তার ওপর বিদেশিদের রাজত্ব। কিন্তু আপনারা তো অনেকেই বিড়ি খান?'

জনতা ঘাড় নাড়ল।

বাপু বললেন, 'আপনারা আমায় আপনাদের একদিনের বিড়ির পয়সা দিন।' তাঁকে দেখতে আসা মানুষেরা একদিন নেশা না করে সেই পয়সা তাঁর হাতে তুলে দিল।

আর কোনও স্মৃতি? আরও মনে পড়ে কিছু?

তিনি ঘাড় নাড়লেন। মনে পড়ে। তিনি দেখতে পাচ্ছেন।

'মহাত্মাজি তখন কলকাতায়। শরৎ বসুর বাড়িতে। জওহরলালও এসেছেন। বাঙালি মেয়েরা বড্ড বেশি সময় কাটায় রান্নাঘরে—বলেছিলেন গান্ধীজি। বাপু দেখেছিলেন বাঙালি মেয়েরা রান্নায় বেশি বেশি মন দিচ্ছে। রান্নার কাজে এত মন দিলে, তারা দেশের কাজ করবে কখন? রুটি তার সঙ্গে একটা ডাল আর সবজি—এটুকু করলেই যথেষ্ট—এমন বলেছিলেন বাপু।' এসব দেখতে দেখতে তিনি নিজের মতো করে গড়গড়িয়ে সব বলে যেতে লাগলেন অমলকে।

'সুভাষচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র বিষয়ে আপনার মতামত?' অমল তার ছোট্ট পকেট টেপ রেকর্ডার আরও খানিকটা এগিয়ে ধরল তাঁর মুখের সামনে।

'সুভাষচন্দ্রকে আমরা সবাই শ্রদ্ধা করতাম। ওঁর পথের সঙ্গে মহাত্মার রাস্তার ফারাক ছিল। কিন্তু আমরা সুভাষকে শ্রদ্ধা করতাম। আমাদের পুরুলিয়ার বাড়িতে বোমা-পিস্তলে বিশ্বাস করা বিপ্লবীরা এসে গোপনে থাকতেন। বাবা তাঁদের আশ্রয় দিতেন দিনের পর দিন। যদিও বাবা গান্ধীবাদী কংগ্রেস কর্মী; চরকা কাটেন। আইন অমান্য করে জেলে যান। কিন্তু তিনি বলতেন, মতের ফারাক আমাদের হতেই পারে। লক্ষ্য কিন্তু এক। 'স্বদেশি' ভাবনা এমনই ছিল তখন। সবার আগে দেশকে স্বাধীন করতে হবে। আনতে হবে স্বরাজ। তারপর অন্য কথা।'

বলতে বলতে চেয়ারে বসা তিনি যেন কেমন হয়ে যাচ্ছিলেন। দৃষ্টি কোন সুদূরে। চোখ দিয়ে ইশারা করলেন গীতা মাসি। অমল বুঝতে পারল গীতামাসি তাঁকে দিয়ে আর কথা বলাতে বারণ করছেন।

'আসলে জানো তো? গান্ধীজি হিন্দ স্বরাজে বিশ্বাস করতেন।'

অমলের টেপ রেকর্ডারের ভেতর ব্যাটারিতে ঘোরা ক্যাসেটে গীতা মাসির গলা জড়িয়ে

যাচ্ছে।

'তিনি বলেছিলেন.... আমরা ইংরেজদের বাদ দিয়ে ইংরেজ শাসন চাই।'

আপনি বাঘের স্বভাবটা চান। বাঘ কে নয়....? গান্ধীজির লেখা একটি ছোট পুস্তিকা আছে, "গঠনকর্ম ও তার অর্থ ও স্থান"। তাতে গান্ধীজি পরিষ্কার বলে গেছেন গঠনকর্ম আসলে কেমন হবে। বাহান্ন বছর ধরে উনি এই আশ্রমে সেই আদর্শই পালন করছেন। সেই ১৯৪৮-এ গান্ধীজির মৃত্যুর পর থেকে। তখন তো পৃথিবী অন্যরকম ছিল। কিছু ছিল না এখানে। শুধু ফাঁকা ফাঁকা টাঁড় জমি।

গীতা মাসির গলা টেপের ফিতেয় বসে যাচ্ছে। অমল বিশ্বাস একটু একটু করে ধরতে চাইছে ফেলে আসা সময়কে। বাবার নিজের হাতে লাগানো অর্জুন গাছ আদর করতে করতে গৈরিক অল্প দূরে সিমেন্ট বাঁদান ইঁদারার পাড়ে টুলকি তিতলি স্বপ্ন কাহিনি আকাশ পার্থদের দেখতে পেল।

শেষ শরতের রোদ চলে আসছে।

'বাবা কত কী করেছিলেন এই আশ্রমের জন্যে। সিমেন্ট বাঁধানো ছোট পুকুরের ভেতর পদ্ম ফুল। খুব গাছ ভালোবাসতেন বাবা। পাখি, সবুজ, জীবজন্তু। আমাদের পোষা কুকুর, পাখিদের সঙ্গে তিনি কথা বলতেন। তাদের ভাষা বুঝতেন।'— এসব ভাবতে ভাবতে গৈরিকের ভেতরটা কেমন যেন মেঘল হয়ে গেল। গৈরিক চোখ না বুজেই দেখতে পেল খুব শীত পড়া সকালে হাঁটু অব্দি চকোলেট রঙের অলেস্টার গায়ে তারা মাঠ ভাঙছে। দু-পাশে আমরা দু-ভাই। মাঝখানে আমাদের বাবা অখিল গাঙ্গুলি। সকলের গুণ্ডাদা। পিসিমার ভালবাসার গুণ্ডা।

শিশির কী মনে হতেই হঠাৎ 'স্বপ্ন স্বপ্ন' বলে দুবার ডেকে উঠল।

অর্চনা বলল, 'থাক না ওরা। কাছেই আছে। খেলছে।'

'ফিরতে হবে তো। রাস্তা তো কম নয়।'

'হ্যাঁ, পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার। সন্ধের আগেই ঢুকে যাব। জানেন শিশিরদা, বাবা আমাদের নিয়ে যখন বেরোতেন, এইখানে বা বলরামপুরের রাস্তায়, তখন তাঁর হাতে অবধারিত একটি বাঁশের বড় লাঠি থাকত। বুনো শুয়োর, শেয়াল, মাতাল সামলাতে হলে তো কথাই নেই। ডাং হাতে চলেছেন বাবা। সঙ্গে আমরা।'

'লাঠিকে তুমি যেন কী একটা বললে গৈরিক?' শিশির জানতে চাইল।

'ডাং। ডাং বলি শিশিরদা। ডাং টো আইজ্ঞা। আপনার মনে নেই শিশিরদা, গেল মঙ্গলবার আমরা যখন বলরামপুর হেঁটে যাচ্ছি, তখন হ্যান্ডলুম পাঞ্জাবি আর জিন্স পরা অমলদাকে দেখে একজন স্থানীয় মানুষ অমলদাকে বার বার বলেছিল, দরখাস্ত লিখ্যা দ্যান আইজ্ঞা। ঠাকুর, দরখাস্ত লিখ্যা দ্যান।'

'খুব খেয়েছিল গৈরিক। পা টলছিল।'

'তা তো খেয়েইছে। মহুয়া নয়ত হাঁড়িয়া। না খেলে খাটবে কী করে বলুন। আর ওর সম্পত্তি বলতে তো হাতের ওই কুড়ুলখানা। খালি পা অমলদাকে দেখে মানিগন্যি কেউকেটো ভেবেছে। দরখাস্ত লিখে দিতে হবে লোকাল থানায়, যাতে ও বাড়িতে বুনো শুয়োর পালার

অনুমতি পায়। বাচ্চা দেবে বন বরা। থাকবে। এ নিয়ে লোকাল থানা ঝামেলা করছে হয়তো। তাই—'

'সত্যি গৈরিক। আমাদের সবাইকে ছেড়ে অমলদাকেই ধরল।'

'আরে অমলদাকেই তো বলবে দরখাস্ত লিখতে। থুতনিতে কেয়ারি করা দাড়ি। চকচকে গাল। ঠিক লোককেই ধরেছে। ভেবেছে মাতব্বর। কই, আপনাকে আমাকে তো ধরল না।'

সিমেন্ট বাঁধানো ইঁদারার পাড়ে একা একা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে দেবু। একা থাকলে সিগারেট বাড়ে। আকাশে বালতি বালতি লাল রঙ ঢেলে দিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তার মানে একটা দিন চলে গেল। নিশ্চিন্ত। আর একটা দিন কম বাঁচতে হবে। পিঠের ব্যথা, ঘাড়, কোমর, পায়ের ব্যথা নিয়ে ভুগতে হবে কম। এজেন্সির ব্যাপারে অ্যাড্ ক্যামপেইনের লে-আউট ভাবনা কমে গেল একদিন। এমন নিশ্চিন্ত জীবন। যদি রোজ আসত। ভাবতে ভাবতে বড় করে শ্বাস পড়ল দেবুর।

'বলরামপুরে আপনাদের বাড়িতে বেস ক্যাম্প করে কয়েকদিন এখানে এসে থাকলে বেশ হয় না?' পার্থ তার এসেলার ক্যামেরা ফোকাস করতে করেত কথাটা বাড়িয়ে দিল গৈরিকের দিকে।

'এখানে থাকলে আশ্রমিকদের সঙ্গে খেতে হবে। ওঁরা যা খাবেন তাই। কোনও চয়েস নেই।'

'তাই খাব। এক্স মাসের ছুটিতে দিন সাতেকের জন্যে'—পার্থ মনে মনে তার স্কুল ছুটির হিসেব করে নিল।

'হতে পারে। সব যদি গুছিয়ে তোলা যায়।' —বলতে বলতে গৈরিক আবার তাকাল অর্জুন গাছের দিকে।

'তখন তো আপনাদের স্কুলও ছুটি?' পার্থ জানতে চাইল।

'হ্যাঁ। তবে মুশকিল হচ্ছে অমলদা আর দেবুদার ছুটি পাওয়া। শিশিরদারও স্টেশনারি দোকান অতদিন বন্ধ করা যাবে না। আর স্কুল ছুটি থাকলেও আমার গুচ্ছের কাজ থাকে অ্যাডমিনিসট্রেশনের। দ্যাখা যাক তবুও। যদি আবার হয়।'

'আমারও অবশ্য কোচিং আছে। কিন্তু সে নয় ম্যানেজ করা যাবে।'—বলে চুপ করে রইল পার্থ। ইঁদারার জলে এইমাত্র রোদ মুছে গেল।

অনেকটা ঝুঁকে সেদিকে তাকিয়ে বুকের ভেতর শিরশির করে উঠল দেবুর। জল এত কালো হয়! এত কালো!!

ইঁদারার কালো জল দেবুকে ডাকছে। জলের রং কালোই শুধু। আর কোনও ভ্যারাইটি নেই। স্থির কালো জল। দেবু চশমা খুলে বুকপকেটে রাখল। তারপর আরও খানিকটা ঝুঁকে জল দেখতে দেখতে ভাবল এই আকাশ আর ইঁদারার ব্যাকগ্রাউন্ডে তোলা টুলকি-তিতলিদের ছবি নিয়ে যদি কোনও ক্যামপেইন—পার্থ কি সেভাবে তুলতে পেরেছে ছবি। প্রিন্ট না নিলে কিছুই বোঝা যাবে না।

কুয়োর গভীর থেকে কালো জল জিভ ভেঙিয়ে উঠল দেবুকে।

দুর্নীতি

নজরুল ইসলাম

সি বি আইয়ের 'অ্যান্টি করাপশান সেল'-এর এস পি বকুল বিশ্বাস উদ্‌বিগ্ন হয়ে অপেক্ষা করছিল। ডি এস পি বাঁধন চক্রবর্তী ফোন করে জানাল, 'স্যার, ট্র্যাপ সেন্ট পার্সেন্ট সাকসেসফুল হয়েছে। চেম্বারে এখন সিজার চলছে। আমরা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে অফিসে পৌঁছে যাব।'

ফোন রেখে সে ভাবার চেষ্টা করছিল, 'সেন্ট পার্সেন্ট সাকসেসফুল। চেম্বারে সিজার চলছে।' তার মানে কথা মতো চেম্বারে গিয়েই ঘুষ নিচ্ছিল। ভয়ডরের কোনও বালাই-ই নেই। দুষ্কর্ম করার সাহস আছে বলতে হবে। বকুল ভেবে পায় না, এত সাহস কী করে হয়?

পরশুদিন বিকেলবেলায় সে দর্শনপ্রার্থীদের স্লিপগুলো দেখছিল। হঠাৎ দেখল, একটা স্লিপে 'প্রফেসার ডাঃ অমিত চ্যাটার্জি লেখা। কদিন আগে তার বাল্যবন্ধু দেশের বাড়ি থেকে ফোন করেছিল, তার ছোট বোনটার কঠিন ব্যাধি হয়েছে। জেলা শহরের ডাক্তার কলকাতার হাসপাতালের ডাঃ অমিত চ্যাটার্জিকে দেখাতে বলেছেন। দু-তিন মাসের আগে তাঁর 'ডেট' পাওয়া যায় না। বকুল যদি তাঁকে একবার ফোন করে দেয়, তা হলে আগে পেতে পারে। বাল্যবন্ধুর মুখের ওপর না বলতে পারেনি। আবার অনুরোধ করতে তার ভালও লাগে না। কাজেই ফোন করবে করবে করেও করা হয়নি। করবে ভাবছিল। সেই চিকিৎসক নিজে থেকে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সে সবার আগে তাকে ডেকে পাঠাল।

চিকিৎসক এসে সামনের চেয়ারে বসে বলল, 'স্যার, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়নি। তবে আপনাদের অনেকের সঙ্গেই আমার আলাপ আছে।'

বকুল বলল, 'আপনি নামকরা চিকিৎসক। সেটা খুবই স্বাভাবিক।'

'আপনাদের চক্রবর্তী সাহেব? আমাকে খুব ভালবাসেন। তারপর আপনাদের ডি জি? ওঁর স্ত্রী আমার পেশেন্ট তো।'

'আচ্ছা, আচ্ছা।'

'ওই যে আপনাদের খগেন বিশ্বাস, আমার ভাইয়ের বন্ধু তো !...'

ইনিয়ে-বিনিয়ে কার কার সঙ্গে পরিচয় আছে তা শুনতে বকুলের ভাল লাগছিল না। এ

রকম বিভিন্ন লোকের সঙ্গে তার সম্পর্ক জাহির করে যারা 'ইম্প্রেস' করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্যে প্রায় সময়ই ভাল হয় না। বকুল বলল, 'আমি আপনার জন্য কী করতে পারি, বলুন?'

'আপনার মতো সৎ লোকই বদমাশকে শায়েস্তা করতে পারেন। সৎ লোক তো আর বেশি নেই।'

'কেন? আপনি যাদের নাম বললেন, তারা কি অসৎ লোক?'

'সে তো আপনি আমার থেকে ভাল জানেন।'

'আপনার সঙ্গে সুসম্পর্ক, আপনারাও অজানা থাকার কথা নয়। যাক সে কথা, আপনার সমস্যাটা কী বলুন।'

'ইনকাম ট্যাক্সের ইনস্পেক্টার ঘুষ চাচ্ছে। আমি চাই, তাকে হাতেনাতে ধরা হোক।'

'তা আপনার ছোট ভাইয়ের বন্ধু, খগেন বিশ্বাস তো এখন রাজধানীর পুলিসে আছে। তাকে বললেই তো হয়ে যেত।'

'গিয়েছিলাম। কিন্তু, সে বলল, ' ইনকাম ট্যাক্স ইনস্পেক্টার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টাফ। আমরা কী করে ধরব? সি বি আইয়ের কাছে যেতে হবে। সে-ই আপনার কাছে আসতে বলল।' বলল, 'খুব কড়া অফিসার। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশান হয়ে যাবে। সেই জন্যই ভরসা করে এলাম।'

বকুল প্রিভেনশন অফ করাপশান অ্যাক্টটা নিয়ে আরেকবার দেখে নিল। না, কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসার ঘুষ নিলে, রাজ্যের পুলিশ তাকে ধরতে পারবে না,— এ রকম কোনও বাধানিষেধ সেখানে নেই। শুধু এইটুকু বলা হয়েছে যে, এ আইনের কোনও ধারায় মামলা তদন্ত করার জন্য একজন অফিসারকে ন্যূনপক্ষে ডি এস পি/এ সি পি পদমর্যাদার হতে হবে। সি বি আই-এর ক্ষেত্রে ন্যূনপক্ষে ইনস্পেক্টার হলেই হবে। সে বলল, 'না আইনে তো সে রকম কিছু নেই যে, রাজ্যের পুলিশ ধরতে পারবে না।'

'তা হলে হয়তো এড়িয়ে যেতে চাইছেন। কিন্তু আপনারাও তো করতে পারেন। ইনকাম ট্যাক্স ইনস্পেক্টার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি হওয়ায় আপনারাও অ্যারেস্ট করে কেস করতে পারেন।'

'পারি।'

'তা হলে, আপনারা একটু তদন্ত করে দেখেন না।'

বকুল এ আবেদন অস্বীকার করতে পারল না। বলল, 'বলুন।'

অমিত বলল, 'কী বলব , বলুন?'

'আপনার কাছে টাকা কীভাবে চাইছে?'

'আমি তো চিকিৎসা নিয়েই থাকি। আমার হিসেবটা আমার সি এ জমা দেয়। তাকে বলেছে, আমরা তো পেয়ে থাকি। আর সবাই যেমন দেয়, ডাক্তারবাবুকেও পঞ্চাশ হাজার দিতে হবে। না হলে খুঁত বের করে নোটিশ পাঠাব, এনকোয়ারি হবে। তারও বেশি খরচ হয়ে যাবে। মানসিক অশান্তিও হবে।'

সঙ্গে সঙ্গে বকুলের একটা ঘটনার কথা মনে পড়েছিল। সে তার নিজের আয়করের ফর্ম

নিজে পূরণ করে জমা দেয়। স্বাভাবিকভাবে গরমিল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবুও গতবছর সে একটা নোটিস পেল। আয়করের রিটার্নটা আরেকবার দেখে নিয়ে, অফিসের কাজের ফাঁকে নিজেই আয়কর অফিসে গেল। দেখল, তার অনার্সের সহপাঠী রবিন তার সার্কেলের আয়কর অফিসার। রবীন খুব হালকাভাবে বলল, 'তুই অনেক টাকার এন এস সি দেখিয়েছিস। ওরা বুঝতে পারছে না তুই এন এস সি-র ইন্টারেস্টটা যোগ করেছিস কি না।' বকুল সন্তুষ্ট হতে পারেনি । বলেছিল, 'তার জন্য ডেকে পাঠাতে হবে? চিঠিতে ওটা পরিষ্কারভাবে জানাতে চাইলেই তো পারতিস। আমি জানিয়ে দিতাম।' রবিন বলল, 'আবার কী একটা প্রশ্ন উঠত, আবার চিঠি লিখতে হত। তার থেকে চলে এসেছিস। কথাবার্তায় সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। তোর সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল। এমনি ডাকলে তো আসতিস না।' কথাটা রবিন হাসতে হাসতেই বলেছিল। কিন্তু বকুলের ভাল লাগেনি। মনে হয়েছিল, রবিন যেন তার ক্ষমতা দেখানোর জন্যই একটা ছুতো তুলে তাকে ডেকে পাঠিয়েছে। তারও থেকেও আরও খারাপ লেগেছিল যখন রবিনের অফিস থেকে বের হতেই গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা পিওন পিছন পিছন এসে, হাত পেতে বলেছিল, 'সাব বখশিশ'। বকুলের মাথায় জ্বালা ধরে গিয়েছিল। কারণ সে ইউনিফর্ম পরে ছিল। তা থেকে পিওন অবশ্যই বুঝতে পেরে থাকবে যে, সে পুলিশের লোক, যাদের কাজ দুর্নীতি বন্ধ করা এবং কেউ দুর্নীতি করলে তাদের ধরা। অবস্থা এত খারাপ হয়েছে যে, তাদের কাছেও লোক ঘুষ চাইতে পারে। সেটাকে কোনও অন্যায় কাজ মনে করে না। বলেছিল, 'সরকারি কাজ করেন। সরকারি ইউনিফর্ম পরে পথের ভিখারির মতো হাত পাততে লজ্জা লাগে না।' তাতে সে বিন্দুমাত্র না দমে বলেছিল, 'কী করব স্যার, ঘরের ভিতর আপনারা যে টাকা দেন, তার তো আমি হিস্‌সা পাই না। আর হাত না পাতলে কেউ দেয়ও না।' অর্থাৎ ভিতরে যেমন ঘুষ দেন, বাইরেও কিছু দিতে হবে। বকুল বলেছিল, 'আমার পোশাক দেখে অন্তত মনে হচ্ছে যে, আমি পুলিসে কাজ করি। আমার কাজ কেউ ঘুষ চাইলে তাকে হাজতে ঢোকানো। চলুন আপনাকেও ঢোকাতে হবে।' এবার সে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'মাফ্ কর দিজিয়ে সাব। মুঝে বখশিশ নেহি চাহিয়ে।' —তার এ রকম কাকুতি মিনতি শুনে লোক জমে গিয়েছিল। রবিনও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছিল। বকুল চলে এসেছিল। কিন্তু তার অত্যন্ত খারাপ লেগেছিল। মনে হয়েছিল এ কোন অবস্থার মধ্যে তারা বাস করছে, সৎভাবে বাঁচতে পারবে না। অফিসে ফিরেও সে অনেকক্ষণ কাজ করতে পারেনি। কদিন আগেই আরেকটা ঘটনা ঘটেছে। সে তার বাড়ির নকশা কর্পোরেশনে জমা দিয়েছে। সে অন্য পথে না গিয়ে নিজে কর্পোরেশনের অফিসে গিয়ে কথা বলে, কী কী করতে হবে সেটা জেনে তার নিযুক্ত আর্কিটেক্টকে নিয়ে গিয়ে কথা বলিয়ে দিয়েছে। তারপরের যখন কাল সেই আর্কিটেক্টের লোক নকশাটা অফিসে জমা দিতে গিয়েছে, তখন অফিসের লোক সেটা জমা নিয়ে একজন মহিলা কর্মচারীকে দেখিয়ে বলেছে, 'ইনি আমাদের ফাইলটা রোডসের অফিসে নিয়ে যাবেন।' সেই মহিলা কর্মচারী তাকে সকলের সামনেই বলেছে , 'আমি তো বাসে করে যাব, বাসভাড়াটা দিয়ে যান।' আর্কিটেক্টের লোক তাকে যা বলেছে, সে এটা স্বাভাবিক নিয়ম ভেবে জিজ্ঞেস করেছে, 'কত?' মহিলা কর্মচারী উত্তর দিয়েছে, 'পঞ্চাশ

টাকা।' সে পঞ্চাশ টাকা সেই মহিলা কর্মচারীকে দিয়ে এসেছে। বকুল জিজ্ঞেস করেছিল, 'ওই টাকার জন্য কোনও রসিদ দিয়েছে?' আর্কিটেক্ট উত্তর দিয়েছিল, 'না'। বকুল বুঝতে পেরেছে, ওটা ঘুষ। অর্থাৎ সে ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার ঘোর বিরোধী হলেও তার কাজ করতে গিয়ে আর্কিটেক্ট অফিসের লোককে ঘুষ দিতে হয়েছে। তার কাজ জেনেও কর্পোরেশনের লোক তার কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছে। অবস্থা এতটাই খারাপ হয়েছে। সৎভাবে বাঁচতে চাওয়া এতটাই কষ্টকর হয়ে উঠেছে। বকুলের খুবই খারাপ লেগেছে। আর্কিটেক্টকে বলেছে, 'ওই লোককে আমার কাজ দিয়ে আর পাঠাবেন না। আর সোজাসুজি কাজ করতে আপনাদের অসুবিধে হলে বলুন, আমি নিজে আবার যাব।' আর্কিটেক্ট তার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছে। কিন্তু তাতে তার মনের ক্ষোভ দূর হয়নি। চিকিৎসকের কথাটা তাই তাকে স্পর্শ করে গেল।

অমিত বলল, 'কিন্তু আমি এভাবে ঘুষ দেওয়ার ঘোর বিরোধী। এ অন্যায়ের একটা বিহিত হওয়া দরকার। সেই জন্য আপনার কাছে এসেছি।'

বকুলের খুব ভাল লাগল। যাক, অন্তত কিছু লোক আছে, যারা তার মতো ঘুষ দেওয়া-নেওয়ার বিরুদ্ধে। এ রকম লোককে সে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। বলল, 'ইনকাম ট্যাক্সের যে ইন্সপেক্টার ঘুষ চাচ্ছে, তার যাতে সাজা হয়, আমি নিশ্চয় সে চেষ্টা করব। কিন্তু সাজা দিতে গেলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হতে হবে। তার জন্য তাকে হাতেনাতে ধরতে হবে।'

'আপনি লোক দিলেই আমি হাতেনাতে ধরিয়ে দিতে পারব।'

'কবে, কখন, কোথায় লোক দেব? সব সময় তো আপনার কাছে লোক দেওয়া যাবে না। আর দেওয়া গেলেও তা গোপন থাকবে না। তার জন্য সুবিধামতো একটা জায়গায় টাকা নিতে আসার সময় ঠিক করতে হবে।' 'সুবিধাজনক জায়গা বলতে আপনি কী বলছেন?'

'যেখানে তাকে ধরার জন্য আমাদের লোকের আত্মগোপন করে থাকতে সুবিধা হবে, এবং টাকা দেওয়া-নেওয়া সম্পূর্ণ হওয়ার সিগন্যাল দিলেই তারা সঙ্গে সঙ্গে পাকড়াও করতে পারবে।'

'সিগন্যাল মানে?'

'সিগন্যাল না দিলে, ওত পেতে থাকা আমাদের লোকেরা এবং নিরপেক্ষ সাক্ষীরা বুঝবে কী করে যে, টাকা লেনদেন হয়েছে। ওরা তো আপনার সঙ্গে থাকতে পারবে না। আপনার সঙ্গে লোক থাকলে সে ঘুষ নাও নিতে পারে।'

'তা ঠিক। তা হলে কোথায় আপনার লোকদের আত্মগোপন করে থাকতে সুবিধা হবে?'

'আপনার চেম্বারে হলে সব থেকে ভাল হয়। রোগী হয়ে খুব সহজেই থেকে যেতে পারে। পি জি হাসপাতালেও হতে পারে। না রাজি হলে কোনও পার্কে বা রেল স্টেশনে বা বাস স্টপের কাছে, যেখানে কয়েকজন লোক থেকে গেলে কারও চোখে পড়বে না। কিন্তু কোনও অবস্থাতেই ওর বাড়িতে বা অফিসে রাজি হবেন না। ও অন্য কোথাও কোনও মতে রাজি না হলে তবে অফিসে বা বাড়িতে রাজি হবেন। বাড়িতে সব শেষে।'

'তা হলে, আমাকে এখন কী করতে হবে?'

'আপনাকে প্রথমে গিয়ে ইন্সপেক্টার ঘুষটা কবে, কখন কোথায় নিতে আসছে সেটা ঠিক করে ফেলতে হবে এবং ঠিক হলেই আমাদের কাছে এসে একটা লিখিত অভিযোগ করতে হবে। অভিযোগ পেলেই আমি আমার লোকদের দিয়ে ট্র্যাপ করে হাতেনাতে ধরব। সময়টা রাতে না হয়ে দিনের বেলায় হলেই সুবিধে হয়।'

পরের দিন সকালেই অমিত চ্যাট্যার্জি তার সি এ স্বপন সমাদ্দারকে নিয়ে এল। স্বপন বলল, 'স্যার, কাল সকালে ডাক্তারবাবুরা চেম্বারে এসেই টাকা নিতে রাজি হয়েছে।'

বকুল জানতে চাইল, 'ইন্সপেক্টরের নাম কী?'

'তপন টিকাদার স্যার।'

'দেখতে কেমন? কোনও ছবি আছে?'

'না স্যার। তবে, আমি দেখিয়ে দিতে পারব।'

'তাতে সন্দেহ করতে পারে। ট্র্যাপ সাকসেসফুল নাও হতে পারে। তার থেকে যারা ট্র্যাপ করতে যাবে তারা বরং আপনার কোনও সিগন্যাল থেকে বুঝে নেবে।'

বকুল বেল বাজিয়ে ইন্সপেক্টার চাণক্য দত্তকে ডেকে পাঠাল। চাণক্য এল। পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে 'কেস স্টার্ট' করার জন্য অমিত এবং স্বপনকে তার সঙ্গে দিয়ে দিল। বলল, 'ট্র্যাপ করার জন্য কাকে কাকে সঙ্গে নেবেন, সাক্ষী কাদের রাখবেন, তা আপনিই ঠিক করবেন। আমি শুধু আপনাদের ট্র্যাপের অপারেশনের আগে ডি এস পি বাঁধন চক্রবর্তী এসে গেলে কেসটা দেখতে বলব।'

চাণক্য বলল, 'স্যার, সেটা আপনার ইচ্ছে। তবে কাউকে দেখতে না বললেও আমি কেসটা ঠিকভাবে হ্যান্ডল করতে পারব।'

'গুড। দ্যাট শুড বি দ্য স্পিরিট। উইশ ইউ বেস্ট অফ লাক।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।'

তার তন্ময়তা ভঙ্গ করে, দরজা ঠেলে চাণক্য চেম্বারে ঢুকল।

বকুল তাকে অভিনন্দন জানাল, 'কনগ্র্যাচুলেশন অন দি সাকসেসফুল ট্র্যাপ।'

'থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।' চাণক্য সাবধান হয়ে বকুলকে অভিবাদন করে সামনের চেয়ারে বসল।

বকুল জানতে চাইল, 'কী করে করলেন?'

'আমাদের প্রায় কিছুই করতে হয়নি স্যার। একদম কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। এসে চেম্বারে ঢুকে টাকার বান্ডিল নিয়ে কোটের পকেটে ঢুকিয়েছে। আমরা তো চেম্বার খোলার সময় থেকেই বসেছিলাম। খানিক পরে সি এ খবর দিল, আসছে। একজন ধূসর স্যুট পরা লোক আসতেই আমাদের ব্রিফিং মতো সি এ এসে তার সঙ্গে কথা বলে শার্টের পকেট থেকে পেনটা তুলে প্যান্টের পকেটে রাখল। আমরা বুঝলাম, স্যুট পরা লোকটাই ইনকাম ট্যাক্স ইনস্পেক্টার তপন টিকাদার। সি এ ভেতরে গেল। ভেতরের রোগীটি বেরিয়ে আসতেই সি এ তপনকে ভেতরে নিয়ে গেল । আমার একটু আশঙ্কা হচ্ছিল, ভেতরে আবার কোনও রকম গোলমাল করে না ফেলে। কিন্তু মিনিট খানেকের মধ্যেই সি এ দরজার

বাইরে এসে মাথায় চিরুনি দিল। আমরা সঙ্গে সঙ্গে বাজপাখির মতো গিয়ে টিকাদারকে ধরে বললাম, আপনি ঘুষ নিয়ছেন। ভয় পেয়ে থতমত খেয়ে গিয়েছিল। আমি অপেক্ষা না করে, সময় নষ্ট না করে একটা গ্লাসে সোডিয়াম কার্বোনেটের দ্রবণ ঢেলে ওর ডান হাতটা নিয়ে ডুবিয়ে দিলাম। টাকার গায়ে লাগানো ফেনোফথ্যালিন দ্রবণে মিশে গোলাপি হয়ে গেল।'

বকুলের মনে হল, এই হাতে রং হয়ে যাওয়ার জন্যই কি হাতেনাতের ইংরেজি ও হিন্দি 'রেড হ্যান্ডেড' ও 'রাঙা হাত' হয়েছে?

চাণক্য বলে চলল, 'সেই দ্রবণ আবার একটা বোতলে নিয়ে সাক্ষীদের সইসাবুদ করলাম। সাক্ষীদের সামনেই পকেট সার্চ করে পঞ্চাশ হাজার টাকা বের করে সিজ করা হল। একদম ফুলপ্রুফ অপারেশন হয়েছে স্যার। কনভিকশন হয়ে যাবে স্যার। কেউ আটকাতে পারবে না।'

'এদের হওয়াই উচিত। সে মক্কেল কোথায়? এমন মহাপুরুষের মুখটা না দেখা ঠিক হবে না।'

'আমার ঘরেই আছে স্যার। এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

কনস্টেবল সুজয় চক্রবর্তী ও রকিব আলি আসামিকে তার ঘরে নিয়ে এল। লম্বা-চওড়া চেহারা। পরনে দামি স্যুট। মুখে বাঘের মুখে হরিণের মতো অসহায়তার চিহ্ন।

বকুল চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন।'

তপন বসল না। ঘাড় নেড়ে বোধহয় বলতে চাইল, দাঁড়ানোই ঠিক আছে।

বকুল বলল, 'চাকরি কতদিনের ?'

'দশ বছর স্যার। এই বছরের শেষের দিকে আই টি ও হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু....'

'হ্যাঁ, আমাদের লে করা ট্রাপে যখন ধরা পড়েছেন তখন আপনার আর আই টি ও হওয়া হবে না। অবধারিত সাজা হবে। আর সাজা হলে আপনাদের ওপরওয়ালার কিছু করার থাকবে না। হয় তো আপনার চাকরিটাই চলে যাবে।'

'স্যার, তা হলে আমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে সব না খেয়ে মরে যাবে স্যার।'

'সেটা ঘুষ চাওয়ার আগে মনে রাখা দরকার ছিল।'

'স্যার, আমি ধরা পড়ে গেছি। আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু বিশ্বাস করুন স্যার। আমি কোনও সৎ লোককে তাক করি না স্যার। ডাক্তারবাবু সৎ লোক না স্যার।' 'ডাক্তারবাবু স্যার একসঙ্গে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার —দুই সরকারের সঙ্গে চিটিংবাজি করেন।'

'কী করে?'

'স্যার ডাক্তারবাবু নন-প্র্যাকটিস পোস্টে চাকরি করেন। প্র্যাকটিস না করার জন্য নন প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স নেন। আবার কলেজ-হাসপাতালের কাজে ফাঁকি দিয়ে দু-বেলা চেম্বার খুলে প্রকাশ্যে প্র্যাকটিস করেন। আবার এইভাবে প্র্যাকটিস করে তিনি বছরে অন্তত তিরিশ-চল্লিশ লাখ টাকা রোজগার করেন। তার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের দশ-বারো লাখ টাকার

ইনকাম ট্যাক্স পাওনা হয়। উনি এক পয়সা ডিক্লেয়ার করেন না। শুধুমাত্র বেতনের টাকা দেখিয়ে ক-হাজার টাকা মাত্র ইনকাম ট্যাক্স দেন।'

চিকিৎসকের সম্বন্ধে বকুলের ধারণা খারাপ হয়ে গেল। তবে তপনের ব্যাপারেও ধারণা ভাল হল না। জিজ্ঞেস করল, 'ডাক্তারবাবু যে অত টাকা রোজগার করেন, আপনার কাছে তার কোনও প্রমাণ আছে?'

'আছে স্যার।'

'কী রকম ?'

'আমি কয়েকজন পেশেন্টকে পাঠিয়ে প্রেসক্রিপশন এবং টাকার রসিদ করে নিয়েছি।'

বকুল বুঝল, অন্যায় করে করে এদের বুকের পাটা এত বেড়ে গেছে যে, এরা অন্যায় কাজও খুব খোলামেলাভাবে করতে কোনও রকম ভয় পায় না। তার খুবই খারাপ লাগল। বলল, 'বুঝলাম, ডাক্তারবাবু কয়েক লাখ টাকার ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছেন। কিন্তু সেটা তো আপনার মতো লোকেদের জন্যও দিতে পারছেন।'

'কেন স্যার?'

'কারণ ডাক্তারবাবু ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছেন সেটা আপনি ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু ট্যাক্সটা যাতে আদায় হয়, তার কোনও চেষ্টা করেননি। যাতে আপনাকে সামান্য ক-টাকা ঘুষ দিয়ে তিনি এ রকম ফাঁকি দিয়ে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করছিলেন। নিজে ঘুষ খাচ্ছিলেন।' তপন এ কথার কোনও উত্তর দিল না।

বকুল বলল, 'যে নিজে ঘুষ খাওয়ার মতো অন্যায় করে, তার মুখে অন্যের অন্যায়ের কথা মানায় না ।'

পি বি এক্সের ফোনটা বেজে উঠল। বকুল ধরতে অপারেটর বলল, 'স্যার, সমর রায় বলে এক ভদ্রলোক আপনাকে চাইছেন।' বকুলের মনে পড়ল, সমর তার ব্যাচমেট। ইনকাম ট্যাক্স অফিসার থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার হয়েছে। এখন এখানেই এই শহরেই পোস্টেড আছে। অ্যাপারেটর বলল, 'দিলাম স্যার।'

সমর বলল, 'কেমন আছিস ?'

'ভাল। তোর খবর কী?'

'ভালই ছিল। তাই খারাপ করে দিলি।'

'কী করে?'

'এই যে ঠিকাদারকে অ্যারেস্ট করেছিস, ও আমার অধীনেই কাজ করে। এখন একশো জায়গায় কৈফিয়ত দিতে হবে। আমার ওপরও অ্যাসপার্সান আসবে।'

'সমর, আই অ্যাম রিয়েলি সরি ফর দ্যাট। কিন্তু আমার কিছু করার ছিল না।'

'যার কথা শুনে তুই ওকে ধরেছিস, সেও কিন্তু লোক ভাল নয়।'

'মানলাম, সেও অসৎ লোক। কর ফাঁকি দেয়। তার ফলে কি তোর ইনস্পেক্টারের ঘুষ খাওয়ার অধিকার জন্মায়? তোরা ওকে ধরে ট্যাক্স আদায় করলি না কেন? তা হলে তো কেউ কিছু বলতে পারত না।'

'আমার লোক তো অন্যায় করেছেই। তবে তোর সততাকে অস্ত্র করে ও লোকটা কিন্তু

বেঁচে গেল।'

'বেঁচে যাবে কেন? তোরা ওকে ধরে ট্যাক্স চার্জ করে দে।'

'এখন আমরা কিছু করতে গেলেই, সবাই বলবে, আমাদের লোককে ধরিয়ে দিয়েছে বলে আমরা ওকে ভিন্ডিক্টিভ হয়ে হ্যারাস করছি।'

'হ্যাঁ, তা বলবে।'

'সেই জন্যই বলছিলাম, তোর পক্ষে কিছু করার আছে। ওদের এ্যাসোসিয়েশনের সব লোকেরা দল বেঁধে আমার কাছে এসেছে।'

'এরকমভাবে ধরা পড়ার পর ওরা দল বেঁধে যেতে পারল কেন, আমি জানি না। তুই কেন তার জন্য বলছিস, তাও আমি বুঝতে পারছি না। তবে, কেসটা এত ক্লিয়ার যে, আমার কিছু করার নেই। আমাকে মাফ কর।'

বকুলের ফোন পেয়ে চাণক্য অমিত চ্যাটার্জিকে নিয়ে ঘরে ঢুকে সামনের চেয়ারে বসল।

বকুল অমিতকে সম্বোধন করে বলল, 'মিঃ চ্যাটার্জি, আপনি যে পোস্টে চাকরি করেন, সেটা কি নন-প্র্যাকটিসিং পোস্ট?'

'কেন স্যার?'

'এই মামলায় তো আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে। বিপক্ষের উকিল ক্রস এগজামিন করার সময় ও প্রশ্নটা নিশ্চয় করবেন। আমাদের তার জন্য তৈরি থাকতে হবে।'

অমিত কিছু বলল না।

বকুল বলল, 'আপনি নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স নেন। তারপর প্র্যাকটিস করাটা কি আপনি অন্যায় মনে করেন না?'

'স্যার, আমি তো কারও ক্ষতি করছি না। রোগী দেখে পয়সা নিচ্ছি। আমার কাছে উপকার পায় বলেই লোকেরা আসে।'

'বেশ ভাল সংখ্যাই আসে। তার জন্য বছরে তিরিশ চল্লিশ লাখ টাকা ইনকামও হয়। কিন্তু আপনি সে-ইনকামের জন্য ইনকাম ট্যাক্স দেন না কেন? দিলে কি টিকাদার আপনার কাছে ঘুষ চাইতে পারত ?'

'কিন্তু কী করে ইনকাম ট্যাক্স দেব স্যার। আমি প্র্যাকটিস থেকে ইনকাম ডিক্লেয়ার করলে তা আমি যে প্র্যাকটিস করি তা প্রমাণ হয়ে যাবে।'

'তা হলে প্র্যাকটিসিং পোস্ট নেবেন । না হলে প্র্যাকটিসে যখন এত পয়সা তখন চাকরি ছেড়ে দিয়ে প্র্যাকটিস করবেন।'

'আমি বড় হাসপাতালে পোস্টেড আছি বলেই তো এত রোগী আসে। চাকরি ছেড়ে দিলে, এমনকি অন্য কোথাও পোস্টিং হলেও এত বেশি পেশেন্ট আসবে না।'

'অতএব আপনি নন-প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স নেবেন, প্র্যাকটিস করবেন, লাখ লাখ টাকার ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দেবেন?'

'কিন্তু স্যার; তার জন্য তো কারও কোনও ক্ষতি হচ্ছে না।'

'ক্ষতি হচ্ছে না বলছেন কেন? কলেজের ছাত্ররা আপনাকে পাচ্ছে না। হাসপাতালের রোগীরা আপনাকে পাচ্ছে না। আর আপনি যা করছেন, সেটা আপনি অন্যায়, বেআইনি মনে করেন কি না?'

অমিত কোনও উত্তর দিতে পারল না।

বকুলের ইঙ্গিত পেয়ে চাণক্য তাকে বাইরে নিয়ে গেল। বকুল কম্পিউটারের চিঠি ড্রাফ্‌ট করতে বসল। মামলার বিবরণ দিয়ে ডাইরেক্টরের কাছে লিখল, ইনকাম ট্যাক্স ইনস্পেক্টারের বিরুদ্ধে আমরা মামলা ভালভাবে, পরিচালনা করব, যাতে তার শাস্তি হয়। কিন্তু রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে প্রতারণা করার জন্য চিকিৎসকের বিরুদ্ধে যাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয় তার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে যেন বলা হয়।



জলের উপর ঘর

অনিতা অগ্নিহোত্রী

না ঝুঁকলে নিজেকে দেখা যাবে না। গত রাতের ছেঁড়া ছেঁড়া ঘুমে মাথাটা ভার, উষি না ঝোঁকাই ঠিক করল। নাবাল জমিতে জল জমতে জমতে একটা পুরোদস্তুর ঝিল তৈরি হয়েছে। সকালের আলোয় রোজ মস্ত একটা আয়না উপরি পাওয়া যায়। ঝিলের ধার ঘেঁষে প্রায় জলেরই উপর উষির নতুন ঘর।

হাত-আয়নাও নেই। দেওয়ালমুখো হয়ে টান করে চুল বেঁধে চুলে কাপড়ের ফুল জড়িয়েছে উষি। কপালে সিঁদুর টিপ। সিঁথিতে সিঁদুর। কাজে যদি দেয়, আজই দেবে এসব। ভাগ্যিস, গতকাল সন্ধেবেলা মাথায় তেল হাতটা মাখিয়ে নিতে পেরেছিল। বুড়ো দাদুকে চুল আঁচড়ে দিয়ে তেল মাখিয়ে দিতে হয় বিকেলের পর। সেই সময় আধ-আঁজলা তেল তুললেই কাজ ফতে। বুড়ি দিদার নাক-চোখ দুটোই সাংঘাতিক। উষির মাথা থেকে পাছে গন্ধ তেলের বাস বেরোয়, তাই দূরে দূরে থাকতে হচ্ছিল।

ব্লাউজ, সায়া, দুটোই সাবান কাচা করে রেখেছে পরশুর আগের দিন। সেও ওই একই রাস্তায়। বুড়ো দাদুর কাপড়-গামছা কাচার বেলায় একমুঠো গুঁড়ো সাবান সায়ার ভাঁজে, ব্লাউজের ভিতর মাখিয়ে রাখা। তারপর ঘরে ফিরে পরনের কাপড় জলে ডোবালেই ফেনা। এইভাবে রোজ দু-কূল সামলাতে হয় উষিকে। বেরোনোর মুখে বিড়বিড় করে তার ঠোঁট; 'মা মঙ্গলচণ্ডী, মা কালীঘাটের কালী, দোষ নিও না মা।'

'কোথায় যাচ্ছ মা? ডিউটি যাবে না আজ?' আর, আজই মেয়েটা উঠে পড়েছে আগে আগে। ওর কোলের দুটো এখনও ঘুমে ন্যাতা। উষির গায়ে সারারাতই আধো ঘুম জাগায় কাটিয়ে দেয়। টাকা ছিল না, মাটি ফেলতে পারেনি, উঠোনটা মাটির উপরে, আর ঘরখানা জলের উপর। বাঁশের চ্যাচারির উপর খড়, পাট, হাবিজাবি দিয়ে মেঝে বানানো হয়েছে। একোনা-ওকোনা দিয়ে জল দেখা যায়। দিনের বেলা কিছু মনে হয় না। কিন্তু রাত্রেই গা ছমছম করে উষির। যদি খুব ঝড়-জল হয়, যদি জলটা মেঝে ফুঁড়ে উঠে বাচ্চাদুটোকে নিয়ে তলিয়ে যায় আবার? ওর মেয়ে বুকুর খুব ঘুম। রাতে গায়ে জল পড়লেও ওঠে না। টানাটানি করে সরাতে হয়। বাচ্চাদুটোর একটার বয়স সাড়ে তিন, আর একটার আট মাস। আঠেরো বছরের বুকু নিজেই একটা খুকি, তার কোলে আবার দুটো!

নিজের কপালে ভাঙল বলে ভাবলাম মেয়েটার সকাল সকাল বিয়ে দিই! তা দেখো, কী হল।

বুড়ি দিদার ছেলে যেদিন বাপ-মাকে দেখতে আসে উষি যতটা পারে কোনায় সেঁধিয়ে থাকে। কে জানে, আবার যদি বকে! 'পনেরো বছরের মেয়ের বিয়ে দিলে। উষা, তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই! এর বছর বছর ছেলেপুলে হলে কী হবে ভেবেছ মেয়েটার?'

একটা নয়, দু-দুটো বাচ্চা। কাজেই, উষি আর মুখ দেখায় কী করে? লুকিয়েই বসে থাকতে হয়। আজ উষি ডিউটি যাবে না।

কাল সন্ধেবেলা মোড়ের বুথ থেকে ফোন করে দিয়েছে বেশ রাগ করেই। 'ছোট নাতনিটার জ্বর গো দিদা, ডাক্তার দেখাতে যাব।' কীভাবে যে মিথ্যেগুলো দরকার মতো জিভের গোড়ায় এসে যায়! মা কালী, অপরাধ নিও না, রোগাভোগা বাচ্চাটাকে সত্যি সত্যিই জ্বর দিও না যেন!

কাউকে কী আর বলা যায় যে, আজ আমার জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া। বাইরে থেকে এসেছে জামাই। উষির বারণ মেয়ের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া। জামাই উষির বাড়ি আসতে পারবে না। মা জানতে পারলে তুলকালাম করবে। ফোনে ফোনে দেখার জায়গা ঠিক করেছে শাশুড়ি-জামাই। বুড়ি দিদা বলে, 'না গো উপবতী, তোমার যে কত ফোন আসে!'

আজ এস্‌পার নয় ওস্‌পার।

ক-দিন ধরেই ভাবছে উষি। এস্‌পার নয় ওস্‌পার। এভাবে চলবে না। হয় তুমি তোমার বউ-মেয়ে নিয়ে নিজের কাছে রাখো, নয় আমাকে সাফ বলে দাও। বলে দাও যে, ওদের খাওয়ানোর মুরোদ নেই, যা করার আপনি করুন। পেটে বাচ্চা দেবে, অথচ ভাত দেবে না, ঘরে নেবে না, এ কেমন জামাই! ট্রেনটা স্টেশন ছাড়িয়ে স্পিড্ নিতেই আকাশের হলুদ-মেশা কালো মেঘের রং, সোঁদা বাতাস, উষির মনটা আরও খারাপ করে দেয়। এস্‌পার-ওস্‌পার করা অত সোজা নয়। মেয়ের বয়স সবে আঠেরো, তার রাস্তা মা হয়ে কী করে বন্ধ করে উষি। মেয়ে পরে তাকে দুষবে না?

নিজের বেলা কিছুই করতে হয়নি উষিকে। লোকটা সেই যে বিয়ের পর কেটে পড়েছিল, দু-বার বাপ হওয়ার জন্যে যা আসা মাঝে। শ্বশুরের জমি ছিল, শাশুড়ির সঙ্গে ধান ভানত উষি, তার একটা শোয়ার খাট ছিল, আর হ্যাঁ, বড় একটা আয়না। আয়না তার বাপের ঘরেও ছিল, তবে এত বড় নয়। আয়না দেখে চুল আঁচড়ানো, সিঁথি কাটা, সিঁদুর দেওয়া, যত্ন করে চোখে কাজল পরা — বেশ ভালো অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল উষির। সেই অভ্যেসেই চলে যাচ্ছে। আজও যেমন আয়না ছাড়াই চুল বেঁধে সেজেগুজে নিল, সিঁদুর পরে। অভ্যাসের হাত কত কিছু করে নেয়। আজ ক-বছর জিভেও কেমন মিথ্যে এসে যায় দরকারে। আপনিই কি আর আসে? গরিবকে মিথ্যে ভগবানই জোগান।

শাশুড়ি বলত, হারু এসেচে, সামনে গিয়ে বস, পাখা কর বউমা। উষি করত। তারপরেও নাকি হেসে গল্প করতে হয়, নানারকম শুধোতে হয়, সে সব উষি করত না। কাঠ বোকা ছিল তো। তার জন্য অবশ্য কোনও লোকসান হয়নি। কারণ, পরে যা জানা গেল, হারুর আর এক পরিবার ছিল বিয়ের আগে থেকেই। উষির শ্বশুর গণেশ মণ্ডল ভারি চটল জানতে

পেরে। উষির ছেলের বয়স এতদিনে দশ, মেয়ের সাত। শেষবার, হারু যখন বছর দুয়েক উধাও, শ্বশুর নিজেই বলেছিল, সব শুনছ তো বউমা, এবার যা ভাল বোঝো কর। মাসের পর মাস আসত না লোকটা, হঠাৎ আট-দশ দিন থেকে হাওয়া। তার থাকা-না থাকায় কিছু আসে যাচ্ছিল না উষির। সে নিজের মতো থাকত, খেত, ধান ভানত, সবজি কুটত, পাঁজা-পাঁজা বাসন মাজত। ছেলে-মেয়েকে খাওয়াত। সিঁদুর-শাঁখা পরত। স্বামী থাকলে পরতে হয়। ছেলে বিয়ে করেছে, সেও তো নতুন খবর নয়। তবু জানার পর শ্বশুর-শাশুড়ি কেমন যেন খেপে উঠল উষির উপর। ভাবখানা, ছেলেই যখন ফিরল না, এ মেয়ে যখন তাকে বাঁধতে পারলই না, তবে একে আমরা খাওয়াই পরাই কেন, সব জানাজানি হতে দাদারা কেমন ধেয়ে এল সন্দেশখালি থেকে, উষির শ্বশুরবাড়িতে হল্লা-গুল্লা করল, তারপর উষি কবে যেন ছেলেমেয়ের হাত ধরে কাজিপাড়ার বস্তিতে গিয়ে উঠল। আয়না ছাড়া একখানা ঘরে উঠোনে, কোনটা যে আগে, কোনটা পরে ভাবতে গিয়ে গুলিয়ে যায় উষির। তার কেবল মনে পড়ে, সবুজ একখান দেওয়ালে বিকেলের রোদ, আর নিজের চুল সিঁথি কেটে আঁচড়ে বাঁধা। নিরেট দেওয়াল নিজের মুখ দেখতে পাওয়ার আরম্ভ সেই থেকেই।

ট্রেন একটা করে স্টেশন ছাড়ায়। গড়িয়া, বাঘাযতীন, সোনারপুর..... রোদ নিভে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে জষ্ঠির আকাশে। যদি কালবোশেখি আসে বৃষ্টি আসে মাথায় করে, জলের উপর ঘরখানা....বাবা গো। মেয়েকে বলে এসেছে, তেমন উথাল-পাথাল হলে ভিতরে সেঁধিয়ে বসে থাকিস না। ছুটে বাইরে বেরিয়ে পড়বি ..... তা মেয়েটা ঘুমিয়ে না পড়ে আবার! ছোটটার জন্য দুধে ভেজানো পাঁউরুটি রেখে এসেছে, বড়টার জন্য বিস্কুট, কাল রাতের ভাত.... ওরা উঠে দেখেশুনে না খেলে ভাত গেঁজিয়ে উঠবে....

বুড়িদাদা কত রাগ করেছিল শুনে। 'জলের উপর ঘর, তার জন্য এক কাঁড়ি টাকা ধার করলে, তোমার আর বুদ্ধি হল না উষা!'

এক কাঁড়ি বলে কথা! আট হা-জা-র টাকা! একশো টাকায় মাসে ছ-টাকা সুদ। ধ্যাৎ, এত সুদ আবার আছে নাকি। ব্যাঙ্কে সুদ দেয় বছরে ছ-টাকা! সুদের হার নাকি নেমে গিয়েছে আজকাল। কাগজে দিয়েছে। ব্যাঙ্কে নেমে থাকবে। পার্টির যে ছেলেটা টাকা দেয় হিসাব রাখে, সে শুনলে বলে দেবে, তবে ব্যাঙ্কেই যা উষি। কী যে হয়ে গেল মাসখানেকের মধ্যে! ভোটের শোরগোল উঠল। বস্তির বাড়িওলা ঘরে তালা ঝুলিয়ে দিল, তিনটে মানুষ নিয়ে উষি রাস্তায়। দু-দিন এর বাড়ি, চারদিন ওর বাড়ি। কার আর ঘরে জায়গা আছে যে অন্যকে থাকতে দেয়!

পার্টি থেকেই বলল, 'জলের ধারে জায়গা দখল হচ্ছে, লোক ঘর বানাচ্ছে, তুইও যা।' সত্যিই কী ধুন্ধুমার কাণ্ড। ষাট-সত্তর-একশো ঘর উঠে গেল দেখতে দেখতে। জবর দখল ঝিলের ধারের পুরো জমিটাই। উষি কি ওই ভিড়ের মধ্যে পারে? ক-খানা বাঁশ, ক-গাড়ি মাটি জোটাতেই তো তার দু-সপ্তাহ গেল। টাকা কই? জলের উপরের জমিখানা ছাড়া আর কী কিছু খালি থাকত উষির জন্য! যা বরাতে ছিল তাই পেয়েছে।

এক পার্টি জায়গা দখল করতে বলল, আর এক পার্টি টাকা ধার দিল। পার্টি তেজারতি করে, কালে কালে কী যে হল!

উষির বাপ শুনলে হাঁ হয়ে যেত। সে ছিল সন্দেশখালির বুনিয়াদি স্কুলের মাস্টার। এখন আগের মতো ঘরের ভাড়া দিতে হচ্ছে না, তবে সুদের টাকা দিয়ে যাচ্ছে নিয়ম করে।

আসল শুধবে কী দিয়ে?

বুড়িদিদাকে কিছু বলতে পারেনি উষি। আসল শোধ — সে তো অনেক, অনেক দূর! জলের উপরকার এই ঘরটা কী আর ততদিন থাকবে? রোদে, জলে গলে মিশে যাবে মাটিতে। কিংবা পুলিশ এসে তুলে দেবে তাদের। বাঁশ, দড়ি-দড়া যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে, গুটিয়ে নিয়ে আবার অন্য ঠিকানায় যাবে উষিরা। কিন্তু তার আগে বুকুর ব্যবস্থাটা হয়ে যাওয়া দরকার।

ওভারব্রিজের বাঁ মুড়োয় দাঁড়িয়ে থাকার জামাইয়ের। এই তো। কপালের, গলার ঘাম মুছে নিল উষি। জামাই একটু ভারী হয়েছে, দারোয়ানি গোঁফ রেখেছে। গোঁফটা আগে ছিল না। একটা সিগারেট হাতে নিয়ে উসখুস করছিল। উষিকে দেখে সিগারেটটা লুকিয়ে ফেলল। মাটিতে ফেলে দিল না অবশ্য। ফেললে চলে, পয়সার জিনিস?

মাথায় আধঘোমটা টেনেছে উষি। জামাই আর সেই একই বয়সি বলতে গেলে! রোদে-জলে পুড়ে উষি কেমন ঝগড়াটে, বেহায়া আর দজ্জাল হয়েছে, জামাই সে তুলনায় মোলায়েম। ভীতু আর মুখচোরা মতো। বিশেষত, মায়ের ভয়ে কাঁটা। উষি বুঝতে পারছে, তার সময় মাপা। যা বলার, ভাল করে গুছিয়ে নিতে হবে, বুকের মধ্যেকার ধুক্ ধক্ কানের কাছে উঠে এসেছে এরই মধ্যে।

স্টেশনে হাজার লোকের মেলা। ট্রেন থেকে আরও মানুষ উঠেছে, নামছে। কে কখন দেখে ফেলে এই ভয়ে জামাই একটু আড়ষ্ট হয়ে আছে। স্টেশনের বাইরে একটা চায়ের দোকানে বসল ওরা দুজন।

মা, শাশুড়ি দুজনেই জামাইকে আপনি ডাকে। উষিও তাই।

'চায়ের সঙ্গে কিছু নেবেন?'

উষির খুব খিদে। কিন্তু দু-জনের খাবারের দাম দিতে হয় পাছে, এই ভেবে জামাইয়ের নিশ্চয় ভাবনা হচ্ছে।

'আমি খাওয়াচ্ছি', উষি বুদ্ধি করে হেসে বলল, 'মামলেট টোস্ট খাবেন?'

ফেটানো ডিম, কাঁচালঙ্কা ও পেঁয়াজের সুস্বাদে জলের উপরকার বাড়ির আঁশটে গন্ধ মনে আসে। বাসি ভাত। জল মেশানো দুধে ভেজানো রুটি। দুটো ডিমভাজা বাড়ি নিয়ে গেলে হয় আজ। তার আগে বুকুর ফয়সালাটা করে নিতে হবে।

মেছেতা পড়া গালে হালকা পাউডার — সে কি ফুটে উঠেছে এতক্ষণ? আধঘোমটা টেনেটেনে নিয়ে উষি বলে,

'মেয়ের পর মেয়ে। এই দোষে মেয়েটাকে ত্যাগ দিয়েছেন বাবা, ওর কী করার ছিল বলুন?'

চামচ ছেড়ে জামাই হাতে পাঁউরুটি দিয়ে ডিমটাকে বাগ মানতে চাইছে, মুখ ভর্তি খাবার।

'আমাদের বাড়িতে ছিল একরকম, আপনি তো টেনে গাছতলায় এনে ফেললেন। মা তো ছি ছি করছে.....'

'সাধ করে আনিনি বাবা। ছোটোটা দুধ পাচ্ছিল না। বড়টা খিদে খিদে করে অস্থির তোমার মায়ের এখন কালজোড়া রতন, আমার নাতনিদের কে দেখে .... ওরা বলে, যার সে গা করে না, আমরা ক-টা মুখে খাবার জোগাব!'

বলতে বলতে কান দুটো গরম হয়ে ওঠে উষির। কী বলতে কী বলেছে, কে জানে। কোলজোড়া রতন শুনে জামাইয়ের মুখ কি একটু রাঙা হল?

বিয়ের সময় পাঁচবছরের একটা হাত-ধরা মেয়ে ছিল বুকুর শাশুড়ির। এই চার বছরে আরও দুটো হয়েছে। সব ছোটটা ছেলে এক বছরের। শ্বশুরের যদি মতিগতি এমন হয়, উষির মেয়ে আর নাতনিদের খাওয়াবে কে?

'যা রোজগার করি তাতে আমারই চলে না, তাতে....' বলে জামাই উদাস চোখে দোকানের বাইরে চেয়ে থাকে। তার কাপে ধোঁয়া ওঠা চা।

উষি যেন এই জন্য মুখিয়ে ছিল....সুযোগ পেতেই চট করে লুফি নিয়েছে.....

'তাই বলেন বাবা, পেটই যদি না চলে, তবে অতদূরে কেন? এখানে কী দোষ করল? তবু কাছে কাছে থাকেন....'

'এখানে? এখানে কী করব? কে কাজ দেবে আমায়? বলে ঘরে ঘরে বি.এ, এম এ পাস বেকার....'

এতক্ষণ পরে চোখের জল মুছে হাসে উষি। ঝুঁকে পড়ে বলে, 'ও বাবা! মেয়েমানুষ, মুখ্যসুখ্যু আমি যদি গতরে খেটে মাসে আড়াই হাজার কামাই, আপনি পুরুষ মানুষ ও টাকার জন্য বিদেশ যাবেন কেন? ঘরে থাকলে বাচ্চা দুটো তো বাপের মুখ দেখবে ....'

'থাকব কোথায়? ওই গেরামগঞ্জ থেকে কী কাজ খোঁজা যায়? মা তো বউকে নেবে বলে মনে নিচ্ছে না....'

ধোঁওয়া ওঠা চায়ে এলাচ-গন্ধ। মেয়েকে নিজে থেকে আনতে চায়নি উষি। বলেছিল, 'শ্বশুরবাড়ির ভিটে কামড়ে পড়ে থাক।' মেয়েই কেঁদেকেটে খবর পাঠাল। 'ইস্কুল, ছাড়িয়ে বিয়ে দিয়েছ, যদি গলায় দড়ি দিই, বুঝবে মজাটা! কে বলেছিল বিয়ে দিতে!' মেয়েটা পাছে মরে যায়, এই ভয়ে উষি ওকে আনিয়ে নিয়েছে।

'আমার ঘরটা তো আছেই, বাবা। দু-তিন গাড়ি মাটি ফেললে মেঝেটা দিয়ে আর জল দেখা যাবে না। আপনি ওখানে থাকুন... সুদ তো দিচ্ছিই মাসে মাসে পার্টিকে....'

'আর কাজ?'

লোকটা ভীতু, গোবেচারা, আবার সেয়ানাও বটে। কোথায় কী আছে, যেন বাসন চেটে, খুঁটে খাবার তুলে নিচ্ছে।

'কাজের ব্যবস্থা আমিই করে দেব। আপনি আগে ঘরে আসার দিন ঠিক করুন দিকি।'

তার সবচেয়ে ভাল হাসিটি হেসে দোকানের কাউন্টারে গিয়ে দাঁড়ায়। 'দু-কাপ চা, টোস্ট দুটো মামলেট। আর দুটো ভেজে দিন। সঙ্গে নিয়ে যাব।'

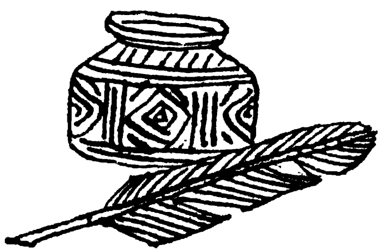
'বারো টাকা।' জামাই আড়ে আড়ে দেখছে। পকেটে একবার হাত ঢুকিয়েছিল কিন্তু টাকা বার করেনি।

বুড়ো দাদুর জন্য পুরুষ লোক খুঁজছিল ওরা। দাদু বড্ড ভারী হয়ে গিয়েছে, তুলতে

ভাষর হাতে-পায়ে খিল ধরে। উষির জামাই যদি কাজ করে, দিদা রাখতে রাজি হয়ে যাবে।

বাকি রইল উষির নিজের জন্য একটা কাজ; উষির নিজের একটা মাথা গোঁজার জায়গা। সেসব নিয়ে আর ভাবে না উষি। আয়না ছাড়া দেওয়ালে মুখ দেখতে শিখিয়েছে তাকে এই শহর। এ দুটোই সে জুটিয়ে নেবে। খাটতে পারা মেয়েমানুষের আবার চিন্তা কিসের? কোলের বাচ্চা নিয়ে জলের উপর বাড়িতে রাত জাগার চেয়ে হাড়ভাঙা খাটুনি অনেক অনেব ভাল।

উলটোদিকে জামাইয়ের ট্রেন ছেড়ে গালে যতক্ষণ শেষ বগিটা কালো ফুটকি না হয়ে যায়, মামলেটের ঠোঙা হাতে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রইল উষি। আধঘোমটা খসে গিয়ে তার চুলের ফুল বেরিয়ে পড়েছে।



জন্মকথা

ঘনশ্যাম চৌধুরী

রাত্রি মানে রহস্য। রাত্রিকে রোজই খুঁজে বেড়াতে হয়। রাতের কোনও সীমানা খুঁজে পায় না ফতেমা। রাত হলেই ও একা হয়ে যায়। কেউ থাকে না ওর চারপাশে । শুধু ওর শরীরের ভেতর, ওর অস্থি-মজ্জার রস থেকে একটু একটু করে বড়ো হতে থাকা আরও একটা প্রাণ নড়াচড়া করে জানান দেয়, সে আছে। এভাবেই প্রতিটা দিন চলে যাচ্ছে। যাচ্ছে প্রতিটা রাত। দিনে তবু সবাইকে পাওয়া যায়। রাতে শনি-রবিবার ছাড়া সে তার স্বামীকে পায় না। স্বামী সইদুল ইসলাম বাজারে কাজে চলে যায় সোমবার সকালে। সপ্তাহ শেষে শনিবার বিকেলে বাড়ি আসে। সোমবার ভোর হলেই আবার বাস ধরে ছুট দেয়। বিয়ের পর থেকেই ফতেমা এই নিয়মেই স্বামীর ঘর করছে। অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল বেশ। কিন্তু বাচ্চাটা পেটে আসার পর থেকেই একা রাতগুলো আর কাটতে চায় না ফতেমার।

ফতেমার কাছে রাতগুলো কেন রহস্যময় লাগবে না? এই যে আজ বিছানায় শুয়ে পড়ার পর থেকে ও শুধুই জলের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। কল-কল-কল-কল, কুলু-কুলু-কুলু-কুলু নদীর অবিরাম স্রোতের শব্দ। কিন্তু অজয় তো এখান থেকে চার ক্রোশ দূরে। সে-নদীর শব্দ এখানে আসবে কী করে?

কিন্তু জলস্রোতের শব্দ এখন যেন আরও জোরালো হচ্ছে। এই শব্দ কী তার শরীরের অন্তহীন অন্তস্থল থেকে উঠে আসছে। যার ঠাঁই নেই, কূল নেই। ফতেমা চোখ বুজে নিজের গভীরে ডুব দেয়। ডুব-ডুব-ডুব-ডুব। পেটের মধ্যে সে বুঝি নড়ে-চড়ে ওঠে। দারুণ এক ঝাঁকুনিতে ফতেমা কেঁপে উঠল। এক ধরনের সুখ-সুখ যন্ত্রণা চুঁইয়ে পড়তে থাকে তার শরীর বেয়ে।

তবুও সে শুনতে পাচ্ছিল শুধুই জলের শব্দ। শুধু কি জলের শব্দ? আরও কিছু শব্দও তার মস্তিষ্কে এসে ধাক্কা মারছে যে! হ্যাঁ, জলস্রোতের সঙ্গে সঙ্গে আরও আরও শব্দ সে শুনতে পাচ্ছিল এবার।

চট্‌কা ভেঙে ফতেমা একটু সচেতন হয়। কান খাড়া করে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করে। যদি সে ঠিক বুঝে থাকে, এ তবে বহু মানুষের চিৎকার। সে কী ভুল শুনছে। মাঝরাতে জলের শব্দই বা হবে কেন? কেনই বা লোকজন এভাবে চিৎকার জুড়ে দেবে?

এখন কিন্তু আর কোনও শব্দ নেই। সত্যিই বহু মানুষের চিৎকার স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। ফতেমা উঠে পড়ল। ওর ভয় করছিল। পেটের ভেতর ন-মাসের বেশি সময় ধরে একটা প্রাণ বেড়ে উঠেছে। ভরা শরীর তার। ভরা নদীর মতো সেই ভরা শরীর নিয়ে চিন্তিত ফতেমা চৌকি থেকে নেমে ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। দরজার ওপারে পায়ের শব্দ কেন? ফতেমা বিহ্বল, ফতেমা সন্ত্রস্ত!

ঠিক তক্ষুনি দরজার ওপাশ থেকে সে শুনতে পেলো তার শাশুড়ির গলা-'ও বউ! ও ফতেমা! উটে পড়ো। গেরামে নদীর পানি ঢুকেচে। উ-দিবাকর নোকেরা ছুটে এসেছে। তাড়াতাড়ি কইরে বেইরে আসো!'

ফতেমার বুক হাপরের মতো ওঠানামা করছে তখন। সে ঝট্ ক'রে দরজার খিল খুলে ফেলল। উদ্‌ভ্রান্ত শাশুড়ি উদ্‌ভ্রান্ত ছেলের বউকে ধরে ঘরের বাইরে নিয়ে এল। ফতেমা বুঝি আর বাস্তবে নেই। সে বিরামহীন জলকল্লোল শুনতে পাচ্ছিলো। সাংঘাতিক, গা শিরশির করা সেই শব্দ তার শরীরটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল বারবার। ওর পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল এক লহমার জন্য। ওর শ্বশুর, দেওর, দুই ননদ—সবাই কাঁচা ঘুম থেকে উঠে ভয়ে আশঙ্কায় কালো মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে বারান্দায়। আশঙ্কা, ভয়, ভাবনা কোনও কিছুই আর মনের মধ্যে থিতিয়ে রাখার সময় পেল না কেউ। সর-সর-সর-সর, কলকল কলকল করতে করতে অজয় নদের উপচে পড়া জল ঢুকে পড়ল গ্রামে।

'ওরে আবদুল! টর্চ বার কর! দেরি করিসনে বাপ। জলদি কইরে ফতেমা আর তোর মায়েরে হাই-স্কুলে নে যা। আমি ইদ্দিগটা দেকি।' —এই কথা বলেই ফতেমার শ্বশুর ঘরে ঢুকে পড়ল।

দেওর আবদুল ঘরের ভেতর থেকে টর্চ বের করে সবাইকে নিয়ে স্কুলবাড়ির দিকে রওনা দিল। তখন ওদের বাড়ির উঠোনে পায়ের পাতা অবধি জল।

ওরা স্কুলবাড়িতে চলে এল। অজয়ের কূল উপচানো জল ওদের তাড়া করতে করতে পৌঁছে গেছে স্কুলবাড়ির চত্বরে। কেমন করে যে এতটা পথ এল ফতেমা, তা কি সে নিজেই জানে? কিচ্ছু জানে না। তার শরীরের ভেতর তিল তিল করে গড়ে ওঠা ছোট্ট প্রাণটাকে বাঁচাতে হবে! এই ইচ্ছেকে বুকের মধ্যে পেতে রেখে টইটুম্বুর শরীরটাকে কীভাবে যে এখানে নিয়ে এল, যদি ওই আসমানে কেউ থাকে, তবে সেই দেখছে। আর কে দেখবে? ওর দরদ সইদুল, সেও যে কাছে নেই!

কয়েকশো মেয়ে-পুরুষ বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে স্কুলবাড়ির উঠোনে জড়ো হয়েছে। ফতেমা দেখছিলো, স্কুলের পাকা দেওয়ালের ধরে অজয়ের পানি ওপরের দিকে উঠছে তো উঠছেই।

শাশুড়ি ধরে রেখেছিলো ফতেমাকে। আবদুল বলল, 'মা, ভাবীকে ডানদিকের সিঁড়ি ধরে ওই উঁচু বারান্দায় নে যাও। পানি নাগাড়ে বাড়তেছে। হুঁশিয়ার।'

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই হাজারখানেকের বেশি মানুষ গ্রাম থেকে হাইস্কুলের পাকা দালানে চলে এল। আবদুল অনেকের বউ বাচ্চা, বুড়ো-বুড়িদের ধরে ধরে দালানে তুলে দিচ্ছিল। প্লাবনের জল স্কুলের একতলার বারান্দা ছুঁয়ে ফেলল এবার!

'দোতলায় উঠে পড় গো সবাই। একতলা ডুবে যাবে যে!'

হইচই লেগে গেল। সিঁড়িতে গাদাগাদি ভিড় লাগল। বাচ্চা কোলে বউগুলো, জোয়ানদের হাত ধরে বুড়োবুড়ি চলল দোতলায়।

এতকিছুর মধ্যেও ফতেমা দেখছিল, নিশ্চুপে পানি বেড়ে যাচ্ছে। ওর কোথায় যেন অদ্ভুত এক কষ্ট হচ্ছিল। কষ্টটা কোথায় ? মনে, না শরীরে? ঠাহর করতে পারছিল না সে। জলের কলকল শব্দ ওর বুকে ঢেউ তুলছে বারবার। সর্বনাশী নদী মানুষের ভাগ্য পানিতে ভাসিয়ে দিচ্ছে। ফতেমা দোতলায় ক্লাসঘরের একটা খোলা জানলার সামনে বসে দেখতে লাগল ওদের গ্রাম বসুধা কেমন করে জলের তলায় চলে গেল। আকাশে চাঁদ ছিল। সেই চাঁদের আলোয় ফতেমা দেখছিল, গ্রামের লোকগুলো পোটলা-পুঁটলি নিয়ে জল ঠেঙিয়ে বড় রাস্তার দিকে যাচ্ছে। কেউ আসছে স্কুল বাড়ির দিকে। শোরগোল বেড়েই চলেছে। ঢং-ঢং-ঢং শব্দে স্কুলের ঘড়ি জানান দিল, রাত তিনটে বাজে।

ঠিক তখনই ফতেমার পেটের ভেতরটা যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল। 'ওমা গো!' বলে চিৎকার করে উঠে জানলার দুটো গরাদ মুঠিতে চেপে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল সে।

'কী হল বউ?' —শাশুড়ি মমতাজ বেগম ছুটে এসে ধরল ওকে।

'বড় কষ্ট হচ্ছে!'

'কোথায়?'

'পেটে।'

মমতাজ বেগম ডাকলেন, 'ও মনিরুদ্দির মা! ইদিগে আসো দেকি।'

মনিরুদ্দির মা ছুটে এল। 'কী হয়েছে?'

'মনে হচ্ছে বউয়ের পেসব বেদ্না উঠেছে। বেটাছেলেগের ইদিগে আসবার মানা করি দাও।'

লাল পানি যদি গেরামে একবার ঢোকে, তবে মাইনসের সব্বেনাশ—বলতেন খালেক চাচা। আব্দুলের বাপ গিয়াসুদ্দিন বাড়ি থেকে কিছু খাবারদাবার আর কাপড়-চোপড় মাথায় নিয়ে কোমরজল ভেঙে হাঁটতে হাঁটতে এই কথা ভাবছিল।

শেষ রাতের অন্ধকার কেটে যাচ্ছে। পুব আকাশ একটু ফর্সা হয়েছে। সেই আলোয় জলের গেরিমাটি রং দেখে খালেক চাচার প্রবাদবাক্যটা মনে পড়ল গিয়াসুদ্দিনের। পাঁচ মিনিটের রাস্তা প্রায় এক ঘণ্টায় পার হয়ে আবদুলের বাপ স্কুলবাড়িতে যখন পৌঁছল, বন্যার জল যখন এক বুক। আবদুল ছুটে নেমে বাপের কাছ থেকে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে বলল, 'আব্বা, ভাবীর শরীলডা খুব খারাপ হয়েছে। অজ্ঞান হয়ে গেছে।'

গিয়াসুদ্দিনের কপালে ভাঁজ পড়ল। লাল পানি কী বিপদ ঘটাবে কে জানে। চারিদিকে শুধু জল আর জল। স্কুলমাঠ পেরিয়ে পাকা সড়কের দুপাশে জলস্রোত বেড়েই চলেছে। দেখে তো বুকের কাঁপন ধরল অভিজ্ঞ গিয়াসুদ্দিনের।

দমবন্ধ করা যন্ত্রণায় ছটফট করছিল ফতেমা। পেটের ভেতরটা তার উথালপাথাল হয়ে যাচ্ছে। বন্যার জলের ঢেউ উঠছে যেন তার বুকে। মাথা ছিঁড়ে খেতে চাইছে। হায় আল্লা! এত কষ্ট! এমন দিনে সইদুল কাছে নাই। সে থাকলে মন শক্ত করে ফতেমা সব কষ্ট ধারণ করে নিত।

আধো চেতন, আধো অচেতন ফতেমা বিবি জলকল্লোল শুনতে পাচ্ছিল। বুকের ভেতরটায় কষ্ট। পেটের মধ্যে যন্ত্রণার ঢেউ। শিরায় শিরায় তরল আগুনের স্রোত। 'উঃ মা গো! মরে যাবো গো মা! আর সহ্যি হচ্ছে না গো মা!'

ফতেমার শাশুড়ি, আর সব মেয়েরা ঘিরে আছে ওকে। কপালে পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

নীচে হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে গিয়াসুদ্দিন, আরও অনেকে। জলময় এই ভূমিতে আশার আলো নেই। ওপর থেকে ফতেমার যন্ত্রণাদগ্ধ আর্তনাদ ভেসে আসছিল। আবদুল সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছটফট করছে।

'কার কাছে যাব?' কুতায় পাব ডাক্তার? পানি যে বাড়ছেই শুধু। বেশ রোদ উঠছে। সামনে পিছনে যেদিকে তাকাচ্ছে আবদুল, ছুটে চলা জলরাশি ছাড়া কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সে। এমন সময়ে দাদা ইখানে থাকলে মনে ভরসা পাওয়া যেত। বেপদ যখন আসে, সবদিক থিকেই আসে। জলাকায় ভূমির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আবদুল অসহায়ের মতো এসবই ভেবে যাচ্ছিল।

আর একদিকে আধো-চেতনায় সইদুলের কথা উচ্চারণ করছিল ফতেমাও। সইদুল তার পুরুষ, তার আশ্রয়। অবচেতনার অস্পষ্ট অন্ধকারে ডুবতে ডুবতে ফতেমা দেখছিল, দারুণ জলোচ্ছ্বাস বারবার তাকে কঠিন ভূমিতে আছড়ে ফেলে দিচ্ছে। সারা শরীর ব্যথায়-যন্ত্রণায় খাক হয়ে যাচ্ছে।

ওই যে সইদুল না? অনেক দূরে অস্পষ্টতার ছায়া আলোয় সে দেখতে পেল তার স্বামী সইদুলকে। চারিদিকে জল আর জল। আর ডুবে যাওয়া বাড়িঘর। প্রবল স্রোত কাটিয়ে সইদুল ফতেমার কাছে আসতে চেষ্টা করছে। পারছে না। ফতেমা চিৎকার করে উঠল, 'আমাকে ধরো! আমাকে বাঁচাও!' জলোচ্ছ্বাস তাকে আবার আছড়ে ফেলল। যন্ত্রণার তরল আগুন মাথা থেকে সারা শরীর বেয়ে নীচে নামছে। আরও নীচে। 'ও, মাগো!' বলে প্রবল চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল ফতেমা।

অস্বাভাবিক নৈঃশব্দ্য নেমে এল চরাচরে। শুধু রয়ে গেল জলরাশির অনিঃশেষ বয়ে চলার শব্দ। পৃথিবী কি তার অবিরাম ঘূর্ণন থেকে থমকে দাঁড়াল?

সেই অখণ্ড স্তব্ধতার বুকে আচমকা এক সদ্যজাত শিশুর কান্নায় সম্বিৎ ফিরে পেল ফতেমার শ্বশুর গিয়াসুদ্দিন, দেওর আবদুল। হতচকিত ওরা তাকিয়ে দেখল চারধার। জল থইথই সেই চরাচরের মাঝখানে একখণ্ড ডাঙায় ওরা আছে। হ্যাঁ, ওরা আছে, আছে আরও মানুষ। না, একা নয়, সবাই পাশে। তাদের চোখের সায়রে বটবৃক্ষের ছায়া। হাতে হাতে ধরে সঙ্গে থাকার প্রবল ইচ্ছে।

..ফতেমা চোখ মেলেছে। ওরা কানে তখনও জলতরেঙ্গর শব্দ। সে দেখল, সেও তো একা নয়! একগুচ্ছ মমতা মাখানো দৃষ্টি জড়িয়ে রেখেছে তাকে। পাশে তাকাতেই ফতেমার বুকে ফের উথালপাতাল ঢেউ উঠল।

তার পাশে হাত-পা ছুঁড়ে তখন চিৎকার জুড়ে দিয়েছে সেই খুদে ছেলেটা, যে এইমাত্র পৃথিবীর আলো দেখল।

সন্ধ্যাবাসরের কথকতা

আফসার আমেদ

মাস তিনেক আগে আয়েসা ফোনে জানিয়েছিল, থলিয়া বলে একটি গ্রামে থাকছে। সে গ্রামেই তার স্কুল। আয়েসার সঙ্গে জাফরের ডিভোর্স হয়ে গেছে সবে দু-মাস। পাকাপাকি একা থাকা যখন নির্দিষ্ট হয়ে গেল, তখন তার স্কুলের গ্রামে একটি গোড়ো বাড়ি কিনে নেয় আয়েসা। তিন মাস আগে ফোনে আয়েসার নতুন বসতের খবর শুনে নাসিম খানিকটা আলোড়িত হয়েছিল। পনেরো-ষোলো বছর আগে ইউনিভার্সিটি জীবনে যার দোলা নিয়ে থাকা জুটত। তাকে নিয়ে বন্ধু-বান্ধবদের কাড়াকাড়ির শেষ ছিল না। এক দিন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত আয়েসার সঙ্গে কাটিয়ে আসা যায়, তখনই ভেবেছিল। আজ রবিবার, চলেছে সে আয়েসার কাছে। আগত সন্ধ্যার ছায়ামাখা আলোর চারপাশে।

বাস থেকে নেমে বাসস্টপে স্থানীয় মানুষদের শুধিয়ে জেনে নিয়েছিল নাসিম আয়েসার বাড়িটা। দূর থেকে দেখাও যাচ্ছিল। কাছেই। এত কাছে যে, আয়েসা যদি একটা উলের বড় গোলার খুঁট তাকে ধরিয়ে দিয়ে মাঠে নেমে পিছিয়ে যেতে বলত, এতক্ষণ যেখানে, সেখানে এসে পৌঁছত। এখন পৌঁছচ্ছে সে আয়েসার বাড়িটাতে। মাঝ মার্চের মরা বিকেল। চমৎকার আবহাওয়া। বিবাহিত জীবন চোদ্দো বছর কেটে গেছে, ভেবে দেখে, মন থেকে বাসনার আলো এখনও মুছে যায়নি।

আয়েসার সঙ্গে জাফরের বিচ্ছেদটা আয়েসার পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক। জাফর একটা গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টার হয়েছিল। তারই স্কুলের এক ছাত্রীকে বিয়ে করে বসে। এই ঘটনায় গ্রামের মানুষ স্কুল বয়কট করে। খবরের কাগজে এ-খবর বেরিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত জাফরের স্কুলের চাকরিটা যায়। জাফর অল্পবয়সি বউ নিয়ে থাকে। আয়েসা ডিভোর্স নিয়ে নেয়। আয়েসা, জাফর ও আরও অনেকে নাসিমের ইউনিভার্সিটির বন্ধু। আয়েসা মুর্শিদাবাদ থেকে পড়তে এসেছিল। থাকত হেস্টিংসের মেয়েদের হোস্টেলে। সে-সব দিন গেছে।

কিন্তু মন থেকে স্মৃতি মুছে যায়নি। হয়তো আয়েসাকে নিয়ে বাসনাও। আয়েসার ছিল অনেক আলো। যেই-ই তার সঙ্গে মিশত, তার প্রেমে পড়ে যেত। আয়েসার প্রত্যাখ্যানও ছিল খুবই নরম, প্রেমময়। নাসিম এখনও কি আয়েসার প্রেমে পড়ে আছে?

আয়েসার বাড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে নাসিম ভাবল, সে কি গলা খাঁকারি দেবে?

না, নাম ধরে ডাকবে? সিঁড়ির নীচে ইতস্তত করছিল নাসিম। বারান্দা থেকে সিগারেটের গন্ধ। তা হলে জাফর আবার আয়েসার সঙ্গে থাকছে নাকি? জানলায় অস্পষ্ট একটা মুখ দেখতে পেল। নারীকণ্ঠ — 'উঠে এসো নাসিম।' আয়েসাই তাকে ডেকেছে।

বারান্দায় তখন আসাদ চেয়ারে বসে সিগারেট ফুঁকছিল। আসাদকে দেখে চমকায় নাসিম। আসাদও তাদের ইউনিভার্সিটির বন্ধু।

আসাদ বলল, 'আরে, আয় আয়, বোস।'

'তুই কখন এলি?'

'এই তো সবে।'

'আয়েসা কোথায়?'

'আমি আসার পর শাড়ি বদলাতে গেছে ঘরের ভিতর।'

আয়েসার কাছে একা একা আসার রোমাঞ্চটা মাঠে মারা গেল। মনে মনে বিষণ্ণ হল নাসিম। আয়েসার কাছে একা এলে, আয়েসার সঙ্গে কী কী সংলাপ গড়ে উঠত, কী কী ঘটনায় যেত, তা যদিও অনুমেয় নয়। কিছু একটা ঘটনা ও সংলাপের বাসনা ছিল, এটুকু মনে করতে পারে। আজও এত বছর পর আয়েসার কাছে এসে প্রতিদ্বন্দ্বী টানাপোড়েন নিয়ে কাটাবে, নিজের ওপর দূর-ছাই করতে ইচ্ছে হচ্ছে তার।

আয়েসা একটা ফিরোজা রঙের তাঁতের শাড়ি পরে বেরিয়ে এল। দিনের আলো এখনও আছে। আয়েসা যতই সুন্দরী হোক না কেন, নাসিম অনুভব করে তারই সমবয়সকে আয়েসা লুকিয়ে ফেলতে পারেনি। তার জন্য নাসিমের এক ধরনের আত্মতৃপ্তিও জোটে।

তাদের মুখোমুখি এসে বসল আয়েসা। নাসিম বলল, 'আমরা কিন্তু নিজেদের মধ্যে প্রোগ্রাম করে আসিনি।'

আয়েসা মৃদু হাসল। 'আমি জানি। বল, তোমাদের খবর কী?'

আসাদ বলল, 'নতুন খবর কিছু নেই।'

'বেশ, তোমরা এসেছ, ভালো হয়েছে, তোমাদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটানো যাবে।'

নাসিম বলল, 'কেমন আছ?'

আয়েসা বলল, 'এখনই চা খাবে তো?'

আসাদ বলল, 'প্রথম রাউন্ডটা এখনই হয়ে যাক।'

আয়েসার মুখে আবার হাসি। 'জীবনে আয়েসের অভিজ্ঞতা তোমাদের যথেষ্ট হয়েছে।' বলে পাশ ফেরে আয়েসা। রান্নাঘরের দিকে তাকায়। সেদিকে তাকিয়েই থাকে।

রান্নাঘরের ভেতরটা অন্ধকার ছায়াময়। রান্নাঘর থেকে কমবয়সি এক মেয়ে বেরিয়ে এল। তাদের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল।

আসাদ বলল, 'ও মা, তুমি তো গোটা একটা মেয়েমানুষকে লুকিয়ে রেখেছিলে ওইটুকু ঘরের মধ্যে। টেরই পাইনি।'

আয়েসা বলল, 'ওর নাম হালিমা। ওর স্বামী ওকে ছেড়ে দিয়েছে। আর বিয়ে করতে চায় না। আমার সঙ্গে থাকে। আমিও ওর সঙ্গে থাকি বলতে পার।'

হালিমা কাছে এসে শাড়ির আঁচলের খুঁট বাঁ-হাতের তর্জনীতে জড়াচ্ছিল। চমৎকার মিষ্টি

ও রমণীয়। আয়েসার ইশারায় ফিরে যায় রান্নাঘরে।

ততক্ষণ আয়েসা উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দা, রান্নাঘর আর ঘরের ভিতরের আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। চা খেতে খেতে গল্প চলছিল। বার বার আসাদ জাফরের প্রসঙ্গ তুলছিল, শুরুতেই আয়েসা তাকে অন্য কথায় নিয়ে যাচ্ছিল। যে বাড়িটা কিনেছে, সেটি মাটির বাড়ি। এক নিঃসন্তান বুড়ির বাড়ি ছিল। মারা যাওয়ার বেশ কিছু বছর পড়ে ছিল। বুড়ির ভাইপোদের কাছ থেকে বাড়িটা কিনে নেয় আয়েসা। সব ঘর এখনও পরিষ্কার করা হয়নি। একটা ঘর পরিষ্কার করে থাকে। ইলেকট্রিসিটি সংযোজন করেছে এই যা।

আসাদ বলল, 'তোমার সঙ্গে জাফরের আর দেখা হয় না?' কথাটা জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্য আসাদ চেয়ারসুদ্ধ ঝাঁকিয়ে উঠল। তার পর ভারসাম্য রাখতে সামান্য কী একটা ধরে ফেলল। কিছুই নয়, সামনে বসানো ছিল মাটির একটা বড় জালা। সেটা টলে গেল। সেটা প্রায় গড়িয়ে যেত, ঝট করে উঠে আয়েসা জালাটার পতন রোধ করে। হাত দিয়ে সোজা করে দাঁড় করায়। আয়েসা বলল, 'করেছিলে তোমরা কী—'

নাসিম বলল, 'জালাটা ভেঙে যেত না কি? জালাটা কি তোমার খুব সাধের?'

'কিন্তু তা নয় — জালার গায়ে আলতো করে কান ঠেকিয়ে শোনো, কিছু শুনতে পাবে।'

আয়েসা কিছু একটা রহস্যজনক গল্পে তাদের নিয়ে যেতে চায় যেন।

নাসিম আর আসাদ কান ঠেকিয়ে শুনল। শুনে বুক হিম। জালার ভেতরে একটা বিষধর সাপ ফোঁস ফোঁস করছে। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায় নাসিম আর আসাদ। পিছিয়ে যায় খানিকটা।

আসাদ আর নাসিমের অবস্থা দেখে প্রথমে হেসে উঠল আয়েসা।

মুড়ি মাখতে মাখতে রান্নাঘর থেকে হালিমাও ছুটে এল। হালিমা গায়ে-গা দিয়ে দাঁড়িয়েছে আয়েসার।

আয়েসা হাসি থামায়। গম্ভীর হয়। বলল, 'ভয় পাওয়ার কিছু নেই। ওটা ভেতরে আছে। তা ছাড়া জালার মুখে একটা প্লেট ঢাকা দিয়ে রেখেছি, তার ওপর শিলনোড়া চাপিয়ে রেখেছি, দেখছ তো। ও সহজে বের হতে পারবে না। এসে বসো, যেমন বসেছিলে। তোমাদের সঙ্গে কতদিন পরে দেখা হচ্ছে। জালাটাতে হাত দেবে না, ঠেলাঠেলি করবে না। তা হলেই হল।'

সন্ধ্যা গাঢ় হয়েছে বাইরে। প্লেটে করে মুড়ি মেখে এনেছে হালিমা। পেঁয়াজ লঙ্কা আর আচার চানাচুরের গন্ধ। বসতেই হয় জালাটার পাশে।

আয়েসা বলছিল জালার মধ্যে গোখরো সাপটা ঢুকে পড়ার গল্পটা। দু-দিন আগে বারান্দার কোণ থেকে জালাটা আয়েসা আর হালিমা টেনে বের করে এনেছিল এখানে। পরিষ্কার করবে কোনও এক সময়ে। জালার ভিতর কিছু চাল ছিল। তাতে ইঁদুর এসে খাচ্ছিল। ইঁদুর ধরতে গোখরো সাপটা ঢুকে পড়ে জালায়। আয়েসা জালার মুখে প্লেট চাপা দেয়। হালিমা এসে নোড়া চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত করে, সহজে বেরুতে পারবে না। দূরের গাঁয়ের গুনিনকে খবর দেওয়া হয়েছে। দুই-একদিনের মধ্যে সাপটাকে ধরে নিয়ে যাবে। এখন সাপটাকে না ঘাঁটালেই হল। জালাটাকে ঠেলাঠেলি না করলেই ভালো।

কথা যেমন চলছে চলুক। খানিকটা মুখ তোলে আয়েসা, জাফরের কথা শুধোচ্ছিলে? সে

তো ভালোই আছে। চাকরিটা খুইয়েছে। এখন টিউশনি করে খায়।'

নাসিম বলল, 'তোমার মেয়ে কোথায় থাকে?'

'ওকে আলামিন মিশনে দিয়েছি, ওখানেই থাকে, পড়ে।'

'কী নাম যেন ওর?'

'কুসুম হিয়া।'

আসাদ কথা বলছে না। সিগারেট ধরিয়েছে।

নাসিমও চুপ করে ছিল।

আয়েসা মুখ তুলে নাসিমের দিকে তাকিয়েছিল, নাসিমের কথার জন্য প্রশ্নের জন্য। কিছুক্ষণ নীরবতা থাকে।

তারপর নাসিম বলল, 'আমরা চুপ করে থাকলে সাপটার ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনতে পাই। অদ্ভুত এক বেঁচে থাকাকে নিয়ত করে।'

আয়েসা হাসল। কিছু বলল না। বলল, 'কী বলছ বল?'

'বলছি না। তোমার থাকা নিয়ে ভাবছি।'

'সব থাকার মধ্যে আমি না থাকলে সে থাকা, থাকে না।'

'সাপটা এ বাড়িতে আছে জানতে?'

'না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। জানতাম।'

'সামনের মাঠটা তোমার? যেটা দিয়ে হেঁটে এলাম?'

'আমারই তো। ওখানে জ্যোৎস্না নেমে আসে। এই ঘরের অন্ধকারও আমার খুব প্রিয়। কোনও ঋতকথনের বাধ্যতা আমার নেই।'

'হালিমাও তোমাকে পেয়ে সুখী হয়েছে, দেখছি। তোমাদের বেডরুম দেখা হল না।'

'আলো জ্বালা আছে যাও। সাবধানে যেও, জালায় ধাক্কা না লাগে।'

'না থাক। সাপটা বেশ আছে।'

'বেডরুমে শুয়ে নিশুত রাতে ওর ফোঁস ফোঁস শুনতে পাই। ও ঘুমিয়ে গেলেও আমি বেশ বুঝতে পারি।'

'আমরা দুজনেই যে একইদিনে এসেছি, অবাক হওনি?'

'না। অবাক হব কেন? তোমরা যে রবিবার ছুটির দিনে স্বার্থান্ধতা স্নিগ্ধতা হারিয়ে ফেলনি, এটা দেখে আমার ভালোই লাগছে।'

'আচ্ছা, সবাই হাতাহাতি করে জালাটাকে বারান্দার কোণে রেখে আসি না কেন? ও আমাদের আড্ডাব সংলগ্ন হবে কেন?'

'ওরকমই থাক।'

'কেন? সরালে দোষ কী?'

'না, হাতাহাতি করে সরাতে গেলে যদি জালাটা ভেঙে যায়?'

'ওরে বাবা! তাহলে আমাদের আড্ডার সংলগ্ন হয়েই থাক।'

অতএব সাপটা তাদের আড্ডার মধ্যে থাকল। তারা আরও খানিকটা সময় থাকবে। আরও কথায় যাবে। সন্ধ্যাকে আরও গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে দেবে। অবিশ্যি আর এক

রাউন্ড চা তো হবেই।

এক সময়ে রান্নাঘর থেকে হালিমা এল। হালিমাকে কাছে ডাকল আয়েসা। আয়েসার চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়াল হালিমা। হালিমার মুখে চমৎকার এক স্নিগ্ধতা। হালিমার বাঁহাতটা আয়েসা তার ডানমুঠোর মধ্যে নেয়। হালিমাও সোহাগভঙ্গিতে হাসে। আয়েসা নাসিমদের দিকে তাকিয়ে শুধোল, 'কেমন দেখছ?'

নাসিম বলল, 'আত্মনির্মাণের অনেক কিছু সংগ্রহ করে নিয়েছ এর মধ্যে। আমরা এখন চারজন হয়ে গেছি। লুডো খেলা চলতে পারে।'

আয়েসা শব্দ করে হাসল। অন্ধকার হলে ভাবা যেন দূর থেকে অন্য কেউ হেসেছে। বলল, 'ভাবনার আড়াল নিয়ে কথা বলাতেই তোমার সুখ?'

'কী করব?'

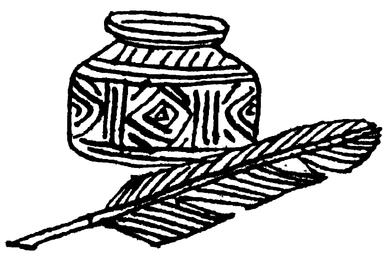
'অন্য কিছু কর।'

আসাদ আবার সিগারেট ধরায়।

নাসিম বলল, 'বরং আবার নতুন করে আড্ডা বসাই, এসো। জাফরের কথা উঠবে না। বন্ধুরা একসময় মারা যায়। সব বন্ধুই চিরকাল বেঁচে থাকে না।'

আয়েসা হাসল। খুব একচোট হাসল।

নাসিম ভাবল, এবার ফিরতে হবে। ফিরতেই হবে।



শরণার্থী

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

মালতী তাহলে এল না। দু-দিন হয়ে গেল। আজ দুপুর থেকে বিকেল ঘরেই কেটে গেল বিকাশের। নীচের উঠোনে বাচ্চাদের সাইকেল তৈরির ফ্যাক্টরি ছুটি হয়ে গেছে। কারখানাটা বিকাশের পৈতৃক সূত্রে পাওয়া। ওয়ার্কাররাই চালায়। ছুটির সময় বিকাশ না থাকলে ওরাই বাচ্চাদের সাইকেলের ঘন্টিগুলো বাজিয়ে ঘরে ফিরে যায়। সেই ঘন্টির আওয়াজে দোতলায় বসে থাকা বিকাশের বিভ্রম সৃষ্টি হয়। নীচে এক দঙ্গল কচিকাঁচা এসেছে মনে হয়। বিকাশ বিছানা ছেড়ে উঠল। আজ একবার খোঁজ নিতেই হবে মালতীর। ভাগের বাড়ির এঘর ওঘর থেকে শাঁখের আওয়াজ আসছে। সাংসারিক মানুষের বেঁচে থাকার সদম্ভ ঘোষণা। বিকাশ অনেকদিন একা। ওর ঘরে শাঁখ বাজে না। অথচ বাজার কথা ছিল। পাগলি বউ বিয়ের পর একদিনও শাঁখ বাজায়নি। বলত, ভয় হয় যদি এরমধ্যে ঘুমিয়ে থাকা সমুদ্রের কোন পোকা বেরিয়ে আসে। সেই বউকে নিয়ে কিছুতেই সংসার করা গেল না। অনেক কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে মাসোহারা দিয়ে তার বাপের বাড়ি দিয়ে এসেছে। তারপর অনেকদিন একা বিকাশ, বাড়ির ইলেকট্রিক মিটার ঘরটার মতন একা। মালতীর ব্যবস্থা কানাই করে দিয়েছিল। ভাড়া করা মেয়েমানুষকে তো রোজ সন্ধেতে শাঁখ বাজাতে বলা যায় না। মালতার খোঁজ নিতে শনিতলার ঠেকে যেতে হবে, ওখানেই কানাইকে পাওয়া যাবে। দরজা খুলে বেরিয়ে আসে বিকাশ। সিঁড়ির ওপর পড়ে আছে হলুদ আলো। সিঁড়িটা উঠে গেছে চারতলা অবধি, সেই চারতলার ছাদে ইংরেজ আমলের বাল্‌বটা এখনও কীভাবে যেন টিকে আছে। বাল্‌বটার হলুদ আলোর মধ্যে পরাধীন ভারতের গন্ধ। ওপরতলা থেকে একটা ছায়া বিকাশের সামনে এসে পড়ল। চোখ তোলে বিকাশ। মেজবউদি। বিকাশ বোঝে বউদি কিছু একটা বলতে চায় ওকে। হয়তো এতক্ষণ অপেক্ষায় ছিল বিকাশের দরজা খোলার। আওয়াজ পেয়েই বেরিয়ে এসেছে। নেহাত ঝগড়ার প্রয়োজন ছাড়া এবাড়ির বাসিন্দার কথাবার্তা হয় না। বউদিকে এড়িয়ে বিকাশ সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিল।

'ছোট ঠাকুরপো দাঁড়াও কথা আছে।' বিকাশ দাঁড়ায়।

'এসব আর কতদিন চলবে?' জিজ্ঞেস করল বউদি। বিকাশ বুঝল কোন সবের কথা বলছে বউদি। তবু সময়সাপেক্ষে মানুষকে নির্বোধ সাজতে হয়।

'কী সব বউদি?'

'এই যে তোমার বুড়ো বয়সে রাসলীলা।'

'ও।'

'শোনো ঠাকুরপো এটা বাচ্চাদের ঘর। তারা বড় হচ্ছে.

'আমার ঘর তো বন্ধ থাকে। আর ঘটনাচক্রে আমরা আত্মীয়। কিন্তু আমরা তো সেপারেট, ফ্ল্যাট বাড়ির মতন। সেখানে কেউ কারোর ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলায় না।'

'তবু আমরা তো একই ছাদের তলায় থাকি। আমাদের ছেলেমেয়েরা তোমাকে নিজের কাকা বলেই জানে। বাচ্চাদের কাছে কাকা-বাবা আদর্শ।'

'শোনো বউদি আমাকে এসব বলার আগে, বাড়িতে ঢুকে আসা কেব্‌ল টিভির তারটা কেটে দিয়ে এসো। ওটা বাচ্চাদের আরও সর্বনাশ করছে।'

'এ তোমার এড়িয়ে যাওয়া কথা। ঠাকুরপো তুমি ওকে বিয়ে করে নিচ্ছ না কেন?'

'ও বিবাহিতা। আর তাছাড়া আমি তো ডিভোর্স পাচ্ছি না।'

কথাবার্তার মাঝখানে বিকাশের ঘরের উলটো দিকে বড়দার ঘরের দরজা খুলে গেল। বড়দা চৌকাঠে এসে দাঁড়াল। এবাড়ির সব থেকে বেশি বখে যাওয়া ছেলে। হাতে বাদামি জলের গ্লাস, মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি। খালি গা, পরনে লুঙ্গি বুকের ওপর গিঁট বাঁধা। বড়দার ছায়া সিনে এন্ট্রি নিতেই মেজবউদির ছায়া ওপরে উঠে গেল।

'কিরে জ্ঞান দিচ্ছিল?' বলল বড়দা।

'না ওই আর কী....'

বিকাশ দাদার সামনে ইতস্তত করছে। যতই হোক বড়দা। হাতে মদের গ্লাস, একটু আগে মা কালীর ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে গ্লাস দু-আঙুল ডুবিয়ে ফ্রেমের কাচে ছিটে মেরে এসেছে। উদ্দুগ্‌গু। মা কালীকে উৎসর্গ না করে বড়দা কিছু মুখে দেয় না।

'যা করছিস করে যা। মেয়েটাকে তো বারো জায়গায় যেতে হচ্ছে না। নিজের সংসারটাও হেসেখেলে চালাতে পারছে। আমার লাকটাই খারাপ। তোর মতো গেরস্থ জুটল না। তাও আবার একটা ফো কাট্‌কা মেয়ে মানুষ করতে হচ্ছে।'

এমন সব ওপেন কথাবার্তা হচ্ছে যে বিকাশ কেটে পড়তে পারলে বাঁচে। এই বড়দাই ছোটবেলায় বিকাশকে শীর্ষাসন শিখিয়েছিল সেই মাথাটাই আবার নিচু করে বিকাশ সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। বড়দা ওপর থেকে বলল, 'দু-দিন হল মা লক্ষ্মীকে তো দেখছি না। বাড়িতে কোনও গণ্ডগোল হল নাকি?' বিকাশ কথার উত্তর না দিয়ে উঠোনে পৌঁছে গেল। বড়দাটা আজব মাইরি। মাথাটা পুরোটাই খারাপ হয়ে গেল নাকি কে জানে। মালতীকে মা লক্ষী বলে ডাকছে! যেখানে মেজবউদি মালতীকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। বড়দার মাথাটা সত্যিই একটু টাল খাওয়া। কিন্তু টালটা কখন হল, ধরা গেল না বলে চিকিৎসা করা গেল না। বড় একা একা থাকত। বাবার সঙ্গে পটত না। ওর ধারণা বাবার এই বৈভব সব লুটের পয়সায়। সারা যৌবন জুড়ে আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরেছে বড়দা। ব্যবসা-চাকরি মিলিয়ে কমসে কম কুড়িরকম রোজগারের ধান্দা করছে। কিছুতেই কিছু করতে পারেনি। একপয়সাও জমাতে পারেনি। শুধু বয়েসটা জমে গেছে। সব ছেড়ে যখন বড়দা বাড়ি ফিরে এল, ততদিনে বাবা

সব ছেলেকে সম্পত্তি ভাগ করে দিয়েছে। বাকি তিন ভাইয়ের বিয়েও হয়ে গেছে। বড়দা নিজের ভাগ নিয়ে চুপচাপ ঘরে বসে গেল। একসময় বাবা মারা গেলেন। এখন সব ভাইয়ের আলাদা ঘর, আলাদা সংসার। বড়দার আর সংসার হল না।

রোজ বিকেলে সোনাগাছি থেকে এক মহিলা আসত। এখন বড়দার যৌবন ফুরিয়েছে। এখন সেই মহিলার মেয়ে আসে। বড়দা মানুষ করেছে। মেয়েটার সব খরচ-খরচা বড়দার। রোজ সকালে মেয়েটা আসে। চুপচাপ বড়দার ঘরে বসে থাকে। মেয়েটার গলা কোনওদিন শোনা যায়নি। এবাড়ির কেউ কেউ দেখেছে বড়দা নাকি রোজ কালীজ্ঞানে মেয়েটাকে পুজো করে। মেয়েটা কি বড়দার।

'ঐকতান' থেকে বেরিয়ে এল বিকাশ। এই পৈতৃক বাড়ির মূল দরজার ওপর শ্বেতপাথরের টালিতে লেখা 'ঐকতান'। বাবার দেওয়া নাম। পার্টিশনের সময় প্রচুর আত্মীয়স্বজন ওপার থেকে এসে এবাড়িতে ছিল। তখনই বোধহয় দেওয়া হয়েছে নামটা। সিধুজ্যাঠাই একমাত্র এদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, জ্যাঠা সঙ্গে একপাল শরণার্থী নিয়ে বাবার কাছে উঠেছিল। বাবা কাউকে ফেরায়নি। নীচে ঢাকা বারান্দায় সবার স্থান হয়েছিল। সিধুজ্যাঠার কথা মত ওপার থেকে নিয়ে আসা সোনাদানা সবাই মিলে বাবার কাছে গচ্ছিত রেখেছিল। বড়দার তখন সদ্য কৈশোর, সিধুজ্যাঠার সঙ্গে জমে গেল খুব। খুব গপ্পে মানুষ ছিল সিধুজ্যাঠা। পূর্ববঙ্গের গল্প বলে বলে সিধুজ্যাঠা দাদাকে ওপারের বাসিন্দা করে দিয়েছিল। বড়দা নীচে শরণার্থীদের সংসারে খাওয়া-দাওয়া করত। ওদের সঙ্গেই শুত। তার কিছুদিন আগে মা মারা গেছে বিকাশদের। সামান্য স্নেহ-আশ্রয়ের জন্যে দাদা কাঙাল ছিল, বাবাও তাই বাধা দিত না, দাদাকে মিশতে দিত ওদের সঙ্গে। বিকাশ বড়দার কাছে শুনেছে, সিধুজ্যাঠা নাকি দিনেরাতে কখনই ঘুমোত না। রাতে সদর দরজা খোলা রেখে রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থাকত। সিধুজ্যাঠার একটিই মাত্র সন্তান, মেয়ে। বর্ডার পেরনোর আগেই হারিয়ে গেছে।

দিন যেতে যেতে একসময় সিধুজ্যাঠাদের চলে যাওয়ার সময় এল। তারা যে যার নিজেদের মতন কাজ জোগাড় করেছে, আস্তানা জোগাড় করেছে। তারা বাবার কাছে সোনা ফেরত চাইল। বাবা ফেরত দিল, কিন্তু হিসেবে প্রচুর গণ্ডগোল। তারা বাবাকে চেপে ধরল, অর্ধেকের বেশি সোনার হিসেব পাওয়া যাচ্ছে না। বাবা সমস্তটাই অস্বীকার করল এবং ভাড়াটে গুণ্ডা দিয়ে মেরে তাদের তাড়িয়ে দিল। এ সমস্ত ঘটনা চোখের সামনে দেখেছে বড়দা। সিধুজ্যাঠা অভিশাপ দিতে দিতে সদর পেরিয়েছে। তারপর থেকেই বড়দার সঙ্গে বাবার ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হল। বড়দা বাড়িতে প্রায় থাকতই না। কখনও মামার বাড়ি, কখনও দাদার কোনও বন্ধুর বাড়ি। মাঝেমধ্যে বাড়ি ফিরে আসত। নিজের ছোটভাই বিকাশের সঙ্গেই সম্পর্কটা ছিল সহজ। ছোটভাইকে সামনে নিয়ে বসত, নানা দেশের গল্প। নানা পরিকল্পনার গল্প। দাদার সমস্ত পরিকল্পনা জুড়ে থাকত, কী করে এবাড়ির আনুকূল্য ছাড়া জীবনটা যাপন করা যায়। বিকাশকে বলত, 'তাড়াতাড়ি বড় হ, তোকে এ অভিশপ্ত বাড়ি থেকে নিয়ে যাব। এ বাড়ির বাতাসে কাটাপড়া দেশের মানুষের দীর্ঘশ্বাস মিশে আছে।' দাদা যা চেয়েছিল তা হল না। সমস্ত ব্যর্থ হয়ে দাদাই ফিরে এল এ বাড়িতে। দাদার ফিরে আসা

বাবার পক্ষে ভাল হয়নি। বাবা দাদার মুখোমুখি হতে চাইত না। বাবা তখন প্রায়ই লাল শালু পরে থাকতেন। কালীভক্ত। এখন যেখানে বিকাশের সাইকেল ফ্যাক্টরি সেখানে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করা ছিল। এক কালীপুজোর রাত্তিরে বাবার সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া হল বড়দার। বিকাশ বিশাল থামের আড়াল থেকে শুনছিল সে ঝগড়া। কুলপুরোহিত শ্রদ্ধানন্দ কাকা মূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করছেন। জোরে জোরে মন্ত্রোচারণ চলছে। এই সময় বাড়ির সবাই কালীমূর্তির দিকে চেয়ে বসে থাকত। মন্ত্র শেষ হলে, শ্রদ্ধানন্দ কাকা বলতেন, 'মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখো, মা কিরম জ্যান্ত হয়ে গেছে। মা হাসছে।' বিকাশরা যেন সত্যিই দেখতে পেত, মা কালীর মুখটা পালটে গেছে। সত্যিই জীবন্ত মনে হচ্ছে। বাবার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ঘটনাচক্রে সেদিন বাবার পাশে দাদা দাঁড়িয়ে ছিল। বাবা আবেগে বলে উঠলেন, 'দেখেছ প্রভাস, মায়ের মুখটা কেমন জীবন্ত মনে হচ্ছে।' দাদা বলে উঠল, 'না আমি দেখছি না। আমি দেখতে পাচ্ছি মায়ের হাতে কাটা মুণ্ডুটা জীবন্ত হয়ে গেছে। সিধু জ্যাঠার মুণ্ডু। মুণ্ডুটা কাঁদছে, দেশ হারিয়ে গেছে, সন্তান হারিয়ে গেছে, এখানে এসে সম্পদ।' বাবা প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, 'প্রভাস, তুমি কি আমাকে বাঁচতে দেবে না?' বাবা চারদিনের মাথায় মারা গেলেন। সেরিব্রাল অ্যাটাক। বাবার দেহ সন্তান ও পরিজনের কাঁধে চলেছে। বড়দা কাঁধ দেয়নি। বড়দার মাথায় কালীমূর্তি। বাবার দেহ আগুন হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দাদাও কালীকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিল। দাদার মাথাটা কি তখন থেকেই খারাপ হয়ে যাওয়া শুরু হল। কখনও-সখনও বিকাশকে বলত, পাগলামি যেমন অনেক সময় বংশগতির মধ্যে প্রভাবিত হয়। বেইমানিও হয়। দাদা পাগল হয়ে যাওয়ার থেকেও বেইমান হয়ে যাওয়াকে ভয় পেত বেশি। এই যে মালতীর প্রতি আসক্তি, এ কি নিজের পাগলি বউয়ের সঙ্গে বেইমানি? পাগলি বউকে গোটা মানুষ হিসেবে গণ্য করা যায়? একজন সাদমাটা মানুষের মতো বিকাশেরও একটা সংসার করতে ইচ্ছে হয়। হল না। সিধুজ্যাঠার অভিশাপ? বড়দারও কোনও সংসার হল না, তা নিয়ে বড়দার কোনও আক্ষেপ নেই। বড়দা বলে সংসার একটা 'আইডিয়া'। ওপারের আত্মীয়রা যখন এবাড়ির নীচের তলায় রান্নাবান্না করত, তখন বড়দার ধাঁধা লেগে যেত, বুঝে উঠতেই পারত না, কে কার বউ, কে কার সন্তান। বিকাশ বড়দার মতন অতো দার্শনিক নয়। তাছাড়া বড়দা যুদ্ধ দেখেছে, দেশভাগ দেখেছে। এমনকি সত্তর দশকে দাদা এতদিন নিরুদ্দেশ ছিল যে বিকাশরা ধরে নিয়েছিল বড়দা পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে মারা গেছে। সেদিক থেকে বিকাশ এমনিই একটা গোবেচারা মানুষ, বিয়ে করে ঠকে যাওয়ার পর ভেবেছিল বাকি জীবনটা দুঃখ-টুঃখ করেই কেটে যাবে। মাঝে মাঝে কানাইদের শনিতলায় ঠেকে যেত। কানাইয়েরও বাচ্চাদের সাইকেল তৈরির ফ্যাক্টরি। কানাইকে নিজের একাকিত্বের কথা বলত বিকাশ। কিন্তু কানাই যে এত সিরিয়াসভাবে নেবে বিকাশ ভাবেনি। একদুপুরে হঠাৎই কানাই এক মহিলা নিয়ে বিকাশের কারখানায় এসেছিল। বিকাশকে আলাদা ডেকে কানে কানে বলেছিল, 'একে কাজে রাখ। মাইনে একটু বেশি দিবি। দুপুরে রান্না করে দেবে। মাঝেমধ্যে, চা, আর দিবানিদ্রাটা এর সঙ্গেই সেরে নিস। সব বলা আছে। গরিবের ঘর, বর পঙ্গু, একটা বাচ্চা আছে। তবে সন্ধেবেলা ছেড়ে দিস। ট্রেনে ফেরে সেই মোতিপুর। আমার বউটা একে টিকতে দিল না। তোর তো দরকারই, নিয়ে রাখ।' বিকাশের

তো বিশ্বাসই হচ্ছিল না। এমনিতে সে বিলো ব্যক্তিত্বের মানুষ। খারাপ পাড়ায় যাওয়ার ক্ষমতা ওর নেই। কিন্তু কানাই যে এভাবে সুখ বয়ে নিয়ে আসবে কে ভেবেছিল! সুখ চশমা পরে। সেই চশমা পরা মালতীর মুখ দেখে বিকাশের মনে হচ্ছিল। বুঝিবা কোনও স্কুলের দিদিমণি। একদুপুরে ওই চশমাই যখন খুলে নিল বিকাশ, তখন থেকেই বিকাশের কাছে সব স্পষ্ট হল। মালতীর কাছে ঝাপসা। রোজ সন্ধেয় বিকাশদের বাড়ি লাগোয়া নিমগাছে কাকেরা ফিরে এসেই কাঃ কাঃ করে। মালতী শোনে কাকেরা বলছে, বাড়ি যাঃ মালতী বাড়ি যাঃ...... তখম মালতী ফের চশমা পরে নয়।

কানাই ক-দিন শনিতলায় আসেনি। তাস খেলারত কানাইয়ের বন্ধুরা বলল, 'কানাইয়ের নাকি জন্ডিস হয়েছে।' একবার কি কানাইয়ের বাড়ি যাবে? ভাবল বিকাশ। তারপরই সিদ্ধান্ত পালটাল। অসুস্থ মানুষকে দেখতে যাওয়ার ছল করে মেয়েমানুষের খোঁজ নেয়াটা বিকাশের বেশ ছোট কাজ মনে হল। এখন বিকাশ কী করবে, বাড়ি ফিরে যাবে? কী করবে বাড়ি ফিরে গিয়ে। একা একা শুধু ছায়ার সঙ্গে থাকা। বিকাশের ছায়াও বোধহয় বেশ হাঁপিয়ে উঠেছে নিঃসঙ্গতায়। বিকাশের ভয় হয় এ ছায়া আবার কোনওদিন চলে না যায় বিকাশকে ছেড়ে। পাগলি বউ যখন চুপচাপ বসে থাকত, আর মাঝেমধ্যে কাঁদত, তখন বিকাশের বউয়ের সামনে বসে থাকা ছাড়া কিছুই করার থাকত না। কিন্তু বিকাশের ছায়া আর পাগলি বউয়ের ছায়া, কিন্তু নিজেদের মধ্যে কথা বলত। অনেক খুঁটিনাটি সাংসারিক কথা। বিকাশ বোধ করত সব। পাগলি, পাগলিই। তা বলে ছায়াটা তো পাগলি নয়। বাপের বাড়ি দিয়ে ফিরে আসার সময়, বউ যখন বাপের বাড়ির দরজার কাছে দাঁড়াল, তখন তার ছায়া এতটাই লম্বা হয়ে রাস্তায় পড়ল যেন বিকাশের আত্মা ছুঁয়ে ফেলবে।

বেশ সন্ধে হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরছে বিকাশ। সদরের কাছে আলোকিত ল্যাম্পপোস্টের আলোয় দেখতে পেল, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাগলি বউ রিকশায় উঠছে। এসেছিল বোধহয় বিকাশের খোঁজে। নিশ্চয়ই কিছু একটা চাই। প্রতিমাসে বিকাশ খরচ পাঠাচ্ছে। তবু হঠাৎ হঠাৎ চলে আসে, এটা ওটা চাইতে। আজ কী ধান্দায় এসেছে কে জানে। বিকাশ একটা ম্যাটাডোরের পিছনে লুকোল। রিকশাটা এদিকেই আসবে। কিন্তু কোথায় লুকোবে বিকাশ। বউ ঠিক দেখে নিয়েছে। রিকশা দাঁড়িয়েছে, বউ রিকশা থেকে ডাকছে—'এদিকে শোনো।' বিকাশ অনিচ্ছুক পায়ে এগিয়ে আসে। রিকশা থেকেই বউ বলে, 'ও বাড়ির গ্যাস সিলিন্ডারের পয়সা আমি দেব। টাকা দাও।'

'হঠাৎ! আমি তো টাকা পাঠাচ্ছি।'

'সে তো খাওয়া-পরার খরচা। পুড়ে মরার নয়। আমি জানি, ও বাড়ির সিলিন্ডার একদিন ফাটবে, আমার সামনে। আমি মরব। আমি নিজের স্বামীর পয়সায় পুড়ে মরতে চাই। দাওনা একশো চল্লিশ টাকা।'

এ ধরনের এলোপাথাড়ি কথা শোনা বিকাশের অভ্যেস আছে। ফলে সে নিরাসক্ত গলায় বলল, 'ঠিক আছে এখন তো হাতে টাকা নেই, আমি না হয় কাল তোমাদের বাড়ি দিয়ে আসব।' বউ বুঝল। রিকশা এগিয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে নিজের ঘরে ঢোকার সময় চোখে পড়ল বড়দার ঘরের দরজা খোলা।

দরজা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বড়দা মেঝেতে বসে আছে। বড়দার মুখোমুখি খাটে বসে আছে সেই মেয়েটা। দুজনের মধ্যে কোনও কথা নেই। সূর্য ডোবার পর মেয়েটাতো কখনও আসে না । আগে যখন মেয়েটা স্কুলে পড়ত, স্কুলছুটির পর রোজ দাদার সঙ্গে দেখা করে যেত। দাদাই সন্ধে নামার আগে মেয়েটাকে ওর মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিত। সেই মেয়ে এখন কেন। কিছু কি ঘটেছে? বড়দার সাহায্য দরকার? বিকাশ বড়দার ঘরের দরজায় দাঁড়ায়।

'বড়দা।'

বড়দা মুখ ঘুরিয়ে দেখেন। —'আয়।' বিকাশ ঘরে আসে। চোখ পড়ে মেয়েটার দিকে, ও শুধু চুপচাপ বসে নেই, কাঁদছে। নিঃশব্দে।

'কী ব্যপার বড়দা। এরকম থম মেরে বসে আছ কেন? আর ও কাঁদছে কেন? কি হয়েছে?'

বড়দা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, 'সুলতা এসেছে রাত্তিরে থাকবে বলে। এবার থেকে এখানেই থাকতে চায়।'

'থাকুক না।'

'হ্যাঁ থাকবেই তো। কিন্তু ও যে চাইছে ওর মাও এখানে এসে থাকুক।'

এইসময় মেয়েটা বলে উঠল, —'মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা।'

কী মিথ্যে! কীসের মিথ্যে! কিছুই বোঝে না বিকাশ।

'বড়দা ও কী বলছে?'

'ওর কথা ছাড়। বাচ্চা মেয়ে। আমি ভাবছি আমার এই আটান্ন বছর বয়সে আবার সংসার আমায় হাতছানি দিচ্ছে, বলছে ঘর বাঁধো। এইটুকু বাচ্চা মেয়ে উদ্যোগ নিচ্ছে ঘরবাঁধার। যে মেয়েটা নিজেই কোনও বৈধ সংসারে জন্মায়নি। মেয়েটা আবার কাঁদতে কাঁদতে বলে উঠল, —কাকু, বাবু পাগল হয়ে গেছে। কিছুতেই বিশ্বাস যাচ্ছে না। উলটোপালটা বকছে।'

বড়দা তখনও কিছু বলে যাচ্ছে আর মাথা নাড়ছে, হাসছে। বড়দা কি যেন অঘটন অস্বীকার করতে চাইছে? কিছু কি খবর এনেছে মেয়েটা? বিকাশ সুলতার সামনে এসে দাঁড়ায়

'কী হয়েছে রে?' সুলতা কিছুই বলতে পারে না, হাউমাউ করে কান্নায় ভেঙে পড়ে। বিকাশ ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। সুলতা, বড়দা দুজনে কেমন যেন ছায়াদের ভাষায় কথা বলছে; ছায়াদের ভাষা বিকাশ বোঝে না।

মোতিপুর যাবে? বিকাশের কথায় রিকশাওয়ালা ঘাড় হেলাল। রিকশা চলছে। রাস্তায় দু-পাশে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া গাছ। গাছগুলো সন্ধের পোশাক পরেছে। গাছে ফিরে আসছে পাখিরা। বহুদূর অন্তর অন্তর একটা ল্যাম্পপোস্ট। কোনওটা জ্বলছে, কোনওটা জ্বলছে না। কী পরিচ্ছন্ন আকাশ, অগণন নক্ষত্র।এ গ্রামের গা দিয়ে নিশ্চয়ই কোনও নদী গেছে। এসবের মধ্যে বিকাশের নিজেকে অযাচিত মনে হচ্ছে। ওর মাথায় ধান্দা। মালতীর খোঁজ নিতে এসেছে। এটা কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে? আজ দুপুর অবধি অপেক্ষা করে বিকাশ যখন দেখল মালতী এল না, তখন আর কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। স্টেশনে এসে

উঠে পড়ল ট্রেনে। ট্রেনের জানলা দিয়ে সরে যাচ্ছিল দৃশ্যপট, সরে যাচ্ছিল বিকেলের রং। বিকাশ অনেকদিন পর কোথাও চলেছে। দীর্ঘ রাস্তা। রিকশা চলছে তো চলছেই। একসময় মোতিপুর এল। জলা জায়গা। রিকশার ভাড়া মিটিয়ে এগিয়ে গেল বিকাশ। সামনে টিমটিমে সিগারেটের গুমটি। ওখানেই জিজ্ঞেস করে জানতে পারল অনাদি মণ্ডলের বাড়ি। একতলা টালির চাল। দরজায় পরিষ্কার পর্দা ঝুলছে। এই জীর্ণ বাড়ির পর্দাটা মালতীর চশমার মতন। চশমা পরলেই মালতীকে যেমন দিদিমণি লাগে তেমনি এই পর্দাটাও এবাড়িতে ঢোকার আগে সমীহ আদায় করে নিচ্ছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে, একটা লোক আর একটা বাচ্চা মেয়ে লুডো খেলছে। লোকটার একটা হাত কাটা। কবজি থেকে নেই। মালতী বলেছিল, বোমা বানাতে গিয়ে নাকি উড়ে গিয়েছিল। কবজির কাছে কিছুটা চিরে আঙুলের বিকল্প করা হয়েছে। সেই বিকল্প আঙুলে লোকটা ছক্কার কৌটো নাড়ছে। কী বলে ডাকবে বিকাশ, মালতী, মালতী আছে? সেটা কি ঠিক হবে? আবার হঠাৎ খেয়াল হল, মালতী নামটা নকল নয়তো। ফলে বিকাশ একটু গলা খাঁকারি দিল। লুডো খেলোয়াড় দুজন মুখ তুলে তাকাল। ছোট্ট মেয়েটা এগিয়ে এল দরজার কাছে—'কাকে চাই?'

'এটা কি অনাদি মণ্ডলের বাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার মা বাড়ি আছেন?'

'দাঁড়ান। ওমা ওমা তোমাকে একটা লোক ডাকছে।' বলতে বলতে মেয়েটা ঘরে ঢুকে পড়ল। সেই চশমা-পরা মালতী আঁচলে হাত মুছতে মুছতে দরজার কাছে এল।

'আরেঃ আপনি! ভেতরে আসুন।'

বিকাশ চটি ছেড়ে ঘরে ঢুকল। মালতী আলাপ করিয়ে দিল বরের সঙ্গে, মেয়ের সঙ্গে। একটা পুরনো চেয়ারে বিকাশ বসেছে। মালতীর স্বামীই মালতীর হয়ে কাজে না যাওয়ার অজুহাত দিচ্ছে।

'আসলে কাল অবধি মেয়েটার জ্বর ছিল। আমি পঙ্গুমানুষ, তাই মালতীকে বলেছিলাম কাজে না যেতে। তবে কাল থেকে নিশ্চয়ই যাবে। আপনার বেশ ক্ষতি হল কাজের।'

'না না ঠিক আছে।' বিকাশ লাজুক হল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই এখানে আসার যুক্তি খুঁজে পেয়ে বলল, 'মালতীই বলছিল মেয়েটার শরীর ভাল যাচ্ছে না, তারপরই ডুব মারল। আর আমার কারখানার ওয়ার্কাররা আমার আত্মীয়ের মতো, দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। চলে এলাম।' অনাদি একটু অবাক হল। বলল, 'মালতী কী করে জানল মেয়ের শরীর খারাপ! ওতো পরশু কাজ থেকে এসে দেখল, মেয়ের ধুমজ্বর। তার আগে মেয়ে তো দিব্যি হাসছিল, খেলছিল।' বিকাশের মিথ্যেটা বেকায়দায় পড়ে যাচ্ছে দেখে মালতীই সামাল দিল।—'আমাদের মায়ের মন। আমরা ঠিক বুঝতে পারি ছেলেমেয়ের শরীরের ধাত। মেয়েটা ক-দিন ধরেই শীত করছে শীত করছে বলছিল।'

অনাদি আশ্বস্ত হল। বিকাশও হালকা হল।

অনাদি বলল, 'আমি একটু বাইরে থেকে আসছি।'

বিকাশ বলল, 'আমি কিন্তু কিছু খাব না।'

'না না তা কী করে হয়। আমি যাব আর আসব।' পাঞ্জাবি পরে চটি গলিয়ে অনাদি বেরিয়ে গেল। বাড়ি চুপচাপ। মালতী সরাসরি তাকিয়ে আছে বিকাশের দিকে। বোধহয় কিছু বলবে। বাচ্চা মেয়েটাও সন্দিগ্ধ চোখে দেখছে বিকাশকে। বাইরে আঁধার, ডোবা, ঝিঁ-ঝির ডাক ভেসে আসছে। বিকাশের নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হয়।

'আপনার কারখানায় তো অনেকেই ছুটি নেয়। আমার কি ছুটি নেই?'

বিকাশ মাথা নিচু করে নেয়। কী বলবে বিকাশ, আমি তোমাকে ক-দিন না দেখতে পেয়ে আর থাকতে পারিনি চলে এসেছি। একথা শুনে মালতী যদি বলে, আমাকে না দেখতে পেয়ে। নাকি আমার শরীর না পেয়ে? বিকাশ মাথা নিচু করেই আছে। বিকাশের এ ভঙ্গী দেখে মালতীর মেয়েটা একটু সহজ হয়েছে। ও বিকাশের কাছে এসে হাঁটুতে হাত রেখে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি লুডো খেলতেস পারো?'

'পারি।'

'তবে এসো।' বলে বিকাশকে চেয়ার থেকে মাটিতে নামায়। ইতিমধ্যে অনাদি এসে গেছে। হাতে ঠোঙা।

'বুঝলেন স্যার, এমন অজ জায়গায় ভাল মিষ্টির দোকান নেই। তাও এই জায়গার দাম চল্লিশ হাজার টাকা কাঠা হয়ে গেছে। ক-টা বেগুনিই নিয়ে এলাম। গরম ভাজছিল। মালতী এই নাও, মুড়ি দিয়ে দাও তো।'

অনাদি গুছিয়ে বসল মেঝেতে। তারপর বেশ গল্পগাছা হতে লাগল। কথায় কথায় অনাদি জানাল, ওদের এই বাড়ি আর বেশিদিন থাকছে না। এখানকার জমির মালিক ভুলেই গিয়েছিল এই জলা-জায়গার কথা। জমির দাম হু হু করে বাড়ছে দেখে মালিকের টনক নড়েছে। এখন পার্টি মারফত, প্রশাসন মারফত মালিক চাপ দিচ্ছে এই উদ্বাস্তু কলোনি ফাঁকা করার জন্যে। এরপর কোথায় যাব কে জানে।' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল অনাদি।

বিকাশ নেহাতই ভরসা দেওয়ার জন্যে বলে ফেলল, 'কোনও চিন্তা করবেন না। তেমন দরকার পড়লে ক-দিনের জন্যে আমাদের কলকাতার বাড়িতে গিয়েও থাকতে পারেন। আমাদের নীচের তলাটা ফাঁকাই থাকে।' কথাগুলোই বলেই মনে হল, বিকাশের গলায় ওর বাবা কথা বলে উঠল। আবার যেন একটা সুযোগ এসেছে শরণার্থীদের নিঃস্ব করার। কিন্তু অনাদির তো সম্পদ বলতে কিছুই নেই। তাহলে কি অবচেতনে মালতীকে ছিনিয়ে নেওয়ার কথা ভাবছে বিকাশ। নিজের অবচেতনে লোভ দেখে বিকাশ থম মেরে যায়। এর মাঝে মালতী মুড়ি মেখে এনে দিয়েছে। মুড়ি-বেগুনি খাওয়া চলছে। অনাদির চিবুকে একটা মুড়ি লেগে আছে, তাই দেখে বিকাশও নিজের চিবুকে হাত বুলিয়ে একটা মুড়ি পায়। মালতীর মেখে দেওয়া মুড়ি এখন বিকাশের অনাদির মুখে-চিবুকে। মুড়ি লালাসিক্ত হচ্ছে, দুজনে তারিয়ে তারিয়ে চিবুচ্ছে। একসময় মালতীই তাড়া দিল, 'এবার বাড়ি ফিরুন, ট্রেন পাবেন না।' বিকাশ সম্বিত ফিরে পেয়ে, উঠে পড়ে। মেয়েটা বলে, 'কাকু আবার আসবে তো।'

'আসব।' বিকাশ তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায় এসে একটাও রিকশা পাওয়া গেল না। হাঁটতেই লাগল বিকাশ। হাঁটতে হাঁটতে বিকাশের খেয়াল হল, ও আসলে দৌড়চ্ছে, পালাচ্ছে। মাঝেমধ্যে পিছন ফিরে দেখছে কেউ আসছে কিনা। অনাদি, মালতী যদি বিকাশকে

বিশ্বাস করে আজই বোঁচকা-বুঁচকি নিয়ে কলকাতার দিকে রওনা দেয়।

সারা ঘুম জুড়ে বিকাশ দেখল, ওদের সদর পেরিয়ে অনাদি, মালতী ঢুকে আসছে। ওদের পিছন পিছন আরও লোক আসছে। সবার কাঁধে, কাঁধে বোঁচকা-বুচকি কাচ্চা-বাচ্চা। গ্রাম থেকে, কলোনি থেকে ফুটপাত থেকে ক্রমাগত লোক আসছে। ভরে গেছে নীচতলা। এত মানুষকে কোথায় জায়গা দেবে বিকাশ? ঘুম ভেঙে যায়। ঘেমে নেয়ে গেছে। দরজা খুলে হাওয়ায় আসে। বড়দার ঘরে আলো জ্বলছে। এখনও জেগে আছে। বড়দার ঘরে যায় বিকাশ। বড়দা নেই মেয়েটা বসে আছে।

'কী ব্যাপার, বড়দা কোথায় গেল?'

মেয়েটা কান্নাধরা গলায় বলল, 'সদরে দাঁড়িয়ে আছে।'

'কেন?'

'বলছে, মা আসবে। কিছুতেই বিশ্বাস যাচ্ছে না মা মরে গেছে।'

'তার মানে?'

'হ্যাঁ গো কাকু, মা মরে গেছে। আমি কাল এসেছিলাম না, মা তখন হাসপাতালে মরে পড়ে আছে। বাবুকে কত করে বললাম, একবার অন্তত চলো লাস্ট দেখা দেখতে। কিছুতেই গেল না। খালি উলটোপালটা বলতে লাগল। বাবু বোধহয় পাগলা হয়ে গেছে। আমি কার কাছে থাকব কাকু?'

আবার একজন শরণার্থী। বিকাশ সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আলো পাঁচিল ডিঙিয়ে চাতালে পড়ে আছে। সেখানেই বসে আছে বড়দা। সামনে সদর খোলা শুধু হাওয়ারা যাতায়াত করছে। দাদা যেন সিধুজ্যাঠার মতো বসে আছে। সিধুজ্যাঠা তার হারিয়ে যাওয়া মেয়ের অপেক্ষায় এইভাবে বসে থাকত। এসব দাদার কাছ থেকেই শোনা। বিকাশ দাদা পিঠ ছোঁয়।—'আয় বোস।' দাদা সরে গিয়ে জায়গা দেয় বিকাশকে।

'দাদা ওপরে চলো।'

'আর একটু দাঁড়া। এবার বোধহয় এসে যাবে।'

'দাদা, স্বাভাবিক হও। শান্ত হও।'

দাদা শূন্য উঠোনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'জানিস বিকাশ আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল সুলতার মা এখানে এসে থাকুক। কিন্তু এবাড়ির অন্য লোকেদের ভয়ে আনিনি। এখন আমি ডিটারমাইন্ড। সুলতার মা থাকবে। সুলতা থাকবে। তোর বউকেও তুই নিয়ে আয়। মালতীকেও নিয়ে আয় ওর পরিবার সমেত। এই নীচতলায় আমরা রান্না করব, খাব, সংসার করব। সেই শরণার্থীদের সংসারের মতন। আবার ভরে উঠবে উঠোন। কী রে রাজি তো?'

বিকাশ বোঝে, বড়দা বর্ডার পেরিয়ে গেছে। স্বাভাবিক মস্তিষ্কের বর্ডার। বড়দা বাবাকে ভুলতে পারল না। সিধুজ্যাঠাকে ভুলতে পারল না। দেশভাগ শেষমেশ ভুলতেই পারল না।



এবার পুজোয়

প্রচেত গুপ্ত

অভিমান হলে এক-একটা মানুষ এক এক রকম আচরণ করে। কেউ মুখ ঘুরিয়ে রাখে। কেউ উঠে চলে যায় ছন্দার ঘটনা অন্যরকম। অভিমান হলে সে মুচকি হাসে। মুচকি হাসলে এই কিশোরীটিকে বড় সুন্দর দেখায়। এখনও দেখাচ্ছে। হাসিমুখে ছন্দা বলল, 'বাবা, তাহলে তুমি কিছুতেই রাজি হচ্ছ না? এটাই তোমার ফাইনাল?'

কৃষ্ণেন্দু টিভি থেকে মুখ না সরিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাই। এটিই আমার ফাইনাল।'

ছন্দা ফিক করে হাসল। এর মানে তার অভিমান আর একটু বেড়েছে। বাড়বারই কথা। একটু আগে তার প্রিয়তম মানুষটি তার যে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করছে সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, এর সঙ্গে তার প্রেস্টিজ জড়িয়ে আছে। সে তার বন্ধুদের বলে এসেছে, বাবা অবশ্যই রাজি হবে। শুধু রাজি হবে না, শুনলেই লাফিয়ে উঠবে! সেই বাবার এই নিস্পৃহ অবস্থা! এই বয়সে সব কিছু হেলাফেলা করা যায়, কিন্তু প্রেস্টিজ হেলাফেলা করা যায় না। বাবা কি বিষয়টা বুঝতে পারল না? মনে হচ্ছে না পারছে। একটু চুপ করে ছন্দা বলল, 'বাবা, কেন ফাইনাল কেন? রিখিয়া, মেখলা, কাবেরী, টুটুদা, ভুটুস সবার বাবাই তো পার্টিসিপেট করছে। তুমি করবে না কেন? আমি অত আশা করে তোমার নাম দিলাম।'

কৃষ্ণেন্দু বিরক্ত হল, সেই বিরক্ত ভাব চোখেমুখে ফুটল। বলল, 'তোমার মতো একটা বুদ্ধিমতী মেয়ে এ রকম কাজ কেন করল সেটাই তো বুঝতে পারছি না। নাম দেওয়ার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। সবাই পাগলামি করলে তোমার বাবাকে করতে হবে?'

সামনের নিচু টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে ছন্দা স্যুপের বাটিটা তুলল। শালপাতার আদলে তৈরি এই বাটিগুলো চমৎকার দেখতে। চেহারায় একটা বুনো এফেক্ট আছে। চামচটাও সে রকম। ঠিক যেন একটা পাতা! ছন্দা রোজ রাতে খেতে বসার আগে এই স্যুপটা খায় এবং বাবার সঙ্গে জরুরি কথা সারে।

পাতা চামচে ছোট্ট চুমুক দিয়ে ছন্দা বলল, 'এটা তুমি কী বলছ বাবা? পাগলামি কেন হবে? উৎসবের দিনে সবাই মিলে হইচই করাটা পাগলামি? পুজোর সময় আমাদের এই

আবাসনে প্রত্যেক বছরই তো কিছু না কিছু হয়। নাটক, গান, আবৃত্তি। ছোট-বড় সকলের জন্য ব্যবস্থা থাকে। সেই যে একবার ছোটবেলায় আমাদের ছোট নদী আবৃত্তি করতে গিয়ে মাঝপথে আজ ধানের খেতে গেয়ে ফেলেছিলাম! মনে আছে?'

কৃষেন্দু আরও গম্ভীর গলায় বলল, 'কত কিছু হওয়া আর এটা হওয়া এক হল ছন্দা? নাটক, গানটানের একটা মনে আছে। এই ধরনের পারফরমেন্সের মধ্যে দিয়ে অনেকের ভেতরের চাপা থাকা গুণগুলো বেরিয়ে আসে। কিন্তু এসব কী? যত্তোসব ছেলেমানুষি। পুজো কমিটিতে কারা আছে এবার? জি ব্লকের সুধাংশুবাবু সেক্রেটারি না? কাদের মাথা থেকে এসব বেরিয়েছে।'

'বাবা, তুমি মিথ্যে রাগ করছ। এবারের আইটেমগুলো যদি শোন তুমি আনন্দে এত জোর লাফিয়ে উঠবে যে ছাদে মাথা ঠুকে যেতে পারে। তুমি কী শুনবে? দয়া করে তুমি যদি টিভির সাউন্ডটা একটু কমাও তা হলে তোমাকে শোনাতে পারি।'

কৃষ্ণেন্দু টিভির আওয়াজ কমাতে কমাতে বলল, 'শোনাতে পার তবে তাতে আমার মত বদলাবে না।'

ছন্দা ভাষণ দেওয়ার কায়দায় হাত নেড়ে বলতে শুরু করল —

'এবার পুজোয় ফাংশানগুলো একটু অন্যরকম হচ্ছে। সামথিং ডিফারেন্ট। সেই চলতি গান, কবিতা, নাটক নয়। সব কিছুর মধ্যেই একটা ফোক আর ভিলেজ টাচ থাকবে। ফোক আর ভিলেজ টাচ মানে বুঝতে পারছ তো? লোক অনুষ্ঠান আর গ্রাম গ্রাম ব্যাপার। লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য যেমন হবে, তেমনি আবার আলপনা, ধনুচি নাচ, পিঠে তৈরি— এ সব গেম্‌সও থাকছে।'

কৃষ্ণেন্দু সোজা হয়ে বসল। চোখ বড়ো বড়ো করে বলল, 'গেমস!'

ছন্দা হাসতে হাসতে বলল, 'বাবা, এবার কিন্তু আমি কেঁদে ফেলব। তুমি এমন একটা ভান করছে যে গেম্‌স মানেও জানো না। সবাই বলছিল, গেম লিস্টে অন্ত্যাক্ষরী, সং মেকিং আর হুজি বুজি লিস্টে ঢোকানো হোক। সেই নিয়ে একটা ঝগড়া হল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে, ওগুলোও থাকবে আবার এগুলোও থাকবে।'

'হুজি-বুজি! হুজি-বুজিটা কী জিজ্ঞেস করলে তুমি রেগে যাবে ছন্দা?'

ছন্দা ঘাড় নেড়ে বলল, 'না, রাগব না। তবে বলবও না। হুজি-বুজি খেলাটা বড়দের আগে থেকে বলা যাবে না। তা হলে খেলা দেখার মজাটা নষ্ট হয়ে যায়। এর সঙ্গে আমাদের মতো টিন এজারদের জন্য থাকছে আলপনা কম্পিটিশন। মা-কাকিমারা করবে পিঠে তৈরির লড়াই। আর তোমাদের জন্য ধুনুচি নাচ। কেমন হয়েছে?'

কৃষ্ণেন্দু মুখটাকে তেতো খাওয়ার মতো কুঁচকে বলল, 'খুব খারাপ। অতি জঘন্য। এসবের মানে কী? আমি যদি এই আবাসনের পুজো কমিটিতে থাকতাম সব বাতিল করে দিতাম। এগুলো ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু ছেলেমানুষি নয়, মেকি, বানানো। গ্রাম ভালো লাগে তো গ্রামে যাও না বাবা। দু-চারদিন বেড়িয়ে এস। হ্যারিকেন আর মশার কামড় কেমন লাগে দেখবে। ফ্লাই-ওভারের ধারের ফ্ল্যাটে বসে একতারা বাজানোর কী আছে?'

ছন্দা উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'চিন্তা কোরো না বাবা। একতারার ব্যবস্থাও থাকছে। এবার

আমরা যে ব্যান্ড আনছি, তার নাম একতারা। নাম শুনেছ? অল বাউল সঙ্গীত। সপ্তমীর রাতে ওদের পারফরমেন্স। তোমাদের ধুনুচি নৃত্য অষ্টমীর সন্ধেতে।'

'তোমাদের মানে! ছন্দা, শুনে রাখ, কোনও রকম লোক হাসানোতে আমি নেই। রাস্তায় ধুনুচি হাতে নাচতে পারব না।'

ছন্দা বলল, 'রাস্তায় কোথায়? প্যান্ডেলের ভেতরে তো।'

'ওই একই হল। বরং একটু বেশিই হল। সং সেজে নাচানাচি করলে অনেকেই পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। প্যান্ডেলে দাঁড়িয়ে পড়বে।'

ছন্দা হাত নেড়ে বলল, 'এ মা, দাঁড়িয়ে পড়বে কেন? আমরা তো বসার জায়গা রাখছি। ছন্দা এরপর গলা নামিয়ে বলল, 'একটা সিক্রেট কথা তোমায় বলে রাখছি বাবা। গোটা ব্যাপারটা তপুদা হ্যান্ডিক্যামে ধরে রাখবে। পরে প্রত্যেককে একটা করে সিডি দেওয়া হবে। তবে বিনি পয়সায় নয়। সিডির দাম ঠিক হয়ে গেছে। আমাদের আলপনা কম্পিটিশনের দাম হয়েছে একশো টাকা। মায়েদের পিঠে তৈরির সিডির জন্য দিতে হবে একশো পঁচিশ। সবথেকে কস্টলি হচ্ছে ধুনুচি নাচের সিডি। ওয়ান হানড্রেড অ্যান্ড ফিফটি। ওই প্রোগ্রামটি সবথেকে এক্সাইটিং কী না। ইতিমধ্যেই সাতাশটা বুকিং হয়ে গেছে। ভুটুস তো বলেছে, ওর বাবা নাচ কালেকশান রাখার জন্য তিনশো টাকা পর্যন্ত খরচ করতে রাজি। হি হি আর কিছু জানতে চাও বাবা?'

কৃষ্ণেন্দু থমথমে গলায় বলল, 'আরেকটা জিনিস জানতে চাইছি। এসবের প্ল্যান কার? মানে পরিকল্পনা কে করেছে?' ছন্দা এগিয়ে গেল বাবার কাছে। কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'মায়ের। হি হি।'

একটু চুপ করে থেকে কৃষ্ণেন্দু বলল, 'তোমার মা কেন এরকম একটা অদ্ভুত পরিকল্পনা করেছে তুমি জান ছন্দা?'

ছন্দা গম্ভীর গলায় বলল, 'জানি বাবা। কিন্তু বলব না। ওটা বড়দের ব্যাপার।'

কৃষ্ণেন্দু সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, 'প্যান্ডেলে নাচানাচির পরিকল্পনা তোমার?' বনানী আয়নার সামনে বসে রাতের ক্রিম মাখছে। হাসতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল। রাত ক্রিম মাখার সময়ে হাসি কান্নার বারণ। বলল, 'হ্যাঁ আমার। ভালো লাগছে না? বেশ অন্যরকম। আমাদের তো এরকম কখনও হয়নি। সবাই খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করল। অ্যাই তুমি কিন্তু আবার প্যান্ট-শার্ট পরে নাচতে যেও না। ছবিতে বোকার মতো লাগবে। হাতে ধুনুচি, গায়ে এক্সিকিউটিভ শার্ট।'

কৃষ্ণেন্দু সদ্য ধরানো সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল। উঠে গিয়ে এ.সি. মেশিনটা চালিয়ে দিয়ে খাটে এসে বসল। বলল, 'তুমি কী ভাবছ বনানী? আমি নাচব?'

বনানী এবার মুখ ঘোরাল। রাতের ক্রিমে কি চোখ বড় করা বারণ আছে? থাকলে থাক। বনানী দুটো চোখই বড় করে অবাক গলায় বলল, 'ও মা তুমি নাচবে না মানে! তোমার জন্যই তো আইটেমটা রাখলাম।'

কৃষ্ণেন্দু ঠান্ডা গলায় বলল, 'আমার জন্য। কেন? তোমাদের কী ধারণা আমি খুব ভালো

নাচতে পারি? এই যে রোজ সকালে আমি অফিসে গাড়ি চালিয়ে যাই, কেন যাই? সেখানে গিয়ে নাচব বলে? এই যে মাসে একদিন করে মুম্বাইতে বোর্ড মিটিং হয়। আমাকে প্লেনে উড়ে যেতে হয়। চেয়ারম্যান আসেন। মিটিংয়ে আমি কী করি? নাচি?' বনানী আর পারল না। রাতক্রিমের নিয়ম ভেঙে হাসল। বলল, 'এরকম রাগ রাগ ভাবে বলছ কেন?'

'কী বলব? নেচে নেচে? শুধু প্ল্যান করনি, মেয়েটাকেও তাতিয়েছ। মনে হচ্ছে, সে তার বাবাকে না নাচিয়ে ছাড়বে না। চলো, ওইদিন আমরা কোথাও ঘুরে আসি। ছন্দার হাত থেকে বাঁচার আর কোনও পথ নেই। ভোরে কোথাও বেরিয়ে যাব, ফিরব একেবারে রাতে। বাইরে কোথাও খাব। ততক্ষণে এখানকার রং তামাশা শেষ হয়ে যাবে।' কথা থামিয়ে কৃষ্ণেন্দু খাট ছেড়ে উঠে এসে স্ত্রীর পাশে বসল। কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'চলো না, তিনজনে মিলে সত্যি সত্যিই একটা গ্রামের পুজো দেখে আসি। কাছাকাছি কোনও গ্রাম। গাড়ি নিয়ে চলে যাব। সন্ধ্যার পর ব্যাক। ছন্দা তো গ্রামের পুজো দেখেনি কখনও।'

বনানীর ক্রিম মাখা হয়ে গেছে। এবার সে তুলো দিয়ে গোটা ক্রিমটা মুছে ফেলবে। এই জিনিসের এটাই মজা। লাগাতে হয়, আবার সঙ্গে সঙ্গে তুলেও ফেলতে হয়।

তুলো ঘষতে ঘষতে বনানী বলল, 'পুজোর সময় গ্রাম দেখতে গ্রামে যেতে হবে কেন? আজকাল পুজোর সময়ে কলকাতার অলিতে-গলিতে অজস্র গ্রাম হয়। মাটির বাড়ি। সুপুরি গাছ। খড়ের চাল। শুনেছি গত বছর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের পাশের একটা গ্রামে নাকি আলপথ ধরে ঢোকার ব্যবস্থা হয়েছিল। সরু আলপথ। দুপাশে ধানখেত। খেতে গাড়ি পার্কিং। বেশ কিছুটা আলপথ ধরে হেঁটে গেলে তবে পুজো মণ্ডপ। সেই আলপথে কাদা ছিল, এমনকি চোরকাঁটা পর্যন্ত ছিল। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। ওখানে ঝিঁ-ঝিঁর ডাকেরও আয়োজন করা হয়। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী মাইকে আর কিছু বাজেনি। ওনলি ঝিঁ-ঝিঁ। সত্যিকারের গ্রামে গিয়ে এর থেকে বেশি তুমি কী পাবে?'

কৃষ্ণেন্দু ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। না, মনে হচ্ছে না পারা যাবে। এবার এদের এখান থেকে সরানো যাবে না। বনানী উঠে পড়ল। বলল, 'নাও অলোটা নিভিয়ে দাও। পুজোর কটা দিন আমি গ্রাম, শহর কোথাও যাব না। এখান থেকে নড়ছি না। এত বড় একটা প্রোগ্রামের রেসপনসিবিলিটি নিয়েছি। দায়িত্ব আগে না মজা আগে? অ্যাই শোন, আমি না পিঠে তৈরির কম্পিটিশনে চিতই পিঠে বানাব ঠিক করেছি। রবিবার ভবানীপুরে ছোড়দির শাশুড়ির কাছে ট্রেনিং নিতে যাব। কী রকম হবে বলো তো?'

কৃষ্ণেন্দু ফিসফিস করে বলল, 'খুবই ভাল হবে। শুধু একটা কথা বল তো বনানী, ধুনুচি নাচের প্ল্যানটা তোমার মাথায় এল কীভাবে? এ সব ছেলেমানুষদের মানায়। বুঝতে পারছি, সেদিন আমাকে ফ্ল্যাট ছেড়ে পালাতে হবে।'

বনানী বিছানায় উঠতে উঠতে বলল, 'তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ। এমন একটা ভাব করছ, আমি যেন তোমাকে ধরে-বেঁধে নাচাচ্ছি। তুমি বলেছিলে, তাই।'

'আমি বলেছিলাম! আমি কী বলেছিলাম?'

বনানী বালিশে মাথা রেখে পাশ ফিরল। গলা নামিয়ে বলল, 'তুমি সব ভুলে যাও। সেই যে বিয়ের পর পরই এক রাতে বলেছিলে না... মনে নেই? ওই যে আমি তোমাকে গান

শোনালাম। মনে পড়ছে? জানি পড়বে না। আমার কথা তোমার মনে পড়বে কেন? আমি গান করলাম। তুমি আহা উহু করলে। মনে পড়ছে? তারপর তুমিও বেসুরো গলায় একটা গান ধরলে। আমি বললাম, খুব খারাপ হচ্ছে। চুপ করো। তখন তুমি বললে, গান না পারলেও তুমি নাকি খুব ভাল নাচতে পারো। স্কুল-কলেজে পড়ার সময়ে পাড়ার পুজো প্যান্ডেলে ধুনুচি নিয়ে.... বলোনি তুমি? এবার দায়িত্ব পেয়ে ভাবলাম, আরে, তোমার ধুনুচি নাচ তো এখনও দেখা হয়নি। আইটেমটা ঢুকিয়ে দিলাম। যাক, অত ভাবতে হবে না। আমি ছন্দাকে বুঝিয়ে বলে দেব। ও তোমার নাম কেটে দেবে। এত চিন্তার কী আছে?'

ঘন নীল কোট-প্যান্টের সঙ্গে হালকা মেরুন টাই। পায়ের বাদামি জুতো চক চক করছে আয়নার মতো। ফুরফুরে চুলে হাত বোলাতে বোলাতে অফিসের করিডোর ধরে হেঁটে আসছে কৃষ্ণেন্দু। পাশে হাঁটছে তীর্থপতি সান্যাল। তারা সকালের ফ্লাইটে মুম্বাই এসেছে। একটু পরেই মিটিং। দুজনেই চাপা গলায় কথা বলছে। নিশ্চয়ই মিটিং শুরুর আগে জরুরি কিছু ঝালিয়ে নিচ্ছে।

তীর্থপতি বলল, 'তারপর কী হল স্যার।'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'কী আর হবে। একটা ধুনুচি হাত থেকে পড়ে গেল বলে তো আর থেমে যেতে পারি না। পুরনো ট্রিক্স অ্যাপ্লাই করলাম। নাচতে নাচতেই হাত বাড়ালাম। কে যেন আরেকটা এগিয়ে দিল। ব্যস্, চটাপট হাততালি।'

'ওয়ান্ডারফুল!'

'ওয়ান্ডারফুল কিনা বলতে পারব না। প্রাইজ তো ভাই পেলাম না। তবে শেষ হয়ে যাওয়ার পর দেখি, মেয়েটা খুব হাততালি দিচ্ছে। হা হা। বাবার নাচ দেখে হাততালি। ভাবো কাণ্ড।'

তীর্থপতি বলল, 'স্যার, আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি। কোনও জখমটখম ছাড়াই এই বয়সে এতক্ষণ ধরে নাচ...।'

কৃষ্ণেন্দু অল্প হাসল। বলল, 'না, সেরকম কিছু নয়। কোমরে একটা হালকা ব্যথা হয়েছে। তবে সেটা এনজয় করছি। নেক্সট উইকে সিডিটা হাতে পাব। একদিন এসো না সবাই মিলে দেখা যাবে!'



জন্মদিনের উপহার

উজ্জ্বলকুমার দাস

ঘড়িতে তখন ঠিক বেলা এগারোটা। সকাল দশটার মধ্যেই অরুণাভ অফিসে চলে গেছে। গার্গীর এখন শুয়ে বসে সময় কাটানো ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। মাঝে মাঝে দুপুরে খেয়ে নিয়ে নিউমার্কেটে শপিং করতে যায়। তাই আজকাল অবসর সময়ে যোগচর্চা করে, বডিকে স্লিম রাখতে চেষ্টা করে। আর তাছাড়া গার্গীর ছোটবেলা থেকেই রূপচর্চার উপর খুব ঝোঁক ছিল।

আজকাল অরুণাভ অফিস চলে যাওয়ার পর গার্গী সিডিপ্লেয়ারে কোনও একটা ডিস্ক্ চালিয়ে দিয়ে নিয়মিত অ্যারোবিক্‌স প্র্যাকটিস করে।

গার্গী-অরুণাভর বিয়ে প্রায় বছর পাঁচেক হয়ে গেল। ওরা ইচ্ছে করেই এখন পর্যন্ত সংসারে কোনও নতুন অতিথি আনেনি। মাঝে মাঝে গার্গী এ-নিয়ে অরুণাভর সঙ্গে ঝামেলা করে। গার্গীর এখন আর একা একা থাকতে ভাল লাগে না। কোনও ছেলেমেয়ে থাকলে তাকে নিয়ে বেশ কিছুটা সময় কেটে যেত তার। সেই নিয়ে গার্গীর মনে একটা কাঁটা বিধে থাকে সবসময়। তবে অরুণাভ ও গার্গীর মধ্যে খুব মিল আছে।

বিয়ের ছয়মাস পরেই অরুণাভ গল্‌ফ গ্রিনে ফ্ল্যাট কিনে চলে এসেছে। এখানে শ্বশুর, শাশুড়ি, ননদ বা বখাটে দেওর কেউ নেই। তার আর অরুণাভর এই দু-জনের ছোট্ট সংসার। দোতলার দক্ষিণ খোলা ফ্ল্যাট। এই ছোট্ট ফ্ল্যাটটায় হয়তো তার জীবনটা সুখেই কেটে যাবে। জানলার হালকা নীল রঙের পর্দাগুলো বাতাস লেগে আনন্দে ওড়াউড়ি করছে ঘরে একপাশে রট আয়রনের ডবল বেডের খাট। একপাশে একটা ছোট্ট আলমারি। দেওয়ালে চোখ জুড়ানো পেন্টিং-এ নীল সমুদ্র, গাঢ় সবুজ ঝাউগাছের সারি। আর আকাশে মালার মতো একরাশ সাদা মেঘ।

অ্যারোবিক্‌স করতে করতে মাঝে মাঝে ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে সে দাঁড়ায়। রূপচর্চা করে নিজের মুখটাকে আরও সুন্দর করে তুলতে চায় গার্গী।

ঠিক এই সময় কলিং বেলটা হঠাৎ হিন্দি গানের সুর তুলে বেজে উঠল। গার্গীও সেই গানের সঙ্গে তালে তাল দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দরজার আই হোলে গিয়ে চেয়ে রাখে।

দরজার ও পাশে দাঁড়িয়ে আছে একজন কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে। হাতে একটা সুন্দর খাম। গার্গী চিন্তা করতে থাকে কে এই ছেলেটা। ছেলেটা কি পোস্টম্যান। আবার ভাবল যদি পোস্টম্যানই হয়, তাহলে ওপরে উঠে আসবে কেন? ওতো তাহলে লেটার বক্সেই ফেলে চলে যেতে পারত। গার্গী এরকম সাত-পাঁচ ভাবতে শুরু করল। তার কারণ, কলকাতার এই ভর-দুপুরে কত কাণ্ডই না ঘটে চলেছে। হয়তো দরজা খুললেই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়বে ছেলেটা। তারপর পকেট থেকে পিস্তল বের করে হয়তো বলবে যা আছে সব কিছু দাও। এছাড়া আরও অনেক কিছুই ঘটতে পারে।

কী ভেবে গার্গী দরজাটা খুলে দিল। ছেলেটা গার্গীর হাতে একটা সুন্দর খাম দিয়ে বলল, 'সুশোভন সেনগুপ্ত এই খামটা আপনাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন।' গার্গী খামটা খুলতে না খুলতেই ছেলেটা চলে গেল।

গার্গী দরজাটা বন্ধ করে এসে সোফার উপর বসে চিঠিটা পড়তে শুরু করল।

গার্গী,

দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটা বছর কেটে গেছে। কাজের গন্ধ গায়ে মেখে এই কয়েকটা বছর যে কী করে কেটে গেল, তা ভাবতেই পারছি না। আজ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই ক্যালেন্ডারের দিকে তাকাতেই চোখটা আটকে গেল। তারিখটা ১ আগস্ট। আজ তোমার জন্মদিন। তাই আজ সকালবেলায় উঠেই তোমাকে চিঠি লিখছি। যেখান থেকে বসে তোমাকে এই চিঠি লিখছি, সেখান থেকে সুন্দরী কলকাতাটাকে অনেকখানি দেখা যায়। যেমন অনেক দূর থেকেও তোমাকে খুব ভালভাবে আমি দেখতে পাই। চিঠি লিখব লিখব করে তোমাকে চিঠি লেখাই হয়ে উঠছিল না। কিন্তু আজকের তারিখটা দেখে আর লোভ সামলাতে পারলাম না। তুমি হয়তো মনে মনে ভাবছ এই এস.এম.এস. আর ই-মেল-এর যুগে কেউ কি প্রেমপত্র লেখে? ডোডো পাখির মতো, ডাইনোসোরের মতো প্রেমপত্রও এই ধরণীতল থেকে লুপ্ত। তার পুরনো আখরগুলো ধুলোয় হয়েছে ধূলি। কিন্তু 'পোয়েট্রি অফ দি আর্থ ইজ নেভার ডেড' — বলেছিলেন কিটস, তাঁর প্রান্তিক প্রত্যয় থেকে। আমি কিটস-এর ভাবনার সঙ্গে আমার চিন্তার একটু বিশ্বাস জুড়ে দিতে চাই। তা হল— 'ভালবাসার চিঠি মৃত্যুহীন।' এই ইলেকট্রনিক্স-এর মিতভাষের যুগেও প্রেমপত্র আমাদের হৃদয়ের অবিরল ক্রমান্বিত।

তুমি হয়তো মনে মনে ভাবছ—'ইস্! প্রেমপত্র! কী প্রাচীনপন্থী তুমি!'

এমন বোদলেয়ারিয় 'আনুই' (annui) বা অনীহা আমার প্রতি তোমার মনে হতেই পারে। কিন্তু কখনও কখনও এ-যুগে অ্যানাক্রনিজম বা কালাসঙ্গতি-ই তো হতে পারে প্রেমপত্রের উজ্জ্বল উদ্ধার! কেউ আর প্রেমলিপি লেখে না বলেই, ভালবাসার চিঠি অ্যানাক্রনিস্টিক বলেই, সে চিঠি হৃদয়ের স্ফটিক বাক্সে সুরক্ষায় আশ্রিতও হতে পারে। যেমন মিউজিয়ামে অন্য গ্রহের পাথর বা ধুলো।

আজ সকালে উঠেই মেঘলা আকাশ দেখছি। মেঘলা আকাশে আরও মেঘ এসে জমেছে। তাদের জাহান্নামে উড়ে চলা দেখতে দেখতে কল্পনার সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে তোমার সুন্দর মুখখানা। সে মুখখানা আজও কীরকম যেন হেঁয়ালি করে, বিদ্রুপ করে। তখন এমনসময় ঈশান কোণ থেকে উড়ে আসা কোনও মেঘ আমার কল্পনার অতলান্তিক গভীরতায় পৌঁছে

দেয়। ঠিক এখন যেমন মেঘ করেছে। তারপরেই বর্ষা। কখনও হয়তো কড়-কড় করে বাজ পড়ল কোথাও। তুমি আঁকড়ে ধরলে বুক-পিঠ লোমোশ হাত সেই স্বপ্নের মানুষ অরুণাভকে। আর এখানে কোনও বাজের আওয়াজ হলে আমাকে আঁকড়ে ধরার কেউ নেই। আসলে জীবনের বেশিদূর গড়িয়ে যাওয়া সময় নিয়ে কখনও ভাবিনি।

জীবনের যেকোনও সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মানুষ বড় পরনির্ভরশীল হয়ে ওঠে। একটি পুরুষ খুঁজে বেড়ায় তার মনের মতো মানুষকে। কিন্তু কোথায় আছে সেজন। যাকেই বলতে চেয়েছি আমি তোমাকে ভালবাসি, গিয়ে দেখি আগে তাকে কেউ না কেউ ভালবেসে ফেলেছে। এটা আমার অবিবেচক নীতির খাম-খেয়ালিপনা।

আমার হঠাৎ আজ কেন জানি মনে হচ্ছে আজকের সকালটা আমি কিনেছি তোমার চেনা রোদ্দুরের কাছ থেকে। আজকের দুপুর, আজকের বিকেল, আজকের রাতটাও। তোমার ছবিটা আজও আমার কাছে রেখে দিয়েছি সযত্নে। আজ সকাল থেকে প্রাণভরে তোমাকে দেখছি। তোমার ওই মুখটার দিকে তাকিয়ে আমি আমার প্রথম দেখার স্মৃতির অ্যালবাম খুলে তোমার সবকিছু মিলিয়ে নিচ্ছি। কী সুন্দর তুমি! তোমার চোখ, চুল, ভ্রু, ঠোঁট, হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসা সাজানো ঝকঝকে দাঁত। তোমার ছোট্ট কপালে লাল টিপটাকে দেখে মনে হয় আমার হৃদয়কথা। সব মিলিয়ে তুমি রবিঠাকুরের 'শেষের কবিতা'-র বন্যা।

আমার হাতে এখন এক অলীক স্বপ্নের তুলি! তাকে আমার চেতনার রঙ বাটিতে ডুবিয়ে নিয়ে তার সূক্ষ্ম ডগায় তুলে নিলাম আজ সকালের সোনালি রোদ্দুর। তারপর তোমার গ্রিটিংসকার্ডে তোমারই ছবি আঁকলাম। আমার স্বপ্নের তুলি দিয়ে খুব আলতোভাবে স্পর্শ করতে ইচ্ছে করে তোমার হৃদয়। তোমার ভালবাসার রঙের সিঞ্চন টুপটাপ করে আজও ঝরে পড়ে আমার চেতনার ওপর। আমার ইন্দ্রিয় হয়ে ওঠে তুলির মতো স্পর্শকাতর, সূক্ষ্ম, নম্য।

কোনও এক মিষ্টি সকালে তোমাকে সেই কথাটা জানাব ভেবেছিলাম, যা আমি তোমাকে কোনওদিনই বলতে পারিনি। কথাটা হয়তো সহজ, আমি তোমাকে ভালবাসি। আসলে কথাটা ভাবা খুব সহজ। কিন্তু বলাটা বোধহয় অত সহজ নয়। যতক্ষণ না আমার হৃদয়পুরে তোমাকে ঘিরে রাতের বেলায় বৃষ্টি না নামছে। যতক্ষণ না দিনের শেষের নরম আলো তোমার বুকের ওপর ছড়িয়ে দিচ্ছে একরাশ ভালবাস। যতক্ষণ রিমঝিম বৃষ্টি অন্ধকারে তোমার পানকৌড়ি মন আমার মনকে ছুঁতে পারছে। ততক্ষণ আমি কিছুতেই তোমাকে এই ছোট্ট কথাটা বলতে পারিনি।

যাক আজ পুরনো দিনের বিবর্ণ অ্যালবামের পাতা না উলটে, সেইসব ভালবাসার স্মৃতি আমার হৃদয়েই থাক। তোমার জন্মদিনে তোমাকে আমার অনেক কিছু উপহার দিতে ইচ্ছে করে। তোমাকে নিয়ে আগ্রার তাজমহলের সামনে লাভার্স বেঞ্চে বসে একটু আদর করতে করতে তোমার শরীরে ছড়িয়ে দিতে যদি পারতাম এক ঝলক সোনাঝুরি। তোমার গোলাপি শরীর থেকে সব আবরণ, ঢাকনা সরিয়ে আমার স্বপ্নের তুলি দিয়ে যদি এঁকে দিতে পারতাম লাল হৃদয়। তোমার নীল শাড়ির পাড়ে যদি চাষ করতে পারতাম লাল গোলাপের বাগান। তোমার ব্লাউজের মিক্স অ্যান্ড ম্যাচে যদি তোমাকে দিতে পারতাম এক দিগন্ত সোনালি

ধানখেত। যদি তোমার জন্মদিনের সকালে আমি নিজে হাতে তোমার বিছানার পাশে রেখে আসতে পারতাম আমার আজকের এই ছোট্ট উপহারটি!

কিন্তু কিছুতেই তো তা সম্ভব নয়। দেখতে দেখতে দিনগুলো ফুরিয়ে যাবে। এরপর কোথায় চলে যাব জানিনা। তোমাকে যে ভালবেসে ছিলাম তা আমৃত্যু স্মৃতির সঞ্চয় হয়ে থাকবে। তা তো কোনওদিনই ভুলতে পারব না। তাই আজ রবিঠাকুরের ভাষায় চিঠি শেষ করছি। — 'জীবনে মরণের সীমানা ছাড়ায়ে/বন্ধু হে আমার রয়েছ দাঁড়ায়ে।'

ইতি

তোমার সুশোভন

গার্গী এক নিশ্বাসে পড়ে ক্যালেন্ডারের দিকে তাকাল। সত্যিই তো আজ ১ আগস্ট। আজ গার্গীর নিজেরই মনে ছিল না যে, আজ ওর জন্মদিন। যতদিন সুশোভন এদেশে ছিল, ততদিনই ১ আগস্ট সকাল বেলায় একটা গ্রিটিংস কার্ড আর একটা উপহার কিনে গার্গীকে পাঠিয়ে দিত। সুশোভন ইউ.এস. এ তে চলে যাওয়ার পর আর কেউই মনে করে তাকে উপহার পাঠায় না।

গার্গী ভেবেছিল, বিবাহিত জীবনের দৈনন্দিনতার পলির নীচে সুশোভনের আর ওর প্রেমের স্রোতে ভাটা পড়ে গেছে। কিন্তু আজ আবার তা ফল্গুনদীর মতো বহমান দেখে গার্গীর বুকটা কেঁপে উঠল। মনে মনে সে ভাবতে শুরু করল তার জীবনের সুখ লালিত শান্তি নষ্ট করবার জন্য বোধহয় এত বছর সুশোভন আবার এ দেশের মাটিতে ফিরে এসেছে।

সুশোভন সঙ্গে গার্গীর পরিচয় যখন গার্গী মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় তখন। সুশোভন গার্গীর মাস্টার হিসাবে ওদের বাড়িতে আসে। গার্গীর মা সুশোভনকে খুব ভালবাসত। সুশোভন বি.এস.সি পাস করে বেকারত্বের জ্বালা পালন করছে। আর দু-চারটে টিউশান করছে। আর সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এসসি পড়ছে।

কী করে যেন হঠাৎ সুশোভনের চোখ দুটো গার্গীর রূপকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেছিল। প্রেম অবশ্য এরকম ভাবেই আসে। গার্গীর চোখ কিন্তু কোনওদিনই সুশোভনকে আকর্ষণ করতে পারেনি। গার্গী কেবল ভালবাসত সুশোভনের পড়ানোকে। তার বেশি আর কিছু নয়। সেটা আজ সুশোভন বিদেশ থেকে ফিরে এসে বুঝতে পারছে।

প্রতিবার এই জন্মদিনে সুশোভন ও গার্গী বিকেলের দিকে বেড়াতে যেত। ভিক্টোরিয়া বা আউট্রাম ঘাট। সেবার সুশোভন রিসার্চ করার জন্য ইউ.এস. এ-তে চলে যাবে, তার আগের দিন গার্গীদের বাড়িতে সুশোভন এসেছিল। সেদিন বাড়িতে কেউই ছিল না।

সুশোভন বলল, 'গার্গী চলো না একটু ঘুরে আসি কোথাও থেকে? কালই তো চলে যাব। আবার কত বছর পর তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে।'

'কেন তিনবছর পরেই তো আপনি আবার দেশে ফিরে আসবেন।'

'হ্যাঁ, ওরা তো তাই বলেছে।'

গার্গীদের ঘরটা ছিল খুব সুন্দর করে সাজানো গোছানো। চারদিকে ছড়িয়ে আছে হালকা একটা ল্যাভেন্ডারের গন্ধ।

গার্গী সুশোভনকে বলল, 'আপনি হাত-মুখ ধুয়ে নিন। আমি কফি করে আনছি। আমি স্নান সারতে সারতে আপনি কফি খান। ইচ্ছে হলে টিভিটাও খুলে দেখতে পারেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে গার্গী কফি করে আনল। গার্গী সামান্য কফি খেয়ে স্নান করতে চলে গেল। যাবার সময় সুশোভনকে বলল, 'আপনার কী রং ভাল লাগে।'

'নীল।'

'কোমল নীল, না আকাশের মতো নীল।'

'না, সমুদ্রের মতো, দূর থেকে দেখা সমুদ্রের মতো, শুধু নীল আর নীল।'

সুশোভনের উত্তরে গার্গী বলল, 'আমারও ঠিক তাই। অদ্ভুত ব্যাপার! আমার অনেক ভাল লাগা ঠিক আপনার মতো কেন!'

'তোমার সঙ্গে আমার অনেক মিল আছে বলো।'

'গরমিলও আছে অনেক।'— বলেই গার্গী বাথরুমের দিকে পা বাড়াল। যেতে যেতে পিছনের দিকে তাকাল একবার। বলল, 'ততক্ষণে কফি খেতে খেতে ঘরে বসে সমুদ্রকে কল্পনা করুন।' বলেই দরজা বন্ধ করল গার্গী।

একটু পরেই জলের শব্দ উঠল। গুনগুন গানের শব্দ। রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইছিল গার্গী— 'আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার। পরান সখা বন্ধু হে আমার।'

এদিকে সুশোভন বসে কফিই খেয়ে চলেছে। মেয়েদের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া আর স্নান করতে যাওয়া এক ব্যাপার। দুটোতেই সমান দেরি। টানা আধঘন্টা পর স্নান করে বেরিয়ে এল গার্গী। সম্পূর্ণ নীলাম্বরীর সাজে। ভিজে চুল, তাতে নীল রিবন বাঁধা, নীল শাড়ি, নীল ব্লাউজ, কপালে নীল টিপ। গার্গীকে দেখে সুশোভন তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিল। সুশোভনকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে গার্গী বলল, 'অমন করে কী দেখছেন?'

'তোমাকে।'

'ভাল দেখাচ্ছে?'

'তোমাকে! তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে বর্ষায় নতুন জেগে ওঠা নীল রঙের এক তরতাজা ফুল।'

'সব সময় কবিত্ব।'

তারপর সুশোভনকে গার্গী অতলান্ত সমুদ্রের নীল ঢেউয়ের স্রোতে নিয়ে এসে উপস্থিত হল আউট্রাম ঘাটে।

তখন সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমাকাশে। আকাশ লাল হল এবং ক্রমে ক্রমে চারিদিকে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ছে দিগন্ত থেকে দিগন্তে। আকাশে দু-একটা তারা ফুটে উঠছে। চাঁদ ও জ্যোৎস্না মাখামাখি হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সুশোভন-গার্গীর উপরে। সব মিলিয়ে এক অদ্ভুত নির্জনতা।

সুশোভন ও গার্গী পাশাপাশিই বসেছিল। কিন্তু কাছাকাছি আসতে পারেনি। অন্তত তখন সেটা সুশোভনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ, সে ছিল গার্গীর শিক্ষক। গার্গী হয়তো চাইছিল এই রাতে আধো জ্যোৎস্নায় নির্জনে সুশোভন তাকে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করুক। পৃথিবীর সমস্ত নারীর কাছে এটা তো একান্ত কাম্য। একটু পরে গার্গী নির্জনতাকে ভেঙে কথা

বলল কেমন নিষ্প্রাণ, অস্ফুট গলায়, 'আমাকে আপনার খারাপ লাগছে'

সুশোভন উত্তর দেয়, 'না তো।'

'তবে কথা বলছেন না যে।'

হ্যাঁ জানো গার্গী......'

'কী?'

'না কিছু না।'

'আপনার মতো এত ভীতু পুরুষকে আমি ঘেন্না করি।'

'কেন?'

'তা আপনি বুঝবেন না। যদি বুঝতেন তাহলে .....'

তারপর দিন সুশোভন চলে গেল। এদেশে ছেড়ে বিদেশে। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর সে আবার ফিরে এসেছে।

গার্গী এতক্ষণে সুশোভনের চিঠিটা পড়ছিল আর মনের স্মৃতিতে অতীতের অ্যালবামের পাতা ওলটাচ্ছিল। তারপর গার্গী ভেবে দেখল যে, সুশোভনের কার্ডটা বাড়িতে রাখা নিরাপদ নয়। কোনওদিন যদি অরুণাভ দেখে ফেলে। তারপর যদি জিজ্ঞেস করে, 'সুশোভন কে?' সে কী উত্তর দেবে। তখন বিপদে পড়ে যাবে। এসব ক্ষেত্রে পুরুষকে কিছুই না জানানোই পারিবারিক শান্তি রক্ষার পাসওয়ার্ড। আবার হঠাৎ মনে পড়ে গার্গীর, কী দারুণ কবিতা আবৃত্তি করত সুশোভন। ভরাট গলায় যখন রবীন্দ্রনাথের বা জীবনানন্দের কবিতা আবৃত্তি করত, তখন মনে হত যেন মেঘের ডাক। অরুণাভকে সে কোনওদিন কবিতা পড়তে কিটস দেখেনি। মাইকেল জ্যাকসন ছাড়া কোনও গান শুনতে দেখেনি কোনওদিন। কোনওদিন খুব ভোরে উঠেও অরুণাভ বলেনি, 'চলো গার্গী। এক্ষুনি, এই মুহূর্তে দীঘা কিংবা পুরী ঘুরে আসি।'

অরুণাভর জীবনচর্চা বড় বেশি ছকে সাজানো। নিয়ম, দায়িত্বে পরিপূর্ণ। সে কেবলমাত্র এক তৃপ্ত রমণীর বংশবদ স্বামী ও অফিসের কর্মচারীদের গাঙ্গুলী সাহেব। জীবনে আর কোথাও কি অন্য কোনও পরিচয় নেই!

আজ হঠাৎই গার্গীর কাছে পুরনোগুলো নতুন করে ফিরে আসতে লাগল। যে সুশোভনকে প্রায় ভুলতেই বসেছিল। তার থেকেই আবার এক নতুন আসা গ্রিটিংস কী বলতে চাইছে। সুশোভন কি এখনও সেই-ভালবাসা মনে পুষে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য মানুষ সত্যি! গার্গী সোফাটা ছেড়ে উঠে গেল। বেডরুমে ঢুকে রাস্তার ধারে জানলা খুলে দিতেই একঝাঁক রোদ্দুর ঘরে এসে ঢুকল। জানলার গ্রিলে বুকটা চেপে দুহাতে সেটাকে ধরে বেশ কিছুক্ষণ আনমনে চেয়ে রইল। তারপর জানলাটা বন্ধ করে খাটে এসে বসল।

গ্রিটিংসটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে গাটা এলিয়ে দিল, পাশ ফিরে শুয়ে আবার একবার চিঠিটা পড়ল। দুটো চোখ গার্গীর আজ যেন এক নতুন কোনও আনন্দের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়েছে। অরুণাভ গার্গীকে তো অসুখী রাখেনি কিন্তু তাও সুশোভনের এই গ্রিটিংস গার্গীকে এক অনাস্বাদিত তৃপ্তি দিচ্ছে। প্রত্যাখাত প্রেমিক বলে। এই কথা ভাবতে ভাবতে গার্গী হেসে ফেলল। গ্রিটিংস কার্ডটা নাকের উপর আলতো করে ধরে চোখটা বুজে

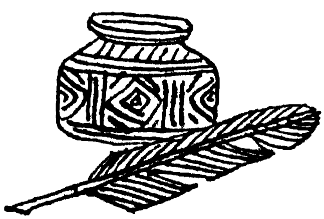
শুকতে চেষ্টা করল, ওটাতে সুশোভনের গায়ের গন্ধ লেগে আছে কি না।

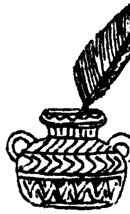
গা ঝাড়া দিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, গুন গুন করতে করতে সারা দেহটা নৃত্যের ছন্দে ঢেউ খেলিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে বসল। আয়নায় নিজেকে বেশ কিছুক্ষণ তারিয়ে তারিয়ে দেখল। ডানদিকের কপালের উপর একটা চুল দুষ্টুমি করে নীচে নেমে এসেছিল সেটা আলতো করে তুলে দিতে আড়চোখে আয়নায় দেখল ঠিক ওই অবস্থায় কেমন লাগছে নিজেকে। হঠাৎ চোখে পড়ল অরুণাভর ছোট্ট বাঁধানো ফটোর দিকে। দুহাত তুলে নিয়ে তাকিয়ে রইল অরুণাভের দুটো চোখ, পরিপাটি চুল, আর সুঠাম বুকটার দিকে।

'অরু তুমি যখন আসবে তখন হয়তো রাত দশটা বা তারও বেশি। যখন শুনবে যে আজ আমার জন্মদিন ছিল, দু-হাতে আমার কাঁধ দুটো চেপে ধরে হয়তো বলবে রিয়েলি সোনা, আমার একদম মনে ছিল না, ওঃ তাহলে একটু এনজয় করা যেত, বাই দি বাই, এখন বলো কী উপহার নেবে তুমি, কালই আমি নিয়ে আসব। এইকথা মনে মনে চিন্তা কবতে করতে গার্গী ওদের ফটোটা নামিয়ে রাখে।

উঠে পড়ে গার্গী, ক্যালেন্ডারে চোখ যায়। কালই তো দোসরা আগস্ট। অরুণাভর সঙ্গে কালই দুটো পার্টিতে অ্যাটেন্ড করতে হবে। শরীরের বেশিরভাগ অংশটা যতসম্ভব খোলা রেখে ওয়েস্টার্ন মিউজিকের উত্তেজক লয় আর বিয়্যার হুইস্কির ফোয়ারার মধ্যে কতো গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে করমদর্ন করতে হবে, না হলে অরুণাভর পদোন্নতি হবে কী করে? আমাদের মতোন সুন্দরী স্ত্রীদের কাঁধে ভর দিয়েই স্বামীরা ওপরে ওঠে।

এই কথা ভাবতে ভাবতে খাট থেকে গ্রিটিংসটা তুলে নেয়। মনে মনে গার্গী বলে, 'সুশোভনদা, তোমার ভালবাসার মূল্য হয়তো কাব্যে আর সাহিত্যে অনেক উঁচুতে স্থান পেতে পারে, কিন্তু আমার মতো নারীরা তোমার ভালবাসার মূল্য দেয় না। সরি, সুশোভনদা' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গার্গী এগিয়ে যায় রাস্তার ধারের জানলার দিকে। ছেঁড়া গ্রিটিংসের টুকরোগুলো খোলা জানলা দিয়ে প্রজাপতির মতো আসতে আসতে খুব শিগগিরিই পিচের রাস্তার পাথরের ফুটপাতে লুটিয়ে পড়ল মৃত্যুর কোলে।





এক আস্তিকের ঠিকানা

তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়

দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দু-পাশে দুটি হাত ছাড়িয়ে দিলে যেমন হয়, বেলপাতা দুটি ছোট ঘটিটির বাইরে বেরিয়ে এসেছে তেমনই। তবে বেলপাতা না বলাই ভাল। বিল্বপত্র বললে মানায়। সুজন দেখল পেতলের ছোট ঘটিটির শরীরে রাজস্থানি ঘরানায় মুঘল কলাচিত্রের কাজ। এরকম সুন্দর একটা জিনিসের ওপরে সিঁদুরের লম্বা টান, দু-পাশে চন্দনের উপস্থিতি বাড়ে আঙুলের ক্ষীণ ছাপে। সেখান থেকে চোখ দুটো সামান্য উঠে আসতেই যখন বেলপাতা দুটির মাঝখানে শৃঙ্গের মতো দাঁড়িয়ে থাকা রক্তজবাটা দেখে ফেলল, সুজন মনে মনে বলে ফেলে —তা বলে বিল্বপত্র।

সে যে সোফাটায় বসে আছে তার মুখোমুখি সোফার পেছনে কালচে পালিশের আলমারির কাচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে থাকথাক করা ক্যাসেট। রাধিকারঞ্জনের নিজের ক্যাসট দু-তিনটে, পাশে অন্যদের। ক্যাসেটের শরীর থেকে সুজন দেখে মানুষের গান, একটা স্ট্রোক, স্ট্রোকের পাশে রাধিরঞ্জন। তিন বছর আগে মালদায় লোকসংস্কৃতির উৎসবে গানটা গাওয়ার পরে খুব শোনা গিয়েছিল ওনার নাম। তার আগে ক্যাসেটের দোকানে, কি সংবাদপত্রের পাতায় রাধিকারঞ্জন খাস্তগীরের নাম দেখা যায়নি। অন্তত সুজন জানত না।

আর এই ধরনের একজন মানুষের বড় পুরস্কার পাওয়া মানে তো সুজনের মতো একজনের অসীম বিড়ম্বনার মুখোমুখি হওয়া। শুভময়দা নিজে না বললে এই সাক্ষাৎকারের দায়িত্বটা সে নিত না। যে কাগজে ফিচার করে, খবর করে তার বাসভাড়া , সিগারেট খরচা, দুদিন বীরভূম ঘুরতে হয়; সেই কাগজের ওপরে শুভময়দার দুটি হাত বিশাল ঝাঁকড়া গাছের ডালপালার মতো বিছিয়ে আছে। তার চাকরির ব্যাপারটা নিয়ে এই একমাত্র ব্যক্তি যিনি ভাবলে তার চাকরিটা হয়ে যেতে পারে।

অথচ রাস্তায় যখন পথ বাড়ছিল সুজনের বারবার মনে হতে থাকে— আচ্ছা যাঁরা বিখ্যাত হন তাঁরা তো মহান, তাঁরা তো জানেন তাঁরা মানুষের কত প্রয়োজনীয়, তাঁরা তো কাছাকাছি থাকার ব্যবস্থা করতে পারেন। সেই বাগনান থেকে কৃষ্ণনগর রোডের এই কামদেবপুরে আসতে আসতে সুজনের ভেতরটা মজে যাওয়া কুয়োর মতো হয়ে উঠেছিল। শীত এবার চলে যাওয়ার ভাব দেখিয়ে ফিরে এসেছে। ফিকে ভোরে উঠোনে নেমে আসতে

ছুঁচের মতো বাতাস সামনের গোলাপখেতের ওপর দিয়ে উড়ে এসে ছুঁয়ে যায় সুজনকে। সোয়েটার রিঠের জলে ধুয়ে এবারের মতো উঠে পড়েছে লোহার ট্রাঙ্কে। কাল চেয়েছিল সুজন। মা বলেছিল নোংরা হলে কে ধোবে আবার! মায়ের আঙুলের শরীরে জড়ানো ত্বক রিঠের শুকিয়ে আসা চামড়ার মতো হয়ে উঠেছে আজকাল। সুজন দেখেছে। কালো জিরে দেওয়া খাস্তা বিস্কুটের প্যাকেট বাবা দোকানের জন্যে এনেছিল। বিক্রি না হওয়ায় এখন রান্নাঘরের পেতলের বাটিতে। তারই দুটো ভেজা ব্লটিং পেপারের মতো ভেসে আছ বুক অবধি উঠে আসা খিদের নীচে।

কিন্তু এখানে পৌঁছে যাওয়ার এক ঘন্টা পরেও সুজন সোফার ওপরে একা। বেল বাজানোর মিনিট দশেক পরে বসতে পেরেছিল। এখন জল চাওয়ার পরে তিনবার দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হয়েছে। তেষ্টা ভোলার জন্যে বাধ্য হয়ে সুজনকে দেখতে হচ্ছে সোফার কভার, ক্যাসেট ভর্তি আলমারির সেগুন কাঠের খাঁজে ধুলোর দাগ। অথচ উলটোদিকে কাচ বসান টেবিলের ওপরে মাছি বসলে সে তার ছবি দেখতে পারে। প্লাস্টিকের ডেট ক্যালেন্ডারে তারিখ পালটানো হয় ঠিকঠাক। দুটি পেপার ওয়েট রাখা আছে প্রথামাফিক। তার একটার ভেতর পূর্ণদাস বাউলের মুখ। একটা কিছু পোড়া মোমবাতি একটা টেরাকোটার মোমদানে। পাশে পবিত্র ঢঙে শুয়ে আছে ডুগডুগি। আর এসব কিছুর মধ্যেই বিরাজ করছে সিঁদুর-চন্দন শোভিত বিল্বপত্র সমেত ঘট। রাধিকারঞ্জন তা হলে পুজোআচ্চাও করেন। সুজনের ভেতরে মানুষটির প্রতি একটা রাগ ধীরে ধীরে নেমে আসতে থাকে ছায়ার মতো।

জল নিয়ে আসে সেই প্রথমের লোকটি। যাকে সুজন রাধিকারঞ্জনের ভাইপো ভেবেছিল। কাচের টেবিলের ওপরে গ্লাস রাখার কোনও শব্দ হয় না। ঘরে ঢুকে বেরিয়ে যাওয়ার মধ্যে লোকটি তাকে দেখে কিনা তাও বুঝতে পারে না সুজন। ঠিক এমনিভাবেই কড়া রোদে দশটা মিনিট তাকে পাথর করে দাঁড় করিয়ে ভেতরে ঢুকে যায় লোকটি। চারবার ফোন করে তবে পাওয়া গিয়েছিল এখানে আসার দিনক্ষণ।

নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে ওনার গাওয়ার কথা ছিল। ফোনে সুজন তাই অনুরোধ করে ওখানেই অনুষ্ঠানের শেষে একটু সময় দেওয়ার জন্য। ফোনের ওপাশ থেকে কাটাকাটি নির্লিপ্ত স্বর ভেসে আসে। আপনি কি ওঁর সম্পর্কে কোনও খোঁজ-খবরই রাখেন না।

সুজনের নীরবতা দেওয়া ছাড়া কোনও রাস্তা থাকে না। আজ তাকে দলিত সাহিত্য সমাজের অধিবেশনের খবর রাখতে হয় তো কাল শ্রীরামপুরের ঘুড়ি উৎসবের। ঠিক কত খবর পেলে নিজের খবর সে পাবে বুঝতে পারে না সুজন। লাইন কেটে যাওয়ার ভয়ে সুজন বলে, 'হ্যালো .....আসলে আমি তো বাগনান থেকে আসব, অতদূর তাই যদি স্টেডিয়ামে, অনুষ্ঠানের শেষ....'

ওপার থেকে উত্তর আসে সেকেন্ডকে হার মানিয়ে। 'অনুষ্ঠানের শেষ উনি কথা বলেন না, মানুষের কথা শোনেন...আপনি জানেন না.....'

সেই জানা-অজানার প্রশ্ন। সুজন কী বলবে। শুভময়দা বলেছিলেন অনুষ্ঠানের পরে রাধিকারঞ্জন শ্রোতাদের মাঝখানে নেমে এসে নিজের ভুলত্রুটি নিয়ে আলোচনা করেন, অজকাল এটা রেয়ার।

সুজন তখন কিছুতেই বোঝাতে পারছিল না নিজের সমস্যাবলি। তাদের এই বাগনান থেকে বাসুদেবপুরে পৌছতে হলে ট্রেনে হাওড়া। সেখান থেকে বাস ধরে বারাসাত। বারাসাত থেকে সাউথ বেঙ্গল ধরে বাসদেবপুর। যেতে আসতে তিরিশ টাকা শুধু রাস্তায়। এর সঙ্গে খিদে পেলে তো কথাই নেই।

ফোনের ওদিক থেকে ততক্ষণে ভেসে এসেছে, 'অসুবিধা হলে থাকনা, উনি তো সাক্ষাৎকার .দিতে দিতে ক্লান্ত—'

শুভময়দাকে কথাটা বলায় বলেছিল, 'দেখেছিস একেই বলে শিল্পীর অহঙ্কার, নিজের ওপরে কতটা আত্মবিশ্বাস থাকলে এমন বলা যায় বলতো.....'

'কিন্তু সুপারি আর নারকেলের ছায়ার ঢাকা পুকুরের ওপারের বাংলো প্যাটার্ন বাড়ির সীমানায় রিকশাওলা সুজনকে যখন নামিয়ে দিল, সে জীবনের ঘ্রাণ কোথাও পেল না ছিটেফোঁটা। চলে যাওয়ার সময় রিকশাওলা বলেছিল, 'গেট খুলে ভেতরে গিয়ে বেল বাজান, লোক আছে—'

নুড়ি বিছানো কারিকুরির রাস্তা পেরোতে পেরোতে সুজন অবাক হয়েছিল। কলিংবেল এখানেও আছে! কই চারপাশের এবড়োখেবড়ো মাঠ, ঝলসে যাওয়া টিঙটিঙে খেজুরগাছ আর অকারণ বাতাস ধুলোর দিকে তাকালে কি মনে হয় এখানে কাউকে ডাকতে হলে কলিংবেল বাজাতে হতে পারে।

বেল বাজিয়ে পাক্কা দশটা মিনিট ঠাঠা রোদের ভিতর সুজন স্থাণুবৎ। তারপর দরজা খুলল অর্ধেক। যেমন দুপুরবেলায় অযাচিত সেল্সম্যানের জন্যে দরজা খোলে ফ্ল্যাটবাড়ির। নির্লিপ্ত প্রস্তরময় একটি মুখ। চুলের ভাঁজে কলকাতার ছোঁয়া। কোথাও বাসুদেবপুর নেই। জীবন নেই। সুজন ভেবেছিল এই বোধ হয় রাধিকারঞ্জনের ভাইপো, যিনি ফোন ধরার কাজটা করেন। আঠায় আটকে যাওয়া ঠোঁট খুলে নিজের পরিচয় দিতেই মুখটি সরে যায় বিনা উত্তরে। ঠাঠা রোদে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মনে হচ্ছিল এবার সে মূর্তি হয়ে যাবে। তখনই দ্বিতীয় মুখের আবির্ভাব। দরজা এবার পুরো খুলে যায়। 'উনি তো নেই।'

সুজন বুঝতে পারে না চারবার ফোন করার পরে ওনার না থাকার কী কারণ, কখন আসবেন—

'বসুন, কাছেই বেরিয়েছেন।' লাল পাঞ্জাবি নীরবতা মাখানো সোফা দেখিয়ে দেয় সুজনকে।

সুজন দেখে এখন তার প্রাচীন এইচ এম টিতে সোয়া এক। এতোক্ষণেও যদি রাধিকারঞ্জন চলে আসেন তা হলে আড়াইটের সাউথ বেঙ্গল ধরা যেতে পারে। পরেরটা চারটেয়। ভেতরের বাড়ি থেকে বাসনপত্রের নামিয়ে রাখার শব্দ পায় সুজন। দুপুরের খাওয়া সারা হল বোধহয় এদের। রাধিকারঞ্জন বোধহয় খেয়েদেয়ে বেরিয়েছেন। সুজন আবার দেখে ফেলে বিল্বপত্র শোভিত ঘট। আর বলে ফেলে —'হারামি.....'

বয়সের বল্কল দীর্ঘদিনের ভারী কামানো গালে নীরবে বসে থাকলেও রাধিকারঞ্জনের ঘরে ঢুকে আসার সঙ্গে সঙ্গেই অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধ দেয় সুজনকে। ফুলের পাপড়ি নখের ডগায় ঘষে ফেললে এই সুবাস পাওয়া যায়। শুভময়দা বলেছিল, 'মানুষটা দীর্ঘদিন লড়াই করেছে, অনেক আগেই ওনার এই পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল, ওঁর হাঁটুর বয়সি

সিন্থেসাইজারের দৌলতে কোথায় পৌঁছে গেল—'

কিন্তু লড়াইয়ের কোনও ছবি যে সুজন এ মুহূর্তে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না।

সোফার ওপরে রাধিকারঞ্জন বসেন না, নিজেকে যেন ছেড়ে দেন, টেঁকুরের শব্দ সুজনের চোখের ওপরে এক ভরন্ত মাঠের ছবি তুলে ধরে। রাধিকারঞ্জন ভূমিকা না রেখেই কথা বলেন, 'কখন এলে..... ট্রেন চলছিল...'

তিন ঘণ্টা বসিয়ে রেখে এখন জিজ্ঞেস করছে ট্রেন চলছে কি না .... শিল্পী মানুষ বলে কি এতটাই! সুজন ঢোঁক গিলে নেয়, 'চলবে না কেন!'

'সকালে বিশের মা এসেছিল বুঝলে, আমাদের ডিম দেয়, তোমাদের হাওড়া লাইনের কোনও পোলট্রি থেকে বার্ড কেনে, বার্ড বোঝোতো.....'

'মুরগির বাচ্চা —'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমরা তো জানবেই, সাংবাদিক বলে কথা,' রাধিকারঞ্জন দুচোখে কৌতুক ভাসাতে চান, বোকাবোকা লাগে সুজনের— রাধিকারঞ্জন বলেন, 'আসলে বিশে কাল মুরগি আর জাগিয়ে ফেরেনি, ওর মা এসে কান্নাকাটি করল বুঝলে, আমাদের পোস্ট অফিসের ফোনটা আবার খারাপ, বাস ধরে কল্যাণপুর গেলাম। তা ফোন করে জানলাম তোমাদের হাওড়া লাইনে ট্রেনে গণ্ডগোল ছিল কাল । তা ওখান থেকেই অতিরিক্ত, কল্যাণপুর ফুটবল মাঠ আবার ......'

সুজন বলে, 'সাক্ষাৎকারটা যদি.....'

রাধিকারঞ্জন জানলার গ্রিলে বসা একটা চড়াই পাখিকে উঠে গিয়ে তাড়িয়ে দিতে বলেন, 'রাখোনা ওসব, হবে......'

সুজনের হাড়ের ভেতর একটা আরশোলা ফরফর করে ওড়ে। হাতের এইচ এম টি তাকে জানিয়ে দিয়েছে হাওড়া থেকে তার ফেরার ট্রেন ছেড়ে গিয়েছে স্টেশন। এখন রাধিকারঞ্জন তাকে গল্প শোনাবেন, আর তাকে চুপচাপ শুনতে হবে। রাধিকারঞ্জনের দীঘল বুকের পাশে আলমারির কাচের ভেতর দিয়ে ক্যাসেটের শরীর থেকে শব্দ দুটো — মানুষের গান চোখ কামড়ে দেয় সুজনের। জ্যান্ত যে মানুষটা চোখের সামনে বসে, তার কি কোনও খবর পৌঁছয় না রাধিকারঞ্জনের ভেতরে! ওই প্রশস্ত বুক, লম্বাটে তামাটে বর্ণের ভারী চোয়ালের ওপরে দীর্ঘ তুলসী পাতার মতো কৌতুকপূর্ণ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকলে তো এই রহস্য ধরা পড়ে না। ফোনে শুনেছিল উনি সাক্ষাৎকার দেন সাধনার আসনে বসে। রাধিকারঞ্জনের কথাগুলো যেন ওঁর ভাইপো টেলিফোন এক্সেচেঞ্জের ক্যাসেট করা উত্তর এনগেজ প্লিজের মতো বলে যায়।

সুজনের কাজ কিছুই এগোয় না। একটু আগে ঘরে ঢুকে দেরি করার জন্য যেমন অস্বস্তি প্রকাশ করেননি, তেমনই বলে চলেছেন নিজের গল্প, 'আরে বলা নেই কওয়া নেই মঞ্চের ওপরে তুলে দিয়ে বলে গাইতে হবে, কল্যাণপুরের ক্লাবটায় আবার এদিকে খুব নামডাক, না গাইলে আবার রটিয়ে দেবে জনবিরোধী। গাইলাম, নামতেই বিশ্বনাথ প্রামাণিকের সঙ্গে দেখা, কথায় কথায় মাঝের পাড়ার ভেতরের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকলাম.....'

'আপনার জনসংযোগটা তা হলে ভালই, এটাকে আপনি বেশ গুরুত্ব দেন —'

সুজন দেখে কথার মাঝেই তার কথায় শরতের আকাশের মতো দৃষ্টি পালটে যায় রাধিকারঞ্জেনের। ঝলমলে চোখ দুটোতে কোথা থেকে যেন জুড়ে যায় মেঘের শেকড়বাকড়। সুজন মনে মনে বলে— জনসংযোগই তো আসল, মানুষের এত খোঁজ খবর রাখবে না কেন, এরাই তো তোমার ক্যাসেটের ক্রেতা.... সুজন অপেক্ষা করেছিল এক অনিবার্য বৃষ্টিপাতের।

অথচ রাধিকারঞ্জন ধীর স্বরে বলেন, 'তোমার কি খিদে পেয়েছে?'

সুজনের ভেতরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ যেন ঝাঁপিয়ে নামে। অদ্ভুত ধুরন্ধর আর কুটিল মানুষ তো রাধিকারঞ্জন এতক্ষণ সুজন ভেতরে ভেতরে যে অস্ত্রটায় শান দিচ্ছিল আঘাতের পরিকল্পনায়, তার শরীরে একটা বেলফুলের মালা পরিয়ে দিল মানুষটা! খিদে তো তার ভীষণ পেয়েছে। এ মুহূর্তে খাওয়ার কথা ছাড়া পৃথিবীতে আর কীই বা থাকতে পারে। কিন্তু 'হ্যাঁ' উত্তরটা যে সুজনের জিভের ওপরে নুড়িপাথরের মতো গড়িয়ে যাচ্ছে।

রাধিকারঞ্জন হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে মানিব্যাগ তুলে নেন। 'কথায় কথায় আমিও খাওয়ার কথা ভুলে গেছি, চলো খেয়ে আসি....'

সুজনের ভেতরটা ঝনঝন শব্দে ভাঙতে থাকে। রাধিকারঞ্জন বাইরে থেকে ঘরে ঢুকে সোফার ওপরে শরীরটা যখন ছেড়ে দিলেন, মৃদু টেঁকুরের শব্দে সুজনকে জানিয়েছিল বাইরে থেকে যে মানুষটা এইমাত্র ঘরের ভেতর এল সে শরীর শান্ততা নিয়ে এসেছে, স্বস্তি। তা হলে এখন এই যে তাকে নিয়ে খেতে যাওয়ার অভিনয়! কেন! এও কী জনসংযোগ। যদি কলকাতায় গিয়ে নিন্দে করে তা হলে ইমেজের ক্ষতি!

কাঁকর বিছানো পথ পেরিয়ে বাইরের গেটে আংটা ফেলে রাধিকারঞ্জন তাঁর বাঁ হাতটা সুজনের কাঁধের ওপরে বিছিয়ে দেন। সুজনের মেরুদণ্ড টানটান হয়। রাধিকারঞ্জন উদাত্ত হাসেন, পাশের মাঠের চড়াইরা উড়ে যায়। সেই শব্দে কয়েকটা ধানগাছ এ ওর সঙ্গে কথা বলে ফেলে। 'তুই আসায় বুঝলি আজ আমারও বাইরে খাওয়া হবে, বাস রাস্তার মোড়ে বিষ্ণু পাত্রর ভাতের হোটেলে দেখছিস, মাংসটা যা করে না, কলকাতার হোটেলও ফেল, নট্ট কোম্পানির ধীরাজকুমারের নাম শুনেছিস তো, ওর রান্নার সার্টিফিকেট দিয়েছিল, দোকানে টাঙানো আছে, চল দেখাব—'

'আপনার তো দুপুরের খাওয়া হয়ে গেছে,' কথাটা না বলে পারে না সুজন। আর অবাক হয়ে দেখে রাগ অথবা ভয়ের জায়গায় রাধিকারঞ্জনের চোখে কাচের মতো হাসি। বলেন, 'কী করে বুঝলি—'

'কেন আপনি যখন বাইরে থেকে এলেন সর্ষেবাটার একটা হালকা গন্ধ পেয়েছিলাম'

'তোর নাক আছে তো ....' কৌতুক যেন শিশুর কান্নার মতো গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসে রাধিকারঞ্জনের বয়সি চোখ থেকে। হাত তুলে দূরের বটগাছের নীচে দাঁড়িয়ে থাকা রিকশাগুলোকে ডাকেন। চাকা গড়াতেই নিজস্ব ভঙ্গিতে হেসে বলেন, 'কী করব বল, ওই যে বিশের কথা বলছিলাম না, ডিম দেয় আমাদের, ওর খোঁজ-খবর করতে গিয়েছিলাম বলে আমার নাকি অনেক পরিশ্রম হয়েছে, ভাত না খাইয়ে ছাড়বে না, বুড়ি সর্ষেবাটা দিয়ে বেলে

মাছের ঝোল যা রাঁধে না.....'

সুজন অবাক হয় অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেলে রেখে সর্ষেটার ভেতরে ডুবে যেতে কোনও অনীহা নেই মানুষটার! চাকা গড়ায়, পরতে পরতে যেন গল্পের সুতো খুলতে থাকে, 'দেরি হতো না বুঝলি, ওই যে বিশ্বনাথ প্রামাণিকের কথা বলছিলাম না ওর কাছ থেকে প্রথম হারমোনিয়াম কিনি, নাইনটিন ফট্টি এইট-নাইন হবে, কত বয়স ছিল তখন, বয়সি তামাটে কপালের দীঘল বলিরেখায় আঙুল ঠেকে স্মৃতির কৌটো বাজিয়ে নেন রাধিকারঞ্জন, ষোলো-সতেরো হবে, ভাল করে খেতে পাই না তো হারমোনিয়াম কিনব কী, ধারে দিয়েছিল, ওই দোকানটার রেকর্ড বুঝলি, গান শুনে বলেছিল বড়ো গায়ক হবে তুমি। সুজন দেখে চারপাশের হু-হু করা আকাশ অবধি ছড়ানো রোদ থেকে দুগ্ধবতী হলুদ শস্যের রঙে এক আলো নেমে এসেছে রাধিকারঞ্জনের চোখে গাঢ় হয়ে, 'ওর সেই বউবাজারের দোকান এখন এক স্যাকরা কিনে নিয়েছে, কারিগরদের জন্যেই উঠে গেল বুঝলি, এখন এদিকে টালির ঘর করে থাকে, মাইক ভাড়া দেয়, সুজনের দিকে গোয়েন্দার মতো ঘন চোখ করে বললেন, প্রথমদিন আমায় এখানে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে, বলেছিল কলকাতার কথা এখানে কাউকে বলবেন না, আমি অবাক হয়েছিলাম বুঝলি, ও বলল ব্যবসার মন্দার কথা কাউকে বলিনি, বলেছি রাজনীতির অত্যাচার এদিকে পালিয়ে এসেছি, লোকে অভাবে অনুষ্ঠানে কাজ দেয় বুঝলেন।'

রাধিকারঞ্জন দৃষ্টি ভাবনার আসা-যাওয়ার পালটায়। 'ওই আমাকে প্রথম অনুষ্ঠানে সুযোগ করে দেয় জানিস তো, ময়রাবাগান সর্বজনীনে তখন নামকরা গায়করা আসতেন ধনঞ্জয়, জগন্ময় মিত্র, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত .... বিশ্বনাথের দোকান হৃদয়মণি ফ্লুটের ফুলপেজ বিজ্ঞাপন থাকত ওদের স্যুভেনিয়রে', রাধিকারঞ্জনের স্বর হঠাৎ যেন মাটির পাতাল ছুঁয়ে আসে, দেখা হলে কথা না বলে পারি নে রে......

হোটেলে টেবিলের তলায় একটা রুগ্ন বেড়াল বেড়ার দেওয়ালে একটা কালিমাখা চ্যাটালো টিকিটিকির দিকে আকুল চোখে তাকিয়ে আছে। দু-তিনটে মুড়োভাজার ওপরে কাঁঠালমাছির আয়োজন। এর থেকে বেশি কিছু চারটের হোটেলে পাওয়া যায়না সুজন জানে। কিন্তু রাধিকারঞ্জনের হাঁকডাকে বিষ্ণু বেরিয়ে আসে রান্নাঘর থেকে। কিছুক্ষণ পরে গরম-ভাতের সঙ্গে ধোঁয়া ওঠা দুটো বাটি আসতে যে ঘ্রাণ পায় সুজন, তাতে যেন ছবিটা পালটে যায় হঠাৎই। বিষ্ণু নিজে হাতে রাধিকারঞ্জনের দিয়ে এগিয়ে দেয় একটা, সুজনের সামনে একটা রাখতে রাখতে বলে, 'আপনার অতিথিকে একদিন দুপুর দুপুর নিয়ে আসবেন, মাছ-ভাত খাবেন।' সুজনের দিকে মুখ তুলে হাসে, 'আমাদের স্পেশাল, এখন তো সন্ধের মিল, রোডের লোক বেশি, মাংস ছাড়া কিছু চলবে না।' দু-তিন গ্রাস ভাত এর মধ্যেই নেমে এসেছে সুজনের শরীরে, রসনা যেন চুঁয়েচুঁয়ে নামছে প্রতিটি কোষে, বিষ্ণুর রান্নার হাতটি সত্যি ভাল, কিন্তু সুজন বুঝতে পারে না, এখানকার মানুষজন কি সারাদিনই খায়! বিকেল চারটাতেও ফ্যানঝরা ঝরঝরে ভাত!

রাধিকারঞ্জন হাড় ভাঙতে ভাঙতে বলেন, 'বিষ্ণু খুব সুন্দর বাঁশি বাজায়, জানো তো....নট্ট কোম্পানিতে তো রান্নার সঙ্গে ওটারও পার্টটাইম ছিল.....'

সুজন দেখে অদ্ভুত এক দৃষ্টি বিনিময় ঘটে যায় রাধিকারঞ্জন আর বিষ্ণুর অভ্যন্তরে। বাইরের দিকে চোখ ফেরাতেই রাধিকারঞ্জনের খাওয়া থেমে যায়। হাত তুলে হীরালালকে ডাকেন, 'হীরু ভেতরে আয়রে......'

রিকশার ওপরে বসে চালকের সিটের ওপরে পা দুটো তুলে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছিল হীরালাল। ভেবেছিল রাধিকারঞ্জন তার রিকশাতেই ফিরবে।

বেঞ্চে বসতে না বসতেই রাধিকারঞ্জন আরেকটা মাংস-ভাতের অর্ডার দেন। সুজন দেখে হীরালাল সলজ্জ হেসে টেবিলের ওপরে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছে। সুজন নিজে অবাক হয়েছিল। ভেবেছিল হীরালালের অবাক হওয়া মুখ দেখবে। কিন্তু হীরালালের মুখে যে কোথাও অবাক হওয়ার চিহ্ন নেই। কী রকম একটা লজ্জা-লজ্জা ভাব ভেসে আছে। এর মানে আজই প্রথম নয়, এর আগেও হীরালালের এ ঘটনা ঘটেছে।

রাধিকারঞ্জন মাথা নিচু করে মন দিয়ে ভাত মাখছেন, 'হীরু খুব ভাল ছেলে জানিস তো, খায় ভালো খাইয়ে তুই আনন্দ পাবি—'

'আপনার থেকেও!'

সুজন দেখে হীরালালের চোখে গ্রামীণ শ্রদ্ধা। হীরালাল বলে, 'এই তো বেলা এগারোটার সময় দেখলাম কল্যাণপুর মোড়ে একগাদা জিলিপি-কচুরি নিয়ে বসেছেন, দুপুরে দেখি বিশেদের দাওয়ায় ভাত নিয়ে বসেছেন .....'

হীরালালকে ধমক দেন রাধিকারঞ্জন, 'তুই খা তো....' আর হঠাৎ রাধিকারঞ্জনের সব অনুভব থেমে যায়, দেখেন সুজন অবাক হয়ে দেখেছে দুজনকে, একটু আগে বিষ্ণু যে হাসি হেসেছিল, হেসেছিল হীরালাল, সেই হাসি হাসেন রাধিকারঞ্জন, 'জানোতো এই আমার একটা প্রবলেম, এর জন্যেই জানোতো সব ব্যাপার আমার দেরি হয়ে যায়....'

সুজন ভুলে গিয়েছিল যে এতক্ষণের রাগ তাকে না জানিয়ে চলে গেছে। মাথা নেড়ে বলে, 'না....না.... সেটা কোনও.....'

রাধিকারঞ্জন যেন কথা কেড়ে নেন, 'না না, আমি ও ব্যাপারে বলছি না, আমার পুরস্কারের ব্যাপারটা দেখো তো কত দেরিতে হল.....'

সুজন সামনে পিছনে আকাশ মাটি সবকিছু হারিয়ে ফেলে। রাধিকারঞ্জন কোন দেরির কোন দেরিকে কী অদ্ভুত মিলিয়ে ফেললেন!

হাওয়া থেমে গেছে দেখে রাধিকারঞ্জন বললেন, 'এবার তাড়াতাড়ি না খেলে কিন্তু শেষ বাসটাও চলে যাবে—'

মালাকর

তিলোত্তমা মজুমদার

আকাশ ঘন নীল হয়ে আছে। দূরে দূরে টুকরো-টুকরো সাদা মেঘ। যেন নীল জামা পরা মেয়েটি আইসক্রিম খেতে খেতে গায়ে মাখিয়ে ফেলেছে। চিল উড়ছে। ওড়ার নেশায় সে বুঝি-বা পাগল এখন। সুতো-ছেঁড়া ঘুড়ির যেমন আর কোনও পিছুটান থাকে না। হালকা হাওয়ায় যেমন সে ভাসে হেলতে-দুলতে, কখনও আঁকাবাঁকা হয়ে, আর তার কাগজ-শরীরের লেজে কিশোরীর দীর্ঘ বিনুনির মতো অপরূপ লহরী হয়ে যায়, তেমনই ওই চিলের দশা। বিনুনির মতো ওই লেজের অভাব সে মিটিয়ে নেয় ডানায়। স্থির ডানাকে তিরতির কাঁপিয়ে উত্তেজনা আর খুশি প্রবাহিত করে দেয় আকাশের নীলে। দিনের আলোয় অদৃশ্য তারাদের গায়ে শিহর লাগে তখন। পুবের তারা গোপনে খবর পাঠায় পশ্চিমের নক্ষত্রকে। বলে, 'জানো, আমি হারিয়ে যাব ঠিক করেছি। এই বিপুল জগৎ, এই মহাবিশ্ব, দেখা হল না কিছুই। তাই এ বার হারিয়ে যাব আমি।'

পশ্চিমের নক্ষত্র বলে, 'হারাবে? সত্যি? কার সঙ্গে যাব? কোথায় যাবে? যাবার পথে দুদণ্ড থেকো, বিশ্রাম নিয়ো আমার কাছে। কেমন?'

'আমি একাই যাব পশ্চিমের নক্ষত্র। আর কেউ যাবে না আমার সঙ্গে। কোথায় যাব, জানি না আমি। তবে বলছ যখন, তোমার কাছে থেকে যাব দু-দণ্ড। ভাল লাগবে তো তোমার।'

'লাগবে। খুব লাগবে। কাছে পাইনি তো তোমাকে কোনও দিন। শুধু দূর থেকে দেখি। তোমার জ্বলতে থাকা। তোমার কাঁপন। কাছে এলে, পুবের তারা, তোমাকে শোনাব আমার গল্প। তুমিও বলবে তো আমাকে, তোমার সব কথা?'

তারা একটু কাঁপে তখন। একটু বেশি করে জ্বলে যায়। মাতালের মতোই এক ভাসমান চিলের পাকসাট মারতে থাকা দেখে বলে, 'নক্ষত্র, আমার যদি পাখিদের মতো ডানা থাকতো দুটি! ও পশ্চিমের নক্ষত্র। তোমার এমন ইচ্ছে করে না?'

'আমার ডানা আছে যে, পুবের তারা। আমাকে তোমার হারিয়ে যাবার সঙ্গী করবে? আমি তোমাকেও একজোড়া ডানা পরিয়ে দেব, কেমন? তারপর ভাসব দুজনে মিলে। এই মহাবিশ্ব দেখতে দেখতে কোথাও গিয়ে পৌছব, সে এক এমন জায়গা, যার কথা আমিও জানি না, তুমিও জানো না।'

পুবের তারার বুক দুর-দুর করে। ইচ্ছায় বুক দুর-দুর করে। স্বপ্নে থরো-থরো হয়ে যে পরিপূর্ণ চোখ মেলে দেয় পশ্চিমের নক্ষত্রের দিকে। দেখা যাচ্ছে, কিন্তু এ যেন সম্পূর্ণ নয়। সামগ্রিক নয়। তারার মধ্যে এক চাওয়া ফুটে ওঠে। সে অস্ফুটে প্রশ্ন পাঠায়—'তুমি ডানা কোথায় পেলে?'

হা! হা! হাসে পশ্চিমের নক্ষত্র। বলে, 'তুমি এসো এক বার। দেখবে তখন। আমাদের ইচ্ছে দিয়ে আমরা গড়ে নেব কী সব আশ্চর্য ডানা। আর একবার ডানা যদি পেয়ে যাও, দেখবে পুরো আকাশটা তোমার। এই গোটা আকাশটাই।'

ভাল লাগার আবেশে পুবের তারা চুপ করে থাকে অনেকক্ষণ। কেন যে এই ভাল লাগা, বোঝা যায় না ঠিকঠাক। আবার ভাল লাগাকে সব দিয়ে অনুভব করতে না করতে পশ্চিমের নক্ষত্রের জন্য অকারণেই কষ্টে বুক ভরে গেল তার। সে কোনও থই পেল না। এই অকারণ আনন্দ-আবেশ বেদনার রহস্য তাকে পুলকিত করল কোনও এক অনন্য আনাস্বাদিতপূর্ব অনুভবে। সে তখন প্রায় ফিস ফিস করে। বার্তা পাঠাল, 'পশ্চিমের নক্ষত্র, তুমি সত্যি যাবে?'

'যাব। যদি তুমি বলো। ডাকো যদি।'

'আমি তবে যাই তোমার কাছে?'

'এসো। চলে এসো।'

এই সব তারা আর নক্ষত্রের নীচে, এই সব মেঘ আর আকাশের নীচে, চিল যেখানে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে, সেই মাটির ওপর পুববাগানের মালি তখন আগাছা তুলছিল। নির্মম ভাবে সে তুলে ফেলছিল অপ্রয়োজনীয় ঘাস, আগাছা জঙ্গল।

পুববাগান আর পশ্চিমের বাগান। একটি পথের এ-পারে ও-পারে দুটি বাগানের দুই মালি। বাগানের মালিকানাও আলাদা আলাদা। যার যেমন অভিরুচি, যার যেমন প্রয়োজনীয়তা, তার তেমন বাগান। পুব বাগানের ফুটে আছে অজস্র ফুল। কত সে রং তাদের, কত সে রকম, কত সে নাম তাদের, সুগন্ধ যে কত — সে এক নজরে বাগান দেখে বোঝা যাবে না। এই সব ফুল ফোটায় রঞ্জন। রঞ্জন মালাকর। লোকে ডাকে রজনমালি। আর পশ্চিমের বাগানটায়? সেখানে শুধুই শাক আর সবজি। ঋতুর পরোয়া না করেই সারা বছর ফলে বেগুন, শসা, টমেটো, সিম, উচ্ছে, বরবটি, কড়াইশুটি, কুমড়ো, পটল, স্কোয়াশ, পেঁপে, পালং, মুলো, ধনেপাতা, লংকা, কপি, পেঁয়াজ। এই বাগানে ফুল বলতে শুধুই সবজির ফুল। আর বাগানের কোণ ঘেঁষে মাঝে-মধ্যে সর্ষেফুলের হলুদ ঝাপটা।

সবজি বাগান যে দেখাশুনো করে তার নাম হারাধন। লোকে বলে হারুমালি। হারুমালি গাঁট্টাগোট্টা, চুল কাটে কদমছাঁটে। শিরা-ওঠা হাতে-পায়ে গুলি-গুলি পেশি। গায়ের রং কালো। ঠোঁট পুরু। ঝোপরা ভুরুর তলায় দুটি কুতকুতে চোখ। তাকে দেখলেই বুঝতে পারা যায়, রজনমালির বাগানে সে তার হাত ছোঁয়ালেই ফুলের বাগান নিমেষে সবজির বাগান হয়ে যাবে। আর ফুলের বাগান করে বলেই বোধহয় রজনমালির ফর্সা রং পুড়ে তামাটে। দিঘল চোখ তার ঈষৎ লালচে থাকে সারাক্ষণ। যেন এত রঙে, এত সুগন্ধে, সৌন্দর্যে যে মাতাল হয়ে আছে রাত্রি-দিন। দেশ-বিদেশ থেকে প্রজাপতিরা উড়ে উড়ে তার বাগানে আসে। একটি জায়গায় বসে যখন তারা, পাখনা খোলে, বন্ধ করে, ডানা গুটোয়, উন্মোচিত করে—আর সেই উন্মোচন রঙের মধ্যে লুকিয়ে থাকা আরও সব রঙের আলপনায় রোদ্দুর পড়ে ঝলমল করে, তখন মনে হয় ওরাও এক রকমের ফুলই বুঝি। ভ্রমরের বিমোহিত চিত্তে দোলাচল লাগে তখন, কোথায় বসবে ঠাহর পায় না। কার রস পান করবে বুঝতে পারে না। ফড়িং-এর দল, পাখির দল উড়ে উড়ে সবজি বাগানে যায়, খেয়েও নেয় গাছের পাতা, ফল-পাকুড়—কিন্তু রঙের টানে আবার ফিরে আসে ফুলের বাগান পুববাগানে।

হারুমালির এ নিয়ে কোনও ক্ষোভ নেই। সে ফল ফলাতে চায়। ফলায়। শাক, সবজি, ফল কাটবার মতো হলে, কেটে নিয়ে যায় মালিকের ঘরে। মুলোগাছের কচি ডগা যখন মাটির গোপন রহস্যময় জগৎ থেকে মুখ তোলে, যখন বাঁধাকপির পাপড়িগুলো একটি একটি করে খুলে যায় কোনও জাদুতে, যখন কচি কড়াইশুঁটির অভ্যন্তরে তুলতুলে গুটিদানা আসে—সে তখন দারুণ যত্নে তুলে দেয় মুলোগাছের মধ্যে মধ্যে জন্মাতে চাওয়া আগাছ। আবার মাটির নীচে মুলো নধর হলেই উপরে নেয় অনায়াসে। বাঁধাকপি পুষ্ট হলে কেটে নেয় গোড়া থেকে। ঝুড়িভর্তি করে তোলে পুষ্ট কড়াইশুঁটি। সে রোপণে যেমন দক্ষ, লালনে যেমন পাকা, ওপড়াতেও তেমন ওস্তাদ। রজনমালি মনে মনে করুণাই করে তাকে। ঘৃণামিশ্রিত করুণা। সে নিজে যখন কিছু কিছু গাছের ডালপালা ছেঁটে দেয়—তার এমন হাতের নড়া, যেন সন্তানের চুল আঁচড়ে দিচ্ছে। শুকনো ফুলগুলি ডাল থেকে কেটে ফেলে যখন, মনে হয়, ছোটমেয়ের কড়ে আঙুলের নখ, কেটে দিল যত্ন করে। রঙে, সুগন্ধে, সৌন্দর্যে মাখামাখি হয়ে থাকে সে সারাক্ষণ আর আগাছাগুলি উপড়ে দেয়। ফুলের জন্য, ফুলগাছের জন্য ভুগর্ভে সার ঢাললেই জল দিলেই, হর্মোনের গুঁড়ো ছেটালেই লক-লক করে বেড়ে ওঠে লোভী আগাছা। রজনমালি তীক্ষ্ণ চোখে নজর করে সারাক্ষণ। আর আগাছা দেখলেই উপড়ে নেয়। সম্পূর্ণ হৃদয়ে, সামগ্রিক যত্নে সে ফুটিয়ে তোলে নানান ফুল।

সেদিনও সে আগাছাই তুলছিল খুঁজে খুঁজে। এত রোদ্দুর, এত প্রজাপতি, পাখির এমন গান—তারই মধ্যে সে যেন স্পষ্ট শুনছিল ফুলগুলির খুশি কলস্বর। আগাছা খুঁজতে খুঁজতে, তুলতে তুলতে সে চলে এসেছিল বাগানের পশ্চিম ধারে। এর পরেই রাস্তা। আর রাস্তার ওপরেই সবজিবাগান।

পশ্চিমের বেড়া ঘেঁষে বেশ গাছ হয়েছে কয়েকটি। ক-দিন এ-দিকে নজর দেওয়া হয়নি। রজনমালি গাছগুলি তুলে তুলে একটি বড় বাঁশের চুপড়িতে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। হঠাৎ শুনল একটি মিহিন স্বরের ডাক—'মালি ও মালি।'

'মালি এ-দিক ও-দিক তাকাল। দেখতে পেল না কারওকেই। স্বর বলল, 'এই যে কোণের দিকে তাকাও। আমি তোমাকে ডাকছি মালি। আমি হলদে ফুল।'

মালির চোখ পড়ল দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বেড়া ঘেঁষে একটি ছোট্ট গাছ। কেমন গড়ন, কেমন পাতার ধরন, সুগন্ধ আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না কিছুই। ছোট্ট গাছে একটি ছোট্ট হলদে ফুল ফুটি ফুটি করছে। ডাকছে সে-ই। একটা আগাছা আর কী। মালি ভাবল। আর এই আগাছার ফুল, সেও কি না রজনমালিকে ডাকতে সাহস করছে? সে গম্ভীর স্বরে বলল, 'কী বলবে বলো। আমার শোনার বেশি সময় নেই।

আধফোটা ফুল বলল, 'আমাকে উপড়ে ফেলো না মালি, আমার গাছকে উপড়ে ফেলো না। সবে পাপড়ি মেলেছি। আমাকে থাকতে দাও।'

মালি বলল, 'ধুর, তুমি আগাছার ফুল, এই বাগানে আমি তোমায় নিয়ে কী করব? তুমি যাও, ফোটো নিয়ে বনে-বাদাড়ে।

ফুল বলল, 'তুমি কী সুন্দর মালি। তোমার হাতে, তোমার আঙুলে কী আশ্চর্য জাদু। তোমার চোখদুটিও ভারী সুন্দর। তোমার স্পর্শে সারা বাগানটায় কত প্রাণ ভরে গেছে। জানো, আমি যখন সবে কুঁড়ি হয়ে ফুটতে পারলাম, তখন এই মহাবিশ্বের এই একটুকু জায়গায়, বিপুল পৃথিবীর এইটুখানি মাটির ওপর দাঁড়াতে পেরেই আমি ধন্য হয়ে গিয়েছিলাম। আহা! এই আকাশ কী সুন্দর। এই সতেজ বায়ু, এই আলো, এই গুঞ্জন—সব, সব কিছু পেয়ে আমার যে কী আনন্দ হল, মালি, বিশ্বাস করো, অপার আনন্দে চোখে জল এসে গেল আমার! পাপড়িগুলো পুরোপুরি মেলতে দাও, তোমাকে দেখব। আমার চোখ তোমাকে দেখাব। মালি, আমি তখন ভাবলাম, দেবতার কী দয়া আমার ওপর। তাঁর এত আছে! এত সৃষ্টি! এত সৌন্দর্য! আমি যদি না থাকতাম, কারও কোনও ক্ষতি হত না। কোথাও এতটুকু কম পড়ত না। তবু তিনি তাঁর পৃথিবীতে আমাকে পাঠালেন। এ বিস্ময়, এই কৃতজ্ঞতার ঘোর কাটতে না কাটতেই আমি তোমাকে দেখলাম মালি। কী যত্নে, কী মমতায় এই বাগানের ফুলগুলিকে তুমি আগলে বেড়াও। তোমাকেও যে দেবতার মতো লাগে আমার গো।'

ফুলের কথা শুনতে শুনতে রজনমালি গম্ভীর মুখে বসে পড়েছিল। একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল আর কী। কাঁধের গামছা দিয়ে এক বার বুক-পিঠ ডলে সে বলল, 'দেখো ও সব কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। আমি যে অসম্ভব সুন্দর করে ফুল ফোটাই—এ কথা সবাই জানে। আমার বাগানের যত ফুল, তারা আমাকে দেবতা বলেই মান্য করে। কত দামি-নামী ফুল সব। কত সুগন্ধ তাদের। কী সব জাতি। পৃথিবীর কত প্রান্ত থেকেই না তাদের আনা হয়েছে এই বাগানে! সেখানে তুমি এক বুড়ো ফুল, ম্যাড়মেড়ে হলদে ফুল, তোমাকে আমার বাগানে রেখে লাভ কী! না তুমি আমার বাগানের সৌন্দর্য বাড়াবে, না সুগন্ধ।

ফুল বলল, 'কাজেও লাগতে পারি তোমার। পুজোর জন্য তুলে নিয়ে তুমি আমায়, আর দেবতার পায়ে দিয়ো। আমার গাছটা রইল শুধু।'

'দুর দুর, তোমায় দিয়ে পুজো হয় নাকি? পুজোয় অন্য ব্যবস্থা আছে।'

'তা হলে আমায় একটা রেকাবে করে রেখে দাও তোমার শিয়রে।'

'ধুর, তুমি তেমন নয়নলোভন, রোমান্টিক ফুল নাকি?'

'তা হলে .....তা হলে মালি, আমাকে না হয় রেখে দাও, কোনও মৃতদেহের পায়ে দেবে বলে।'

'তা-ও যদি সাদা হতে! সে-ও তো ফ্যাকাশে হলুদ হয়ে বসে আছ। আর আর কথা বাড়িয়ো না। আমার অত সময় নেই।'

এই বলেই মালি একটানে উপড়ে ফেলল গাছটা, আর বিরক্তিতে দিক ভুল করে ছুড়ে দিল আরও পশ্চিমে। গাছটি মধ্যবর্তী রাস্তা পেরিয়ে উড়ে পড়ল হারুমালির সবজিবাগানে একেবারে বেগুনগাছেদের ধার বরাবর। ঠিক আগের দিন বেগুনগাছের গোড়া খুঁড়েছিল হারুমালি। আলগা মাটির গর্ভে পড়ে হলদে ফুলের গাছ ধীরে ধীরে শেকড় চারিয়ে দিল, আর দাঁড়াল সোজা হয়ে। এক রাত্রির মধ্যেই ফুল মেলে দিল তার সব কটি পাপড়ি। ভোরের রোদ্দুরে তার অপরূপ হলুদ ঝলক দিল। হলুদের মধ্যে গাঢ় মেরুন দিয়ে আঁকা চোখ। সেই চোখের তারায় রূপ ঠিকরোল যেন পুব আকাশের তারা। ফুলের বুকের ঠিক মাঝখানটার হলুদ মেরুন রেণু থেকে বেরিয়ে এল মৃদু সুগন্ধ।

হারুমালি সকালবেলায় গাছে জল দিতে এসে বেমক্কা একখানি ফুলগাছকে দেখে থমকে দাঁড়াল একটু ভাবল, ওদিকের বাগান থেকে বীজ এনে ফেলেছিল পাখি-টাখি। এখন গাছ বেরিয়েছে। ফুল ফোটার আগে নজর পড়েনি হয়তো। সে বিশেষ যত্নও করল না। উপড়ে ফেলল না। ক-দিনেই গাছ বেড়ে গেল অনেকটা। সরু সরু সবুজ পাতায় ডালপালা ভরে গেল অনেকটা। এত সবুজ তারা, যেন স্কুলের কচি ছেলেমেয়ে। তার পর অজস্র কুঁড়ি থেকে ফুটে বেরোল অজস্র চোখ আঁকা সোনার মতো হলুদ ফুল। সুগন্ধে ভরে গেল সবজিবাগান। এমনকী, ওই হলুদের ছটা লাগল রজনমালির চোখে। সে সব কাজ ফেলে ছুটে এল বাগানের পশ্চিম প্রান্তে। নির্নিমেষ দেখতে লাগল গাছটা। তার নাকে লাগল সুগন্ধের ঝাপটা। এমন মাতাল-করা এ গন্ধ যে, আবেশ তার শরীর জুড়ে রিমঝিম বেজে উঠল— যেন কোনও কাঙ্ক্ষিত প্রিয়কে সে স্পর্শ করতে চলেছে। তখন, ওই মোহাবেশের মধ্যে দিয়ে সে আমার শুনল অসামান্য মধুর ডাক—'রজনমালি, ও রজনমালি! এই যে আমি ডাকছি। এই বাগানের হলুদ ফুল!'

রজনমালি অস্ফুটে বলল, 'কী সুন্দর তুমি! কী সুন্দর তোমার সুগন্ধ! তোমাকে দেখতে যেন ঠিক পুব আকাশের তারার মতো! তোমার গন্ধ যেন স্বর্গের পরিজাতকেও হার মানায়। ফুল, তুমি কেন ওই বাগানে ফুটে আছ? ওই বিবর্ণ, নীরস সবজিবাগান তোমার জন্য নয়। আমি তোমাকে নিয়ে আসব এখানে, এইখানে।

রজনমালি নিজের বুকের দিকে আঙুল তুলল। ফুল বলল, 'মালি, আমি যখন তোমাকে ভালবেসে তোমার বাগানের এককোণে পড়ে থাকতে চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে উপড়ে ফেলেছিল। আমাকে চিনতে পারো?'

'তুমি সে-ই?'

'আমি-ই সে, মালি। কেন আমাকে ধরে রাখলে না? আমি তো ভালবেসেছিলাম তোমাকে মালি।'

'আমাকে ক্ষমা করো। ফিরে এসো তুমি। ওই হারুটা ফুলের কিস্যু বোঝে না। ও

তোমাকে একটুও ভালবাসবে না। তুমি চলে এসো।'

তখন হারুমালি নিড়ানি নিয়ে এসে পৌঁছল সেখানেই। একটা দুষ্টু পোকা, পাতাখেকো, ফুলখেকো পোকা, হলুদ ফুলগাছের গা বেয়ে উঠছে দেখতে পেয়ে খুঁচিয়ে সে পোকাটি ফেলে দিল মাটিতে। মেরে ফেলল। ফুল হাসল। রজনমালি স্তব্ধ হয়ে দেখল এই আদর। আর পশ্চিমের নক্ষত্রের প্রসারিত বাহুর মধ্যে ঠিক তখনই এসে ধরা দিল পুব আকাশের তারা। দুজনে একসঙ্গে হারিয়ে যাবে বলে।

